ফরহাদ মজহার

ক্ষমতার বিকার

আগামী

দ্বিতীয় সংস্করণ ভাদ্র ১৪২১ আগস্ট ২০১৪
প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭
প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২
প্রচ্ছদ আনওয়ার ফারুক
মুদ্রণে স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন ঢাকা
মূল্য : ৬০০.০০ টাকা
Khhmotar Bikar : : collection of essay by Farhad Mazhar
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
First Published : September 2007
Second Edition : August 2014
Price : Tk. 600.00
ISBN 978 984 04 1682 0

উৎসর্গ

দমন, নির্যাতন, কারাগার ও ফাঁসি মানুষের ইতিহাস রুখে দিতে পারে না
বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিপর্যয় ও ক্ষমতার বিকারের বিরুদ্ধে যে যেখানে লড়ছেন–
বিশেষত ফুলবাড়ি, কানসাট ও শনির আখড়ার অকুতোভয় জনগণ– এগারো জানুয়ারির
পর খালিশপুরের শ্রমিক ও বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষক ভাইবোন এবং সর্বশেষ
এই দেশের জনগণের পক্ষে নিজেদের আবারও লড়াকু প্রমাণ করা ২০ থেকে ২২ আগস্টের
ছাত্রছাত্রীদের জন্য।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

দুই হাজার সাত সালে বাংলাদেশে একটা রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে, এখানে একসাথ করা লেখাগুলোর সময়কাল, প্রসঙ্গ ও পরিপ্রেক্ষিত তাকে ঘিরে। এই সময়ের সরকারকে এক-এগারো বা মঈন-ফখরুদ্দিনের সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলা হয়।

তারপর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি যে দিকে ধাবিত হয়েছে, এই নিবন্ধগুলো তাকে অনুসরণ করেই এগিয়েছে। বলাবাহুল্য, ফরহাদ মজহার তখনই স্পষ্ট করে দেখাতে চেয়েছেন যাকে নিছক দুর্নীতি-বিরোধী অভিযান, রাজনৈতিক দলগুলোর অপশাসন ও দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে একটি 'সুশীল' ক্ষমতা গ্রহণ বলে সমর্থন ও বাহবা দেবার জোর প্রচারণা চলেছে, সেই কৌশলের আড়ালে আসল উদ্দেশ্যটি কী, এবং বাংলাদেশের জন্য ঘোরতর বিপদটি কোথায়। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সুনির্দিষ্ট কোন প্রকল্পের অধীনস্থ করে গড়ে তুলতে বাংলাদেশকে সেক্যুলার বনাম ইসলাম— এই রাজনৈতিক মেরুকরণ আর তার ছকে সামাজিক বিভাজনের দিকে তখন ঠেলে দেবার চেষ্টা চলছিল।

তারপর বহু ঘটনা-ঘটনের মধ্য দিয়ে, আজ বাংলাদেশ ঠিক সেই বিপদেরই মুখোমুখি; গভীর খাদে পড়ে আছে। সেই সংকট উত্তরণের চেষ্টায়, প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও করণীয় নির্ধারণে এই লেখালেখিগুলো নিয়োজিত ছিল। সত্য হল, 'গণশক্তি' গড়ে তুলে পরাশক্তির প্রকল্প ব্যর্থ করে দেবার তাবৎ শর্ত এবং সম্ভাবনা তৈরি হবার পরও বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সংগ্রামকে সেই অভিমুখে পরিচালিত করা যায় নি। দুই হাজার আটের নির্বাচন শুধু অবৈধ ক্ষমতা দখলকে বৈধতা দিয়ে নিরাপদে প্রস্থানের বন্দোবস্তই করে নি, পরিণতিতে নির্বাচিতদের জন্য বিপুল শক্তি নিয়ে রাষ্ট্রের ফ্যাসিস্ট রূপান্তরের সুযোগ ত্বরান্বিত করেছে।

বিগত পাঁচ বছরে এখানকার রাজনীতিতে নতুন বহু উপাদান যুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু সংকটের চরিত্র বদলায়নি। ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গেরোটিও একই আছে। তিনটি কারণে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তি-জোটের কাছে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত, ধর্মীয় পরিচয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান,

বিপুল জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা— তা এখন এতই প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে যে আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিদেশি হস্তক্ষেপ ও প্রতিযোগিতা বাংলাদেশকে ঘিরেই তীব্রতর হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সমীকরণের সুবিধা পেতে স্থানীয় মেরুকরণকে কথিত দ্বিতীয় 'মুক্তিযুদ্ধ' নামে এক বাঙালি জাতীয়তাবাদী প্রকরণে হাজির করা হয়েছে যার সাথে বুশ-জমানার ওয়ার অন টেরর-কে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। কার্যত যা এখন আঞ্চলিক শক্তির প্রণোদনা ও সমর্থনে সীমাহীন রাষ্ট্রীয় নৃশংসতায় ভর দিয়ে টিকে থাকতে চাইছে। রাখঢাক না রেখেই ঘোষণা করছে, সেক্যুলার যুদ্ধ সম্পন্ন করার আগে গণতন্ত্রের দরকার নাই।

বহুকাল গত হয়েছে, দুনিয়াতে স্থানীয় যুদ্ধ বলে এখন আর কিছু অবশিষ্ট নাই। কোনো না কোনোভাবে হয় সেটা আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সম্প্রসারণ, না-হয় স্থানীয় দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহণ করছে। বাংলাদেশের বর্তমান সংঘাতের চরিত্র অনুধাবণের ক্ষেত্রেও এই বাস্তবতা মনে রাখলে এখনকার পরিস্থিতি বোঝার সুবিধা। এই পরিস্থিতিতে, রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে কোন্ কোন্ নীতি আর আদর্শিক লড়াইয়ের পাটাতনে দাঁড়ালে একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব— এই বইয়ের লেখাগুলো সেই রাজনৈতিক দিশা নির্মাণে প্রবলভাবে কাজে আসবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

মুসতাইন জহির

ভাদ্র ১৪২১। আগস্ট ২০১৪।
ঢাকা।

সূচিপত্র

কেন এই বই? ১১ ক্ষমতার বিকার ও গণশক্তির উদ্বোধন ১৮ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও
বলপ্রয়োগের রাজনীতি ৩৫ অন্তর্ঘাত না নির্বাচন ৪১ গুড়েবালি অথবা গুড়ের মধ্যে
বালি পিঁপড়েও খায় না ৪৯ প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে শীত কমেনি ৫৫ মেরেছো
কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেবো না! ৬০ কেউ কেউ এতো 'খুশি' কেন ৬৬
বেলুন টেপাটিপি ৭৩ সংকটের মূল্যায়ন এবং দেশ ও দশের স্বার্থ : এক ৭৯ সংকটের
মূল্যায়ন ও দেশ ও দশের স্বার্থ : দুই ৮৬ র‍্যাংগস ভবন, বস্তি উচ্ছেদ ও পেন্টাগণ ৯২
তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি! ৯৯ রাজনৈতিক গতিপ্রক্রিয়া ও
নতুন মেরুকরণের সম্ভাব্য ফলাফল ১০৬ জটিল আবর্তে পড়েছে বাংলাদেশ ১১৩ আমি
কোকাকোলা খাই না ১১৯ টাটার প্রস্তাব কি আসলেই 'বিনিয়োগ' প্রস্তাব? ১২৫
টাটা কাহিনি ১৩১ বার্ড ফ্লু : পরাধীন সময় ও পরাধীন চিন্তা ১৩৭ দিল্লী ১৪ সার্ক সামিট
ও বাংলাদেশের রাজনীতি ১৪৪ ভূতের কারবার!! ১৫০ রাজনীতিই রাজনীতি
মোকাবিলার একমাত্র পথ ১৫৬ পহেলা মে, লাল শুভেচ্ছা ১৬৩ বন্দুকের নলই সকল
রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস– কার তত্ত্ব ১৬৯ আমরা আসলে কী চাইছি ১৭৬ লেখালিখি
ও লেখকের কর্তব্য ১৮৪ গণমাধ্যম, রাষ্ট্র ও মানবাধিকার জনগণের আস্থা অর্জন জরুরি
১৯০ অনাহারি পাটকল শ্রমিকের মৃত্যু এবং বাজেট প্রসঙ্গ ১৯৭ বাজেট ও নয়া
উপনিবেশবাদী নীতি ২০৩ ভাবতে হবে, কিন্তু কীভাবে ২০৯ মানবাধিকার ও আইনী
প্রক্রিয়ায় বিচার ২১৪ বাজেয়াপ্ত রাজনীতি ২২১ ঘটনা দ্রুত ঘটছে ২২৭ ছবিটি
দেখছিলাম ২৩২ ট্রুথ কমিশন নাকি তামাশা ২৩৭ চাই সহনশীলতা ও আরো বিপর্যয়ের
আগে বুদ্ধিমান প্রস্থান ২৪৩ 'সিডর' ও রাজনীতির অন্ধকার দিক ২৪৮ ধসে পড়া ছাদে
জীবন্ত আটকে পড়া শ্রমিক এবং একশ পার্সেন্ট হালাল ফ্রিজ ও ডিপ ফ্রিজ ২৪৯
কয়েকটি বিনীত প্রশ্ন ২৫৭ নববর্ষের শিক্ষা : বেনজিরের জীবন থেকে ২৬২
সাম্রাজ্যবাদ, কৃষি ও বীজ ২৬৮ কী করে হাইব্রিড ধানের কোম্পানি বন্যা ও সিডরের
সুযোগ নিলো ২৭৪ রক্ত শুষে নিয়ে এখন লাশ ফেরত দেবার বাহানা ২৮২
ফরহাদ মজহারের কাছে এক ডজন প্রশ্ন ২৮৭
সাপ্তাহিক ২০০০ ফরহাদ মজহারের সাক্ষাৎকার ২৯৩

কেনো এই বই

পত্রপত্রিকায় সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আমার সাম্প্রতিক লেখালিখি ও সাক্ষাৎকার একটি মলাটের মধ্যে একসঙ্গে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন অনেকে। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লেখালিখিকে দৈনিক পত্রিকার ভাষায় 'কলাম' বলা হয়। তথ্য, বিশ্লেষণ ও তত্ত্ববিচার এই ধরনের লেখায় গৌণ ভূমিকা পালন করে, বরং শক্তিশালী 'কলাম' লেখকরা উল্টা ঘটনাঘটনের উপাদানে পরিণত হন। কারণ তাঁদের লেখালিখি পাঠকদের প্রভাবিত করে এবং সমাজে নতুন রাজনীতির সম্ভাবনা তৈরি হয়। সে কারণে এই ধরনের লেখালিখিকে প্রতিদিনের ঘটনা ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রাম থেকে আলাদা করে পাঠ করলে লেখার কিছুই প্রায় বোঝা যাবে না। বিশেষত, খেয়াল রাখতে হবে, লেখাগুলো লেখা হয়েছে 'জরুরি অবস্থা'-র অধীনে। অধিকাংশ সময় তরবারির নিচে মাথা রেখে। লেখা হয়েছে তখন যখন তথাকথিত লিখিয়েরা কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে এবং তথাকথিত 'মুক্তচিন্তা'র ধারক ও বাহক গণমাধ্যমগুলো তারস্বরে ঘোষণা করে যাচ্ছে যে তারাই নাকি লেখালিখি করে এমন একটি সরকার এনেছে যাকে একমাত্র বন্দুকের নলের ওপর স্থাপন করেই জনগণের কাছ থেকে আনুগত্য আদায় করা যায়। তদুপরি এই এক অবিস্মরণীয় সরকার এনে তারা তুমুল অহংকারে দর্পিত ও গর্বিত যাকে 'তত্ত্বাবধায়ক' বা 'অন্তবর্তীকালীন' ইত্যাদি কোনো ভূষণেই ভূষিত করা যায় না। যে সরকারের সমর্থনের ভিত্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও অস্ট্রেলিয়া এবং নেপথ্যে ভারত। ভারতের ভূমিকা অনেকটা ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলে বাঘের মোষ ধরার জন্য অপেক্ষা করে থাকা হায়েনার মতো। এক দঙ্গল বাঘ লাফ দিয়ে মোষের গলা কামড়ে ধরছে, কেউ কেউ তার পিঠ ও পশ্চাৎভাগ খামচে ধরছে। আক্রান্ত ও কাতর মোষ পড়ে যাচ্ছে মাটিতে, তার গোঁ গোঁ ধ্বনি ও শেষ নিঃশ্বাসের বাতাস টেলিভিশনের কাচ ভেদ করে গায়ে এসে লাগছে। আর পেছনে সেই মোষের মাংসে ভাগ বসাবার জন্য আকুল আগ্রহে হায়েনার দৃশ্যমান অপেক্ষা। একসময় স্বপ্ন পূরণ এবং মাংসে মুখ ডোবানোর চিত্র। লেখাগুলো একসঙ্গে করার পর নামকরণ করতে গিয়ে বিপদে পড়ে যাই। কোনো একটি নামে লেখাগুলোকে ধরতে পারছিলাম না। তাছাড়া কিছু বিষয় তত্ত্বগত দিক থেকে

আলোচনার দরকার বোধ করেছি, লেখাগুলোর মধ্যে যার ইঙ্গিত আছে অথচ লেখা হয় নি। অবশেষে নাম দিয়েছি 'ক্ষমতার বিকার। সারমর্মে বলতে চেয়েছি আমরা এক ভয়াবহ রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হয়েছি। এই বিপর্যয়ের মধ্যে পতনের জন্য পরস্পরকে দোষারোপ করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বা নৈর্ব্যক্তিক যে সকল কারণে ক্ষমতার বিকার ঘটেছে তাকে ঠিকভাবে বিশ্লেষণ ও বোঝা। যদি আমরা সেটা বুঝতে পারি কেবল তখনই আমরা জনগণের মধ্য থেকে পরাশক্তি ও বহুজাতিক কর্পোরেশানগুলোর বিপরীতে জনগণের ক্ষমতা পুনর্নিমাণ বা পুনর্গঠন করতে সক্ষম হবো। এই ক্ষমতাকেই আমি 'গণশক্তি' বলেছি– যে শক্তি পরাশক্তি ও বহুজাতিক কোম্পানির ভাড়াটে ক্ষমতা নয়, জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও সংকল্পের শক্তি দিয়ে তৈরি। কী করে এই গণশক্তির উদ্বোধন ঘটানো যায়? রাজনৈতিক হয়ে ওঠা, রাজনৈতিকতার চর্চার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র হিশাবে বাংলাদেশের গঠন ও বিকাশকেই–অর্থাৎ গণশক্তিকেই রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত করবার জন্য যাঁরা লড়তে প্রস্তুত তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং বিপরীতে রাজনৈতিকতার এই প্রক্রিয়াকে যারা ধ্বংস করতে উদ্যত এবং সাময়িক সফল হয়ে যারা আজ বাংলাদেশকে খামচে ধরেছে তাদের শত্রু জ্ঞান করে জনগণকে সংগঠিত করাই গণশক্তির উদ্বোধন ও বিকাশের প্রধান শর্ত। এটা স্পষ্ট বাংলাদেশকে যারা রাজনীতিশূন্য করতে চায় তারা পরাশক্তি, বহুজাতিক কর্পোরেশান, আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা ও নানান দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তিকে শত্রু গণ্য করে না। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের প্রধান বাধা এখানেই। অথচ দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের আসল হোতাদের জনগণের রুদ্ররোষ থেকে আড়াল করাই শুধু নয়, বরং তাদেরই প্রতিনিধি নিয়ে সরকার গঠন করে যারা এখন রাজনৈতিক দলের চরম দুর্নীতিবাজদের ক্ষমতায় এনে বাংলাদেশের সমূহ সর্বনাশ ঘটাতে চায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামই এই সময়ের কর্তব্য।

কারা এই লড়াইয়ের প্রধান শক্তি? শ্রমিক, কৃষক এবং নিম্ন আয়ের গরিব খেটে খাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। খামচে ধরা বাংলাদেশে আজ তাদেরই নাভিশ্বাস উঠবে। আমার অনুমান সাধারণ সৈনিকরা সৈনিকতার মর্যাদা রক্ষা এবং দেশ ও দশের প্রতি তাঁদের ভালবাসার তাগিদে এই লড়াইয়ে জনগণের পক্ষে থেকে সেনাবাহিনীকে পরাশক্তি ও বহুজাতিক কর্পোরেশানের স্বার্থে ব্যবহার করতে দেবেন না। অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক, গরিব সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ও সৈনিকের মৈত্রীই গণশক্তির পূর্ণ বিকাশের প্রধান শর্ত। বাংলাদেশের সুরক্ষা ও জোর কদমে এগিয়ে যাবার এটাই পথ।

আমার লেখালিখি এই গণশক্তির উদ্বোধনের জন্যই। বলাবাহুল্য যাঁরা লেখালিখি করেন তাঁরা কোনো না শ্রেণী বা স্বার্থের পক্ষেই লেখালিখি করেন। যদি শ্রেণীবিচার আমাদের পঠনপাঠন পদ্ধতির অন্তর্গত বিষয় হয় তাহলে বিশেষ

সমাজে ও বিশেষ বিশেষ কালে বিভিন্ন শ্রেণী কিভাবে মতাদর্শিক লড়াই-সংগ্রাম চালায় তার একটা ছবি আমরা পত্রপত্রিকায়–বিশেষত কলাম লেখকদের লেখালিখির মধ্যেও ধরতে পারি। বলাবাহুল্য, শ্রমিক, কৃষক ও খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি আমার বিশেষ পক্ষপাত আছে, লেখায় আমি তা লুকায়ে রাখি না। সেই দিক থেকে আমি আদৌ সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ রক্ষা করতে পেরেছি কিনা পাঠক নিজেই তার বিচার করবেন, আশা করি।

আমার লেখালিখিতে সৈনিকদের প্রতিও আমি পক্ষপাত দেখিয়েছি। বারবারই বিভিন্ন সময়ে বলেছি যে সেনাবাহিনী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের মধ্যে মৈত্রীই বাংলাদেশের বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণের পথ। আমার এ অবস্থান নীতিগত, কৌশলগত নয়। আমার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় সৈনিকতা ও সৈনিকতার মর্যাদা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। কারণ গণশক্তির প্রশ্ন একই সঙ্গে সৈনিকতার চর্চা ও বিকাশেরও প্রশ্ন। কিন্তু সেই চর্চা তখনই সম্ভব যদি প্রতিটি নাগরিকের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা আমরা নিশ্চিত করতে পারি। জনগণের রাজনীতি মাত্রই সৈনিকতার ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা ও সজ্ঞানতা। নাগরিক মাত্রই সৈনিক–এই নীতিই সার্বভৌমত্ব কখনই রাখতে পারবে না।

গরিব শ্রমিক, কৃষক ও খেটে খাওয়া মানুষ যেখানে পেশাদার সৈনিকদের নেতৃত্বে যে কোনো সময় দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা পেয়ে সার্বক্ষণিক দেশ রক্ষার জন্য তৈরি থাকার গুরুত্বের কথা বলে, বিপরীতে ধনী ও শোষক শ্রেণী এই নীতির গুরুত্ব বোঝা দূরে থাকুক, সৈনিক, সৈনিকতা বা সেনাবাহিনীকে যেন তাদের ধনসম্পত্তির পাহারাদারের বেশি কিছু হয়ে উঠতে না পারে সেই নীতির চর্চা করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দিক থেকে সৈনিক ও সৈনিকতা রাষ্ট্র গঠনের গুরুত্বপূর্ণ দিক। শাসক ও শোষক শ্রেণী সৈনিকদের রাজনীতি–অর্থাৎ ক্ষমতার ভাগাভাগি থেকে দূরে থাকার যে নীতি কায়েম রাখে তার গোড়া সৈনিকদের শুধু ধনীদের সম্পত্তি পাহারা দেবার ধারণা থেকেই আসে। সৈনিকদের এই দিকগুলো সম্পর্কে উপলব্ধি করতে হবে। ধনীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জনগণের বিরুদ্ধে সৈনিকদের ব্যবহারের যে নীতি ধনী শ্রেণী চর্চা করে এই নীতির অবসান ঘটিয়েই জাতীয় সেনাবাহিনী হিশাবে সৈনিকদের মর্যাদা পাকাপোক্ত করতে হবে।

'সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ' কথাটা আমি পাঠকদের কাছে সহজে পৌঁছাবার জন্য ব্যবহার করি, তবে আমি যে-চিন্তা বা ভাবাদর্শে জীবনযাপন করি 'সংখ্যাগরিষ্ঠতা' সেই অন্দরমহলের ভাষা নয়, বাইরের জবান অর্থনৈতিকভাবে শোষিত শ্রেণীর দিক থেকে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা রাজনীতির বিচার নিছকই সংখ্যার গরিষ্ঠতার প্রশ্ন নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে সম্পর্কের ভিত্তিতে আমরা অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি গড়ে তুলি সেই সম্পর্কের রূপান্তর বা বিকাশের প্রশ্নও বটে। অতএব একে পরিসংখ্যানগত ধারণা

গণ্য না করে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে আমার বক্তব্যের প্রতি সুবিচার হবে বলে আমার ধারণা। শ্রেণীসম্পর্কের চরিত্রই যদি শোষণ ও নির্যাতনের হয়, অল্প কিছু মানুষ যদি অধিকাংশকে নিজেদের অধীন রাখে– সেই সম্পর্কের বিলয় তো আমরা চাইবই। কিন্তু একই সঙ্গে নিজেদের ইচ্ছা ও সংকল্পের মধ্যে সেই সাধও আমাদের সাধ্যের অধীন হওয়া চাই যেখানে নতুন ধরনের সম্পর্কের কথা আমরা ভাবতে পারি। নতুন সম্পর্কের নির্মাণ ও বাস্তবায়নও সম্ভব করে তুলতে পারি।

সংখ্যাগরিষ্ঠতার ধারণাটি আসলে নির্বাচনী রাজনীতির পরিভাষা। ভোটাভুটির মধ্য দিয়ে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভ করে তারাই সকলের শাসক হয়। যদি দেখা যায় সমাজের অর্ধেকের কম মানুষই ভোট দিতে যায়নি, তবুও যারা গিয়েছে তাদের মধ্যে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পায় তারাই শাসন করে–এই হচ্ছে ভোটাভুটি দিয়ে শাসক নির্ধারণ। সংখ্যালঘু অংশের প্রতিনিধি হলেও ভোটের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত বলে একেই 'গণতন্ত্র' বলে প্রায় সব শাসক শ্রেণী প্রচার করে। যারা ভোট দিয়েছে তাদের কাছ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাওয়াকেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলে চালায়। এই প্রচারে সাধারণ মানুষ প্রভাবিত ও প্রতারিত হয়। কিন্তু গরিব, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা শক্তিও বটে। সেই দিক থেকে 'সার্বজনীন ভোটাধিকার' জনগণের যে-অধিকার স্বীকার করে নেয় তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। সেই দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে জনগণকে সচেতন করা একটা কাজ অবশ্যই। সেই দিক থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে বিষয়গুলো বিবেচনা করেছি।

অর্থনৈতিকভাবে সমাজ যখন বিভক্ত বা বিভাজিত থাকে তখন সেই বিভাজনের বাস্তবতাকে মনে রেখে রাজনৈতিক গতিপ্রক্রিয়ার বিচারকে শ্রেণী বিচারের পদ্ধতি বলে গণ্য করা হয়। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী কিভাবে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই-সংগ্রমে করে এবং সেই সংগ্রামে তাদের ভাষা ও বক্তব্য বিচারের জন্য এখনো এই পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর এবং রাজনীতির গতিপ্রক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে খুবই নির্ভরযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি। আমার শ্রেণী পক্ষপাত নিছকই দ্বন্দ্ব সর্বস্ব দৃষ্টি কিম্বা সংঘাত ও সংঘর্ষের চশমা দিয়ে ইতিহাস বিচার নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ধরনেই লেখালিখি 'বামপন্থী' ধারা হিশাবে পরিচিতি পাওয়ার কারণে গরিব ও খেটে খাওয়া শ্রেণীর দিক থেকে বাংলাদেশের রাজনীতির বিচার অনেকের কাছে খণ্ডিত অবস্থান থেকে সমাজ ও ইতিহাস দেখা মনে হতে পারে। মার্কস, লেনিন বা মাওজেদংয়ের লেখালিখি যাঁরা পড়েছেন এবং তাঁদের রাজনৈতিক সাফল্য যাঁরা পর্যালোচনা করেছেন তাঁরা 'বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ' কথাটির সঙ্গে পরিচিত। তাঁরা নির্যাতিত ও নিপীড়িত শ্রেণীর দিক থেকে জগতকে দেখা ও বিচার মোটেও খণ্ডিত চোখে বাস্তবকে দেখা, বিচার বুঝবেন না। শ্রমিক, কৃষক খেটে খাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চোখে বাংলাদেশের রাজনীতির বিচার মানে খণ্ডিত, দ্বন্দ্বসর্বস্ব ও সংঘর্ষপরায়ণ ছবি তুলে ধরা নয়। বরং ইতিহাসের বিশেষ

দেশকালপাত্রে মানুষের ইতিবাচক ভূমিকা নির্ধারণের জন্যই বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ–অর্থাৎ বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতার একটা সামগ্রিক ছবি তুলে ধরা। সামগ্রিক গতিপ্রক্রিয়া বোঝার জন্যই নিপীড়িত ও নির্যাতিত শ্রেণীর দিক থেকে বাস্তবতা বিচারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। একমাত্র খেটে খাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থের দিক থেকেই এই ধরনের সামগ্রিকতা আশা করা যায়। কারণ, অন্য শ্রেণীগুলো যেখানে বিদ্যমান ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে শুধু নিজের স্বার্থের দিকটাকে প্রধান করে দেখতে গিয়ে অত্যাচার, নির্যাতন ও শোষণের সম্পর্ককে আরো চিরস্থায়ী করে তোলে, গরিব ও খেটে খাওয়া শ্রেণী বিদ্যমান ব্যবস্থায় অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও শোষিত বলে বিদ্যমান ব্যবস্থার অবসানের জন্য লড়াই-সংগ্রাম করে। ফলে এই শ্রেণীর মুক্তি সমাজের অন্য সকল শ্রেণীর মুক্তিও বটে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় গরিব ও খেটে খাওয়া জনগণের দৃষ্টিই একমাত্র সামগ্রিক ও বাস্তবসম্পন্ন হতে পারে। দৈনিক পত্রিকার কলাম লেখায় এই তত্ত্বগত দিকগুলো সবসময় পরিচ্ছন্ন ভাবে হাজির করা যায় না। প্রয়োজনও নাই। কিন্তু এখন এক সঙ্গে যখন লেখাগুলো পড়বেন, তখন এই দিকটা মনে রাখলে ভালো হয়।

তাহলে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষপরায়ণতার ছবি তুলে ধরা নয় বরং লেখালিখি ইতিহাসের মধ্যে নতুন চিন্তা বা নতুন সম্ভাবনা শনাক্ত করবার জন্যই। পাঠকদের কাছে তারই একটি পরীক্ষা দেবার জন্য খাঁটি লেখকরা উদগ্রীব থাকেন। নতুন চিন্তা বা নতুন সম্ভাবনা গরিব ও খেটে খাওয়া শ্রেণী বাস্তবায়ন করতে পারে যদি তা একই সঙ্গে সকলের মুক্তির পথ হয়। তাহলে গরিব ও খেটে খাওয়া শ্রেণীর পক্ষপাত বাংলাদেশে আমাদের সকলের ভবিষৎ পথটা শনাক্ত করবার জন্যই। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লেখালিখির সীমাবদ্ধতা আছে, মানতেই হবে। তাছাড়া সমসাময়িক ঘটনার মধ্যে আসলে নতুন কি উপাদান তৈরি হচ্ছে তা ধরতে পারা সহজ কাজ নয়। 'জরুরি অবস্থার মধ্যে যতোটা পেরেছি লিখেছি। অনেক সময় সহজ কথা সহজভাবে বলতে পারি নি 'জরুরি অবস্থা'-র জন্যই। এখন, ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের সঙ্গে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে তুলেছে। ক্ষমতাসীন উপদেষ্টা পরিষদ জনগণের ক্ষোভবিক্ষোভের ন্যায্যতা মেনে নেওয়া দূরে থাকুক, তাকে 'অপশক্তির ষড়যন্ত্র' প্রচার চালিয়ে পরিস্থিতিকে আরো সংক্ষুব্ধ করে তুলছে। মনের কথা প্রাণখুলে বলা এখন আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার পরেও আমি এই লেখাগুলো একসঙ্গে এক মলাটের মধ্যে প্রকাশ করতে রাজি হয়েছি, পাঠকদের কাছে পরীক্ষা দেবার জন্যই। তাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে লেখাগুলো পড়েছেন এখন একসঙ্গে পেয়ে আমার চিন্তার ভিত্তি ধারাবাহিকতা সম্ভাবনা সীমা দোষ বিচ্যুতি সবই বিচার করবার সুযোগ পাবে না, আশা করি। এই অসময়ে 'জরুরি অবস্থা'-র

কারণে লেখা যদি মাঝে মধ্যে হেঁয়ালি মনে হয় তাহলে আগাম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু মূল বিষয় বা আমাদের এখানকার কর্তব্য সম্পর্কে কিছু দিকনির্দেশনা দিতে পেরেছি কি না সেটাই হচ্ছে আসল কথা।

পাঠকের কাছে দুটো পরীক্ষা দিতে চেয়েছি। প্রথমত, বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে আত্মবিকাশের লড়াইয়ে বাংলাদেশের বিপদ-আপদ সম্পর্কে আগাম হুঁশিয়ারি দিতে পেরেছি কিনা। আমি বারবারই জোর দিয়েছি যে এগারোই জানুয়ারির ঘটনা আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক ক্ষেত্রে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' অন্তর্গত বিষয় এবং তার আগের ও পরের ঘটনাবলিকে এই আলোকেই বুঝতে হবে। এমনি সামনে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে। এই বিবেচনাতেই বিশেষত পরীক্ষা দিয়েছি যে সৈনিক ও জনগণের মধ্যে মৈত্রী রচনা করতে সেনাবাহিনী ব্যর্থ হলে তার পরিণতি ভয়াবহ হবে। সেই সত্য পরিষ্কার উচ্চারণের সাহস ও সামর্থ্য ছিল কি না আমার, তার বিচার পাঠকরা করবেন। আজ আফগানিস্তান, ইরাক ও পালেস্টাইনের পরিস্থিতির খুবই কাছাকাছি চলে এসেছে বাংলাদেশ। যে আশাংকা দীর্ঘদিন ধরে করে আসছি আজ আমরা সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি। এই ধরনের একটি পরিস্থিতিতে যে আমরা পড়ব এই কথাটা নব্বই দশকের শেষ থেকে আমি বলে আসছি। কোনো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব দ্বারা বলিনি। কারণ ষড়যন্ত্র তত্ত্ব দিয়ে আর যাই হোক ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি বোঝা অসম্ভব। বিশ্ব ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি এবং আমাদের সমাজের বিভাজন, বিভক্তি ও ভাঙনের চরিত্র দেখেই আমি আমাদের বর্তমান দুর্দশা আগমন অনুমান করেছি। তার রূপটাই এখন দেখছি। এখন প্রশ্ন– ইতিহাসের গতি ফিরিয়ে দিতে পারব কি এখন আমরা? এই প্রশ্ন আমার একার জন্য নয়। পাঠকদের জন্যও। তাঁরাই ভেবে দেখবেন, কারণ বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার লড়াইয়ে সকলকেই শামিল হতে হবে।

বলেছি যে যাঁদের জন্য আমি লেখালিখি করি তাঁরা এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। খেটে খাওয়া শ্রমিক, কৃষক আর গরিব জনগণই প্রধান। তাঁরা আমার লেখা পড়বেন, এই ভরসায় আমি লিখি না, বরং আমি বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটে তাঁদের কথা শিক্ষত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে বলতে পারছি কি না সেই পরীক্ষা দেবার জন্যই একসঙ্গে লেখাগুলো হাজির করেছি। যতোদিন এই শ্রেণীর মধ্যে সংবেদনশীল বিবেচনা সঞ্চার করতে আমরা ব্যর্থ হব ততোদিন সংখ্যাগরিষ্ঠের রাজনীতির সম্ভাবনাও ক্ষীণ বলেই আমার ধারণা। এই শ্রেণীর মধ্যে দলীয় বিভক্তি, বিভাজন ও আদর্শিক বিষয়াদি নিয়ে তর্কবিতর্ক ও পর্যালোচনার প্রকট অভাব থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও ভবিষ্যতের স্বার্থে একটা সাধারণ অবস্থানে যেতে পারি কি না সেই দিকে আমি খেয়াল রাখার চেষ্টা করেছি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সঙ্গে মহমর্মিতা বোধ করেন তাঁদের সংখ্যা কম নয়। এই সহমর্মিতা ও একাত্মতা তাঁদের নিজ শ্রেণীর বিকাশের

শর্তও বটে। বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের একটা অংশকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না যাঁরা টের পেয়ে গিয়েছেন যে গ্লোবালাইজেশানের এই যুগে নিজের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সঙ্গে একটা শ্রেণী-মৈত্রী রচনা না করা গেলে বাংলাদেশকে আর্থ-সামজিকভাবে শক্তিশালী করবার পথ রচনা ও তা বাস্তবায়ন অসম্ভব। ফলে সকলেই আমার পরীক্ষক হবেন, এই আশায় আমি লেখাগুলো একখানে জড়ো করে প্রকাশ করেছি। কারো কাছ থেকে লিখিয়ে হিশাবে স্বীকৃতি আদায় নয়। কিম্বা আমার চিন্তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা নয়, বরং পরিস্থিতির পর্যালোচনা এবং এই হাল থেকে বাংলাদেশের জনগণকে বের করে আনবার ক্ষেত্রে সংবেদনশীল নাগরিকদের মধ্যে চিন্তা ও কাজের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা সেটাই আমার চেষ্টা। বাংলাদেশের বর্তমান বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সহকর্মী ও বন্ধু অন্বেষণই এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য।

এই লেখাগুলো লিখবার ক্ষেত্রে আলফাজ আনাম আমাকে সবসময়ই তাড়া দিয়ে লিখিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বলাবাহুল্য, দৈনিক নয়া দিগন্তের সম্পাদকীয় বিভাগের সকলেই বিভিন্ন সময় ঝুঁকি নিয়েও অনেক লেখা বাংলাদেশের স্বার্থের প্রশ্নে নিরাপোষ থেকে আমাকে কথা বলতে দেবার সুযোগ দিয়ে পত্রিকাটি নিজের যে নীতিগত অবস্থান স্পষ্ট করে তুলেছে তার বিচার পাঠকরাই করবেন আশা করি। লেখাগুলো লিখবার ক্ষেত্রে প্রতি পদেই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা বিভিন্ন সময়ে আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন, বলাই বাহুল্য। তাঁদের পরামর্শ বিভিন্ন সময়ে আমার লেখাকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে যেমন সহায়তা করেছে, এইক সঙ্গে বিচ্যুতির হাত থেকেও রক্ষা করেছে বলে আমার ধারণা। বলাবাহুল্য, লেখার দায়দায়িত্ব আমারই, কিন্তু দেশ ও দশের প্রতি যে মমতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা আমার লেখালিখির ঘনিষ্ঠ পাঠক, সমালোচক ও প্রেরণাদাতা ছিলেন তার মূল্য অপরিসীম। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

লেখাগুলো একসঙ্গে একত্রিত করা এবং প্রাথমিক ভুল শোধরানোর কাজে মুসতাইন জহির প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। মেইকআপ করেছেন মনিরুজ্জামান। উবিনীগে (উন্নয়ন বিকল্পের নীতি-নির্ধারণী গবেষণা) আমার সহকর্মীরা আমাকে আমার পেশাগত কাজ থেকে অবসর দিয়ে আমাকে লেখাগুলো লেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁরা আমার দৈনন্দিনের সাহস হয়ে এই লেখায় নানাভাবে হাজির আছেন।

পরিশেষে দিগন্ত মিডিয়া করপোরেশনকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

ফরহাদ মজহার
২২/১৩ খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

বাংলাদেশের তিনটি অপরাধ

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরাশক্তির চোখে বাংলাদেশ তিনটি ঘোরতর অপরাধে অপরাধী। এই অপরাধ সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণের এখনকার বিপদের গুরুত্ব যেমন আমরা বুঝব না এবং একই সঙ্গে এই বিপদ থেকে বেরুবার পথের হদিস দেওয়াও সম্ভব হবে না।

প্রথম অপরাধ হচ্ছে : সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়; এ অভ্যুদয় যারা ঘটিয়েছে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের আরব, ইরানি বা পাকিস্তানি গণ্য না করে নিজেদের বাপদাদা চৌদ্দপুরুষের ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের মধ্যেই তাদের ভবিষ্যৎ বিকাশের বীজ নিহিত রয়েছে বলে তাকে আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু অন্যদিকে তারা ইসলামও ছাড়ে নি। অন্য কাউকে ইসলামের ব্যাখ্যা দেওয়ার এখতিয়ারও মানে নি।

দ্বিতীয় অপরাধ হচ্ছে এই জনগোষ্ঠী প্রাকৃতিক ও প্রাণ সম্পদে সমৃদ্ধ। তৃতীয় কারণ হচ্ছে এদের জনসংখ্যা অন্যান্য দেশের ভীতির কারণ এবং নিরাপত্তার জন্য হুমকি।

বাংলাদেশের প্রথম ও প্রধান অপরাধ এই যে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী গরিব এবং তাদের ধর্ম ইসলাম। পরাশক্তির চোখে ইসলাম পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে নতুন চিন্তা ও রাজনীতির ইন্ধন জোগাতে সক্ষম। বিশেষত কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের পতনের পর 'ইনসাফ' বা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের ধারণার অধীনে ইসলাম নির্যাতিত ও শোষিত শ্রেণীগুলোকে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে ফেলতে পারে। এই ভয় পরাশক্তিগুলো যথার্থই করে। এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ধরনে পরাশক্তিগুলোর যুদ্ধনীতির মধ্যে দুটো প্রধান প্রবণতা আমরা দেখি। প্রথমত, বর্বর ও সন্ত্রাসের প্রধান উৎস বলে ইসলামকে চিহ্নিত করা এবং ইসলাম ও ইসলাম প্রধান জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত ঐক্যবদ্ধ রাখা। 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধ' চালাবার জন্য ইসলাম ও ইসলাম-প্রধান সমাজগুলোর জন্য এই প্রচার ও প্রপাগান্ডা জরুরি। এই বিষয় নিয়ে প্রচুর লেখালিখি হয়েছে এবং আমাদের দেশেও একধরনের সচেতনতা আছে বলে এই বিষয়ে আমি অধিক কথা ব্যয় করব না।

তবে ইসলামবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধনীতির দ্বিতীয় দিকটা নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার। এই নীতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মতাত্ত্বিক বা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার পরিমণ্ডলের বাইরে ইসলামের রাজনৈতিক-দার্শনিক ভাবুকতা ও রাজনৈতিক শক্তির বিকাশকে রুদ্ধ করা, যেন বিশ্ব-পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা অতিক্রম করে মানবেতিহাসের নতুন ইচ্ছা ও সংকল্প নির্মাণে ইসলাম আদৌ কোনো ভূমিকা রাখতে না পারে। এই ধরনের কোনোপ্রকার সম্ভাবনাকে গোড়াতেই অস্বীকার করা হয়। ইসলামকে মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম এবং ধর্মতাত্ত্বিক পরিমণ্ডলে সংকীর্ণ রাখবার কাজটি ইসলামপন্থী ও ইসলামবিরোধী উভয়েই সমান দক্ষতার সঙ্গে করে। একটি সম্প্রদায়ের ধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব কিম্বা মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অধিক কিছু যেন না হতে পারে তার জন্য পরাশক্তি ও ইসলামবিরোধীরা যেমন সচেষ্ট, তেমনি মানবেতিহাসের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে যারা রুখে দিতে চায় তারাও সমান তৎপর। পরাশক্তির রাজনীতির এই দিক সম্পর্কে আমাদের সচেতনতার অভাব আছে। যার পরিণতি বাংলাদেশের জন্য মারাত্মক হতে পারে।

ইসলাম যেন মানবেতিহাসের সার্বজনীন ভাব, চিন্তা বা রাজনীতির উপায় না হতে পারে তার জন্য ইসলামের বিরোধিতাই শুধু নাই, একই সঙ্গে পরাশক্তির অধীন করে রাখবার দরকারে ইসলামের নানান ব্যাখ্যা ও নানান কিসিমের রাজনীতিও প্রচলিত। এই বাস্তবতা মনে রেখে সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই-সংগ্রামের আলোকে ইসলামি ভাবুকতা, চিন্তা ও রাজনীতির একটা পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। যদিও এই বইয়ে মলাটবদ্ধ লেখালিখির মধ্যে তার ছিটেফোঁটা ইঙ্গিত থাকতেও আমরা তা তুলবার অবসর পাই নি। ইসলামকে বারবারই 'আধুনিকতা' অর্থাৎ গ্রিক-খ্রিষ্টীয় ইতিহাস, জায়নবাদ (Zionism) এবং সেকুলারিজমের বিপরীতে দাঁড় করাবার প্রাণপণ কোশেশ আমরা দেখি। পাশ্চাত্য ইতিহাসের একটা ইতিবাচক মুহূর্ত হিশাবে সেকুলারিজম বা তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষতার' একটা বিচার হতেই পারে, কারণ পাশ্চাত্য মানুষের ইতিবাচক অভিজ্ঞতায় ধর্মনিরপেক্ষতার ভাব ও রাজনীতি যে অবদান রেখেছে তাকে অস্বীকার করার উপায় নাই। কিন্তু বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থায় সেকুলারিজম একান্তই ইসলামের বিরুদ্ধে পরাশক্তির যুদ্ধ এবং জায়নিজমের ছদ্মবেশী মতাদর্শ ছাড়া অধিক কিছুই নয়।

অর্থাৎ ইসলাম সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ রাজনীতির উর্ধে উঠতে যেন সক্ষম না হয় তার চেষ্টা ইসলামবাদী রাজনীতির মধ্যে যেমন, ঠিক তেমনি ইসলামের দুশমনদের মধ্যেও আছে। দুটোই সমান মাত্রায়। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা অতিক্রম করে যাবার জন্য যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ভাব বা রাজনৈতিকতার চর্চা দরকার ইসলাম-প্রধান দেশগুলোতে সেই বিকাশের গোড়াতেই আঘাত করা হচ্ছে নানান দিক থেকে। এই নীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামকে সাম্প্রদায়িক, ধর্মবাদী ও ধর্মতাত্ত্বিক রাজনীতির বা অন্য কথায় প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক প্রাচীন চিন্তা ও

মনোগঠনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা। বর্তমান পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা অতিক্রম করে যাবার জন্য ইসলাম আগামীর নতুন ভাব, নতুন চিন্তা বা নতুন রাজনীতি হাজির করতে সক্ষম কি না সেই বিচার দূরের কথা– এই অতি আবশ্যিক কাজটিকেই বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। গোড়ায় এই কাজ করা গেলে ইসলামপ্রধান দেশগুলোকে পরাশক্তির অধীন রাখা সহজ। এই দিকগুলো আমরা পাঠকদের বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে অনুরোধ করি।

বলাবাহুল্য, অন্যান্য ধর্ম, নীতি বা বিশ্বাসের মধ্যে মানবেতিহাসের আগামী দিনের ইচ্ছা বা সংকল্পের আহ্বান আছে। না থাকাটাই বরং বিস্ময়ের কারণ হবে। কিন্তু একইভাবে সেখানেও আমরা দুই প্রবণতার লড়াই দেখি। ইসলাম সম্পর্কে আমাদের নিষ্ঠা ও আগ্রহের প্রধান কারণ ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার। এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মের মধ্যে ভবিষ্যৎ ইতিহাস নির্মাণের উপাদান আদৌ আছে কি না সেই বিচারে মনোযোগী না হয়ে কীভাবে বিপুল জনগোষ্ঠির মনের অন্দরমহলে প্রবেশ সম্ভব?

পরাশক্তি ধারণা করেছিল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পুঁজিতান্ত্রিক রূপান্তর না ঘটিয়ে মাইক্রোক্রেডিটওয়ালা ও দাতাসংস্থাগুলোর মাধ্যমে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলে বাংলাদেশের জনগণকে পরাশক্তির ধ্যানধারণা ও আদর্শের গোলামে পরিণত করা যাবে। এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে দারিদ্র্য বিমোচনের নামে কোটি কোটি ডলার খরচ ও একটি কৃত্রিম 'সুশীল সমাজ' বানিয়ে এবং বাংলাদেশকে দুর্নীতিবাজ, অসৎ ও মৌলবাদীদের স্বর্গ বলে প্রপাগান্ডা চালিয়েও বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে পরাশক্তির গোলামে পরিণত করা যায় নি। বাংলাদেশের জনগণের এই স্বাতন্ত্র্যবোধ, মর্যাদাজ্ঞান এবং নিজেদের সার্বভৌম অস্তিত্ব সম্পর্কে আগের চেয়েও তুলনামূলকভাবে অধিক সচেতনতা পরাশক্তিকে বিপদে ফেলে দিয়েছে। এখন তারা আরো কঠিন আঘাত হানবার জন্য তৈরি হচ্ছে। এই বইটি তারই আগাম হুঁশিয়ারি হিশাবে পেশ করা হলো।

দ্বিতীয় যে অপরাধ করেছে বাংলাদেশ সেটা দৈব রহমতও হতে পারে। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। তেল, গ্যাস, কয়লা ও খনিজ পদার্থ ছাড়াও প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে প্রাণসম্পদ ও প্রাণের বৈচিত্র্য, মিষ্টি পানি ও অন্যান্য জৈব সম্পদ। একদিকে জ্বালানির চাহিদা বৃদ্ধি এবং কাজে কাজেই জ্বালানির উৎস ও সরবরাহের ওপর একচেটিয়া অধিকার কায়েমের জন্য পরাশক্তির নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অন্যদিকে বায়োটেকনলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নামক নতুন শিল্পখাতের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ করবার তাগিদ। একই সঙ্গে পানি বেসরকারিকরণ এবং জলমহাল ও নদীনালা কোম্পানির দখলে দিয়ে দেবার চিন্তাভাবনা চলছে। প্রাকৃতিক ও প্রাণ সম্পদের অধিকারী হবার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবার কারণে বাংলাদেশ আজ বিপজ্জনক সংঘর্ষ ও সংঘাতের মুখোমুখি হয়েছে। বাংলাদেশের এই অপরাধগুলো

জানা থাকলে পরাশক্তি ও তাদের এই দেশীয় দালাল ও ভাঁড়দের কথাবার্তা বোঝা সহজ হবে।

তৃতীয় যে কারণের জন্য বাংলাদেশ পরাশক্তির চোখে অপরাধী সেটা হল এই দেশের জনসংখ্যা। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো মহাদেশে যারা আদিবাসীদের হত্যা ও উৎখাত করে দখল করেছে কিম্বা কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে আদিবাসীদের নিজ বাসভূমেই জবরদস্তি থাকতে বাধ্য করেছে তাদের জন্য এই সংখ্যা হুমকি। জনসংখ্যা আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও যুদ্ধনীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক। অতএব জনসংখ্যা কমানো, একদেশ থেকে অন্যদেশে মানুষের চলাচল বা অভিবাসনের ওপর কড়াকড়ি বা নিয়ন্ত্রণ আরোপকে এই দিক থেকে দেখতে শিখতে হবে। ধনীদের ভোগদখল নিশ্চিত করবার জন্য গরিবদের টার্মিনেট বা 'নিয়ন্ত্রণ' করার কর্মসূচি আর পরিবার পরিকল্পনা সমার্থক নয়। সম্পদ ও সংখ্যার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রতিটি সমাজ এমনকি প্রতিটি পরিবারই কিছু কিছু পরিকল্পনা করে বা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। কিন্তু পরিবার পরিকল্পনা এক কথা আর যে কোনো মূল্যে যুদ্ধনীতির অংশ হিশাবে গরিবদের সংখ্যা খতম করবার কর্মসূচির সাম্রাজ্যবাদী মানে আমাদের বুঝতে হবে। শক্তির যুদ্ধের ভাষা হচ্ছে এই রকম : ধনী এবং ধনীদের দেশ ও তাদের শক্তিকাঠামোর বিরুদ্ধে আগামী দিনের সম্ভাব্য লড়াকুকে মায়ের গর্ভে এখনই হত্যা করবার খরচ যুদ্ধের ময়দানে হত্যার চেয়েও কম। একদিকে অবাধ বাজার ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক পুঁজির পুঞ্জিভবন ও আত্মস্ফীতি ত্বরান্বিত করে দুনিয়ায় অল্প কিছু ব্যক্তিকে ধনী করে আর সকলকে গরিব করবার বিশ্বব্যবস্থা আর অন্যদিকে দরিদ্রের সংখ্যা কমানোর নামে গরিবের ভ্রূণ গর্ভে নষ্ট করা– এই হচ্ছে দুই মুখো সাপের, তো সাম্রাজ্যবাদী নীতি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি অতএব গর্ভে আগামী দিনের যোদ্ধাদের হত্যার কর্মসূচি ছাড়া আর কী ! একই আলোকে 'এইডস'-এর নামে এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিশেষত অর্থনৈতিকভাবে গরিব দেশ থেকে ধনী দেশে মাইগ্রেশান বা ট্রাফিকিং বন্ধ করা এই নীতিরই ধারাবাহিকতা। জনসংখ্যা হ্রাস করবার কর্মসূচির সঙ্গে এইডস বা সন্ত্রাস দমনের নামে মানুষের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ একই সূত্রে গাঁথা। জনসংখ্যায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আজ পরাশক্তির জন্য হুমকি। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের জনগণকে কী ধরনের অপরাধে পরাশক্তিগুলো শনাক্ত করছে সেই দিকগুলো বুঝতে পারলে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার দিকগুলোও আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে।

'ক্ষমতার বিকার'?

সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লেখা বইয়ের নামকরণ কঠিন। প্রথমে শুধু নাম দিয়েছিলাম 'ক্ষমতার বিকার'। কিন্তু শুধু 'বিকার' নিয়ে কথা বলা আমার ইচ্ছা না। আমরা যে ভয়াবহ রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি এটা এখন আর কাউকে

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বোঝাবার প্রয়োজন পড়ে না। প্রশ্ন হচ্ছে এই বিকারগ্রস্ত অবস্থার বিকল্প কি? আমি নামকরণে দুটো দিকেরই ইঙ্গিত দেবার ভাষা খুঁজছিলাম। পাচ্ছিলাম না। এই বিকারের চিকিৎসা একমাত্র গণশক্তির উদ্বোধন দিয়েই সম্ভব। তাই নাম দিয়েছি : 'ক্ষমতার বিকার ও গণশক্তির উদ্বোধন'। এই বিকারের চরিত্র যেমন নতুন, গণশক্তির যে রূপ আমরা দেখব তার রূপও অন্যরকম হবে বলে আমি নিশ্চিত। কিন্তু শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি। কিন্তু আমার লেখায় যদি আগাম সংকেত পাঠক পড়তে পারেন তাতেই বইটি সার্থকতা লাভ করবে।

ঠিকই। বিকল্প কি? অধিকাংশেরই সহজ উত্তর, বিকল্প হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে একটা প্রস্থানের পথ বের করা। কিন্তু তার মানে কি? এই পথটা বাস্তবায়ন করবে কে? এই প্রশ্ন তুললে দেখা যায় যে অনুমান হচ্ছে যারা সেনাসমর্থিত উপদেষ্টা পরিষদকে সামনে রেখে এই বিকারগ্রস্ত ক্ষমতা তৈরি করেছেন তাদেরকেই এই অবস্থান থেকে বের হবার পরামর্শ দেওয়া। কিন্তু তারা কারা? সেনাবাহিনী? উপদেষ্টা পরিষদ? নাকি এই বিকারগ্রস্ত ক্ষমতা গঠনে যে পাঁচটি রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে তাদের আমরা পরামর্শ দেব? নাকি ভারতকে? ভারত অবস্থার পিঠে সওয়ার হয়ে ফায়দা নিচ্ছে। এদের প্রস্থানের পথ বাতলানোই কি আমাদের কাজ? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও তাদের পিঠে সওয়ার ভারত এই পরিস্থিতি থেকে কিভাবে প্রস্থান করবে সেই পরামর্শই কি দেবো আমরা ? ব্যাপারটা কি খুবই হাস্যকর হয়ে যাবে না? সমস্যা কি তাদের? নাকি আমাদের? কেন এগারোই জানুয়ারির মতো ঘটনা ঘটল এবং এই ধরনের ঘটনা ঘটানোর জন্য এই রাষ্ট্রগুলো কেন ইন্ধন জোগাল তার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। ব্যাপারটা নিছকই ষড়যন্ত্র নয়। অন্তত চারটি বাস্তবতার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখলে আগামী দিনের রাজনীতির ভাঙাগড়া বোঝা আমাদের সহজ হবে।

প্রথম বাস্তব সত্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে শক্তি– অর্থাৎ তেল, গ্যাস, কয়লা ইত্যাদির তীব্র চাহিদা, কাজে কাজেই মরিয়া প্রতিযোগিতা এবং বাংলাদেশের ভূখণ্ডের জ্বালানির ওপর দখলদারি প্রতিষ্ঠার অনিবার্য তাগিদ: ফুলবাড়ি, বড়ো পুকুরিয়ার কয়লা এবং বঙ্গোপসাগরের তেল ও গ্যাস ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থই যে বাংলাদেশকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে সেটা সাধারণ মানুষ এখন কমবেশি বুঝতে শিখেছে। জ্বালানির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে জাপানি কোম্পানির সঙ্গে 'বায়োফুয়েল' বা 'এগ্রোফুয়েল' উৎপাদনে এ যুক্তিও যে একই সূত্রে গাঁথা সেই দিকটাও আমরা বুঝব। বায়োফুয়েল বা এগ্রোফুয়েলের মানে হচ্ছে গরিব দেশের সীমিত কৃষিজমিতে খাদ্য উৎপাদন না করে ধনীদের গাড়ি ও বিলাসিতার জন্য জৈব উৎস থেকে জ্বালানি তৈরি করবার জন্য জমিগুলো বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে

দেওয়া। আমাদের খাদ্য উৎপাদন করতে হবে না, আমাদের কৃষিজমি ব্যবহার হবে বড়োলোকের গাড়ি চালাবার জন্য ইথানল বা অন্য কোনো জৈবজ্বালানি তৈরির কাজে। কিন্তু একে রক্ষা করবে কে?

দ্বিতীয় বাস্তবতা হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজির সঙ্গে পুঁজির প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য সেই ধরনের দেশ অন্বেষণের মরিয়া প্রয়াস চলছে যেখানে অল্প সময়ে দ্রুতবেগে মুনাফা কামানো সম্ভব। পুঁজির কেন্দ্রীয় কেন্দ্রগুলোতে মুনাফার হারের ক্রমাবনতির প্রবণতার (falling tendencey of the rate of profit) তাগিদে পুঁজি তার পরিধির দেশগুলোতে সেই ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রই অন্বেষণ করবে যেখানে দ্রুতবেগে অধিক মুনাফা কামানো যাবে কিংবা মুনাফার হার বেশি। বাংলাদেশে এর দৃশ্যমান উদাহরণ হচ্ছে টেলি-কমিউনিকেশান, বীজ, প্রাণবৈচিত্র্য, কৃষি এবং মিষ্টি পানি। বীজ, প্রাণবৈচিত্র্য ও পানির ব্যাপার এখনো জনগণের কাছে পুরাপুরি পরিষ্কার নয়, কিন্তু মোবাইল কোম্পানিগুলোর লুণ্ঠন সম্পর্কে তাদের ইতোমধ্যেই সম্যক অভিজ্ঞতা হয়েছে। মোবাইল কোম্পানি, যেমন টেলিনর (গ্রামীণ ফোন), বাংলালিংক, একটেল ইত্যাদি যে ভাবে বাংলাদেশকে লুণ্ঠন করে খুবই কম সময়ে কোটি কোটি ডলার বিদেশে পাচার করেছে তা অবিশ্বাস্যই বলতে হবে। ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশানের এই যুগে মুনাফা কোন দেশে কতো দ্রুত কামানো ও সেই দেশ থেকে আরেক দেশে পাচার করা যায় তা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশে এটা করা গিয়েছে এবং এখনো করা যায় এবং সবসময়ই যেন এটা সম্ভব হয় তার জন্যই ক্ষমতাকে পুঁজির চাহিদামতো সাজানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আন্তর্জাতিক পুঁজির লুণ্ঠনবৃত্তির সঙ্গে দেশীয় দুর্বৃত্ত ও দুর্নীতিবাজদের লুটপাট তুলনায় কিছুই না। এটাও মনে রাখা দরকার যে তথাকথিত মাইক্রোক্রেডিটওয়ালারা পুঁজির বাজার তৈরি করবার ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী সহযোগী। অর্থাৎ মাইক্রোক্রেডিট বা তথাকথিত গরিবের জন্য ঋণ কর্মসূচির মানে হচ্ছে পুঁজির জন্য বাজার (effective demand) তৈরি করা। গরিব মানুষ টাকা না থাকার কারণে পণ্য কিনতে পারে না। মোবাইল কেনা তো দূরের কথা। কিন্তু মাইক্রোক্রেডিটওয়ালাদের ঋণ দিয়ে মোবাইল ফোন, হাইব্রিড বীজ, পোলট্রির বাচ্চা মায় টেলিভিশনসহ অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের বাজার তৈরি করা হয়েছে। গ্রামের মানুষ বা বাংলাদেশের মানুষ মোবাইল দিয়ে কি করবে? মনে আছে কি? গ্রামের গরিব মহিলার হাতে মোবাইলের ছবি দেখছি শুরুর দিকে আমরা। এতে মহিলা বড়লোক হয়েছেন বলেও প্রচার শুনেছি। মোবাইল ফোন হাতে গ্রামের দুস্থ মহিলা—নিচে ক্যাপশান– তার জীবন মোবাইল ফোন কিভাবে বদলে দিয়েছে!! সেই পরাবাস্তববাদী ছবি থেকে আজ আমরা ডিজুইস জেনারেশান– পরনে মার্কিন জিন্‌স, মাথায় গ্রিজ, ঠোঁটে টম ক্রুজের চোরাগুপ্তা হাসি আর পাশে মোমের মতো গলে যেতে থাকা কিশোরী মেয়ে– এই মোহনীয়

জীবনের মধ্যে দেশকে ঠেলে দিয়েছি। যে দুর্দান্ত পরাবাস্তববাদী চিত্র আমরা মোবাইল যুগের শুরুর দিকে দেখেছিলাম তখন থেকেই বাজার তৈরির প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই টেলিকমিউনিকেশান সেক্টরের লুণ্ঠন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন তত্ত্বের ওপর ভর দিয়ে টেলিনর কোম্পানির লুটপাট এবং তাদের পিছু পিছু অন্যান্য কোম্পানির আগমনের কাহিনি এবং একই সঙ্গে মাইক্রোক্রেডিট, ডক্টর ইউনূসের নোবেল পুরস্কার লাভ ও তাঁকে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান পুরুষে পরিণত করবার জন্য বহুজাতিক কোম্পানি ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর তৎপরতাকে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে উন্নয়নওয়ালাদের কারবার এবং তাদের রাজনীতিকেও।

দ্রুত মুনাফা কামানোর জন্য পুঁজির নতুন বিনিয়োগ ক্ষেত্র মরিয়া হয়ে অন্বেষণের দিক থেকে আমরা পল্লী বিদ্যুৎসহ বিদ্যুৎ খাত, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা এবং নদীনালা ও ভূগর্ভের পানির কথা মনে রাখতে পারি, যাদের বেসরকারি খাতে তুলে দেবার চেষ্টা চলছে এবং চলবে। বাংলাদেশে পুঁজির শ্যেন দৃষ্টি একই সকল দিকেই। এই বেসরকারিকরণ দ্রুততর করবার জন্য বাংলাদেশে ক্ষমতার বিকৃতি ঘটানোর প্রয়োজন ছিল পুঁজির। অর্থাৎ 'গণতন্ত্র' বা গণতন্ত্র নামক ছিটেফোঁটা কিছু থাকাও পুঁজির জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। এমনকি আওয়ামী লীগ ও বিএনপি মার্কা লুটপাটের রাজনীতি কিন্তু বছর শেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামক বিচিত্র সরকারের অধীনে নির্বাচন। বাংলাদেশে বহুজাতিক কর্পোরেশানের শ্যেন দৃষ্টি এই সকল দিকে যখন পড়েছে তখন এই আব্রুটুকু রাখাও তার জন্য বাড়তি ঝামেলা মনে হয়েছে। বিদ্যমান অবাধ বাজার ব্যবস্থার নীতি পুরোদমে জারি রেখেও তারা স্বস্তিবোধ করে নি। এই অস্বস্তির ফলে হচ্ছে সেনাসমর্থিত উপদেষ্টা পরিষদ। ক্ষমতার যে বিকৃতি আমরা আওয়ামী লীগ, জোট সরকার বা তারও আগের সরকারগুলোতে দেখেছি এখনকার বিকৃতি আগের ক্ষমতার বিকৃতির চরিত্র থেকে আলাদা।

তৃতীয় বাস্তবতা হচ্ছে পুঁজি পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য যে সকল শক্তিশালী রাষ্ট্রের ওপর ভর করে থাকে সেইসব রাষ্ট্র তারা নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও শক্তি বলবৎ করবার জন্য ছোটো রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব মানা এখন আর প্রয়োজনীয় মনে করে না। সকল দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদা এবং সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক না গলানোর যে নীতির ওপর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই জাতিসংঘ আর নাই বললেই চলে। ইরাক ও আফগানিস্তানে পরাশক্তি কিভাবে ভয়াবহ ও বীভৎস যুদ্ধ পরিচালনা করেছে এবং কোনো কারণ ছাড়াই কিভাবে ইরাক দখল করে নিয়েছে আমরা তা চোখের সামনেই দেখেছি নাগরিকদের মানবাধিকার রক্ষার ছুতায়, দেশ চালানোর ব্যর্থতার অজুহাতে, ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্র থাকার অপরাধে বা জঙ্গি ইসলামকে মদদ দেবার প্রচারণা চালিয়ে এইসব দেশে শক্তিশালী দেশগুলো প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ

করে। এই ধরনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের নানান ধরন আছে। যেমন পরাশক্তির অর্থে পরিচালিত সিভিল সোসাইটি বা 'সুশীল সমাজ' দিয়ে রাজনীতিহীন বা রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বহীন 'সুশাসন' বা গুড গভর্নেন্স। এতোকাল এই চর্চাটাই আমরা কমবেশি দেখে আসছিলাম। একই সঙ্গে বাংলাদেশ জঙ্গি ইসলামকে মদদ দিচ্ছে এই প্রচার নব্বইয়ের শেষ থেকে শুরু হয় এবং দুই হাজার সালের প্রথম থেকে তীব্র আকার ধারণ করে। পরাশক্তি এই প্রচারে গণমাধ্যমগুলোকে বিপুলভাবে ব্যবহার করে। জঙ্গি ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল গণমাধ্যম তুমুল জেহাদি ভূমিকা রাখছে তাদের আমরা এখন কমবেশি চিনি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা নতুন যে চর্চা দেখলাম সেটা হলো রাজনীতির দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের কথা বলে সেনাসমর্থিত 'উপদেষ্টা পরিষদ' দিয়ে সংবিধানবহির্ভূতভাবে রাষ্ট্র চালানোর নজির। অর্থাৎ সাংবিধানিকভাবে সেই সংবিধান ছেঁড়া ত্যানা বা বাজে কাগজই হোক– কোনো না কোনো কাগুজে সাংবিধানিক নিয়ম মানাও পরাশক্তিগুলোর জন্য দায় হয়ে উঠেছে। পরাশক্তিগুলো কী পরিমাণ নির্লজ্জ ও কপট হতে পারে সংবিধানবহির্ভূতভাবে ক্ষমতায় আসা সেনাসমর্থিত উপদেষ্টা পরিষদকে সমর্থন দেওয়ার মধ্যেই সেটা অনায়াসে বোঝা যায়।

চতুর্থ বাস্তবতা হচ্ছে অবাধ বাজার ব্যবস্থার এই যুগে সকল রাষ্ট্রেরই নিরাপত্তামূলক রাষ্ট্র বা সিকিউরিটি স্টেট হিশাবে রূপান্তর। এই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ইসরাইল আর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। বাংলাদেশের সঙ্গে এই সকল শক্তিধর রাষ্ট্রের তুলনায় অনেকে অবাক হতে পারেন, কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রের যে পরিবর্তন ঘটেছে সকল রাষ্ট্রের সাধারণ চরিত্রের মধ্যে একইভাবেই পরিবর্তন ঘটেছে। এই মিলের দিকটা ছোটো বড়ো রাষ্ট্রের অমিল বোঝার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি বাজারই সম্পদ বিতরণ ও বণ্টনের একমাত্র নীতি, উপায় ও প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে তখন নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের আর কোনো দায় থাকে না। অন্যদিকে বাজারের পক্ষে নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক স্বার্থ রক্ষার দায় এড়ানোর অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্র মূলত স্বার্থ রক্ষা করে বৃহৎ পুঁজি বা বহুজাতিক কর্পোরেশানের। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর তত্ত্ব বা আদর্শ হিশাবে সমাজতন্ত্রেরই শুধু বিলয় ঘটে নি, নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা অনান্য স্বার্থ রক্ষা করবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকাকেও অস্বীকার শুরু হয়। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্র ও কর্পোরেশানের কাছে সমস্যা দাঁড়ায় এই যে যদি বাজার ব্যবস্থাই সব সমাধান করতে পারে তাহলে রাষ্ট্রেরই বা কী দরকার? রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখার কোনো যুক্তি যদি না থাকে তাহলে রাষ্ট্র নাগরিকদের কী কথা বলে নিজেকে টিকিয়ে রাখে? যুক্তি হচ্ছে, সিকিউরিটি বা নিরাপত্তা। রাষ্ট্র ও কর্পোরেশানের পক্ষে যে মতাদর্শ খাড়া করা হয় তাকে বলা হয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার তত্ত্ব। দাবি করা হয়, যেহেতু বল প্রয়োগের ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রের হাতেই একচেটিয়া, অতএব রাষ্ট্র তার সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশান ব্যাটেলিয়ান

দিয়ে নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তার এই নিরাপত্তার কাজকে যুক্তিসঙ্গত করবার জন্য রাষ্ট্রের শত্রু তৈরি করতে হয়। এক দিকে বাজার ব্যবস্থার প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে নাগরিকদের নিক্ষেপ, অন্যদিকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার যুক্তি দেখিয়ে রাষ্ট্রের বল প্রয়োগের হাতিয়ারগুলোর ক্ষমতা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি রাষ্ট্রের সাধারণ চরিত্র-লক্ষণ হয়ে ওঠে। এই সাধারণ লক্ষণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত বা ইসরাইল– বা অবাধ বাজারের যুগের যে কোনো রাষ্ট্রের মধ্যেই আমরা দেখি।

নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার দরকারেই রাষ্ট্র তখন শ্রমিক বা জীবন-জীবিকার অন্বেষণে দেশ থেকে দেশে ছুটে যাওয়া মানুষের চলাচলের ওপর কড়া বিধিনিষেধ জারি করে। 'নজরদারি'-র (SURVEILLANCE) বিভিন্ন টেকনলজি ও কৌশলের উদ্ভব ও প্রয়োগ বাড়ে। বহুজাতিক কর্পোরেশান ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর পক্ষে নিজ দেশের নাগরিকদের ওপর 'নজরদারি' সকল দেশেই প্রবল ও প্রকট আকার ধারণ করে। শ্রমিক ও মানুষের চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করবার জন্য নতুন অভিবাসন আইন ও বিধিনিষেধ প্রয়োগ শুরু হয়। এইভাবে এইডস ও অন্যান্য মারাত্মক অসুখ নিয়ন্ত্রণের বিবিধ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মানুষের চলাচলের ওপর নিত্য নতুন পন্থায় শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটতে থাকে। ভারত বাংলাদেশের সীমান্তে যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে এবং নির্বিচারে সীমান্তে বাংলাদেশীদের গুলি করে মারছে তার পেছনেও ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার অজুহাত আছে। অথচ ভারতের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার একমাত্র নির্ভরশীল পথ হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছা ও সংকল্পের প্রতি সম্মান জানানো। প্রতিবেশী ছোটো দেশ যেন নিজের সার্বভৌমত্ব নিয়ে বিপন্ন বোধ না করে তা নিশ্চিত করবার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং দুই দেশের মৈত্রীর সম্পর্ক জোরদার করা ছাড়া ভারতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার অন্য কোনোই পথ নাই। কাঁটাতার, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতা –গুলি করে নিরপরাধ বাংলাদেশীদের হত্যা, পুশব্যাক ইত্যাদির কারণ ভারতীয় রাষ্ট্র নিজের নাগরিকদের কাছে নিজের বৈধতা প্রমাণ করবার জন্যই ক্ষুদ্র ও শক্তির দিক থেকে একদমই অসম বাংলাদেশকে শত্রু রাষ্ট্র হিশাবে প্রমাণ করা। বাংলাদেশী জঙ্গি বা সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা করার দায়কেই ভারতীয় রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরা নিজেদের প্রধান দায় হিশাবে হাজির করে। অবাধ বাজার ব্যবস্থার যুগে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র নিজের বৈধতা প্রমাণের যে তাগিদ বোধ করে তাকে নতুন ঐতিহাসিক বাস্তবতা হিশাবে বুঝতে পারা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

এই দিক থেকেই রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের আন্তরিক মিল আছে। অথচ অন্যদিক থেকে পার্থক্যও প্রকট ও বিপুল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও ইসরাইল তাদের নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য অর্থনৈতিক বা বৈষয়িক বিকাশের

পাশাপাশি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর বিকাশ ও শক্তিকাঠামোর যে-স্তরে রয়েছে বাংলাদেশ সেই স্তরে পৌঁছানো দূরের কথা– ধারেকাছেও নাই। এই ব্যর্থতাকে বাংলাদেশের 'আধুনিক' ও 'সুশিক্ষিত' সেনাবাহিনী গড়ে তোলা ও প্রচলিত অর্থে তথাকথিত শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যর্থতা বা সংকট হিশাবে হাজির করা হয়। সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও উন্নত প্রযুক্তির তর্ক আমরা এখানে করছি না। 'আধুনিক' ও 'সুশিক্ষিত' সেনাবাহিনী আদৌ শক্তিশালী নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার প্রধান শর্ত কি না সেটা ভিন্ন বিতর্ক। নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার প্রশ্নকে নিছক সামরিক অর্থে চিন্তা করবার ধারণাও অত্যন্ত পুরানা ও রাষ্ট্রচিন্তায় পশ্চাৎপদতার লক্ষণ। এখানে যে প্রশ্ন তুলছি তার গুরুত্ব ও গভীরতা আরো ব্যাপক– বিদ্যমান সকল রাষ্ট্রের সিকিউরিটি স্টেট বা নিরাপত্তাই রাষ্ট্রের প্রধান বিবেচ্য বিষয় ও সক্রিয়তার ক্ষেত্র হয়ে ওঠা এবং তার কারণে রাষ্ট্রের শক্তি ও কাঠামোর রূপান্তর– এই বিপজ্জনক বাস্তবতার চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাজে কাজেই একই সঙ্গে প্রচলিত অর্থে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার ধারণা ও সেই ধারণার ওপর গড়ে ওঠা ব্যবস্থারও সংকট বটে। অর্থাৎ খোদ রাষ্ট্রই এখন জনগণের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। আর্থ-সামাজিক ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল দেশগুলোতে এই সংকট প্রবল ও প্রকটভাবে ধরা পড়ে। জনগণের দিক থেকে রাষ্ট্র গুণগতভাবে যে নতুন বিপদ নিয়ে হাজির হয়েছে সেই দিকটাই আগামী দিনের রাজনীতির নির্ণায়ক হবে–এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই।

তাহলে নয়া ঔপনিবেশিক অবাধ বাজার ব্যবস্থার নীতি অনুসরণ ও তার প্রয়োগের সঙ্গে রাষ্ট্রের চরিত্রে ও ভূমিকায় যে গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে সেই বিকারের দিকটার প্রতি আমরা বিশেষভাবে নজর দেবার পক্ষপাতী। এর সঙ্গে বিভেদ ও বিভাজনের রাজনীতি, রাজনৈতিক চেতনার অনগ্রসরতা এবং নব্বই দশকে গণবিদ্রোহকে গণঅভ্যুত্থানে রূপ দিয়ে নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়বার ব্যর্থতা– অর্থাৎ ত্রিদলীয় জোটের রূপরেখার অধীনে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার নামে অগণতান্ত্রিক ও গণবিরোধী রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখা– এমনকি তথাকথিত 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' নামক ক্ষমতা হস্তান্তরের ফর্মুলা এবং সম্প্রতি এগারোই জানুয়ারিতে চরম রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রের আরো অধঃপতন ও বিকৃতি ঘটানো– ইত্যাদি নানা কারণে আজ আমরা নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার দিক থেকে চরম ও ভয়াবহ সংকটের মধ্যে পড়েছি। রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী বা অন্য কথায় আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিশাবে টিকে থাকার আশংকা দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে নিজেদের টিকে থাকার জন্য নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার বিকল্প পথ ও পদ্ধতি অন্বেষণ ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। প্রথাগত বা প্রচলিত নিরাপত্তার ধারণা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এই পরিস্থিতিতে কাজ করতে পারে না। তাছাড়া নতুন

ও ছোটো দেশ এবং তিন দিকে ভারত পরিবেষ্টিত থাকার কারণেও বাংলাদেশকেও নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার প্রশ্নে মেধাবী হওয়া ছাড়া পথ নাই।

রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে আমাদের বিপদের চরিত্রটা কী? একদিকে নিরাপত্তাসর্বস্ব বিদ্যমান রাষ্ট্র এবং তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আজ নাগরিকদের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি– অথচ অন্যদিকে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতার চরম অভাব রয়েছে। এটা একটি দিক। কিন্তু আরো একটি দিক আছে। বড়ো ও শক্তিশালী রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবার পাশাপাশি বাংলাদেশের মতো ছোটো ও দুর্বল দেশগুলোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর ভর করে। অন্যদিকে ছোটো ও দুর্বল রাষ্ট্র নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার ফাঁদে পড়ে মূলত পরাশক্তিরই অধীন হয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন দাবি করে যে হয় তোমরা আমাদের পক্ষের, অথবা তোমরা শত্রুপক্ষ–এই নীতির চাপে সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মূলত মার্কিনিদের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' স্থানীয় অপারেশানের হাতিয়ার হয়ে ওঠা ছাড়া আর উপায় থাকে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্নায়ুযুদ্ধের যুগে তৃতীয় বিশ্বের সেনাবাহিনীকে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে দেশে দেশে গণতান্ত্রিক লড়াই-সংগ্রামের বিরুদ্ধে যেভাবে ব্যবহার করেছিল, এই নতুন ব্যবহারের কার্যকারণ পুরানা স্নায়ুযুদ্ধ থেকে আলাদা। ধারাবাহিকতা যেমন আছে, একই সঙ্গে নতুন গুণগত উপাদানও যুক্ত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ আগে পুঁজির আত্মস্ফীতি ও পুঞ্জিভবন নিশ্চিত করবার জন্য সম্মুখস্থ সকল বাধা অপসারণ করতে চেয়েছে। সম্পর্ক ও মতাদর্শ সবই। সেই সময় বিশ্ববাজার এখনকার মতো বিকশিত হয়ে ওঠার আগে সেনাবাহিনীর ব্যবহার যেভাবে প্রয়োজনীয় মনে করেছিল, যেমন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভূমিকা– এখন সেই প্রয়োজন অবাধ বাজার ব্যবস্থা, তদুপরি বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসংস্থার কারণে গৌণ। আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থার বিকাশের জন্য রাষ্ট্রগুলোকে বাণিজ্য চুক্তি ও অবাধ বাজারের নীতিতে রাজি করিয়ে নেবার পর সেনাবাহিনী নয়, আমলাদের ভূমিকাই প্রধান হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি জাতীয় সেনাবাহিনী গ্লোবালাইজেশানের যুগে জাতীয় চরিত্র হারিয়ে বরং 'শান্তিবাহিনী'তে রূপান্তরিত হচ্ছে।

ক্ষমতার এই বিকার ও বিপন্ন সার্বভৌমত্বের এই ইচ্ছানিরপেক্ষ বাস্তবতার মুখে আমাদের পথ কি? অবশ্যই বিদ্যমান রাষ্ট্রশক্তির বিপরীতে গণশক্তির নতুন উদ্বোধন ঘটানো। অর্থাৎ জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতার কথা মনে রেখে রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে নিজেদের পুনর্গঠনের কাজ ত্বরান্বিত করা ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নাই বলেই আমার আশংকা। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণপ্রতিরক্ষার ধারণা ক্রমাগত স্পষ্ট ও জনপ্রিয় করে তোলা, তার আলোকে নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার লড়াই-সংগ্রাম সংগঠিত করাই এখন

আমাদের কাজ। রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে আমাদের সার্বভৌমত্বের পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন ছাড়া আমাদের সামনে অন্য কোনো পথ খোলা আছে কি না সন্দেহ। এগারোই জানুয়ারির ঘটনা মূলত এই আশঙ্কাকেই আরো তীব্র করে তুলেছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য বিদ্যমান রাষ্ট্র এমন এক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাধ্য যার সঙ্গে রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে আমাদের সার্বভৌমত্ব এবং কাজে কাজেই আমাদের অর্থনীতি, সমাজ, ভাষা ও সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদির বিরোধ অনিবার্য। যে দিকটা আমরা বোঝাবার চেষ্টা করছি সেটা হলো এই অনিবার্য বিরোধ বিশ্ব অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার নৈর্ব্যক্তিক গতিপ্রক্রিয়া অর্থাৎ এক ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বাস্তবতার মধ্যে তৈরি হচ্ছে। এই বাস্তবতাকে সকলের হৃদয়ঙ্গম করাই আজ আমাদের বিশেষভাবে দরকার।

এই দুর্দশার লক্ষণ ইতোমধ্যেই পরিষ্কার। নিজেরা নিজেদের পথ অনুসন্ধান ও মজবুত করবার আগেই নাগরিকদের কাছ থেকে গণবিচ্ছিন্নতার কারণে বাংলাদেশ রাষ্ট্র মূলত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তা বিভাগের অধীন হয়ে পড়েছে। যে কারণে বাংলাদেশে আমরা মার্কিন নিরাপত্তা বিভাগের সক্রিয় ও সরব উপস্থিতি ছাড়াও অন্যান্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এজেন্সির সক্রিয় তৎপরতা লক্ষ করি। তাদের হুকুমদারি ছাড়া বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা এজেন্সিগুলোর স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা কতোটুকু আমাদের পক্ষে এখন তা ধারণা করা রীতিমতো মুশকিলই বলতে হবে। ক্ষমতার এই বিকার বাংলাদেশের রাজনীতির নতুন কিন্তু বিশেষ উপাদান এই কারণে যে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' জন্য রাষ্ট্রের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটছে, একই সঙ্গে আইন ও বিচার ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। নিজেদের নিরাপত্তা আর প্রতিরক্ষা আমরা নিজেরা আর নিশ্চিত করতে পারছি না। আমরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু হয়ে উঠছি, এই ইচ্ছানিরপেক্ষ গতিপ্রক্রিয়াই একদিকে জনগণ আর অন্যদিকে রাষ্ট্রক্ষমতার এই বিকারকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।

রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা আমাদের অত্যন্ত আবশ্যিক ও অতি জরুরি একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিদ্যমান রাষ্ট্রের যে কাঠামো এখন দাঁড়িয়েছে এবং প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার যে প্রথাগত ব্যবস্থা আমরা দেখছি তা দিয়ে জনগণের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অসম্ভব। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে নতুন ধরনের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা ভাবতেই হবে, যাকে আমি 'গণপ্রতিরক্ষা' বলে থাকি। নিজেদের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা নিজেরা নিশ্চিত করাই এখন আমাদের একমাত্র পথ, কিন্তু সেই কাজ জনগণকে সঙ্গে নিয়েই এবং জনগণের ইচ্ছা ও সংকল্প বাস্তবায়ন করবার জন্য বিদ্যমান রাষ্ট্রের খোলনলচে বদলে তার রূপান্তর সাধন ছাড়া অসম্ভব। নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার প্রাচীন ও অকেজো ধারণার বাইরে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

আবারও বলছি, অন্যান্য রাষ্ট্রও পুঁজির আত্মস্ফীতি ও পুঞ্জিভবনের এই কালে সিকিউরিটি স্টেট বা নিরাপত্তামূলক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত– তারাও নিরাপত্তা বিধানের কর্তব্যের কথা বলে নিজেদের বৈধতা দাবি করে। তাদেরও বাংলাদেশের র‍্যাব, পুলিশ বা সেনাবাহিনীর তৎপরতা রয়েছে। গণবিরোধিতার ক্ষেত্রে বা গণবিচ্ছিন্নতার দিক থেকে এই রাষ্ট্রগুলোও বাংলাদেশের রাষ্ট্রের তুলনায় ভিন্ন কিছু নয়। রাষ্ট্রের পক্ষে তারাও সর্বদা এই যুক্তিই হাজির করে যে দেশকে তারা সন্ত্রাসমুক্ত করছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত বা ইসরাইলের সঙ্গে জনগণের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতা বাংলাদেশের মতো নয়। রাষ্ট্র নির্বাচন ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক কায়কারবারের মধ্য দিয়ে নিজের সপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের বৈধতা অর্জন করবার নিয়ম অন্তত পালন করে। কিন্তু এইসব রাষ্ট্রও কাউন্টার টেররিজম বা সন্ত্রাস মোকাবিলাকেই নিজের বৈধতা প্রমাণের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলেই গণ্য করে। অন্যান্য শক্তিশালী দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে এই যে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার শক্তি ও কাঠামো গত এক দশকে ক্রমশ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরাশক্তি বলয়ের অধীন হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তিবলয়ের বাইরে জনগণের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বিধানের কোনো স্বাধীন ক্ষমতা বাংলাদেশের আদৌ আছে কি না এটাই আমাদের আশংকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও ইসরায়েলের নিরাপত্তা চুক্তি এই কঠিন বাস্তবতাকে আমাদের জন্য আরো মূর্ত ও অব্যবহিত করে তুলেছে। এই নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা চুক্তির ছায়ায় বাংলাদেশে একটি অসাংবিধানিক, গণবিরোধী ও বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থ সংরক্ষক রাষ্ট্র সন্ত্রাস ও বল প্রয়োগের শক্তি জারি রেখে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। এই দিকটাও আমাদের জন্য খুবই শিক্ষণীয় দিক। এগারোই জানুয়ারির ঘটনা থেকে যদি আমরা শিখতে পারি কেবল তবেই আমরা এই পরিস্থিতি থেকে প্রস্থানের গণতান্ত্রিক একটা পথ হয়তো বের করতে পারবো।

এই চার বাস্তবতা মনে রাখলে আমরা বুঝবো এগারোই জানুয়ারিতে বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে তা আকস্মিক কিছু নয়। বাস্তবতার মধ্যেই তা পরিণত হয়ে উঠছিল, অন্যদিকে একে আবার অনিবার্য ভাবাও হবে নিজের কাপুরুষ ব্যর্থতা ঢাকা দেওয়ার শামিল। মানুষের ইতিহাসে 'অনিবার্য' বলে কোনো কথা নাই। কারণ মানুষ মাত্রই কর্তাসম্পন্ন এবং বাস্তবতাকে বিনা বিচারে মেনে নেয় না বলেই মানুষকে 'মানুষ' হিশাবে চেনা যায়। এই কর্তাসম্পন্নতাকেই ইতিহাসের চালিকাশক্তি বলে দার্শনিকরা শনাক্ত করেন। মানুষ যদি শুধু আর্থ-সামাজিক গতিপ্রক্রিয়ার দাস মাত্র হয় তাহলে মানুষের ইতিহাস আর প্রাকৃতিক বিবর্তনে কোনো ভেদ থাকে না। একদিকে এই নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতা আর অন্যদিকে বাস্তবতাকে মোকাবিলা করবার জন্য কর্তাসম্পন্নতার অভাব– অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও নেতৃত্ব তৈরি করবার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা– এই দুয়ে মিলেই এখনকার বিপদ ঘটিয়েছে। একদিকে চোখের সামনে ঘটতে থাকা

ক্ষমতার বিকার ও অন্যদিকে বিকল্প গণক্ষমতা তৈরির রাজনৈতিক ব্যর্থতা– এই দুই আমাদের আজ এই অধঃপতিত অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে।

কিন্তু বাস্তব দুর্দশা ও নিজেদের অক্ষম আহাজারি দিয়ে এই গ্রন্থ পাঠকদের কাছে হাজির করতে আমি প্রবল দ্বিধান্বিত ছিলাম। সেই কারণে শুধু 'ক্ষমতার বিকার' নাম দিয়ে এই লেখাগুলোকে একটি মলাটের ভেতর পেশ করা ছিল বিব্রতকর। প্রতিপক্ষ পরাশক্তির চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলাদেশের জনগণের কর্তাসম্পন্নতার কোনো লক্ষণ বা নমুনা নাই এটা আমার কখনই মনে হয় নি। আমার এই লেখা যাঁরা পড়বেন তাঁরা স্পষ্টই দেখবেন যে বাংলাদেশের জনগণ বিদ্যমান পরিস্থিতি যে মেনে নেবে না সেই বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম। আমরা চাই বা না চাই– বা তত্ত্ব হিশাবে মানি বা না মানি– সমাজে শ্রেণীতান্ত্রিক পথে আগ বাড়িয়ে আরেকটি 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র' হয়ে উঠকু– শ্রেণীসংগ্রাম থামতে পারে না। মানুষের ইতিহাস মাত্রই লড়াই-সংগ্রাম– মার্কস-লেনিন এই কথা বলেন নি। মানুষের ইতিহাসের আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রাম যে ইতিহাসের চালিকাশক্তি এই কথার পর জোর দিয়েছেন। তাকে কী করে পাঠ করতে হবে এই শিক্ষা মার্কস, লেনিন মাওজে দংয়ের কাছে আমাদের নিতেই হবে। মগজ পাথর হয়ে যাওয়া পুরানা বামপন্থীদের সঙ্গে আমার পার্থক্য হচ্ছে এই যে আমি কাস্তে, হাতুড়ি বা দুনিয়ার মজদুর এক হও শ্লোগান না দিলে কারো লেখায় খুঁজে পাই নি। গরিব ও নির্যাতিত জনগণ হাতের কাছে যে ভাষা পায় সেই ভাষাতেই নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ইনসাফের জন্য লড়ে।

একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে লিখেছি বলে ক্ষমতার যে বিকারের কথা আমি বলছি সেটা হঠাৎ এগারোই জানুয়ারিতে ঘটেনি। নব্বই দশক থেকে যাঁরা আমার লেখালিখির সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন এটা মোটেও আমার প্রস্তাব নয়। ক্ষমতার বিকার বা অসুখ অনেক আগেই শুরু হয়েছিল, আমরা কেউই মানতে চাইনি যে আমরা অসুস্থ। ফলে চিকিৎসায় কাউকে রাজি করানো যায় নি। ক্রমে ক্রমে আমরা নতুন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছি এখন। এই বাস্তবতার একদিকে আছে পরাশক্তির স্বার্থ দেখভালের জন্য ক্ষমতায় আসীন সেনাসমর্থিত উপদেষ্টা পরিষদ। আর তার বিপরীতে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ। বাংলাদেশের মানুষ আজ সরাসরি পরাশক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ সৈনিকসহ সাধারণ মানুষ দেশের বিপদ কতোটুকু অনুধাবন করতে সক্ষম হয় চিকিৎসার চরিত্রও ঠিক সেই রকমই হবে বলে আমার ধারণা।

গণশক্তির উদ্বোধন

এই পরিস্থিতিতে গণশক্তির দৃশ্যমান উদ্বোধন না হোক– তার কোনো লক্ষণ বা নমুনা দেখব না এটা আমার যুক্তি বা বিশ্লেষণের মধ্যে ছিল না। তবে এতো দ্রুত শ্রমিক ও কৃষকদের বিক্ষোভের পর ছাত্র– অর্থাৎ সংবেদনশীল তরুণদের কাছ

থেকে ব্যাপক বিদ্রোহ গণশক্তির অন্তর্গত পরিগঠনের আওয়াজ হিশাবে গণ্য করা যায়। আমরা আদৌ সঠিক কিনা সেটা আগামী দিনের ইতিহাসই প্রমাণ করবে। খালিশপুরের শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ, সারের জন্য কৃষকের আন্দোলন ও সংবেদনশীল তরুণদের ব্যাপক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ একই সূত্রে গেঁথে তাকে গণশক্তির নতুন উদ্বোধন গণ্য করব কি আমরা? নাকি আমরা এগারোই জানুয়ারির আরো আগে গিয়ে কানসাট, ফুলবাড়ি ও শনির আখড়ার গণবিক্ষোভ ও লড়াইয়ের মধ্যে আগামী দিনের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করব? বলাবাহুল্য, আপাতদৃষ্টিতে স্থান, কাল ও ঘটনাপ্রবাহের দিক থেকে এই সকল গণবিদ্রোহের সারবস্তুর মধ্যে গণশক্তির পরিগঠন প্রক্রিয়া চলছে এই দিকটি আমাদের আছে পরিষ্কার।

সম্ভবত এই বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ নতুন শক্তির পরিগঠনের তাগিদে বাস্তব পরিস্থিতি যে পরিপক্ব হয়ে উঠেছে তার লক্ষণ মাত্র, এর বেশি কিছু নয়। স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ও বিক্ষোভ গণশক্তির উদ্বোধন না হয়ে বিদ্যমান রাষ্ট্রকে আরো নিখুঁত, আরো নিষ্ঠুর ও বল প্রয়োগের দিক থেকে আরো নির্বিচারী ও একনায়কতান্ত্রিক করে গড়ে তুলতে পারে। নব্বইয়ের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামের পরিণতি কি হয়েছিল? এই বাস্তবতাও আমাদের পরিষ্কার মনে রাখা দরকার যে গণশক্তির বিকাশ ও পরিগঠনের জন্য যে রাজনৈতিক কর্তাশক্তি বা প্রচলিত রাজনীতির ভাষায় যে ধরনের সংগঠন দরকার বাংলাদেশে তার চরম অভাব রয়েছে। কিন্তু তারও আগে রয়েছে গণশক্তির উদ্বোধন ঘটানোর পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক বিচার ক্ষমতা। অর্থনৈতিক স্বার্থসংবলিত দাবিদাওয়া মাত্রই গণশক্তির উদ্বোধন ঘটায় আমরা তা মনে করি না। বিদ্যমান বাস্তবতার নিরিখে বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছা ও সংকল্প ইতিবাচক পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার একটিই মাত্র পথ। সেটা হলো : জনগণের ইচ্ছা ও সংকল্প ধারণ করে গণপ্রতিরক্ষার ব্যবস্থা সংবলিত একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট দাবি তোলা এবং তার পক্ষে ব্যাপক জনমত তৈরি করা।

তাহলে কী ধরনের দাবিদাওয়া গণআন্দোলন, গণবিক্ষোভ ও গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের তোলা উচিত? এই বিষয়ে আমরা পরস্পরের মধ্যে ব্যাপক আলাপ আলোচনা শুরু করতে পারি অবশ্যই। তবে কয়েকটি অতি প্রাথমিক বিষয় সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ মত তৈরি করা কঠিন নয় বলেই আমার মনে হয়।

এক : প্রাণ, পরিবেশ ও প্রাণের ব্যবস্থাপনা ও শর্তসমূহ রক্ষা করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার অধীন করা। রাষ্ট্র উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও বাজার ব্যবস্থার নামে জনগণের জীবন ধ্বংস করবে এটা তো হতে পারে না। কিম্বা কেউ তা করলে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে রাষ্ট্রকে। প্রাণ, পরিবেশ, প্রাণের ব্যবস্থাপনা ও শর্তসমূহ রক্ষা করা যে একই সঙ্গে উৎপাদনের ভিত্তি সংরক্ষণ ও উৎপাদন শক্তির বিকাশ নিশ্চিত করা এই দিকটি আমাদের রাষ্ট্রচিন্তা, কাজে কাজেই প্রতিরক্ষার ধারণার মধ্যে আনতে হবে। আমাদের অবশ্যই দ্রুত ও

ত্বরান্বিত অর্থনৈতিক বিকাশ দরকার এবং সেটা যে একমাত্র প্রাণ, পরিবেশ ও প্রাণের ব্যবস্থাপনা ও শর্তসমূহ রক্ষা ও বিকাশ ছাড়া সম্ভব নয়, জনগণের দিক থেকে তা অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক দাবিদাওয়া তুলতে হবে।

দুই : কোনো নাগরিকের রিজিক রাষ্ট্র নষ্ট, ধ্বংস বা কোনো জীবন ও জীবিকায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। তার মানে নাগরিকদের বাজার ব্যবস্থার অনিশ্চয়তায় মধ্যে ঠেলে দিয়ে অল্প কিছু কোম্পানি বা বিদেশি কোম্পানির জন্য দেশকে মুনাফা কামানো ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্র বানানোর এখতিয়ার রাষ্ট্রকে কোনোভাবেই দেওয়া যাবে না। বিদ্যমান রাষ্ট্র এই অধিকারের বলেই জনগণের বিরুদ্ধে অবাধ বাজার ব্যবস্থার নীতি জবরদস্তি প্রবর্তন করতে পারে। রাষ্ট্রের এখতিয়ারের সীমা নির্দিষ্ট থাকে না বলেই রাষ্ট্র বহুজাতিক কর্পোরেশানের ভাড়া খাটে এবং বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার গোলামি করে।

তিন : মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকার রক্ষা ছাড়াও রাষ্ট্রকে অবশ্যই বিচারের প্রক্রিয়া পরিচ্ছন্ন করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবার শর্তগুলো পূরণ করতে হবে। বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক হলেই আমাদের সমস্যা মিটে যায় এই উকিলি চিৎকারের বিপরীতে রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে কিভাবে গরিব ও ক্ষমতার দিক থেকে দুর্বল নাগরিকরা ন্যায়বিচার পেতে পারে। ন্যায়বিচারের প্রশ্ন বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করে বিচারপতি, উকিল ও ব্যারিস্টারদের হাতে আদালতপাড়া তুলে দেওয়া নয়, এই প্রতারণার ব্যাপারে আমাদের হুঁশিয়ার হতে হবে।

চার : রাষ্ট্রকে অবশ্যই জনগণের সম্পদ রক্ষা করতে হবে। প্রাকৃতিক, জৈবিক, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদে সকল নাগরিকের অধিকার যেমন নিশ্চিত করতে হবে, তেমনি তা রক্ষা করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। গ্যাস, কয়লা, তেল, খনিজসম্পদ এবং প্রাণ ও জৈবসম্পদ রক্ষা রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং প্রতিরক্ষার ধারণার মধ্যে জনগণের সম্পদ রক্ষার ধারণাকে আরো পরিচ্ছন্ন বা স্পষ্ট করতে হবে। ঔপনিবেশিক কায়দায় সম্পদ লুণ্ঠনের জায়গায় এখন 'বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার' নামক আইনি কায়দায় লুণ্ঠনের কাজ চলছে। এই সব বন্ধ করতে হবে।

পাঁচ : সৈনিকতার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে প্রতিটি নাগরিকের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সৈনিকসহ প্রতিটি নাগরিককে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার প্রশ্নে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলা। সৈনিকতার মর্যাদা অর্থ হচ্ছে সৈনিক তার পোশাক ও প্রতীককে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবেন এবং নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে কখনই তাঁর অস্ত্র কাউকেই ব্যবহার করতে দেবেন না। পোশাক ও প্রতীক একটি সার্বভৌম জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্য হিশাবে মর্যাদা শুধু নয়, সৈনিকের পেশাদারিত্বের মর্যাদাও পেশাকে ও প্রতীকে খচিত থাকে। সৈনিককে এর ভার বইবার নৈতিক শক্তি অর্জন করতে হবে।

সৈনিকতার মর্যাদা কেবল তখনই রক্ষা করা সম্ভব যদি শত্রুমিত্র ভেদজ্ঞান সৈনিকদের প্রখর থাকে।

লক্ষ করতে হবে রাষ্ট্র পুঁজিতন্ত্রের সেবাদাস হবে নাকি 'সমাজতন্ত্র' মূলনীতি হিশাবে গ্রহণ করবে সেই সকল অর্থনৈতিক বা মতাদর্শিক তর্ক এখানে আমরা তুলছি না। আমরা শুধু এতোটুকুই বলছি যে প্রাণ ও প্রাণ ব্যবস্থাপনার ক্ষতি বা নাগরিকদের জানমাল, রিজিক ও সম্পদ নষ্টের সার্বভৌম এখতিয়ার রাষ্ট্রের থাকতে পারে না। ক্ষতির বা নষ্টের দায়দায়িত্ব নিতে হবে সরকার ও রাষ্ট্র উভয়কেই। নষ্টের এখতিয়ার রাষ্ট্রকে তো নয়ই কাউকেই দেওয়া যায় না। গণপ্রতিরক্ষার দিক অর্থাৎ ক্ষমতার যে বিকার আমরা দেখছি তার বিপরীতে গণশক্তির উদ্বোধনের শর্ত তৈরি করবার তাগিদ থেকেই এই দিকগুলো আমরা তুলে ধরছি। রাষ্ট্রচিন্তার এই ধারণাগুলোকে যদি আমরা গণমানুষের মধ্যে প্রচার ও স্থাপন করতে পারি তাহলে গণশক্তির যে রূপ আমরা দেখব তার মধ্যে নতুন ধরনের রাষ্ট্র গঠনের তাগিদ তৈরি হবে। এই দাবিগুলো অনুধাবন করতে পারলে আন্দোলন, সংগ্রাম ও গণবিক্ষোভ নতুন বোতলে পুরানা মদ বিতরণের দাবি তুলবে না। প্রাণের ক্ষতি হয়, প্রাণ ব্যবস্থাপনার ভিত্তি যে একই সঙ্গে উৎপাদনের ভিত্তিও বটে এবং সেই ভিত্তি রক্ষা করাই যে রাষ্ট্রের কাজ এবং সে কারণে সেটা প্রতিরক্ষারও অন্তর্গত বিষয় সেই দিকগুলোর দিকেই আমরা সকলের মনোযোগ আশা করছি। চাইছি। এই দিকগুলো কোনো সরকারের নীতির ওপর ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

যদি আমরা ওপরের কথাগুলো বুঝে থাকি তাহলে এটাও সম্ভবত মানবো যে জনগণের দিক থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট, দুর্নীতি, নির্বাচন বা বিনিয়োগের সংকট আশু সমস্যা বা এখনকার প্রধান সমস্যা মনে হলেও আগামী দিনের রাজনীতির প্রথম ও প্রধান সংকট গণপ্রতিরক্ষার ব্যবস্থা সংবলিত সংবিধান এবং জনগণের ইচ্ছা ও সংকল্পের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পুনর্গঠন।

আশা করি সেই লক্ষ্য খুব দূরের পথ নয়। জনগণের ইচ্ছা ও সংকল্পের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রচিন্তা পরিগঠিত হয়ে উঠলে বাস্তবে তাকে রূপ দেওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। এই আলোকে আন্দোলন-সংগ্রামে সঠিক স্লোগান ও দাবি তোলার ক্ষেত্রে এই লেখালিখিগুলো কতোটুকু কাজে এলো তার দ্বারাই তাদের মূল্য বা উপযোগিতার বিচার হবে। সেই বিচার ইতিহাসের হাতে ছেড়ে দেওয়াই সুবিবেচনার কাজ।

৩১ ভাদ্র ১৪১৪। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭। শ্যামলী।

আর্থ-সামাজিক নীতির দিক থেকে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল (জামায়াতে ইসলামীসহ) প্রত্যেকেই উদারনৈতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধারক ও বাহক। ফলে এ ক্ষেত্রে তাদের কোনো ঝগড়া নাই। এই ক্ষেত্রেও তারা একমত যে বিশ্ববাণিজ্য ও বহুজাতিক কোম্পানির রমরমার এই যুগে রাষ্ট্র বা সংসদ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য কোনো আইন বা নীতি প্রণয়নের অধিকার আর রাখে না বললেই চলে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের সঙ্গে এখন যুক্ত বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা এবং নানাবিধ বহুপক্ষীয় ও দ্বিপক্ষীয় চুক্তি। তথাকথিত 'সার্বভৌম' রাষ্ট্র বা সংসদ কথাটা এখন সোনার পাথরবাটি।

তিনটি ক্ষেত্রে তারা একদমই একমত। এক সম্পদ সৃষ্টি ও বণ্টনের জন্য বাজারব্যবস্থাই একমাত্র বা প্রধান পথ। রাষ্ট্র ধনী-গরিবের ব্যবধান মোচনের জন্য এমন কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যা সুদখোর, মুনাফাখোর ও শোষকদের ওপর সামাজিক বা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য রাষ্ট্র কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবে না– বরং রাষ্ট্রকে এনজিও বানাবে অথবা এনজিওর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের কেচ্ছা গাইবে। দুই রাষ্ট্রের এখতিয়ার যেহেতু সীমিত অতএব রাষ্ট্রের কাজ হবে সিকিউরিটি বা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুঁজির পক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা। বাংলাদেশের র‍্যাব ও পুলিশ এবং সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীর নির্বিচারে মানুষ হত্যা চলবে। ঠিক তেমনি চলবে কানসাট, ফুলবাড়ি ও শনির আখড়ায় গণমানুষের বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও প্রতিবাদীকে বুলেটে ঝাঁঝরা করে দিয়ে খামোশ করে দেওয়া। রাষ্ট্র আইনশৃঙ্খলা অবনতির ছুতায় যে আইনে র‍্যাব গঠন করে, র‍্যাব ও পুলিশ উভয়কেই রাষ্ট্র 'ক্রসফায়ার' নামক যে আইনি ফাঁকে মানুষ মারতে অনুমতি দেয়– তাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আখ্যা দিয়েছেন 'State of exception'। অর্থাৎ রাষ্ট্র দাবি করতে থাকবে সে একটা বিশেষ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। অতএব সে আর সংবিধানের বা আন্তর্জাতিক বিধিবিধানসম্বলিত মানবাধিকারের বিষয়গুলো মানবে না। মানুষ মারা ছাড়া রাষ্ট্রের যেন আর কোনো কাজ নাই। আর ঠিক এই স্টেট অব একসেপশান বা বিশেষ পরিস্থিতির ছুতায় কার্যত প্রেসিডেন্ট অবৈধভাবে ক্ষমতা হাতে নিয়ে নিয়েছেন এবং বিদেশি রাষ্ট্রের সমর্থনও তিনি পেয়েছিলেন।

তিন নম্বর মতৈক্য হলো প্রতি পাঁচ বছর কারা জনগণকে লুটপাট, শোষণ, নির্যাতন করবে তার জন্য ভোটাভুটি। কিন্তু এমন ধরনের ভোটাভুটি, যাতে প্রতিটি

দল বা জোটের দাবি যে তারাই যেন নির্বাচনে জিতে আসে। কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই সকলের বিজয় নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। একটা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া গড়ে উঠুক সেই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের বর্তমান দাবি-দাওয়ার কোনো সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ দাবি-দাওয়া দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর গোপন বাসনা ধরা যাবে না। আসলে রাষ্ট্রক্ষমতাই দ্রুত লুটপাট, অর্থোপার্জনের উপায়। অতএব কে নির্বাচন পরিচালনা করছে এবং নির্বাচনের সময় প্রশাসন কার পক্ষে, সেটাই একমাত্র প্রসঙ্গ এবং কাজে কাজেই এটাই দাঙ্গাহাঙ্গামা, রক্তপাত ও নৈরাজ্যের প্রধান কারণও বটে। এখনকার পুঁজিবাদের যে চরিত্র তাতে নৈরাজ্য ও সহিংসতা অবশ্যম্ভাবী। গত নির্বাচনের পরপরই নির্বাচিত সরকারকে মৌলবাদী প্রমাণ করতে করতে শেষতক এই দেশ ও দেশের মানুষই মৌলবাদী প্রমাণিত হয়ে গেছে। নির্বাচিত হবার পরেও বিরোধী পক্ষের সংসদ বর্জনের অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। আওয়ামী লীগ যদি তা গত পাঁচ বছর করে থাকে, তাহলে ১৪ দলীয় জোট জিতলে বিএনপিও আবার আগামী পাঁচ বছর আমাদের অশান্তির কারণ হবে। মোট কথা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের কেচ্ছা একটা ভুয়া ও প্রতারণামূলক কাঁদুনি ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের জিতিয়ে দাও তাহলেই আমরা আর অশান্তি করবো না– এটাই মোদ্দা কথা।

কারও বিজয় নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের কাজ নয়। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া গড়ে তোলার সঙ্গে নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের বর্তমান দাবি-দাওয়ার কোনো সম্পর্ক নাই। দাবি-দাওয়া থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর গোপন বাসনা ধরা যাবে না। যখন রাষ্ট্রক্ষমতাই দ্রুত লুটপাট-অর্থোপার্জনের উপায়, তখন কে নির্বাচন পরিচালনা করছে ও নির্বাচনের সময় প্রশাসন কার পক্ষে সেটাই একমাত্র প্রসঙ্গ; দাঙ্গাহাঙ্গামা, রক্তপাত ও নৈরাজ্যের প্রধান কারণও বটে।

নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে যে তর্ক চলছে তাকে এই তামাশার দিক থেকে বিচার করলে আমরা রাজনীতির দুই প্রধান প্রতিপক্ষের মধ্যে তৃতীয় 'মতৈক্য' কোথায় সেটা বুঝবো। যেহেতু ক্ষমতায় যাওয়া না-যাওয়ার সঙ্গে আর্থিক লুটপাটের প্রশ্ন জড়িত, ফলে মতৈক্য হচ্ছে ওখানে যে, যেভাবেই হোক নির্বাচনী ব্যবস্থা হতে হবে নিজ দলের ক্ষমতায় যাওয়ার আলোকে। এই 'মতৈক্য' ওপরের দুই মতৈক্য থেকে চরিত্রে আলাদা। এ এক দারুণ মতৈক্য, যা নির্বাচনী ব্যবস্থায় কোনো আপোশ বা ছাড়ের জায়গা রাখে না। অর্থাৎ আমাদের সামনে হাজির হয় চরম মতানৈক্যের রূপ নিয়ে– তার চেহারা সহিংস। নির্বাচনী ব্যবস্থাসংক্রান্ত যতো তর্কবিতর্ক, বাদ-বিসম্বাদ তার উদ্দেশ্য নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক করা নয়, রাষ্ট্রকে তো নয়ই– বরং কী করে আমার দল ক্ষমতায় যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে। আহা! গণমাধ্যম ও এনজিওদের যে প্রভাবশালী অংশ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ধুয়া তুলে সৎমানুষের খোঁজে নেমেছিল এই বাস্তবতায় তাঁদের প্রকল্প মাঠে মারা গিয়েছে নাকি?

বহুজাতিক কোম্পানি ও বহুপক্ষীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং ঢাকার ইউরোপীয় ও মার্কিন দূতাবাসগুলোও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চায় বলে দাবি করছে। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বগলে বাংলাদেশকে ঢোকানো হয়ে গেছে এবং এখন দেখাতে হবে যে অবাধ বাজারব্যবস্থা, বিপুল পরিমাণ অর্থসাহায্য এবং ক্ষুদ্রঋণ ও দারিদ্র বিমোচনের কায়কারবার বাংলাদেশকে কতো সুন্দরভাবেই না গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ বাড়ে নি, বরং লুটপাটের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। ইরাক ও আফগানিস্তানে বুশ-ব্লেয়ারের নেশান বিল্ডিং প্রজেক্টের মতো বাংলাদেশও তো পরীক্ষার ক্ষেত্র। দাতাসংস্থাগুলোর ধারণা হয়েছিল যে বাংলাদেশের জনগণ শান্ত্রিপূর্ণ নির্বাচন চায় এবং ড. ইউনূসের মতো কাউকে প্রধান উপদেষ্টা হিশাবে খাওয়ানো গেলে রাজনৈতিক দলগুলোও তাঁকে গিলবে। এই আন্তর্জাতিক প্রকল্পও ব্যর্থ হয়েছে। ড. ইউনূস শান্তি পুরস্কার পাওয়ার পরপরই অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে সাফাই গাওয়ার পরেও, কিম্বা তিনি বহুজাতিক কোম্পানিরই অতি বন্ধুস্থানীয় হওয়া সত্ত্বেও মানুষ হয়তো মেনে নিত। কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দর 'সবার জন্য' খুলে দেবার কাতর বক্তৃতা দেওয়ায় তিনি বিরোধী রাজনৈতিক জোটের সন্দেহের খাতায় নাম লিখিয়ে ফেলেছেন*। এর সঙ্গে চট্টগ্রামের স্থানীয় রাজনীতির বিবাদেও তিনি নিজেকে জড়িয়েছেন। এই প্রশ্নের সঙ্গে আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বিরোধ সম্পর্কে তিনি সজ্ঞান বলে মনে হয় নি। তাছাড়া হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক সরকারের সঙ্গে তার অতীত সম্পর্ক এবং মার্কিনপন্থী বিএনপির সঙ্গে তার সম্পর্কের গভীরতা সম্পর্কে আওয়ামী লীগের যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ রয়েছে। এখন তিনি বহুজাতিক কোম্পানির দই আর বোতলে করে তাদের পানি বিক্রি করবেন আমাদের কাছে। তবুও তার সততার আমি প্রশংসা করি। তিনি নোবেল পেয়ে এতোই গদগদ হয়েছেন যে গ্রামীণফোনের লোগোও রাতারাতি বদলে গেল। এটা টেলিনর কোম্পানির আদত লোগো। তাকে নোবেল দিয়েও রাজনৈতিকভাবে আপাতত বিকানো গেল না। তার প্রতি সন্দেহ বা দূরত্ব বজায় রাখাও আওয়ামী লীগের ভারতপন্থী রাজনীতির দিক থেকে সঠিক হয়েছে।

নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি আর গণতন্ত্র আলাদা জিনিস। সংবিধান ও রাষ্ট্র ঘোর অগণতান্ত্রিক হলেও একটা নিয়মের মধ্যে একজন বা একদলের কাছ থেকে অন্য দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হতে পারে। গণতন্ত্র দূরে থাকুক, একটি দেশে যদি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির খানিক রেশও থাকে, তাহলে অন্তত ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা নিয়ম রাজনৈতিক দলগুলো মানে এবং সেই নিয়ম না মানলে বিদ্যমান

---

* চৌদ্দদলীয় জোট জাতীয় স্বার্থের জায়গা থেকে ড. ইউনূসের বিরোধিতা করছে তা নয়, মূলত চট্টগ্রাম বন্দর খুলে দেওয়া না-দেওয়া ভারতের আঞ্চলিক নিরাপত্তার সঙ্গেও সম্পৃক্ত। মার্কিন ও ভারতীয় স্বার্থের পার্থক্য আছে এখানে। পরবর্তীতে ড. ইউনূসের হঠাৎ উত্থানের ফানুস হঠাৎ চিমসে যাওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে হলে এই দিকটি নিয়ে আলাদা আলোচনার প্রয়োজন আছে।

আইনে আদালত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এটা তখনই সম্ভব যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতা একটা কার্যকর ক্ষমতা হিশাবে বহাল। কিন্তু আমি আমার আগের বহু লেখায় অনেকবারই বলেছি যে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের নামে একদলীয় শাসনই চলে। যে দল ক্ষমতায় আসে, সেই দলের নেতা বা নেত্রীই একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করেন। যাকে আমি বলি, 'সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্র'। এই ক্ষমতা তিনি ভোগ করেন সংবিধানের জোরেই। আমরা এই দিকটা গণ্য করি না বলে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা ওয়াজেদের মধ্যে তিক্ত এবং অনেক সময় অশ্লীল বিরোধকে তাঁদের ব্যক্তিগত রুচি বা স্বভাবের দোষ বলে মনে করি। যদি একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সুযোগ সংবিধানে না থাকে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্রেই যদি একনায়কতান্ত্রিকতার সিংহাসন পাতা থাকে, তাহলে সন্ত্রাস করে হোক, লাঠি বৈঠা নিয়ে হোক, যেনতেনভাবে ক্ষমতায় যাবার আওয়ামী নীতি ও কৌশল অবশ্যই 'সঠিক'। দুই নেত্রী (নেতা হলেও একই কেচ্ছা হতো) পরস্পরের প্রতি যে ঘৃণা প্রকাশ করেন, তার উৎপত্তি বাংলাদেশের সংবিধানে– তাঁদের চরিত্রে নয়, বা থাকলেও তা রাজনৈতিক বিচারে গণ্য করার মতো কিছু নয়। এটা তো জানা কথাই একনায়কতন্ত্র তার প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করা ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। এটা বাঁচামরার প্রশ্ন।

নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির খানিক রেশ থাকলেও অন্তত ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা নিয়ম রাজনৈতিক দলগুলো মানে। রাষ্ট্রক্ষমতা কার্যকর ক্ষমতা হিশাবে বহাল থাকলে মানতে বাধ্য করার পাশাপাশি অমান্যতার জন্য আইন-আদালত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বিদ্যমান রাষ্ট্রশক্তির চরিত্রের মধ্যে সেই ক্ষমতা নাই। রাজনৈতিক দলগুলোর একনায়কতান্ত্রিক শক্তিকেই রাষ্ট্রক্ষমতা হিশাবে বহাল করবার বিচিত্র নিয়মটার নাম তথাকথিত 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার'।

এসবের গোড়ায় না গিয়ে বাংলাদেশে সাংবিধানিক বিষয় নিয়ে যেসব গুরুগম্ভীর তর্ক চলছে, সেসব অতিশয় ফালতু তর্ক। যাদের এখনো হুঁশ হয় নি যে বাংলাদেশের বর্তমান সংকট নির্বাচনী প্রক্রিয়া সংস্কারের প্রশ্ন নয়, তাদের লেখালিখি বেকার। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো গায়ের জোরে সংবিধান বদলিয়ে নিজেরাই যে নিয়ম বানায়, নিজেরাই তা আদৌ মানে না। কিন্তু তারা তো আদৌ তা মানতে বাধ্য নয়, কারণ বিদ্যমান রাষ্ট্রশক্তির চরিত্র এমন যে তাদেরকে নিজেদেরই করা আইন মানতে বাধ্য করবার কোনো ক্ষমতা এই রাষ্ট্রের নাই। রাষ্ট্রশক্তিকে দুর্বল রেখে দলীয় একনায়কতান্ত্রিক শক্তিকেই রাষ্ট্রশক্তি হিশাবে বহাল করবার ও বহাল রাখবার ভারী বিচিত্র একটা নিয়ম তৈরি করেছে রাজনৈতিক দলগুলো। এটাই হলো তথাকথিত 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার'। এই সরকার নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ অথবা ক্ষমতাহীন হবে শুধু তাই নয়,–তাকে প্রতিদিন সকলের, বিশেষভাবে দুই বিরোধী পক্ষের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে তারা

'নিরপেক্ষ'। তামাশাটা দেখার মতো। যে নির্বাচন রাজনৈতিক দলগুলো নিজেরা করতে পারে না, সেই নির্বাচন তিন মাসের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে করে দিতে হবে। বাহ্।

অথচ রাজনৈতিক দলগুলোই কি বলে নি যে আমরা অসৎ, আমরা নির্বাচনে কারচুপি করি, আমরা আইন ও সংবিধান মানি না– অতএব প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতো একটি সাংবিধানিক পদ থাকা সত্ত্বেও তারাই কি 'তত্ত্বাবধায়ক' সরকারের দাবি তোলে নি? তারাই কি তা আবার বাস্তবায়ন করে নি? নিয়মতান্ত্রিক সংবিধান ও সেই সংবিধান রক্ষা এবং প্রয়োগের জন্য প্রশাসনিক ও বলপ্রয়োগের সংস্থাগুলো যদি তারা কার্যকর রাখতো তাহলে এই ধরনের কোনো সরকারেরই প্রয়োজন থাকতো না। নির্বাচন কমিশনারকেই সাংবিধানিক ও প্রশাসনিকভাবে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য পরিপূর্ণ অর্থে তারা শক্তিমান রাখত–রাষ্ট্রশক্তিকে এখনকার মতো বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন বা খণ্ড খণ্ড করতো না।

বলপ্রয়োগ বা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রশক্তি হয়ে না উঠলে সে আবার কীসের সরকার? রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থনই যার শক্তি সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনোই ক্ষমতা নাই আওয়ামী লীগ না চাইলে কোনো কিছু মানতে বাধ্য করার? সেটা সংবিধানের ভুয়া তর্ক দিয়ে কিম্বা সেনাশাসন তলব করবার হুমকি দিয়েই হোক। আদত কথা, রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের সংস্থা যতক্ষণ দুই জোটের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নির্বিকার তখন একমাত্র রাজপথের শক্তিই রাষ্ট্রশক্তি।

একদিকে বলা হচ্ছে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার শুধু অরাজনৈতিক সরকারই নয়, দৈনন্দিনের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনা ছাড়া তার আর কোনো ক্ষমতা নাই। একটা নজির দিচ্ছি। রাজনৈতিক দলগুলোর সহিংসতায় আজ পর্যন্ত বহু মানুষ নিহত হয়েছে, জানমালের ক্ষতি হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কি কোনো ক্ষমতা আছে যে কারো চুলের উকুনটিকেও টুস করে ধরে? ধরলে কারো ধড়ে কি মাথা থাকবে? আইন কই? বিচার কই? অন্যদিকে নির্বাচন হওয়া না হওয়ার ব্যাপারটা রাজনৈতিক দলগুলোরই ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছেই জিম্মি। যারা নিয়ম বানায় তারাই সেই নিয়ম মানবার কোনো ব্যবস্থা রাখে নি– তাদের কাছ থেকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন কী করে আশা করা যায়?

রাষ্ট্রশক্তির এই ঘোর দুর্দশার চরিত্র বিএনপি-জামায়াত জোট যতোটা বুঝেছে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দল বরং বুঝেছে বেশি। আমরা জানি জামায়াতে ইসলামীর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা নিজের বলে রফা করেছে আওয়ামী লীগ, তার সুবিধা আছে বলে। আওয়ামী লীগ জানে এই সরকার কোনো সরকারই নয়। যে-সরকারের পেছনে কোনো রাজনৈতিক শক্তি নাই, রাজনৈতিক দরগুলোর সমর্থনই যার শক্তি সে আবার কীসের সরকার? যে শক্তি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রশক্তি হয়ে ওঠে, সেই শক্তি হিশাবে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার মানা না-মানা নিজের ইচ্ছাধীন গণ্য করে ঠিকই করছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি মনে করে যে মার্কিন ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের

রাষ্ট্রদূতদের সামনে রেখে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার শপথ নিলেই তিনি আপসে আপ ক্ষমতাবান আর জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবেন, সেই মিথ আওয়ামী লীগ এখনো ভোলে নি। এই বিপদের ঝুঁকিটা নিয়েছে বলেই আওয়ামী লীগের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেড়েছে। যদিও বিএনপি ক্ষমতা ছাড়ার পরের সহিংসতায় আওয়ামী ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছিল; কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটের শর্তেই নির্বাচন হতে হবে এই দাবি জারি রেখে এবং নিজের পক্ষে ঠিক সময়ে রাজপথে শক্তি প্রদর্শন করে আওয়ামী লীগ ঠিক কাজই করেছে। গণমাধ্যমের বিপুল সুবিধা পেয়েছে আওয়ামী লীগ এবং তাদের মারমুখী অবস্থার সামনে চারদলীয় জোট ভিজে বেড়ালের মতো লেজ গুটিয়ে সরে বসে আছে। পুরো ঘটনাই ঘটেছে মাত্র এক হপ্তার মধ্যেহেই। সেই সময় যখন প্রতি মিনিটেই পরিস্থিতি বদলায় এবং বদলাবে। আমি যখন গ্রামে বসে এই লেখা লিখছি তখন সাধারণ মানুষের অধিকাংশের মত হচ্ছে চুরি-দুর্নীতি করে ও সাধারণ মানুষকে বিদ্যুৎ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসে কষ্ট দিয়ে–তদুপরি কানসাট, ফুলবাড়ি ও শনির আখড়ায় মানুষ মেরে বিএনপি এখন গ্রামে সালিশ ডেকে মাতবরের পেছনে দাঁড়িয়ে যেন বিচার চাইছে। নিজের কিছু করার ক্ষমতা নাই। তারা টাকা দিয়ে নির্বাচন করবে এই আনন্দে আছে; কিন্তু সাংগঠনিক বল নাই। যতোবারই বিএনপি বলে যে বর্তমান উপদেষ্টা ও নির্বাচন কমিশনার বা বর্তমান সংবিধানের অধীনে নির্বাচন হবে, ততোই বিএনপির মুখপোড়া ভাব আরো স্পষ্ট হয়। কারণ জনগণ ঠিকই জানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা বিদ্যমান সংবিধান বা রাষ্ট্রের কোনোই ক্ষমতা নাই যে আওয়ামী লীগ যদি না চায় তাহলে আওয়ামী লীগকে কোনো কিছু মানতে বাধ্য করার। সেটা সংবিধানের ভুয়া তর্ক দিয়ে হোক কিম্বা সেনাশাসন তলব করবার হুমকি দিয়েই হোক। রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের সংস্থা যতক্ষণ দুই জোটের দাঙ্গাহাঙ্গামায় নির্বিকার তখন একমাত্র রাজপথের শক্তিই রাষ্ট্রশক্তি। সেই শক্তি দিয়েই শক্তির মোকাবিলা না করে সংবিধান ও নিয়মের কথা বলা মানে নিজের ক্ষমতা নাই কিন্তু মাতবরের কাছে সালিশে বিচার চাওয়ার মতো অবস্থা। গত সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে ঘটনার চরিত্র বদলে গিয়েছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে 'ছুটি' দিয়ে নির্বাচন কমিশন 'পুনর্গঠন' করবার তামাশা দেখলাম। দুই পক্ষ আমাদের ধারণা দেবার চেষ্টা করছে যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক হানাহানি, খেয়োখেয়ি, একনায়কতান্ত্রিকতা বা ফ্যাসিবাদ রাজনৈতিক সংকট তৈরি করে নি, তৈরি করেছে এম এ আজিজ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে না তুলে, রাষ্ট্র পরিগঠন সম্পন্ন না করে, ব্যক্তির উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে তারা রাষ্ট্র রূপান্তরের রাজনৈতিক প্রশ্নকে ক্রমাগত আড়াল করে চলেছে।

শেষে সকলকে অতি বিনয়ের সঙ্গে বলি– আমি নিরস্ত্র একজন নাগরিক– এই অধম নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আজিজের ভূমিকার একজন নিরীহ সমর্থক। একজন বিচারপতি হিশাবে এতোদিন পদত্যাগ না করে তিনি সঠিক সাংবিধানিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ট্রাজেডি অবাস্তব বিচারপতিদের মতোই। যাঁরা

সংবিধান ও আইন বোঝেন (সকলে নয়), কিন্তু আইনের পেছনে ক্ষমতা না থাকলে সেটা যে সংবিধান বা আইন নয় এই মোদ্দা কথা ধরতে পারেন না। সংবিধান রাষ্ট্রশক্তি নয়, সংবিধান বা আইনের পেছনে রাষ্ট্রশক্তি বা সোজা কথায় গায়ের জোর থাকলেই সেটা সংবিধান বা আইন হয়– বহু আইনবিদ ও দার্শনিক বারবার এই রূঢ় সত্যটা বলে গেছেন। বিচারপতি হিশাবে যে নীতিতে জনাব আজিজ অবিচল থাকতে চেয়েছেন, সেটা অক্ষমের নীতি। ফলে রাজপথে আওয়ামী সহিংসতা, বলপ্রয়োগ ও সাংগঠনিক শক্তির তোপে তাঁকে অপমানিত হয়েই হয়তো যেতে হবে*। আওয়ামী লীগ এটা তাদের বিজয় হয়েছে মনে করে উৎসব করবে, আর চারদলীয় জোট নিজেরা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটকে মোকাবিলা না করে তাঁকে বলির পাঁঠার মতো কোরবানি দিতে চলেছে, এই মহা করুণ দৃশ্য অভিনয়ের মঞ্চ ইতোমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে!

কিন্তু এটাই রাজনীতি। আওয়ামী জোট বুঝিয়ে দিলো জনগণের পূর্ণ সমর্থন না থাকলেও ক্ষমতা রাজপথেও তৈরি করা যায়, তৈরি হয়।

৭ অগ্রহায়ণ, ১৩১৩। রিদয়পুর, টাঙ্গাইল।

অন্তর্ঘাত না নির্বাচন

এই লেখা যখন লিখছি, তখন রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার বিরুদ্ধে ১১ জন নেতা হাইকোর্টে রিট করেছেন। তাঁরা দাবি করছেন, রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করে অবৈধ কাজ করেছেন। তাঁরা ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার বিরোধিতা করছেন, এই বিষয়ে হাইকোর্টের রায় চান। এটাও তাঁরা চাইছেন যে, প্রধান উপদেষ্টা অন্য উপদেষ্টাদের সঙ্গে নিয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিক, এই রকম একটা নির্দেশ দিক হাইকোর্ট। রাজনীতির এটা নতুন উপাদান। একে দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এক, চৌদ্দ দল নির্বাচন চায় না, তাদের ভেতরে যারা 'গণঅভ্যুত্থানের' স্বপ্ন দেখছে এটা তাদেরই কৌশল। অথবা আওয়ামী লীগ নির্বাচন চায়, তবে ভোটার তালিকা তৈরির কথা বলছে আসলে বাড়তি সময়ের দরকারে। একই সঙ্গে রাস্তায় থেকে এমন একটা পরিস্থিতি তারা বহাল রাখতে চায়, যাতে তাদের বিজয় নিশ্চিত হয়। কিন্তু

---

* শেষাবধি বিচারপতি আজিজকে সরে যেতে হয়েছে।

অন্তর্ঘাত* না নির্বাচন– রাস্তার এই দুই ধারার মধ্যে কারা জয়ী হবে আমরা এখনো জানি না। দেখা যাক। এখন কিছু পেছনের কথাই শুধু বলবো।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দুই অগণতান্ত্রিক ও গণবিরোধী ধারার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। যার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একনায়কতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের মিশাল রক্তে আর লাশে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। রক্ত ও লাশের উৎসবের মধ্যে সবচেয়ে কৌতুকময় দিক হচ্ছে, সংবিধান উভয়পক্ষের যেমন খুশি তেমন ব্যাখ্যা এবং তাদের ইচ্ছামতো বদলানো ও বদলাবার দাবি তোলা। দুই পক্ষই সংবিধান পাল্টিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, যেন তাদের সংবিধান পাল্টাবার অধিকার নাগরিকরা দিয়েছে। এর আগেও তারা বহুবার সংবিধান ভেঙেছে, কিন্তু তাকে বৈধ করবার জন্য 'সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা'র নামে সংসদে আবার পাশ করিয়ে নিয়েছে। কে ক্ষমতায় যাবে, তার জন্য রাস্তায় মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা করে একসময় জোর-যার মুল্লুক-তার নীতির ভিত্তিতে তারা তাদের বিরোধ মীমাংসা করছে, সংসদে বসে তাদের বিরোধে মীমাংসা করে নি বা তারা তা করে না।

এবার ঘটনাঘটন অতিরিক্ত মনে হবার কারণ গণমাধ্যম ও টেলিভিশানগুলো বিভিন্ন কোম্পানির বিজ্ঞাপন পাবার প্রতিযোগিতায় তাদের খবর পরিবেশনায় রসালো, রহস্যময় ও উত্তেজক 'লাইভ' উপাদানের মিশাল দিয়ে মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামাকে রীতিমতো উৎসব গণ্য করে প্রচার করেছে।

একের-পর এক ব্যক্তিকেই তারা রক্তাক্ত সংঘর্ষের কেন্দ্রবিন্দু খাড়া করছে। প্রথমে কে এম হাসান, পরে এম এ আজিজ, এখন রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজউদ্দিন আহমেদ। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ আজিজকে 'ছুটি' দিয়ে নির্বাচন কমিশন 'পুনর্গঠন' করবার তামাশা আমরা দেখলাম। দুইপক্ষ আমাদের এই ধারণা দেবার চেষ্টা করছে যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক হানাহানির মূল কারণ তারা নিজেরা নয়। তাদের খেয়োখেয়ি, একনায়কতান্ত্রিকতা বা ফ্যাসিবাদ রাজনৈতিক সংকট তৈরি করে নি, তৈরি করেছে এম এ আজিজ। যেমন খুশি তেমন কাটাছেঁড়া করে নিজ দলকে ক্ষমতায় নেবার জন্য ক্রমাগত তারা সংবিধান চটকাবে। এমনকি নাগরিকদের প্রাণহানি ও সম্পদের চরম ক্ষতি করতেও দ্বিধা করবে না তারা। কিন্তু সবই আমাদের মেনে নিতে হবে গণতন্ত্রের নামে। অথচ দুইপক্ষের কেউই গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মানা দূরে থাকুক, তাদেরই বানানো নীতি নিজেরাই মানে না। একপক্ষ সাংবিধানিকতার দোহাই দিয়ে নির্বাচনী পরিস্থিতি

---

* রাজপথে সহিংসতা, সন্ত্রাস ও অন্তর্ঘাতের ফলাফল আমরা এখন জানি। এই ক্ষেত্রে যে দিকটা বিশেষভাবে খেয়াল করবার তা হলো তথাকথিত 'সিভিল সোসাইটি ও গণমাধ্যমের একটি অংশ সজ্ঞানে অন্তর্ঘাতমূলক রাজনীতিকেই সমর্থন করেছে। একে 'অন্তর্ঘাত' বলছি এই কারণে যে বাংলাদেশে সরকার বা রাষ্ট্রের কোনো গুণগত, ইতিবাচক বা গণতান্ত্রিক রূপান্তরের লক্ষ্যে রাজপথের সংঘাত ও সন্ত্রাস সমর্থনের কোনো কারণ ছিল না। বাংলাদেশের জনগণ শেষাবধি কী ধরনের সরকার পেয়েছে এখনকার বাস্তবতাই তার বড়ো প্রমাণ।

তাদের অনুকূলে রাখতে চাইছে, আর বিরোধীপক্ষ আবদার জানাচ্ছে যতোক্ষণ না নির্বাচনী সংস্কার তাদের মনঃপূত হয়–অর্থাৎ যতোক্ষণ তারা নিশ্চিত না-হয় যে ভোটাভুটিতে একমাত্র তারাই জিতে আসবে, ততোক্ষণ তারা হানাহানি ও সহিংসতা বন্ধ করবে না। দুই পক্ষের এই হিংস্র হানাহানির উদ্দেশ্য কোনো ন্যূনতম গণতান্ত্রিক নিয়মনীতির অধিষ্ঠান নয়। একটাই উদ্দেশ্য–তারা চায় এমনভাবে নির্বাচন পরিচালিত হোক, যাতে তাদের দল বা তাদের জোটই ক্ষমতায় যায়, যেন আগামী পাঁচ বছর এই দেশের জনগণকে শোষণ ও লুটপাট করবার বৈধ পারমিট তারা তথাকথিত নির্বাচনের নামে কুক্ষিগত করতে পারে।

এই পরিস্থিতি নতুন কোনো কেচ্ছা নয়, শাসক ও শোষক শ্রেণীর তথাকথিত গণতন্ত্র নামক ঘোড়ার ডিম এইভাবেই নির্বাচনের সময় রক্তাক্ত হয়ে ফাটে। এবার আমাদের ঘটনাঘটন অতিরিক্ত মনে হবার কারণ হচ্ছে গণমাধ্যম ও টেলিভিশানগুলো বুঝে গিয়েছে যে, বিভিন্ন ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপন পেতে হলে, তাদের চ্যানেল মানুষ যেন বেশি দেখে তার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই প্রতিযোগিতায় তাদের খবর পরিবেশনায় রসালো, রহস্যময় ও উত্তেজক 'লাইভ' উপাদান পরিবেশনার মিশাল থাকা চাই। তারা এইসব মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামাকে রীতিমতো উৎসব গণ্য করে প্রচার করছে। এর ফলে একটা পরিস্থিতি গণমাধ্যমগুলো তৈরি করতে পেরেছে যে, তারা যা দেখায় ও আমরা যা দেখি যেন তার ভিত্তিতেই আগামী দিনে বাংলাদেশের নির্বাচন বা রাজনীতির গতিপ্রক্রিয়া ঠিক হয়। এটা যে হবে না সেটা নিশ্চিত। এইক্ষেত্রে বিচক্ষণ নাগরিকদের প্রথম পাঠ হবে এই রকম যে টেলিভিশান বা পত্রপত্রিকায় আমরা যা দেখি বা পড়ি তা সংখ্যাগরিষ্ঠসাধারণ জনগণের চিন্তা, মত বা ইচ্ছার প্রতিফলন নয়। আমরা আগামীতে কী দেখবো তা আন্দাজ করার জন্য যে বাস্তব উপাদন অন্বেষণ ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে– সেই দিকে কারো নজর পড়েছে দেখিনি।

এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার একটাই মাত্র পথ-অগণতান্ত্রিক, একনায়কতান্ত্রিক, ফ্যাসিবাদী ও গণবিরোধী শক্তি ও দলগুলোর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য সকল ধরনের ক্ষমতা ও শক্তি অর্জন করা। নানান ঐতিহাসিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কারণে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শক্তির আবির্ভাব ঘটানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। এই লড়াই-সংগ্রাম সাধারণত সমাজের চিন্তাচেতনার মধ্যে আগে দানা বাঁধে। সেটা আরো কঠিন হয়ে পড়েছে পত্রপত্রিকায় দলীয় পক্ষপাতদুষ্ট লেখকদের আধিপত্যে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ বা সংখ্যাগিরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে লেখালিখি নাই বললেই চলে। অতএব, পাঠক যদি গত কয়েক মাসে তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত লেখালিখি পাঠ করেন তাহলে অনায়াসেই দেখবেন যে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি কেন্দ্র করে পক্ষ দাঁড়িয়েছে দুটি : এক পক্ষ সাংবিধানিক উসিলা তুলে দাবি করছে বিদ্যমান রাষ্ট্রের এই হাল রেখেই নির্বাচন

করতে হবে, অথচ রাস্তায় বিরোধী পক্ষের সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসের মুখে তারা সংবিধান গিলে ফেলতে এক মুহূর্তও দেরি করছে না। অপরপক্ষ বিজয়োৎসব করছে সন্ত্রাসের। তারা সংবিধান বা আইন দূরে থাকুক কোনো নিয়মের অধীনে নির্বাচন হোক এটা চায় না। তাদের একটাই উদ্দেশ্য– রাস্তার সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে তাদের পক্ষে এমন একটা অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি, যাতে ক্ষমতায় যাওয়া নিশ্চিত হয়। অবশ্য এই ক্ষমতারোহণ হবে বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য রক্তাক্ত ও ভয়াবহ। বাংলাদেশের যেসব নাগরিক ন্যূনতম মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন তাঁরা ইতোমধ্যেই বীভৎস লাশের উৎসবের দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। কেমন হবে তার চেহারা তা পিটিয়ে মানুষ হত্যার উৎসব দেখে ইতোমধ্যেই জনগণ টের পেয়ে গিয়েছে।

বিগত সরকার নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন ও প্রেসিডেন্ট পদ তাদের অনুকূলে যেভাবে সাজিয়ে রেখে গেছে নির্বাচন সেই শর্তেই হতে হবে বলে চারদলীয় জোট দাবি জানিয়ে যে চলেছে। কিন্তু এই দাবিকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনো কারণ নাই। যদি আসলেই সংবিধান কাটাছোঁড়া যাই হোক– তারই অধীনে নির্বাচন করার প্রশ্ন একটা নীতিগত প্রশ্নই হয়, তাহলে নিজেদের কথার পেছনে শক্তি নিয়েই চারদলীয় জোট দাঁড়াত। এমনকি এখনকার হাঙ্গামা শুরু হবার আগে, বিচারপতিদের অবসর নেবার বয়সসীমা বাড়িয়ে খামাখা কে এম হাসানকে প্রধান উপদেষ্টা বানাবার চেষ্টা চালাত না। যে প্রয়াস দলীয় রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে মোকাবিলা করা হলো না, বিরোধী দলের দাবির মুখে পরাজয় মেনে নিতে হলো– সেই পরাজয় এম এ আজিজকে অপসারণেই কিন্তু থেমে থাকবে না। কে এম হাসান এবং এম এ আজিজ দুইজনেরই অপসারণ মানতে বাধ্য হয়েছে চারদলীয় জোট। এখন তাকে মোকাবিলা করতে হবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজউদ্দিনকে রাখা না-রাখার ব্যাপারটি। তবে আমার ধারণা চৌদ্দদলীয় জোট এই প্রশ্নটিকে মাঠে জারি রাখবে, নির্বাচনে জিততে না পারলে নির্বাচনী কারচুপির পক্ষে যুক্তি খাড়া করার জন্য। কিন্তু এমন জায়গায় এই দাবিকে তারা নেবে না যাতে প্রেসিডেন্ট জরুরি অবস্থা ও সেনাবাহিনী তলব করতে বাধ্য হয়।

চারদলীয় জোট অবশ্য ভিজে বেড়াল নয়। সন্ত্রাস কী করে দেখাতে হয় তারা সেটা জানে। সহিংসতা এবং বলপ্রয়োগের দিক থেকে তাদের শক্তি চৌদ্দদলীয় জোটের চেয়ে কম আছে বলে ভাবার কারণ নাই। সেটা বিএনপির যেমন আছে, জামায়াতে ইসলামীরও আছে। অপ্রস্তুত অবস্থায় জামায়াত- শিবির পাল্টা আঘাতের চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেটা ছিল নমনীয় এবং আগামী নির্বাচনের কথা ভেবে সংযত।

ভারতীয় আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যে গণচেতনা বাংলাদেশে বহাল, চারদল গত নির্বাচনে তাকে কাজে লাগাতে পারলেও এবার জনগণ চার দলকে একই চোখে দেখছে না। আস্থায় তাদের দুর্বলতার এটাও একটা কারণ। এই

দুর্বলতার সুযোগে চৌদ্দ দল যদি তাদের সহিংসতা ও সন্ত্রাস দিয়ে একটা সংঘাতপূর্ণ অবস্থায় দেশকে নিয়ে যেতে চায় রাজনীতির হিশাবনিকাশ তাহলে এখনও ভিন্ন রকম হতে পারে। এই বিবেচনায় আওয়ামী লীগের নির্বাচনমুখী হবারই কথা। যদিও চৌদ্দ দলের মধ্যে অন্তর্ঘাতী শক্তি যথেষ্ট প্রবল। চৌদ্দ দলের মধ্যে নির্বাচন বানচাল করে দেবার শক্তি যথেষ্ট তৎপর, কিন্তু আওয়ামী লীগের নির্বাচনে না যেতে পারা হবে মারাত্মক বোকামি। নির্বাচন হওয়া না-হওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কিছুই আসে যাবে না। কিন্তু অন্তর্ঘাত ও জাতীয় নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে অন্তর্ঘাতের ফাঁদে আওয়ামী লীগের পা দেওয়া হবে বোকামি।

চারদলীয় জোটের শাসনামলের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হচ্ছে ইসলামী দল ও শক্তির মধ্যে বিভাজন। জঙ্গী ইসলাম বনাম শান্তিবাদী ইসলাম–এই দুইয়ের বিভাজন বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলতে বাধ্য। এই বিভাজনের কারণেই ইসলাম সমর্থক কর্মীদের পিটিয়ে হত্যা করার পরও ইসলামী ধারার রাজনীতিতে তা চরম কোনো ক্ষোভ সৃষ্টি করে নি। জামায়াতে ইসলামী তাদের কর্মীদের পিটিয়ে হত্যা করার পরেও শান্তিবাদী ভাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, এ যাবতকাল তারা রাজনীতিতে যতোটা আগুয়ান হয়েছে জঙ্গী প্রতিহিংসা প্রদর্শন করে তারা তা হারাতে রাজি নয় বলেই। অন্যদিকে সবচেয়ে শিক্ষণীয় দিক হলো, তথাকথিত মানবাধিকারবাদীদের অধিকাংশই এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো শক্তিশালী নীতিগত অবস্থান নেয় নি।

যদি চারদলীয় জোট পাল্টা চৌদ্দ দলের সন্ত্রাস ও হামলার জবাব দিত তাহলে নিশ্চয়ই রাজনীতির গতি অন্যদিকে যেত। চারদলীয় জোটের দুর্নীতি ও তাদের আমলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি তাদের নৈতিক দুর্বলতার কারণ–কাজে কাজেই গত মাসখানেকের সাময়িক পরাজয়েরও পেছনে এই দৌর্বল্যই প্রধানত কাজ করেছে। ভাববার কোনোই কারণ নাই যে দুর্নীতি ও আর্থ-সামাজিক নীতির প্রশ্নে চৌদ্দদলীয় জোট চারদলীয় জোট থেকে আলাদা। চৌদ্দ দলও সমান দুর্নীতিবাজ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানো তাদের পক্ষে অসম্ভব। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজার, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের চুক্তি, নির্দেশ ও চাপ আছে।

এই লেখার উদ্দেশ্য চৌদ্দ দলের 'বিজয়' ব্যাখ্যা করে কে কার চেয়ে বেশি শক্তিশালী সেই তর্ক তোলা নয়। দুই পক্ষের কাছেই নাগরিক হিসাবে আমরা জিম্মি হয়ে গেছি। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ নাগরিকরা নানান ঘটনাঘটন থেকে কী শিক্ষা লাভ করবে সেই দিকে নজর রাখতে হবে। যেমন, রাজনীতির বিশেষ মুহূর্তে বলপ্রয়োগের ফল ও অর্থের মধ্যে তারতম্য ঘটে। দুটো পরিস্থিতির তুলনা করা যাক: চারদলীয় জোট ক্ষমতাসীন থাকার সময় চৌদ্দ দলের হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ও সহিংসতা পাল্টা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস দিয়ে মোকাবিলা করেছে অর্থাৎ পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে আওয়ামী ও চৌদ্দদলীয় কর্মীদের বেদম পিটিয়ে।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিপরীতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন চৌদ্দদলীয় জোটের রাজপথের সন্ত্রাস ও সহিংসতাকে জনগণ সমর্থন করে নি। ফলে তাদের পুরো আন্দোলন-সংগ্রাম মূলত মিডিয়ার প্রতাপেই জারি রাখা হয়েছিল।

কিন্তু চারদলীয় জোট ক্ষমতা ছাড়ার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চৌদ্দ দলের একই ধরনের কর্মকাণ্ড–সন্ত্রাস ও সহিংসতা জনগণের চোখে ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়েছে। যে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় থাকার সময় চৌদ্দ দলকে রাষ্ট্রশক্তির পূর্ণ ব্যবহার করে পিটিয়েছে, সেই চারদল ক্ষমতা ছাড়ার পর চৌদ্দ দলকে সন্ত্রাস, সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের দিক থেকে দলীয় বা জোটগতভাবে মোকাবিলা করতে পারে নি। এটাই এখনকার রাজনীতির নগদ সত্য। রাজনীতির জন্য এই দিকগুলো অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। এই ধরনের মুহূর্ত ও গণমূল্যায়ন গোটা রাজনীতির অভিমুখ ও গতিপ্রকৃতি বদলে দিতে পারে। চারদলীয় জোট রাস্তার ক্ষমতার বিপরীতে রাস্তায় ক্ষমতা প্রদর্শন ছাড়া আদৌ চৌদ্দদলের রাজনৈতিক অগ্রগতি ঠেকাতে পারবে কি-না এখনও সন্দেহ রয়েছে। তবে দুই পক্ষই চাইবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেন এমন অবস্থায় না যায় যাতে সেনাবাহিনীকে এগিয়ে আসতে হয়।

দুই হাজার এক সালে বিএনপি ও চারদলীয় জোট ক্ষমতায় এসেছিল ফ্যাসিবাদ, মার্কিন, ভারত ও ইসরায়েলি আঁতাতের ওপর গড়ে ওঠা আঞ্চলিক আধিপত্যবাদ এবং আন্তর্জাতিকভাবে ইসলাম ও ইসলামপ্রধান দেশগুলোর জনগণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিপরীতে সম্ভাব্য রক্ষাকবচ হিশাবে। তারা জামায়াতে ইসলামীর মতো দলকেও ক্ষমতায় মেনে নিয়েছিল এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ইসলামী দলগুলো দেশ ও দশের নিরাপত্তা অন্য দলগুলোর চেয়েও তুলনামূলকভাবে বেশি নিশ্চিত করতে পারে এই ভরসায়। এই কারণেই বিগত সরকার নির্বাচনে পরাজিত বিরোধী শক্তির কুপ্রচারের মুখেও টিকে গিয়েছিল। চুরি, ডাকাতি, লুটপাট দুর্নীতি করার পরেও আওয়ামী লীগ ও তাদের সমর্থকরা চারদলীয় জোটকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে পারেনি। এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ অন্তত এতোটুকু বুঝিয়ে দিয়েছে যে ইসলাম-প্রশ্ন ও জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু।

আওয়ামী লীগ ও তাদের সমর্থকরাও ইসলাম-প্রশ্নকে গুরুত্বের সঙ্গে না নিয়েও ইসলামপন্থী রাজনীতিকে অত্যন্ত সফলভাবে বিভক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও চৌদ্দদলের গোঁড়া সমর্থক হিশাবে আমার চেনা পত্রিকাগুলো ছাড়াও এখন ইনকিলাবকেও যুক্ত দেখতে পাচ্ছি। ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের দিক থেকে ইসলাম-প্রশ্ন রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে কোন্ শ্রেণী কীভাবে মীমাংসা করে তার ওপর বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। অন্যদিকে ইন্দো-মার্কিন-ইসরায়েলি আঁতাতের প্রশ্নে দুই পক্ষেরই অবস্থান একই রকম। উভয় পক্ষই এই আঁতাতের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যেতে চায়। তাছাড়া এ

আঁতাতের সঙ্গে বাংলাদেশে বহুজাতিক কোম্পানির অবাধ বাজার ও বিনিয়োগ, পত্র-পত্রিকা টেলিভিশান গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং সাধারণভাবে নব্যধনী শ্রেণীর স্বার্থ জড়িত। এই রাজনৈতিক লড়াইয়ের নীতি ও কৌশল কী হবে, সেই প্রশ্ন একটি গুরুতর জাতীয় প্রশ্ন হিশাবে রয়েছে এবং আগামী দিনে– নির্বাচন হোক বা না হোক– আরো প্রকাশ্য ও দৃশ্যমান প্রশ্ন হিশাবে সামনে চলে আসতে বাধ্য।

দুর্নীতি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধিতে গণঅসন্তোষ আছে অবশ্যই, কিন্তু যাঁরা এই দুই আর্থ-সামাজিক ইস্যুকে চারদলীয় জোটের দুর্বলতার রাজনৈতিক কারণ বলে মনে করেন আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আওয়ামী লীগ ও তাদের সমর্থকরাও এই দুটো ইস্যুকে তাদের রাজনৈতিক ইস্যু আকারে সামনে আনেনি– সুবিধামতো বুলি ছেড়েছে কেবল। তারাও দুর্নীতিবাজ। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানোর ক্ষমতা তাদের নাই। কিন্তু আধিপত্যবাদী ও অন্তর্ঘাতী শক্তিগুলোর হাত থেকে এই জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা চারদলীয় জোট আদৌ নিশ্চিত করতে পারবে কিনা এই সন্দেহই এখন ঘোরতরভাবে সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন ২০০১ সালেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল, এখনও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশ্নই রাস্তার রাজনীতিতে যেমন নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করছে ও করবে, ঠিক তেমনি নির্বাচনের রাজনীতিতেও সমান ভূমিকা পালন করবে বলে আমার ধারণা। কিন্তু দৃশ্যত রাজনীতির বিতর্ক এখনও অতোদূর পৌঁছায়নি। কিন্তু রাজনীতির গতিপ্রক্রিয়া সেই অভিমুখ নিতে বাধ্য হবে।

যেখানে চার ও চৌদ্দ উভয় জোটই বাংলাদেশের দুর্দশার জন্য দায়ী সেখানে একজন ব্যক্তিকে হেনস্তা ও অপমান করে ছুটিতে যেতে বাধ্য করার মধ্যে বাংলাদেশের গৌরব বাড়েনি। প্রেসিডেন্ট ও প্রধান উপদেষ্টা প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ আজিজকে 'ছুটি'-নেবার অনুরোধ করেছেন। প্রথমত এই অনুরোধের এখতিয়ার তাঁকে সংবিধান দেয়নি। তাহলে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা কোন্ সাংবিধানিক অধিকারের বলে প্রধান নিবাচন কমিশার বিচারপতি এম এ আজিজকে 'ছুটি'তে যাবার 'অনুরোধ' করেছেন? এটা স্পষ্ট যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের 'স্বাধীন'ভাবে কাজ করবার সংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ্ন করেছেন। যাঁরা দাবি করছেন যে রাষ্ট্রপতি এটা করতে পারেন, তাঁরা সংবিধান পড়ে দেখতে পারেন। এম এ আজিজকে আমরা সমর্থন করি বা না। করি তার সঙ্গে এইসব গুরুতর সাংবিধানিক বিতর্কের কোনো সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ চারদলীয় জোটের নির্বাচনে সুবিধা হয় বলে সবকিছুই সংবিধানমাফিক হতে হবে আর চৌদ্দ দল ক্ষমতায় যাবার জন্য সংবিধান পাল্টাবে– এই দুইপক্ষের কোনো পক্ষে না থেকেই আমাদের বুঝতে হবে দুই পক্ষই নিজ নিজ সুবিধামতো সংবিধানের পক্ষে ও বিপক্ষে অবস্থান নিচ্ছে। চার দল যদি এতোই সংবিধান প্রেমিক হয় তাহলে এম এ আজিজের 'ছুটি' মেনে নিলো কেন? তারাও রাস্তায় আন্দোলন সংগ্রাম

করছে না কোন দুঃখে? আমি পাঠককে বোঝাতে চাইছি আমরা সংবিধান নিয়ে যে তর্ক এখানে তুলছি তা চার দল বা চৌদ্দ দলের ফাজলামি নয়।

প্রেসিডেন্ট নিজে যেভাবে প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করেছেন সেখানে গুরুতর সাংবিধানিক গলতি আছে। সেই তর্কে প্রবেশ না করে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে বিপরীতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারই– ভালো হোক কি মন্দ হোক– এখনকার মতো একমাত্র সাংবিধানিকভাবে বৈধ ব্যক্তি। দ্বিতীয়ত, প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ছুটিতে রেখে, অন্য কারো নেতৃত্বে নির্বাচন আদৌ সাংবিধানিকভাবে বৈধ ও গ্রহণযোগ্য হবে কিনা সে ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। বাধ্যতামূলক ছুটি– তাও আবার রাজপথে আইন ও সংবিধানবিরোধী সহিংস কর্মকাণ্ডের মুখে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত। সাংবিধানিকতার বিচারে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ছুটিতে রেখে অন্য কাউকে দিয়ে নির্বাচন পরিচালনা বৈধ কি? এই ধরনের কোনো নির্বাচন নাগরিকরা মানতে বাধ্য হবে কেনো?

আমি সংবিধানবাদী নই। সাংবিধানিকতার দোহাই দিয়ে চারদলীয় জোট যেভাবে রাজপথে আওয়ামী হিংস্রতার হাত থেকে বাঁচার জন্য এবং আগামীতে আবার নির্বাচিত হয়ে আসার সুখস্বপ্নে উদার ভাব ধরেছে, তার সঙ্গে একই কাতারে দাঁড়ানোর সাধ আমার নাই। আমি শুধু দেখাতে চাইছি যে শাসক ও শোষক শ্রেণীর কাছে সংবিধান, আইন বা নিয়মনীতি সব সময়ই ছেঁড়া ত্যানার মতো। তাদের খেলার সাথী প্রেসিডেন্ট ও প্রধান উপদেষ্টাও একই জিনিস। ইচ্ছা করলেই তারা সংবিধানবিরোধী কর্মকাণ্ড করে, করতে পারে, সংবিধান বদলায় এবং পরবর্তী সংসদে 'সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা'র ছুতা তুলে তাকে আবার বৈধ করেও নেয়। প্রশ্ন হচ্ছে যদি আমরা সত্যি সত্যিই গণতান্ত্রিক না হোক– নিদেনপক্ষে একটা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিও চাই তাহলে এইসব অনাচার বন্ধ করবো কীভাবে? বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগই কি একমাত্র সমাধান? যদি তথাকথিত সংবিধানের হাওয়াই কেচ্ছার গোমর আমাদের কাছে ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এই কাণ্ডজ্ঞানটুকু তো আমাদের হওয়া উচিত যে বিদ্যমান সংবিধান বহাল রেখে আমরা কোনোদিনও একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে পারবো না।

মোদ্দা কথা সাংবিধানিক বিতর্ককে নিছকই নির্বাচনী বিতর্ক থেকে আমাদের বের করে আনতে হবে। আনতেই হবে। প্রশ্ন তুলতে হবে বিদ্যমান সংবিধান দিয়ে আমরা গণতন্ত্র কায়েম করতে পারবো না। দলবাজি ও নির্বাচনী হট্টগোলের মধ্যেও অগণতান্ত্রিক, একনায়কী ও ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক চিন্তাচেনার লড়াই চালিয়ে যাওয়াই এখনকার প্রধান কর্তব্য।

১৩ অগ্রহায়ণ ১৪১৩, ২৭ নভেম্বর ২০০৬, শ্যামলী।

গুড়েবালি অথবা গুড়ের মধ্যে বালি পিঁপড়েও খায় না

আমরা একটা গর্তের মধ্যে পড়েছি। উঠতে পারবো কিনা এখনো জানি না। আমাদের রাষ্ট্রচিন্তা, গণতন্ত্র সম্পর্কে ভাবনা এবং ব্যক্তির ভূমিকা ইত্যাদি নানান বিষয়ে সমাজে য ধ্যানধারণা তার বিপরীতে দৈব কিছু ঘটে যাবে আশা করা বৃথা। পাথরে মাথা ঠুকলে পাথর ভাঙে না, মাথা ফাটে। আমার অনুমান ও আশা ছিল নির্বাচন হবে এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটের ‘ন্যায়সঙ্গত’[*] দাবিদাওয়া মেনে নেবেন, শুধুমাত্র বিএনপির হুকুমে চলবেন না। কিন্তু সেই অনুমান ও আশার গুড়ে বালি! অর্থাৎ গুড়ের মধ্যে বালি। যদি গুড়ে পিঁপড়া পড়ত তবুও আমাদের গুড় জীবের কাজে লাগতো। এখন এটা গুড় না বালি। না, তাও ঠিক নয়। আমরা আরো ঘোর বিপদের মধ্যে পড়েছি।

বিপদটা এই রকম যে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করবার সিদ্ধান্ত দিয়ে ক্ষান্ত নয়। মহাজোটের বলে বলীয়ান হয়ে আওয়ামী লীগ ঘোষণা দিয়েছে তারা ‘যেকোনো মূল্যে’ নির্বাচন প্রতিহত করবে। এর সহজ মানে হতে পারে আওয়ামী লীগ মারপিট, দাঙ্গাহাঙ্গামা, বোমাবাজি, সহিংসতা, লগি-বৈঠার পিটুনি দিয়ে হোক বা অন্য যেভাবেই হোক নির্বাচন ঠেকাবে। প্রশ্ন উঠেছে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার অধিকার আওয়ামী লীগের আছে, কিন্তু নির্বাচন ঠেকাবার অধিকার কি আছে তাদের? এটা কি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি? সিধা উত্তর হচ্ছে, নিশ্চয়ই না। তাহলে কি আমাদের আওয়ামী নেতৃত্বাধীন মহাজোটের নির্বাচন বানচালের এই ঘোষণা বা এই অবস্থানের নিন্দা করা উচিত? সংবিধান ও

---

[*] এই লেখা যখন লিখছিলাম তখন বাংলাদেশ একটি সংকটের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলো। আওয়ামী লীগের দাবি গণতান্ত্রিকতার বিচারে ‘ন্যায়সঙ্গত’ কিনা সেই তর্ক এখানে তোলা হয়নি। কয়েকটি গণমাধ্যম চৌদ্দদলীয় জোটের পক্ষে প্রবল প্রচারণা চালাচ্ছিল এবং তারা চৌদ্দদলীয় জোটের দাবিকে ন্যায়সঙ্গত বলে দাবি করে আসছিল। যে ইঙ্গিতটা এখানে দেওয়া হয়েছিল তা হলো তথাকথিত ‘ন্যায়সঙ্গত’ দাবিদাওয়া চারদলীয় জোট মেনে নিয়ে একটা রফা করবার সম্ভাবনা তখনও আমি ভাবছিলাম। সেটা সঠিক ছিল কি-না এখন আর বিচার করবার উপায় নাই। এখন পরিষ্কার যে নির্বাচনহীন পরিস্থিতি তৈরির জন্য একটা সক্রিয় উদ্যোগ আগাগোড়াই কাজ করে যাচ্ছিলো। আমরাই বুঝতে পারছিলাম না।

আইনকানুনের কথা বললে এর উত্তর হবে– হ্যাঁ, এটাই আমাদের করা উচিত। কিন্তু রাজনীতির কথা বললে এই উত্তরটা সহজ নয়।

কেনো? কারণ আওয়ামী লীগ শুরু থেকেই আমাদের এই ধারণাই দিয়ে এসেছে যে যদি নির্বাচনী পরিস্থিতি তাদের অনুকূল না থাকে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। পরিস্থিতির এই আনুকূল্য আছে-কি-নাই তার বিচার কে করবে? বলাবাহুল্য আওয়ামী লীগ ও তাদের সঙ্গে জোটভুক্ত শরিক দলই সেটা করবে। এই আনুকুল্য তৈরি হলো কি হলো না সেই জায়গা থেকেই আওয়ামী নির্বাচনী সংস্কারের দাবি-দাওয়া তুলেছে। আওয়ামী নির্বাচনী সংস্কারের দাবি-দাওয়াগুলো গণতান্ত্রিক বিধিবিধান সমুন্নত রাখা বা অসৎ, ঋণখেলাপী বা অযোগ্য ব্যক্তিরা যেন আমাদের আইন তৈরির বিধাতা না হয়ে ওঠে সেই সবের জন্য ছিল না তাদের কথা পরিষ্কার। বিএনপি ক্ষমতা ছেড়েও আসলে ছাড়েনি। সেটা সত্য বলেই আমরা জানি বা দেখেছি। প্রেসিডেন্ট, তত্ত্বধায়ক সরকার, প্রশাসন, পুলিশ, সামরিকবাহিনীসহ রাষ্ট্রের পুরো কাঠামো না হোক মাথাটা বিএনপির আজ্ঞাবহ হয়ে আছে। এই পরিস্থিতি আওয়ামী লীগের জিতে আসার অনুকূল নয়। জোট সরকার প্রেসিডেন্ট, প্রধান উপদেষ্টা থেকে শুরু করে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সব জায়গা এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছে, যার অধীনে নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগের জিতে আসবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বলাবাহুল, আওয়ামী লীগের এই দাবি অন্যায্য প্রমাণ করা কঠিন। এর সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো রয়েছে যুগপৎ রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার মতো এক বৃন্তে দুটি ফুল ফুটে থাকার কুদরতি।

এখন কথা হল আওয়ামী লীগ কিন্তু একবারও আমাদের বলেনি যে জোট সরকার অন্তর্হিত হলে তারা আর্থ-সামাজিক, পরদেশের সঙ্গে সম্পর্ক, কৃষি, কলকারখানা, শ্রমিক ইতাদি ক্ষেত্রে এমন সব নীতি অনুসরণ করবে যা চারদলীয় জোট থেকে ভিন্ন এবং দেশ ও দশের জন্য মঙ্গলজনক। বরং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে চারদলীয় জোট ও আওয়ামী লীগের মধ্যে ফারাকের কেচ্ছা আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা আমাদের এতোদিন বয়ান করে আসছিল, শায়খুল হাদিসের খেলাফত মজলিশের সঙ্গে চুক্তি করে আওয়ামী লীগ প্রমাণ করতে বাধ্য হয়েছে আমরা যেন আওয়ামী-ননিমাখন খাওয়া বুদ্ধিজীবীদের মানদণ্ড দিয়ে তাকে আর বিচার না করি। এখন থেকে নতুন করে আওয়ামী লীগকে বিচার করতে হবে। কসম বাংলাদেশের, আমরা তা করবো। যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতিকে ইউরোপীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতার আলোকে মানবেতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন হিশাবে দেখেন, তাঁদেরকে আমি আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস থেকেও আলাদা কিছু গণ্য করেন অঙ্গাঙ্গী গণ্য করেন। একইভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকেও সেই ইতিহাস থেকে আলাদা করে বিচার করেন না, যেমন করেন না বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের

ইতিবাচক দিককেও। আমি নিজেকে সেই রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত মনে করি। এই রাজনীতির কাছে ইসলাম প্রশ্ন ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতির জন্য নতুন কোনো সংকট নয়। বরং নতুন একটি প্রশ্ন যার উত্তর ইউরোপের চার্চ বা খ্রিষ্টীয় রাজনীতির মধ্যে আমরা পাবো না। সেই রাজনীতির মধ্যে ইসলাম সবসময়ই শত্রু হিশাবে হাজির। মসজিদ আর চার্চও এক কথা নয়। এর উত্তর আমাদের নিজেদের ইতিহাসের মধ্যেই সন্ধান করতে হবে। যেমন ফকির লালন শাহ্ বা আলাউদ্দিন খাঁনসহ আরো হাজারো ভাবুকের মধ্যে এর উত্তর আছে। আওয়ামী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা আওয়ামী লীগকে সেই পথে নেয়নি। জাতীয় রাজনীতির জন্য একটা কোনো নতুন সংকট নয়। বরং আওয়ামী লীগ সম্ভবত নিজের অজান্তেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জায়গা থেকে এই প্রশ্নের একটা সমাধানের ক্ষেত্র তৈরি করে দিলো। তার অতি পশ্চাদপসরণকে আপাতত ভাবতে হবে ইসলাম-প্রশ্নে আওয়ামী লীগের গণবিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে ওঠার ত্বরিত চেষ্টা মাত্র। এর ক্ষতির দিক আছে, কিন্তু সেটা আজ আমার বিষয় নয়।

তাহলে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে কোনো ফারাক নাই। গণমাধ্যমের ভূমিকা যদি আমরা দেখি তো দেখবো যে আওয়ামী লীগের 'ভোটের অধিকার আদায়ের রাজনীতি'-কেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তিশালী অংশ প্রধান জাতীয় সমস্যা বলে মেনে নিয়েছে। বিশেষত গণমাধ্যমগুলো আওয়ামী লীগের যুক্তি মানে বলেই 'ভোটের অধিকার আদায়' করবার জন্য এতো রক্তপাত, আত্মত্যাগ, দাঙ্গাহাঙ্গামাকে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও অগ্রগতির একমাত্র রক্ষাকবচ বলে গণ্য করেছে। আমার কথার পক্ষে পত্রপত্রিকা, টেলিভিশানের কায়কারবার পরীক্ষা বা পর্যালোচনাই যথেষ্ট।

এই ভোটের অধিকার যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে চারদলীয় জোটের জায়গায় আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানো ছাড়া আর কী গত্যন্তর থাকে? আমরা কি এই সত্য মেনে নিইনি? নিয়েছি। আওয়ামী লীগ নির্বাচনের রাজনীতি করে নি, নির্বাচনে যে কোনো মূল্যে জয়ী হবার রাজনীতি করেছে। আমরা সেই ঘিয়ে আগুন দিয়েছি। 'মহাজোট গঠন করে আওয়ামী লীগ এটাও প্রমাণ করেছে এই দাবি তার একার দাবি নয়, এটা চারদলীয় জোট ছাড়া বাংলাদেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলেরই দাবি। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলসহ আরো কয়েকটি ছোটখাটো দলের অবস্থান আলাদা হতে পারে। কিন্তু তাঁরা রাজনৈতিক অভিনয়-মঞ্চের বাইরে রয়ে গেছেন।

তাহলে যা দাঁড়িয়েছে তা হলো এই, আওয়ামী লীগ যেন জিতে আসতে পারে এবং সরকার গঠন করতে পারে এই রকম পরিস্থিতি তৈরি না হলে আওয়ামী লীগ নির্বাচন করবে না। আওয়ামী লীগ নিজের পক্ষে এই 'জনমত' তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। 'ভোটের অধিকার আদায়ের পক্ষে ' মহাজোট' গঠন করেছে এবং রাস্তায়

নিজের শক্তিও প্রদর্শন করেছে। সশস্ত্রতা ও সহিংসতা ও যে শাসক-শ্রেণীর রাজনীতি ভূষণ সেটা আওয়ামী লীগ দেখিয়ে দিয়েছে।

আমার অনুমানের গুড়ে কেনো বালি পড়েছে তার ব্যাখ্যাটা এখানে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনী দল বলে আমি অনুমান করেছিলাম, একটা সমঝোতা ও নির্বাচনী সমর্থনের জায়গা তৈরি হলে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যাবে। এই অনুমান ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ জোট করে আর সকল দলকে আসন বিলি-বণ্টন করার সময় এই সন্দেহ হয়েছিল যে আওয়ামী লীগ করছে কী? তার সিট ছাড়ছে কেনো? দ্বিতীয়ত, যাদের আওয়ামী লীগ আসন ছেড়ে দিচ্ছে তারা নিজ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করবে। নির্বাচনের পরে তারা সরকার গঠন করার সময় আওয়ামী লীগকেই সমর্থন করতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। কিন্তু পরে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারিনি। আমরা বুঝিনি যে আওয়ামী লীগ জোট করেছিল নির্বাচন করবার জন্য নয়, নির্বাচন বর্জন ও প্রতিহত করবার জন্য। অতএব কাকে কয়টা সিট দিচ্ছে তাতে আওয়ামী লীগের থোড়াই কিছু আসে-যায়, মূল কথা হল নির্বাচন সম্পর্কে শেখ হাসিনার সিদ্ধান্ত মানতে তারা বাধ্য কি-না। যারাই বাধ্যতা মেনে নিয়েছে তাদের সিট সংখ্যার দাবি আওয়ামী লীগ মেনে নিয়েছে। নির্বাচনই যদি না হয় তাহলে সিট বণ্টনে ক্ষতি কী? চারদলীয় রাজনীতির বিপরীতে আওয়ামী লীগের চালটা হয়েছে দুর্দান্ত। মহাজোট শরিক দলগুলোকে বগলদাবা করে নিজের রাজনীতিটাই করলো আওয়ামী লীগ। রাজনীতিতে এটা না-জায়েজ কিছু নয়।

এর অনিবার্য ফল হয়েছে এই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউকে ইত্যাদি দেশের কূটনীতিকরা আগাম বলে দিচ্ছেন যে মহাজোট যদি নির্বাচন না করে তবে তা "গ্রহণযোগ্য" হবে না। কথাটা হচ্ছে "গ্রহণযোগ্য"। চারদলীয় জোট সংবিধানের পেছনে দাঁড়িয়ে যে রাজনীতি করছে এই আগমন ঘোষণা তাদের গালে চপেটাঘাতের মতো হয়েছে। এই নির্বাচন "বৈধ" হবে অবশ্যই, কারণ পার্লামেন্ট ভেঙে দেবার পর সংবিধানে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের কথা আছে। কিন্তু "গ্রহণযোগ্য" হবে না। এই অগ্রহণযোগ্যতা কী পরিমাণের সেটা বোঝানোর জন্য মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিউটেনিস হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বাসায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছেন। এরশাদের বিরুদ্ধে মামলাগুলো ঠিক না বেঠিক সেই তর্ক না তুলেও বলা যায়, এই দেশের আইনেই তাঁর সাজা হয়েছে। তাহলে একজন সাজাপ্রাপ্ত মানুষের সঙ্গে দেখা করা কূটনীতির সীমালঙ্ঘন করা কিনা তার বিচার হতেই পারে। কিন্তু এই সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে মার্কিন কূটনীতি চার দলীয় জোটের বিচারকেও উপহাস করে গেলো। মহাজোট গঠন করে শুধু আওয়ামী লীগের লাভ হয়নি, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদেরও লাভ হয়েছে।

এরই মধ্যে আমাদের কিছু মিষ্টি মিলেছে, আগেই বলেছি। ধর্মনিরপেক্ষতার ধুয়া তুলে ইসলামের প্রতি ঘৃণাচর্চার গণবিচ্ছিন্ন শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতি আওয়ামী লীগ যে আর কাঁধে বয়ে বেড়াবে না, এই সংবাদটা আমরা পেয়ে গিয়েছি। এই দুঃসাহসী অবস্থানের একটা ভালো পর্যালোচনা দরকার, কারণ এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতি বনাম সংসদীয় পদ্ধতিতে নির্বাচনী রাজনীতির ফারাকটা গোলমাল পাকিয়ে বসে আছে। সেটাও পরিষ্কার করা দরকার। আওয়ামী লীগ এটা পরিষ্কার জানে যে এই ধরনের আঁতাত অন্যায্য কিছু নয়। একই কারণে আওয়ামী লীগ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ– যিনি আমাদের অষ্টম সংশোধনী উপহার দিয়েছেন– তার সঙ্গেও আঁতাত করেছে। এটাও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে বদরুদ্দোজা সাহেব একবার তাঁর ইসলামপ্রীতি প্রমাণ করবার জন্য পুলিশের ব্যারিকেডের সামনে কোরান শরীফ পড়তে বসে পড়েছিলেন। দারুণ দৃশ্য! এইসব সার্কাস দেখতে আমরা অভ্যস্ত। তাঁর এলডিপির সঙ্গেও তো আওয়ামী লীগ আঁতাত করেছে। পার্লামেন্টারি পলিটিকসে এই ধরনের সম্পর্ক মোটেও না-জায়েজ নয়। এই দলগুলো তাদের প্রতীক ও আদর্শ নিয়েই নির্বাচন করার কথা ছিল। যদি খেলাফত মজলিশের সঙ্গে আঁতাত করা খারাপ হয় তাহলে এলডিপি ও জাতীয় পার্টির সঙ্গে আঁতাত করাও মন্দ। কিন্তু শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী খেলাফত মজলিশকে সহ্য করতে পারে না, এই দলটির নাম আরবি বলে? কিন্তু তারা অন্য দুটি দলের মতো ধর্মকে রাজনৈতিক প্রতারনা হিশাবে ব্যবহার করে না। ধর্মের রাজনীতিই করে, যেভাবে তারা ইসলাম বোঝে সেটাই করে। সেই ইসলামই তারা কয়েম করতে চায়। তাহলে ইসলামের জায়গা থেকেও মজলিশি 'ইসলামি'র একটা মোকাবিলা হতে পারে। এই হিম্মত আওয়ামী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের নাই। মজলিশ বাংলাদেশে ইসলাম কায়েম করতে না পারুক নিদেনপক্ষে আওয়ামী লীগকে তাদের 'ইসলাম'-এর সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য করেছে। বলাবাহুল্য, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তির সঙ্গে এই চুক্তি করতে পারা খেলাফত মজলিশের এক বিশাল রাজনৈতিক বিজয়।

কিন্তু আওয়ামী লীগের বিজয় আরো উঁচুতে। এই আঁতাতে যে কোনো মূল্যে 'ভোটের অধিকার আদায়' করবার আওয়ামী রাজনীতির বিজয়টা আন্তর্জাতিক। প্রেসিডেন্ট ও প্রধান উপদেষ্টা বিএনপির হুকুম মেনে সংবিধান রক্ষা করবার জন্য নির্বাচন করতেই পারেন। করবেন– কিন্তু সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। বিউটেনিস দাবি করেছেন বাংলাদেশের সমস্যাটা সাংবিধানিক নয়, সেটা রাজনৈতিক। আর ঠিক এখানেই আওয়ামী রাজনীতির বিজয় হয়েছে। অর্থাৎ সংবিধান দেখিয়ে নির্বাচন হালাল করা যাবে না।

এবার তাহলে আমার আশার গুড়ে বালি পড়লো কেন, সেই কথাটা বলি। আওয়ামী লীগের 'মহাজোট' গড়বার রাজনীতি এবং একপক্ষীয়ভাবে নির্বাচন করবার বিপদ সম্পর্কে চারদলীয় জোটের নেতারা সজ্ঞান ও সচেতন। কূটনৈতিক

পাড়ার খবরাখবরও তাঁদের ভালো জানবার কথা। চারদলীয় জোট মান্নান ভুঁইয়াকে এই সংকটের শুরু থেকেই সামনে রেখেছে এবং এখন নজরুল ইসলাম খানকে সামনে নিয়ে আসছে। বিএনপি রাজনীতির এঁরা সত্যিকারের প্রতিনিধি। তাঁদের গণসমর্থনের ভিত্তিও শক্ত। ভাবমূর্তিও আস্থার। আশা করি তাঁরা তা বজায় রাখবেন। তাঁদের নেতৃত্বের সামনের সারিতে রাখা অত্যন্ত সুবিবেচনার কাজ। তাঁদের সংযত ভাষা ও রাজনৈতিক আচরণ সম্ভবত বিএনপিকে বড়ো ধরনের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে পারে, যদি আমরা মনে রাখি যে চারদলীয় জোটের শাসনামলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ ও রোষ এখনও প্রশমিত হয়নি। বিএনপি রাজনীতির মধ্যে এই উদার ও সংযত রাজনীতির ধারা সবসময়ই চারদলীয় জোটের ভেতরে আওয়ামী লীগকে নিয়েই নির্বাচনের পক্ষে কাজ করেছে। এই ক্ষেত্রে দলের সংকীর্ণ স্বার্থের চেয়েও জাতীয় সংকটকে তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন। এ কারণেই দুর্নীতির কারণে গণরোষ থেকে বিএনপি খানিক রেহাই পেয়েছে। যদি আওয়ামী লীগের অধিকাংশ দাবিই বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে মানা যায় তাহলে প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে ইয়াজউদ্দিন সাহেবকে সরানোর মধ্যে কী অসুবিধা ছিল? যদি পার্লামেন্ট ভেঙে যাবার ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করা সাংবিধানিক হয় তাহলে নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা পাওয়াও সাংবিধানিক অধিকার। এই আপোশগুলো না-করবার কারণ আমার কাছে স্পষ্ট নয়। আওয়ামী লীগসহ মহাজোটের অন্যান্য শরিক দলের মধ্যে নির্বাচনমুখী ধারার সঙ্গে সমঝোতা করবার এই ব্যর্থতা বড়ো কঠিন জাতীয় বিপর্যয়ের দিকে আমাদের ঠেলে দিতে পারে। সেই বিপর্যয় হবে না– আমার সেই আশাতেই গুড়ে বালি হয়েছে। আফসোস।

কী হবে এখন? প্রত্যক্ষ সেনা শাসন? কিম্বা জাতীয় সরকার বা জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ নামক কোনো বস্তুর আড়ালে একনায়কতান্ত্রিক শাসন? নির্বাচন করবার পর তিন মাস কি ছয় মাসের মধ্যে আবার নির্বাচন? কে জানে? ঘটনা দ্রুত ঘটবে এবং ঘটছে। কিন্তু এগুলো সমাধান নয়। প্রশ্ন হচ্ছে কতোদিন গণবিরোধী ও অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো আমাদের জিম্মি করে রাখবে? কতোদিন আমরা কূটনৈতিকতার আপদ ও প্রকারান্তরে বিদেশি শাসন মানবো? কতোদিন আমরা একটি দেশ ও জাতি হিশাবে রাজনৈতিক দলগুলোর কারণে অপমান সহ্য করতে থাকবো? কতোদিন?

২৭ পৌষ, ১৪১৩। ১০ জানুয়ারি, ২০০৭, শ্যামলী।

প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে শীত কমেনি

গতকাল ২১ জানুয়ারিতে প্রধান উপদেষ্টা ভাষণ দিয়েছেন। আমরা অনেকেই আগ্রহভরে শুনেছি তিনি কী বলতে চান। তাঁকে আমরা চিনতে ও বুঝতে চেষ্টা করছি। তিনি কেনো এসেছেন, কীভাবে এসেছেন, কয়দিন থাকবেন, কী করবেন, ইত্যাদি। এই সকল প্রশ্ন নাগরিকদের মনে উদয় হতে শুরু করেছে। অস্বস্তি ও অস্থিরতা বাড়ছে। ইতোমধ্যে মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের যাঁরা পক্ষে, দেশ ও দশের মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে যাঁরা চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন তাঁরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান, অবৈধ স্থাপনা ভেঙে দেওয়া, গডফাদার ও সন্ত্রাসীদের ধরা ইত্যাদি কাজের সঙ্গে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রশক্তির বৈধতা ও চরিত্রকে গুলিয়ে ফেলতে রাজি নন। অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় আসা ও কোনো সরকারই নিজেদের পক্ষে জনমত ও সমর্থন তৈরির জন্য শুরুর দিকে এই ধরনের উদ্যোগ নিয়ে থাকে। সে যাই হোক, একটা হিম নেমেছে বাংলাদেশে। এ এক শৈত্যপ্রবাহ যা ঋতুকালীন কিম্বা প্রাকৃতিক নয়। অস্বাভাবিক।

প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ আমাদের উষ্ণ করতে পারেনি। নাগরিকদের মনে যে সব যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন উদিত হয়েছে তাঁর ভাষণে আমরা কোনো উত্তর পাইনি। অবশ্য না পাওয়ায় আমরা বিস্মিত নই। কারণ এই সরকারের ক্ষমতারোহণের পরিপ্রেক্ষিত আমরা এখন কমবেশি জানি।

সাপ্তাহিক The Economist পত্রিকার জানুয়ারি ১৮ তারিখের খবরের শিরোনাম হচ্ছে "এই এক অভ্যুত্থান নিজের নাম নিজে মুখে নেবার হিম্মত যার নাই" (The Coup that dare not speak its name)। শিরোনামটির মানে হচ্ছে বাংলাদেশে একটি সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে কিন্তু যাঁরা ক্ষমতায় তাঁরা যে অভ্যুত্থান করেছেন সেই কথা তাঁরা মুখে আনছেন না। পুরো খবরের মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক লিখিত ভাষ্যে যতোটা নয় তার চেয়ে অনেক বেশি ছবিতে। ইকনমিস্ট পত্রিকাটি রয়টারের সরবরাহ করা যে ছবিটি ছেপেছে সেই ফটোগ্রাফে, সেখানে দেখা যাচ্ছে মারণাস্ত্র হাতে সেনাসদস্যরা দাঁড়িয়ে আছেন আর বিপরীত দিক থেকে টুপি-পাঞ্জাবি পরে আর গামছা গলায় ঝুলিয়ে একজন বাংলাদেশের নাগরিক হেঁটে যাচ্ছেন। বলাবাহুল্য এই পোশাকপরা মানুষটিকে ইকনমিস্ট ইসলামী জঙ্গীদের প্রতীক হিশাবে মারণাস্ত্র হাতে দাঁড়ানো সৈনিকদের বিপরীতে পেশ করছে। বিভাজন তৈরি করছে সেনাবাহিনী বনাম ইসলামের সঙ্গে।

ছবিটি উস্কানিমূলক। ছবির ক্যাপশানে উস্কানি আরো তীব্র: "সেনাব্যারাক আর মসজিদের মধ্যবর্তী পথ" (between barracks and the mosqus)। বাংলাদেশের একদিকে নাকি সেনাব্যারাক, ক্যান্টনমেন্ট বা সেনাবাহিনী আর তাঁর বিপরীত দিকে আছে মসজিদ, ইসলাম বা এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। প্রতিবেদনটির সিদ্ধান্ত হচ্ছে "মূলধারার রাজনীতির ব্যর্থতার প্রধান উপকারভোগী হচ্ছে ইসলামী চরমপন্থা" ("The main beneficiary from the failure of mainstream politics is an extremist Islamist fringe")। যাই হোক ইকনমিস্ট-এর এই প্রতিবেদন এখানে আমার আলোচনার বিষয় নয়। আমার প্রশ্ন, বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতার এই চেহারা দেখছি কেনো আমরা? বাইরে তার বেসামরিক নেকাব ভেতরে সমরতন্ত্র? এর উত্তরটাও আমরা আরেকটি বিদেশি পত্রিকার বরাত দিয়ে দেবার চেষ্টা করবো।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের দিল্লী ব্যুরোর প্রধান সোমিনী সেনগুপ্ত জানুয়ারির ১২ তারিখে যে খবর ছেপেছেন সেখানে তিনি বলছেন, 'ইমার্জেন্সি সেনাবাহিনীকে আইনশৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেবার পথ তৈরি করলো এবং সংবাদমাধ্যমের ওপর নতুন নিয়ন্ত্রণ জারি করার সুযোগ দিলো, আজ থেকে ১৬ বছর আগে গণতন্ত্র প্রত্যাবর্তনের সময় থেকে যে নিয়ন্ত্রণ কখনো আরোপ করা হয়নি" (দেখুন, State of emergency and election delay, January 12, 2007, *New York Times*) ।

অবশ্য বাংলাদেশেই তো আমরা আছি, ব্যাপারটা তো জানি। সেনগুপ্তের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ দিক অন্যত্র। প্রতিবেদনটি পাঠ করলেই পরিষ্কার হয় যে ঘটনার হঠাৎ পরিবর্তনের পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউকে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘই প্রধান কারণ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অবিশ্বাস্য দুর্নীতি, দাঙ্গাহাঙ্গামা, মারপিট ইত্যাদি অবশ্যই সত্য, কিন্তু ঘটনাটি তো রাজনৈতিক দলগুলো ঘটায়নি। ঘটনা ঘটাবার জন্য বিদ্যমান বাস্তবতাকে জাতিসংঘ ও পরাশক্তিগুলো নিছকই উসিলা আকারে ব্যবহার করেছে। বাংলাদেশের বাস্তবতার পরিণতিতে এই "অভ্যুত্থান" ঘটেনি। এই অভ্যুত্থান ঘটানো হয়েছে। সেনগুপ্ত বলছেন যে জাতিসংঘ আগামী নির্বাচনে সকল কারিগরি সাহায্য বন্ধ ঘোষণা দেবার একদিন পর জরুরি অবস্থা জারি হলো। জাতিসংঘের দাবি এই নির্বাচন 'credible or legitimate' গণ্য হবে না। 'ক্রেডিবল' কথাটার মানে করা যায় "সুষ্ঠু"। এমনকি আমরা এর অর্থ করতে পারি 'গ্রহণযোগ্য'। ক্রেডিবল মানে শুধু সুষ্ঠু হওয়াই নয়– একই সঙ্গে গ্রহণযোগ্য হওয়াও বটে। ইরাকে যুদ্ধাবস্থায়, বিদেশি হানাদার সৈন্যদের উপস্থিতিতে এবং একটি পুতুল সরকারের অধীনে নির্বাচন জাতিসংঘ ও পরাশক্তিগুলোর কাছে "সুষ্ঠু" যেমন হয়, ঠিক তেমনি 'গ্রহণযোগ্য'ও হয়। আফগানিস্তানেও একই অবস্থা। অন্যদিকে প্যালেস্টাইনে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যখন হামাস নির্বাচিত

হয়ে আসে তখন পরাশক্তিগুলো সেই নির্বাচন গ্রহণ করে না। বরং কেনো ফিলিস্তিনিরা হামাসকে নির্বাচিত করলো তার জন্য উল্টা তাদের অর্থনৈতিক সহায়তা বন্ধ করে দিয়ে সকল ফিলিস্তিনিকে শাস্তি দেয়া মানবাধিকার লংঘনের এর চেয়ে নগ্ন নজির আর কী হতে পারে? এমনকি নির্বাচন করে নিজেদের সরকার গঠন করবার অধিকার থেকেও ফিলিস্তিনিদের বঞ্চিত করা হলো। জাতিসংঘ প্রশ্ন তুলেছে ২২ তারিখে যে নির্বাচন হবার কথা ছিল যদি তা হত তাহলে তা লেজিটিমেট' বা "বৈধ" হবে না। প্রশ্ন হচ্ছে এই "বৈধতা" কীসের বৈধতা? কীসের legitimacy? কোন আইনে লেজিটিমেট হওয়া না-হওয়া? বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নাকি জাতিসংঘের কোনো সনদ বা আইন অনুযায়ী? "গ্রহণযোগ্যতা" এক জিনিস– আর "বৈধতা" অন্য বিষয়। বলাবাহুল্য, এই ব্যাপারে জাতিসংঘের কোনো ব্যাখ্যা নাই। একই যুক্তিতে মার্কিন নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের দুটি টিম এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের তরফে যাঁরা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবার জন্য আসার কথা তাঁদের প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

এগারো জানুয়ারি বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ পররাষ্ট্র বিভাগ থেকে চাপ দেওয়া হয় যেন দুটো পক্ষ "সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য" (credible, peaceful and universally accepted) একটা "আপোশ" করে। এর আগের দিন বুধবার জাতিসংঘের বিবৃতিতে বলা হয় যে চলমান সংকট যদি নিরসন না হয় তাহলে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা এবং 'আন্তর্জাতিক অবস্থান" (international standing) ক্ষুণ্ন হবে।

সোমিনী সেনগুপ্ত বলছেন, তবে সবচেয়ে ভয়ানক ওয়ার্নিং শেষমেশ এসেছে জাতিসংঘ থেকে বৃহস্পতিবারে। জাতিসংঘ বলেছে, সামরিক শাসনের জন্য যে কোনো প্রকার নড়নচড়ন জাতিসংঘের শান্তিমিশনে বাংলাদেশ যে মোটাসোটা মালপানি কামাচ্ছে সেখানে টান পড়বে। (Any moves toward military rule could cost Bangladesh its handsome earnings from participation in United Nations Peace Keeping Force)। বাংলাদেশ শান্তি মিশনে বেশ ভালো সংখ্যা নিয়েই অংশগ্রহণ করে। এই কথার মধ্য দিয়ে জাতিসংঘের হুঁশিয়ারিমূলক বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন সোমিনী সেনগুপ্ত। শেষে তিনি জাতিসংঘের বক্তব্যের হুঁশিয়ারি অংশটুকু উদ্ধৃত করেছেন :

'Should the 22 January parliamentary elections proceed without participation of all major political parties, deployment fo the armed forces in support of the election process raises questions. This may have implications for Bangladesh's future role in U.N. peacekeeping operation'.

(প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের অংগ্রহণ ছাড়া যদি ২২ জানুয়ারি তারিখে সংসদ নির্বাচন হয় এবং তার সমর্থনে সেনাবাহিনীকে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নিয়োগ

করা হয় তাহলে বিস্তর প্রশ্ন উঠবে। সেনাবাহিনীর এই নিয়োগের কারণে জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশ ভূমিকা রাখতে পারবে কিনা সেই প্রশ্ন যুক্ত)

সোমিনী যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আর জাতিসংঘের উদ্ধৃতি এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। যে কারণে বাংলা অনুবাদ করেও আমি মূল ইংরেজি রেখেছি যাতে বাংলাদেশের পাঠকরা নিজেরাই বিচার করতে পারেন। এখানে বলে রাখা দরকার যে সাংবাদিক হিশাবে সোমিনী সেনগুপ্তের প্রতিবেদনে যে পেশাগত দক্ষতা, সাংবাদিকসুলভ নিরপেক্ষতা এবং জরুরি অবস্থা জারি করার পেছনে খুব কম কথায় আসল সত্য হাজির করা হয়েছে তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। আমাদের গণমাধ্যমে আমরা এই ধরনের পেশাগত দক্ষতার নজির খুব কম পাই। চতুর্দিকে পক্ষপাতদুষ্ট বিকৃত তথ্য, অর্ধসত্য বা প্রপাগান্ডারই তো ছড়াছড়ি দেখি। নিউ ইয়র্ক টাইমসে সোমিনী সেনগুপ্তের প্রতিবেদনকে গুরুত্ব দেবার এটাও একটা কারণ।

পার্থক্যটা কোথায়? সোমিনী বলছেন যদি সামরিক শাসনের দিকে ঘটনা গড়ায় (any move towards military rule...) তাহলে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী শান্তিমিশনে আয়-উপার্জনের সুযোগ হারাবে। এটা কি জাতিসংঘের কোনো নীতি বা বিধান? তাহলে পাকিস্তান কী করে শান্তিমিশনে অংশগ্রহণ করে আসছে? কিম্বা নেপাল? নাকি শান্তিমিশনে কে অংশগ্রহণ করবে বা কে করবে না সেই সিদ্ধান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নেয় বলেই জাতিসংঘের নামে এই হুঁশিয়ারি আসলে নিছকই মার্কিনি হুঁশিয়ারি! ব্যাপারটা অন্যত্র খতিয়ে দেখা দরকার।

সে যাই হোক সোমিনী বলছেন সামরিক শাসনের কথা। কিন্তু তিনি জাতিসংঘের যে বক্তব্য উদ্ধৃত করলেন সেখানে বলা হচ্ছে সেনাবাহিনী যদি ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে সহযোগিতা করে তাহলে জাতিসংঘের শান্তিমিশনে আয়-উপার্জনের সুযোগ পাওয়ার ব্যাপারটা সংকটাপন্ন হবে। সোজা কথা হলো যদি সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সংবিধান ও আইন অনুযায়ী ২২ তারিখের নির্বাচনে নিজেদের নিয়োগ করে তবে তারা শান্তিমিশনের চাকরি হারাবে। কিন্তু বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সংবিধানের অধীন। তারা জাতিসংঘের চাকুরে নয়। শান্তিমিশনে চাকরির ভয় দেখিয়ে সামরিক বাহিনীর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাধা দেবার এই নজির অবিশ্বাস্য।

ব্যাপারটা ভালো করে বোঝা দরকার। একদিকে বলা হচ্ছে সেনাশাসন জারি হলে যেমন শান্তিমিশনে যুক্ত থাকার সুযোগ সেনাবাহিনী হারাবে, ঠিক তেমনি নির্বাচনে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করলেও সেনাবাহিনী জাতিসংঘে আয়-উপার্জনের সুযোগ হারাবে। এ এক শাঁখের করাতের মতো। এর অর্থ কী দাঁড়ায়? তার মানে সেনাবাহিনী সরাসরি সামরিক শাসন জারি করতে পারবে না, কিম্বা চারদলীয় জোট ও আওয়ামী মহাজোটের বিপরীতে জনগণের পক্ষ নিয়ে নিজের ভূমিকা পালন করতে পারবে না। সরাসরি সেনাশাসন জারি করতে পারবে না,

আবার অন্যদিকে ২২ তারিখের নির্বাচনে তার সাংবিধানিক দায়িত্বও পালন করতে পারবে না। পরাশক্তিগুলো যাদের বাছাই করে ক্ষমতায় বসাবে সেনাবাহিনীকে তাদের আদেশই শিরোধার্য গণ্য করতে হবে। বাংলাদেশ সংবিধান রক্ষার যে শপথ সেনাবাহিনী নিয়েছে, সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আন্তর্জাতিক শক্তির তাঁবেদার হতে হবে সেনাবাহিনীকে। সেনাবাহিনীর জন্য এই পরিস্থিতি শাঁখের করাতের মতো। একদিকে দেশ ও দশের স্বার্থ, দেশের সার্বভৌমত্ব, সৈনিক হিশাবে সৈনিকের অহংকার ও মর্যাদা আর অন্যদিকে শান্তিবাহিনীতে চাকরি ও পরাশক্তির তাঁবেদারি–এই দুই পথের টানাপড়েনে সৈনিকরা কোন্ অবস্থান গ্রহণ করেন তার ওপর বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

আর ঠিক এখানেই আমাদের উদ্বিগ্ন হবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা জানি না এই টানাপড়েনের প্রতিক্রিয়া সেনাবাহিনীর ওপর কীভাবে পড়ছে। আমরা স্পষ্ট নই, সেনাবাহিনী কী চায়? কার পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন তাঁরা? দেশের এই সংকট মুহূর্তে নিজেদের ভূমিকা কীভাবে তাঁরা নির্ধারণ করছেন? ক্ষমতার হাতবদলের এই প্রক্রিয়ায় তাঁদের নিয়ন্ত্রণ কতোটুকু? কতোটুকু পরাশক্তির?

ওপরের বিশ্লেষণ থেকে যে উপসংহার আমরা টানতে পারি তা হচ্ছে এই জরুরি অবস্থা বা ইকনমিস্টের ভাষায় মুখে স্বীকার না করলেও এই সেনা অভ্যুত্থানের কারণ পুরোপুরি রাজনৈতিক দলগুলোর মারপিট, দাঙ্গাহাঙ্গামা বা সহিংসতা নয়। সেটা উসিলা। এই অভ্যুত্থান পরিকল্পিত। এবং পরাশক্তিগুলোই এর হোতা।

কিন্তু এই সত্য চাঁছাছোলা জেনে আমাদের লাভ কী? প্রথম লাভ হচ্ছে এই পরিস্থিতি আমাদের ভালো কিছুর দিকে নিয়ে যাবে আমরা খামাখা সেই প্রত্যাশা করবো না। আমাদের ইস্যু ছিল সুষ্ঠু নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক না হোক, কম-সে-কম নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর। অতএব, এই সরকার যেন আমাদের মূল লক্ষ্য এবং প্রতিশ্রুতি থেকে আমাদের নজর অন্যদিকে সরিয়ে নিতে না পারে তার জন্য সতর্ক থাকা। এই সরকারের কাজ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন করা। তাঁরা তা করছেন কিনা এবং কতো কম সময়ের মধ্যে করতে পারছেন তার দ্বারাই এই সরকারের মূল্যায়ন করার দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। যদি আমাদের প্রত্যাশা এই সীমা ছাড়িয়ে যায় তার মানে দাঁড়াবে আমরা এই সরকারের মেয়াদও দীর্ঘ করছি। গণতন্ত্র ও মৌলিক মানবাধিকারের দিক থেকে ফল ভালো হবে বলে আমি মনে করি না।

তবে জাতীয় প্রতিরক্ষা ও সার্বভৌমত্বের দিক থেকে চাঁছাছোলা সত্য জানলে আমরা আমাদের আরেকটি কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট থাকতে পারবো। সেটা হলো এই হঠাৎ বদলের প্রশ্নে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভক্তি যেন না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখা। এর পরিণতি হবে মারাত্মক। আমাদের আশা যাঁরা দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে এই মুহূর্তে প্রধান বিষয় বলে মনে করেন তাঁরা স্বাধীন ও

সার্বভৌম দেশের একজন নাগরিকের অহংকার নিয়েই সিদ্ধান্ত নেবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ও দেশপ্রেমিক সৈনিকদের মৈত্রী ছাড়া বাইরের বিপদ থেকে আমরা বাংলাদেশকে রক্ষা করতে পারবো না।

৮ মাঘ ১৪১৩। ২১ জানুয়ারি ২০০৭, শ্যামলী।

মেরেছো কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেবো না

গত ২৬ জানুয়ারির পর থেকে সমাজের ক্ষমতাসীন শ্রেণীর পত্রপত্রিকাগুলো হঠাৎ ঢোঁক গিলতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশের নাকি খুবই খারাপ অবস্থা। জরুরি অবস্থার অধীনে সরকার বাক, ব্যক্তি, মত ও চিন্তার স্বাধীনতা 'স্থগিত' রেখে সন্তুষ্ট নয়, জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা ২০০৭ জারি করে জানিয়েছে গণমাধ্যমও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। কোনো সভা-সমাবেশ, মিছিল, অবরোধ, বিক্ষোভ, বক্তৃতা, বিবৃতি, ক্ষতিকর ও উত্তেজক কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত কোনো সংবাদ বা তথ্য এবং সরকারের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক কোনো সংবাদ, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, ফিচার, ব্যঙ্গচিত্র, কার্টুন, টকশো, বা আলোচনা অনুষ্ঠান সংবাদপত্র কিংবা টেলিভিশান, ইন্টারনেটসহ যে কোনো প্রকার গণমাধ্যমে প্রচার, সম্প্রচার বা প্রকাশ করা, স্থির বা চলচ্চিত্র বা অনুরূপ কোনো মাধ্যমে প্রদর্শন করা নিষিদ্ধ বা সরকার এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ওপর শর্ত আরোপ করে প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারবে। এর পক্ষে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমরা তার সঙ্গে একমত। 'জরুরি অবস্থা'র অধীনে গঠিত সরকার এই ধরনের বিধান অবশ্যই জারি করতে পারে। তিনি সংবাদ ও গণমাধ্যমের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের কথা বলেছেন। দরকার ছিল না। আমরা বাস্তববাদী– এখানে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কিছু নাই। 'জরুরি অবস্থা'–ই এখানে বাস্তবতা। গণমাধ্যমের কর্মী হিশাবে যদি 'জরুরি অবস্থা' মেনে নিয়ে থাকি বা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই পরিস্থিতি অনিবার্য গণ্য করি তাহলে 'জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা ২০০৭'–কেও অনিবার্যই গণ্য করি। এর পরেও গণমাধ্যমের কিছু প্রতিনিধি কোন্ যুক্তিতে হঠাৎ এতো গোস্বা প্রকাশ করলেন সেই দিকটা বরং অস্পষ্ট। তাঁরা বোধহয় আমাদের কাছে প্রমাণ করতে চাইছেন যে, তাঁরা বুঝি আসলেই বাক, ব্যক্তি, মত ও চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এই ধরনের দ্বিচারিতার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে।

সরকারের প্রতি তাঁদের হাবভাব দেখে আমি আমোদ বোধ করেছি। ভাবখানা এমন– মেরেছো কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেবো না? আহ্!

এই কিছুদিন আগেও আগের কেয়ারটেকারকে হটিয়ে দিয়ে নতুন যে-সরকার আমাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিয়েছেন তাদের প্রতি রীতিমতো গদগদ হয়ে গিয়েছিল কয়েকটি গণম্যধ্যম। স্তুতি ও আনুগত্যে নিবেদিত তাঁদের গদগদ প্রশংসায় আমাদেরও গাল লাল হয়ে গিয়েছিল। লজ্জায়। সন্দেহ হয়েছিল ইমার্জেন্সির সরকার সম্পর্কে সতর্ক থেকে আমরাই ভুল করছি কি? সাধারণ মানুষ ফখরুদ্দীন সরকারের ক্ষমতা অধিগ্রহণ অস্বাভাবিক, সাংবিধানিকভাবে প্রশ্নাত্মক ও গণতন্ত্রের সংকট গণ্য করবার পরেও এই অর্থেই সমর্থন দিয়েছে যে, একটি ঘটনা ঘটে যাবার পর তাৎক্ষণিকভাবে কিছুই আর করার থাকে না। আসলেই কী ঘটছে বোঝার জন্য সাধারণ মানুষ সময় নিতে চায়। ক্ষমতার হাতবদলে তাদের নগদ কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তবে এই সরকার আসলে কী করতে চায় তা যেন সকলকে বোঝাতে পারে তার জন্য সরকারকে কিছু সময় দেওয়া দরকার।

কিন্তু কয়েকটি গণমাধ্যমের সেই সময়টুকু নেবারও অবসর হয়নি। তাদের লেখালিখিতে মনে হয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলোর কৃতকর্মের জন্য আচ্ছাসে শাস্তি দিয়ে এই ধরনের অরাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠাই বুঝি তাদের সারা জীবনের সাধনা ছিল। যেখানে রাজনীতি থাকবে না, রাজনৈতিক দল থাকবে না, কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থাকবে না। জনগণের কাছে জবাবদিহিতা থাকবে না। শুধু থাকবে অনন্ত বর্ষব্যাপী 'জরুরি অবস্থা'। জনগণ, শ্রমিক, কৃষক বা অন্য কোনো পেশাজীবী বা খেটে খাওয়া মানুষও থাকবে না– শুধু থাকবে 'সিভিল সোসাইটি' আর 'বিশিষ্ট নাগরিক' নামক নব্য অভিজাত শ্রেণী ইত্যাদি। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের কাছে এই ধরনের চিন্তা ও তৎপরতাই আজ সবচেয়ে বড়ো বিপদ হিশাবে হাজির হয়েছে। শুধু রাজনৈতিক দলগুলোকে আমরা আমাদের রাজনৈতিক দুর্দশার জন্য দায়ী করতে পারি না।

সত্য যে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও সহিংসতা আমাদের আশু সমস্যা। কিন্তু এই সমস্যার মুখে জরুরি অবস্থা জনগণ মেনে নিচ্ছে, কারণ এর সঙ্গে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও গণমানুষের স্বার্থের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গী জড়িত বলে। এই জন্যই তারা তাদের সাংবিধানিক ও মৌলিক মানবাধিকার স্থগিত রাখতে এখনও অবধি আপত্তি জানাচ্ছে না। অন্যদিকে গণমানুষ এই কাণ্ডজ্ঞানটুকু রাখে যে তারা নিজেরাই যদি তাদের সার্বভৌম রাজনৈতিক অস্তিত্ব সম্পর্কে সজ্ঞান না থাকে, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও প্রতিরক্ষার জন্য সচেতন না হয়, লড়াই না করে, গণপ্রতিনিধিত্বহীন একটি অরাজনৈতিক সরকারের পক্ষে সেই রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পন্ন করা অসম্ভব। কিন্তু সজ্ঞানতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলো আমাদের সহায়তা করেনি, উল্টো ক্ষতি করেছে।

দেশ ও দশের স্বার্থ রক্ষার প্রশ্ন শেষাবধি রাজনৈতিক প্রশ্ন। তর্ক হতে পারে যে, 'রাজনীতি' বা 'রাজনৈতিক' বলতে আমরা কী বুঝি? নিদেনপক্ষে এতোটুকু

জ্ঞান তো আমাদের থাকা উচিত যে দলবাজিতা বা সংঘবদ্ধ মাস্তানি, সহিংসতা ও সন্ত্রাসকে 'রাজনীতি' বলে না। নৈরাজ্য রাজনীতি নয়। তাহলে জরুরি অবস্থার অধীনে গঠিত সরকার 'রাজনীতি' নিষিদ্ধ করেছেন কথাটা কি পুরোপুরি ঠিক? গণমানুষ বরং বুঝেছে যে বাধ্য হয়ে 'রাজনীতি'র তকমাধারী যেসব কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হয়েছে তা হলো দলবাজি, সংঘবদ্ধ সন্ত্রাস, সহিংসতা ও নৈরাজ্য। দেশের পরিস্থিতি এই অবস্থায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা আছে।

রাজনীতির নামে এই দলবাজিতা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সার্বভৌমত্বসহ বাংলাদেশের তেল গ্যাস বন্দর ও প্রাণসম্পদের ওপর নেমে আসা সমূহ বিপদের সঙ্গে যুক্ত। অথচ অধিকাংশ গণমাধ্যম বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার প্রশ্নকে তোয়াক্কাই করেনি। সেখানে একটি অরাজনৈতিক সরকারের কাছে আমরা কী আর আশা করতে পারি? দেশ ও দশের স্বার্থের বিরোধী এই রাজনৈতিক দলগুলোকেই কি দলবাজ গণমাধ্যমগুলো এযাবতকাল সমর্থন দেয়নি? তারাই কি দলে দলে জনমত বিভক্ত করে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা-আপোশের পথ কঠিন করে তোলেনি? কেউ চারদলীয় জোট আর কেউ মহাজোট হয়ে কি প্রচার-পপাগান্ডা করেনি? সবচেয়ে ন্যক্কারজনক পক্ষপাত- সবচেয়ে লজ্জাজনক দলবাজিতার চরম নোংরামি কি কতিপয় শক্তিশালী গণমাধ্যমের মধ্যেই আমরা দেখিনি?

দেখেছি। আমরা বাক, ব্যক্তি, চিন্তা ও মতের স্বাধীনতা বলতে এই গণমাধ্যমগুলো কী বোঝে তার নমুনা ও নজিরও পেয়ে গিয়েছি। তারা বাক, ব্যক্তি, চিন্তা ও মতকে ব্যবসার পুঁজি ধরে নিয়েই কাজ করেছে। এই অধিকারগুলো বিমূর্ত কোনো অধিকার নয়, একে সার্বজনীন ভাববারও কোনো কারণ নাই। কতিপয় গণমাধ্যম প্রমাণ করেছে এই কথাগুলো শাশ্বত ও বিমূর্ত কোনো সত্যও নয়- বরং মৌলিক অধিকারের কথা কয়ে দেশ ও দশের স্বার্থের বিরুদ্ধেও কাজ করা যায়। ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করা যায়। সেই কাজ দারুণ আরামের। ক্ষমতা ও মুনাফা দুটোই জোটে। ফলে অনেক পত্রিকা ফুলে-ফেঁপে উঠেছে বহুজাতিক কোম্পানির অনৈতিক বিজ্ঞাপনে। ভূমিদস্যুদের বিজ্ঞাপন তাদের সংবাদপত্রের প্রথম পাতার পুরোটাই ঢেকে দিয়েছে, যেখানে গণমাধ্যম হিশাবে তাদের দায় ছিল সত্যিকারের সংবাদ পরিবেশন করা, প্রপাগান্ডা নয়। যারা আমাদের চাষের জমি সন্ত্রাসীদের ও সিন্ডিকেটেড ক্রিমিনালদের দিয়ে গরিব কৃষকদের কাছ থেকে জবরদস্তি করে কেড়ে নিয়েছে, যারা আমাদের বন্যাবিধৌত অঞ্চলগুলো অবৈধভবে দখল করে নিয়েছে- কতিপয় গণমাধ্যম কি দিনের পর দিন সেই সকল সন্ত্রাসী ও সিন্ডিকেটের প্রচার ও প্রপাগান্ডায় ব্যবহৃত হয়নি? তাদের অর্থনৈতিক অস্তিত্বের সঙ্গে ভূমিদস্যু, সিন্ডিকেট, দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী ও প্রতারকদের সম্পর্ক কি অঙ্গাঙ্গী নয়? তাদেরই টাকায় ও বিনিয়োগে কি তারা চলে না? তাহলে কীসের তাদের বাক, ব্যক্তি, চিন্তা ও মতের স্বাধীনতা? কীসের

মুক্তচিন্তা? এর অর্থ তাদের কাছে যা খুশি তাই চাপিয়ে মুনাফা কামাবার স্বাধীনতা। অতএব জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা ২০০৭ এই সরকার জারি করায় হোঁচট খেয়ে তারা যখন ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের সঙ্গে দেখা করতে যায়, তখন আমাদের ছাদ ফাটিয়ে হাসা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

গণস্বার্থ ও মুক্তচিন্তার বিরোধী এই সকল গণমাধ্যম যেন আমাদের বিভ্রান্ত না করে সেই দিকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। গণমাধ্যম হিশাবে এই অধিকার তো নিজের ও গণমানুষের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও স্বার্থ রক্ষার অধিকার। তারা কার স্বার্থ এতোকাল রক্ষা করেছে? সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের অংশীদার এসব সংবাদপত্র গণমানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা দূরে থাকুক ক্রমাগত জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তাকে বিপজ্জনক অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে। আমরা কি গত কয়েক বছর ধরে 'ব্যর্থরাষ্ট্র' সংক্রান্ত কেচ্ছাকাহিনী শুনিনি? সারা দুনিয়ায় যেখানে গ্লোবালাইজেশান বা সাম্রাজ্যবাদী গোলোকায়ন, যুদ্ধবিগ্রহ সহিংসতার বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার এরাই কি বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার পক্ষে সাফাই গায়নি? যেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রায়ই কুকুর-বেড়ালের মতো বাংলাদেশের মানুষকে সীমান্তে হত্যা করছে এরাই কি দিনের পর দিন নীরব থাকেনি?

আর এরাই, হ্যাঁ, এরাই যখন জরুরি অবস্থা ঘোষণা হলো, তখন বাক, ব্যক্তি, চিন্তা ও মতের পক্ষে সিপাহসালার বলে নিজেদের জাহির করবার চেষ্টা করছে। অথচ কিছুদিন আগেই রাজনৈতিক অস্বাভাবিকতাকে তারা শর্তসাপেক্ষে মেনে নেওয়ার পরিবর্তে, এই সরকার যেন একটি নির্বাচিত সরকার এই রকম গণ্য করে তাদের দাবিদাওয়ার বিরাট বিরাট ফর্দ হাজির করেছিল। যদি তাদের এই দাবিদাওয়া বাস্তবায়ন করতে হয়, তাহলে এই সরকারকে পাঁচ কি দশ বছর বা হয়তো তারো বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে হবে। অরাজনৈতিকতা দীর্ঘদিন বহাল থাকুক কোনো গণতান্ত্রিক নাগরিকের কাম্য হতে পারে না। গণমানুষ তাদের উদ্দেশ্য ঠিকই বুঝে গিয়েছে। রাজনীতি ও রাজনৈতিকতার বিপক্ষে তারা যতো দৃঢ় অবস্থান নিল, তাতে মনে হয়েছে তারা চায় এই সরকার চিরকাল থাকুক। আর জনগণ চেয়েছে দলবাজিতা ও সংঘবদ্ধ সন্ত্রাস থেকে রাজনীতিকে মুক্ত করে যতো তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় ততোই তা দেশের জন্য মঙ্গল। গণমানুষের এই সতর্ক অবস্থান ও সমর্থন বর্তমান পরিস্থিতির পক্ষে উৎফুল্ল সমর্থন বলে গণমাধ্যমগুলো দেশে বিদেশে প্রচার করেছে।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন তাঁর কথাবার্তায় ঠিকই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, জরুরি অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থা নয়–স্বাভাবিকই যদি হতো তাহলে তাকে জরুরি অবস্থা বলবো কেন আমরা? যে গণমাধ্যমগুলোর কথা বলছি তাদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য হচ্ছে তারা যেখানে অস্বাভাবিকতাকেই 'স্বাভাবিক'–এমনকি চিরস্থায়ী করবার জন্য ফর্দ তৈরি করছে– মইনুল হোসেন সেই ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতাকে

অস্বাভাবিকই বলছেন– কসমেটিক মেখে তাকে কতিপয় গদগদ গণমাধ্যমগুলোর মতো আদর্শ কোনো ঘটনা বলে জাহির করার চেষ্টা করেননি। সত্য যা তাই বলেছেন। এমনকি এখন জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা ২০০৭ জারি করে সকলকে এই বলেই সতর্ক করে দিয়েছেন যে–একেই জরুরি অবস্থা বলে। কেউ যেন 'জরুরি অবস্থা' কি জিনিস বুঝতে ভুল না করে।

আমরা ভুল করিনি। অন্য প্রসঙ্গে আসি। আচ্ছা, উত্তরার বাদালদি গ্রামের শিশুপীর খোরশেদের ফুঁ বড়ো প্রতারণা নাকি দিনের পরদিন যেসকল বহুজাতিক কোম্পানি প্রচার করে বেড়ায় যে, তাদের ফেয়ার এন্ড লাভলি মাখলেই আমাদের মেয়েদের গায়ের রং ফর্সা হয়ে যাবে তারা বেশি প্রতারক? খোরশেদ নিতো লোবান আর মোমবাতি আর তা বিভিন্ন মাজারে পাঠিয়ে দিতো। আর এইসব কোম্পানি প্রতারণা করে লুট করছে কোটি কোটি টাকা। তাছাড়া আমার কালো মায়ের বা কালো বোনটির চামড়া কালো থাকলে কী ক্ষতি? এই ধরনের প্রতারণামূলক পুরুষতান্ত্রিক ও বর্ণবাদী বিজ্ঞাপন– তাই কি দিনের পর দিন গণমাধ্যমগুলো প্রচার করেনি? মেরিল ও পন্ডস ক্রিমকে নারীমুক্তির সঙ্গে যুক্ত করবার তামাশাও তো আমরা সহ্য করেছি। হ্যাঁ, দিনের পর দিন। বাংলালিংক তাদের বিজ্ঞাপনে দাবি করছে যে মোবাইল ফোন দিয়ে যুবক জেলেরা নাকি তাদের বাবাদের মহাজনী জালের বঞ্চনা ও শোষণ থেকে মুক্ত করেছে। এই অবিশ্বাস্য সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রপাগান্ডা কি চরম প্রতারণা নয়? এই বিজ্ঞাপনকে আবার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন দিয়ে পুরস্কৃতও করা হচ্ছে। মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো ফালতু ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে তরুণ সমাজকে প্ররোচিত করে। কোটি কোটি টাকা আমাদের দেশ থেকে নিয়ে যাচ্ছে। কমিউনিকেশন বা যোগাযোগের অবশ্যই অর্থনৈতিক ভূমিকা আছে। কিন্তু এই কোম্পানিগুলো কি দিনের পর দিন তরুণদের অনুৎপাদনশীল কথা চালাচালিতে প্ররোচিত করে মুনাফা হাতিয়ে নেয়নি? কোন গণমাধ্যম আছে বাংলাদেশে যারা প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপনে কোম্পানির মুনাফার পাহাড়ে অবদান রাখেনি? বুকে হাত দিয়ে বলুক যে তারা গরিব ও খেটে খাওয়া মানুষদের যেসব সন্তান মধ্যপ্রাচ্যে, মালয়েশিয়ায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করছে তাদেরই আয় করা বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশের সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তকে অনুৎপাদনশীল মোবাইল ফোন দিয়ে প্ররোচিত করে আবার হাতিয়ে নেয়নি? গণমাধ্যমগুলোর কাছে এগুলোই– এই বিজ্ঞাপনই তো বাক, ব্যক্তি, মত ও চিন্তার স্বাধীনতা।

কিন্তু এটাই কি মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার? জরুরি অবস্থায় এই প্রশ্ন কতোটা জরুরি? মুশকিল হলো ব্যবসায়িক স্বার্থে কোম্পানিগুলোর এই ধরনের টেলিভিশন বিজ্ঞাপনকে আমরা প্রতারণা বলি না, কিন্তু খোরশেদ ফুঁ দিয়ে মানুষের চিকিৎসা করে আর বিনিময়ে মোমবাতি আগরবাতি নেয় বলে তাকে আমরা এতোই প্রতারণা মনে করি যে, জরুরি অবস্থার সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আশু

কর্তব্য হয়ে গিয়েছিল শিশুপীর খোরশেদ ও বাদালদি গ্রামের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ করা? কোম্পানিগুলোর প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন বন্ধ করা নয়। এই কি জরুরি অবস্থা?

ঠিকই। আমরা জরুরি অবস্থার অধীনে আছি। জরুরি ক্ষমতার অধীনে সংবিধানের ১৪১ গ(১)-এ দেওয়া ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অধীন মৌলিক অধিকারগুলো স্থগিত রেখেছেন। সংবিধানে নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার নাই। "রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, দেশে এখন এক জরুরি অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশের নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন"।

মৌলিক অধিকার নাই কথাটির কার্যকর মানে কী? এর অর্থ হচ্ছে সংবিধানের তৃতীয় ভাগে রাষ্ট্রের 'নাগরিক' হিশাবে আমাদের যেসকল অধিকার আছে যদি রাষ্ট্র তা কোনো কারণে ক্ষুণ্ন করে তাহলে সেই অধিকার রক্ষা করবার জন্য আমরা আদালতে যেতে পারবো না। আমরা গিয়ে বলতে পারবো না, মহামান্য আদালত, আমি নালিশ জানাতে এসেছি। আপনি রাষ্ট্রের দেওয়া ক্ষমতাবলে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষিত হচ্ছে কিনা তা দেখ-ভাল করবার জন্য আছেন। কিন্তু রাষ্ট্র আমার মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে, আপনি বিহিত করুন। তখন আদালত রাষ্ট্র– অর্থাৎ রাষ্ট্রের পক্ষে যাঁরা এই অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে তাদের আদালতে হাজির হওয়ার আদেশ দিয়ে জানতে চাইবে কোন সাংবিধানিক ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র এই অপকর্ম করেছে। রাষ্ট্রকে বাদীর অভিযোগের জবাব দিতে আদালত বাধ্য করবেন, আর রাষ্ট্রের পক্ষে যাঁরা আদালতে বিবাদী হবেন তাঁরা যদি জবাব দিতে না পারেন আদালত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার পুনর্বহাল ও নিশ্চিত করবার ব্যবস্থা নেবেন এবং অসাংবিধানিক বা বেআইনি কাজ করবার জন্য রাষ্ট্রকে তিরস্কার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাকে শাস্তি দেবেন। কিন্তু জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি বলছেন, জরুরি অবস্থা চলার সময় আদালতে মামলা করবার সাংবিধানিক অধিকার "স্থগিত থাকিবে"। রাষ্ট্র বলছে, আমি আর রাষ্ট্র না। অর্থাৎ জনগণের ইচ্ছা ও মৌলিক অধিকারের ওপর আমি এখন দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। কারণ আমার অস্তিত্বই এখন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আমাকে তোমার নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন হবার নালিশ এখন জানাতে আসবে না।

শুধু তাই নয়, একই ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশ জারি করেছেন। যেখানে সাতটি ক্ষেত্রে সরকারকে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যেমন, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক 'ক্ষুণ্নকারী কার্যকলাপ নিবারণ' করবার জন্য সরকারের "বিধি" জারি করবার ক্ষমতা। জরুরি অবস্থা চলার সময়ও বিদেশি কূটনীতিবিদরা বিশেষ ব্যক্তিদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক

কূটনৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করে দেখা করছেন, সেটা আবার গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচারিতও হচ্ছে। যাঁদের সঙ্গে দেখা করছেন তাঁরাই "আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশের নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন" করেছেন। তাহলে আমরা নাগরিকরা কি জেনেও পরাশক্তিগুলোর বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারবো না? আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের বিপদটা "আভ্যন্তরীণ" নয়– বরং বাইরের– বৈদেশিক হস্তক্ষেপের– আমাদের সার্বভৌমত্বের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপের আপদ। তাহলে নাগরিক হিশাবে দেশ রক্ষার কোনো কাজ আমরা করতে পারবো না কেনো? গণমাধ্যমগুলো এই প্রশ্ন 'জরুরি অবস্থা'র মধ্যেও তুলতে পারতো। তোলেনি।

নিশ্চয়ই আরমরা বাক, ব্যক্তি, মত ও চিন্তার স্বাধীনতার ওপর কোনো তরবারি ঝুলে থাকুক চাই না। কিন্তু যেসকল গণমাধ্যম এই আদর্শকে নিছকই দলবাজির মাধ্যম বানিয়েছে আমরা তাদের নিন্দা করি। এই অধিকারকে তারা রাজনীতির বিরুদ্ধে বিষোদগার অর্থাৎ বাংলাদেশকে গণরাজনীতি মুক্ত করে দেশি-বিদেশি কোম্পানির স্বর্গরাজ্যে পরিণত করতে চাইছে– আমরা অবশ্যই তাদের এই সক্রিয়তা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে যাবো। রাজনীতি চাই না, শুধু পুঁজি ও বিনিয়োগ চাই– এটা হয় না। হবে না। তারা এই অধিকারের নামে বাংলাদেশকে 'ব্যর্থরাষ্ট্র' প্রমাণ করবার জন্য বারবার চেষ্টা করছে– আমরা তাদের সেই চিন্তার গোমর ফাঁক করে দেবো। এই গণমাধ্যমগুলোই যখন এখন গলা তুলে বাক, ব্যক্তি, মত ও চিন্তার স্বাধীনতার কথা বলে আমরা অট্টহাসি করে যাবো। জরুরি অবস্থার মধ্যেও আমাদের এই অট্টহাসি গ্রাম থেকে গ্রামে প্রতিধ্বনিত হবে। শত্রু-ভেদজ্ঞান শিখবো আমরা। শিখবই।

১৬ মাঘ, ১৪১৩। ২৯ জানুয়ারি, ২০০৭, ঢাকা।

কেউ কেউ এতো 'খুশি' কেনো

'মেরেছো কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেবো না'!–শিরোনামে যে লেখা আগে লিখেছি তার উদ্দেশ্য ছিল সংবাদপত্রের 'স্বাধীনতা"র নামে কতিপয় পত্রপত্রিকা ক্রমাগত যে নীতিহীনতার প্রমাণ রাখছে সেই দিকটা ধরিয়ে দেয়া এবং বিদেশি স্বার্থের পক্ষ নিয়ে দেশ ও দশের বিরুদ্ধে তাদের ক্রমাগত তৎপরতাকে

রুখে দেবার জন্য জনগণকে সচেতন করে তোলা। আমাদের সার্বভৌমত্ব ও সমষ্টির স্বার্থ যদি আমরা রক্ষা করতে চাই তাহলে শত্রুমিত্র ভেদ করবার সময় এসে গিয়েছে।

সত্যি কথা যে বর্তমান অস্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেশের স্বার্থ বা সমষ্টির স্বার্থ– কোনো দিক থেকেই আমরা মেনে নিতে পারি না। রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে এই পরিস্থিতি আমাদের সকলের জন্যই চরম পরাজয়। কিন্তু আমরা মেনে নিয়েছি ঘটনা ঘটে গিয়েছে বলেই। অন্য কোনো উপায় আমাদের কাছে ছিল না। ঘটনাঘটনের যুক্তি ছাড়া এই পরিস্থিতি মেনে নেবার অন্য কোনো যুক্তি কোনো সচেতন ও সজ্ঞান নাগরিকের থাকতে পারে না। কিন্তু কতিপয় গণমাধ্যম ও কয়েকটি চেনা মহল ক্রমাগত রাজনৈতিক দল বা রাজনীতিকই বাংলাদেশের সকল ক্ষতির কারণ– এই বিপজ্জনক প্রচার ও প্রপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। এদের উদ্দেশ্য এই অস্বাভাবিক রাজনীতিশূন্য পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী করা– তাদের সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকার জন্য অনেক কথা খোলামেলা বলতে হচ্ছে।

বাংলাদেশ একটি রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের ভিত্তি রাজনীতি– জনগণের ইচ্ছা বা অভিপ্রায়কে সার্বজনীন রূপ দেওয়া এবং শত্রুমিত্র ভেদজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কাজ। রাষ্ট্রের নাগরিকরা রাজনৈতিক অর্থেই নাগরিক, কারণ রাষ্ট্রের বৈধতা তাদের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় থেকে উৎসারিত। সমষ্টিগতভাবে আমরা একটি রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী। বিশ্ব রাষ্ট্রব্যবস্থার আমাদের স্বীকৃতিও রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী ও রাষ্ট্র হিশাবে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই– ভুলে যাওয়া উচিত নয় এমনকি রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতই রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে আমাদের ঐতিহাসিক পরিগঠন নিশ্চিত করে। ইতিহাস সৃষ্টি গোলাপ ফুল দিয়ে ঢাকা পথ নয়– বরং রক্তাক্ত পথ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের আবির্ভাব সফল হয়েছে লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই। কোনো বিশেষ ধরনের রাজনীতি খারাপ হতে পারে, কিন্তু খোদ রাজনীতি বা রাজনৈতিকতার নির্ণায়ক ভূমিকাকে আজ যাঁরা অস্বীকার করতে উঠেপড়ে লেগেছেন, জনগণকে অবশ্যই তাঁদের সন্দেহের চোখে দেখতে হবে। আশা করি তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝবেন এবং সিধা পথে চলবার চেষ্টা করবেন। রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবেই আমরা বিশ্ব ইতিহাস থেকে মুছে যেতে আসিনি। বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তর এবং জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও অটুট অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে বৈশ্বিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বাংলাদেশকে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিকভাবে শক্তিশালী করাই আমাদের কাজ। অতএব যারা ভিন্ন উদ্দেশ্যে কাজ করছে তাদের চিনতে হবে। বাংলাদেশের নব্যধনী শ্রেণী, কতিপয় গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক দল দেশকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছিলো তার বিপরীতে বর্তমান পরিস্থিতি ভালও নয়, মন্দও নয়।

একই দুর্দশার নামান্তর মাত্র। কিন্তু জনগণ এই পরিস্থিতি মেনে নিয়েছে, কারণ এর আগে রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতির নামে যা করে আসছিল তার প্রতি তাদের সমর্থন ছিল না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে রাজনীতিহীন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিকে তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক বলে গণ্য করে। এটা হয় না। এটাই বাস্তবতা।

রাষ্ট্র যখন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে, রাষ্ট্র যখন নিজেই নাগরিকদের কাছে ঘোষণা দেয় আমি আর রাষ্ট্র নাই, রাষ্ট্র যখন বলে, যে অধিকার রক্ষা করবার দায় নিয়ে আমি রাষ্ট্র হয়েছি বা নাগরিকরা রাষ্ট্রের 'নাগরিক' হয়েছেন সেই অধিকার আমি আর রক্ষা করতে পারছি না, তাকেই সাংবিধানিক অর্থে জরুরি অবস্থা বলে। জরুরি অবস্থা ঘোষণার এই সাংবিধানিক অধিকার সমষ্টিকে বিপদআপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য সব রাষ্ট্রই হাতে রাখে। কোনো নাগরিক রাষ্ট্রের এই দুর্দশায় 'খুশি' হতে পারেন না। অবস্থা গতিকে এই দুর্দশা রাষ্ট্র ও নাগরিককে বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়– কিন্তু সেটা খুশির খবর নয়। খুশির খবর হতে পারে না। যাঁরা 'জরুরি অবস্থা'কে স্বাগত জানিয়েছেন, খুশি হয়েছেন, ফুর্তি প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেননি– তাঁদের সঙ্গে সজ্ঞান ও সচেতন নাগরিকদের উপলব্ধির মিল হবে না। আমরা একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি, আমরা সকলেই ব্যর্থ হয়েছি। এখন সকলে মিলে কতো তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে পারি সেই চেষ্টাই প্রাণপণ করতে হবে।

হায়, এমনকি ড. কামাল হোসেন ও ড. ইউনূসের মতো মানুষও দাবি করেছেন যে মানুষ জরুরি অবস্থা জারি হওয়ায় খুশি হয়েছে। কারণ এতে নাকি 'গৃহযুদ্ধ' ঘটবার বিপদ থেকে দেশ রক্ষা পেয়েছে, অর্থনীতিতে স্থিতি ফিরে আসছে ইত্যাদি। কিন্তু দেশ ও দশকে ভালবাসেন এই ধরনের নাগরিকদের সংখ্যাই বাংলাদেশে অধিক। তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁদের মনের কথা ড. কামাল হোসেন বা ড. ইউনূস কিন্তু বলেননি। এমনকি তাঁরা নিজের কথা বলেছেন কিনা বলা মুশকিল, হয়তো অন্য কারো খুশি হওয়ার কথা বলেছেন। গ্যাস তেল কয়লাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা বিনিয়োগ করতে চায় হয়তো তারা খুশি। হয়তো খুশি টেলিনর কোম্পানিসহ টেলিকমিউনিকেশান সেক্টরে বিনিয়োগে আগ্রহী নানান বহুজাতিক কোম্পানি। ফুলবাড়ি কয়লাখনি থেকে বিতাড়িত হয়ে এশিয়া এনার্জি কর্পোরেশান নতুন নামে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে। নতুন নাম গ্লোবাল কোল ম্যানেজম্যান্ট (জিএসএম)। তারা পিপলস টেলিকম এন্ড ইনফরমেশান সার্ভিসেস লিমিটেডের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। পঞ্চাশ লাখ ডলার বিনিয়োগের কথাবার্তা চলছে। তারা অবশ্যই খুশি হবে কারণ 'জরুরি অবস্থা'র অধীনে জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা ২০০৭ বলছে, "রাষ্ট্র বা জনসাধারণের নিরাপত্তা বা স্বার্থ রক্ষার্থে বা জনশৃঙ্খলা বজায় রাখিবার প্রয়োজনে দেশের সর্বত্র বা যেকোন স্থানে মিছিল, সভাসমাবেশ বা বিক্ষোভ

অনুষ্ঠান বা উহাতে অংশগ্রহণ" কতিপয় উপবিধি বা বিধানাবলী সাপেক্ষে "নিষিদ্ধ"। তার মানে এশিয়া এনার্জি বা বহুজাতিক কোম্পানি আমাদের দেশের সম্পদ লুট করে নেবার প্রতিবাদ আমরা এখন আর জানাতে পারবো না, মিছিল করতে পারবো না, বিক্ষোভ প্রকাশ করতে পারবো না। অথচ প্রতিবাদ জানিয়ে, পাঁচটি প্রাণ আত্মাহুতি দিয়ে, বহু মানুষ চিরজীবনের মতো পঙ্গুত্ব বরণ করে, বহু মানুষ আহত হয়ে ফুলবাড়িয়ার জনগণ এশিয়া এনার্জির খোলামুখ কয়লাখনির কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। রুখে দিয়েছিল। তখন সরকার রাষ্ট্রের পক্ষে জনগণের সঙ্গে চুক্তি করেছে– নাগরিকদের জীবন ও জীবিকা রাষ্ট্র ধ্বংস করবে না। আর এখন বলছে জীবন ও জীবিকা রক্ষার জন্য তারা মিটিং মিছিল প্রতিবাদ বিক্ষোভও জানাতে পারবে না। তাহলে জরুরি অবস্থায় ফুলবাড়িয়ার মানুষ বা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ "খুশি' হয়েছে এই কেচ্ছা ড. ইউনূস বা ড. কামাল হোসেন কোথায় পেলেন?

খুশি কি কানসাটের মানুষ? লড়াই করে, জীবন দান করে তাদের বিদ্যুৎ পাবার অধিকার আদায় করতে হয়েছে। খুশি কি শনির আখড়ার জনগণ? সাধারণ খেটে খাওয়া গরিব জনগণ? কৃষক? মজুর? অল্প আয়ের চাকরিজীবী? কীসের 'খুশি'? খুশি কি পোশাক তৈরি কারখানার শ্রমিকরা? –যারা ন্যূনতম মজুরি দূরে থাকুক পুড়ে মরার হাত থেকে বাঁচবার জন্য লড়াই-সংগ্রাম করতে বাধ্য হয়। একদিকে জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করবার কোনো নীতি নাই বিদ্যমান রাষ্ট্রের, এখন জীবন ও জীবিকা রক্ষার আন্দোলন করবার মৌলিক নাগরিক অধিকারই যদি তারা হারায় তাহলে তারা কেন 'খুশি' হবে? হ্যাঁ, তারা পরিস্থিতি মেনে নেবে, মেনে নিতে বাধ্য কারণ তাদের পক্ষে কোনো নোবেল বিজয়ী নাই, কোনো সংবিধান বিশারদ নাই, কোনো গণমাধ্যম নাই। মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী? সেই জন্যই বলছিলাম ড. ইউনূস বা ড. কামাল হোসেন হয়তো টেলিনর কোম্পানি বা এশিয়া এনার্জির মতো বহুজাতিক কোম্পানির খুশির কথা বলছেন। বা যেসব কোম্পানি আসবে তাদের খুশির কথাই আগাম জানাচ্ছেন। সাধারণ মানুষের বরাতে তাঁরা যা বলছেন তা ঠিক নয়।

এই যে রাষ্ট্র নাগরিকদের মৌলিক অধিকার 'স্থগিত' করেছে রাষ্ট্রের সেই চরম দুর্দশার আলোকে ড. ইউনূস ও ড. কামাল হোসেনের এই অতি আতিশয্যেরও ভয়ানক রাজনীতি আছে। সেই রাজনীতি হচ্ছে বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করা। আমাদের তেল-গ্যাস-কয়লা বন্দর প্রাণবৈচিত্র্য বিনা প্রতিবাদে বিদেশি স্বার্থের হাতে তুলে দেওয়া। আমাদের সম্পদ, জীবন ও জীবিকা রক্ষার বিরুদ্ধে আমরা কোনো টুশব্দ করতে পারবো না। এটাই কি 'জরুরি অবস্থার' অর্থ? জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রের কী দুর্দশা হয় এতোটুকু বোঝার ক্ষেত্রে আইনশাস্ত্রে কি কোনো মুশকিল আছে, ড. কামাল হোসেন? এটা বোঝার জন্য কি আমাদের আবার নোবেল পুরস্কার পেতে হবে?

এই আলোকে গণমাধ্যমের তথাকথিত 'স্বাধীনতা' ব্যাপারটা পাঠক বিচার করে দেখুন। গণমাধ্যম তাদের জন্য 'স্বাধীনতা' চায়।

আর কারো জন্য নয়। তারা বলছে অন্য সকল নাগরিকদের নাগরিক অধিকার না থাকুক, কিন্তু আমাদের 'স্বাধীনতা' দিতে হবে। ফুলবাড়িয়া, কানসাট, শনির আখড়ার 'মানুষ' মানুষ না। ওদের 'স্বাধীনতা' ও মৌলিক অধিকারের জন্য গণমাধ্যমের হর্তাকর্তাদের মাথাব্যথা নাই। নিজের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা এতোই উন্মাদ যে তাঁরা যেন মঙ্গলগ্রহের মানুষ– রাষ্ট্র, রাজনীতি, আইন সংবিধান সবকিছুরই তাঁরা উর্ধ্বে থাকবেন। তারা রাষ্ট্রের, আইনের, সংবিধানের এমনকি 'জরুরি অবস্থা'রই উর্ধ্বে থাকতে চাইছেন। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেছেন তিনি তাঁদের প্রতি আস্থা রাখেন। আমরা কিন্তু রাখি না। তারা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে ধমক দিয়ে বলেছেন যে তাঁরা জরুরি বিধানাবলী মানবেন না। তাঁরা প্রতিবাদ করেছেন। এর পরদিন সরকারকে বাধ্য হয়ে বলতে হয়েছে– না, থুক্কু, আমরা গণমাধ্যমের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেইনি। তাঁরা 'জরুরি অবস্থা'র অধীনেও স্বাধীন। তাহলে বস্তির মানুষগুলোর স্বাধীনতা যে হরণ করা হলো তার কী হবে? যে হকারগুলোকে উচ্ছেদ করা হলো তাদের কী হবে? জীবন ও জীবিকা রক্ষার তাগিদেই তো তাদের এই পেশা। তারা কি জন্তুজানোয়ার? যদি আমরা বস্তির মানুষদের, হকারদের, সাধারণ মানুষদের সংঘবদ্ধ করে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের কাছে যাই তিনি কি তাদের কথা শুনবেন? যদি প্রতিবাদ করি তাহলে কি তিনি আমাকে কারাগারে পাঠাবেন? গণমাধ্যমের, সমাজের স্বল্প কিছু ওপরতলার অভিজাত শ্রেণীর 'স্বাধীনতা' জরুরি অবস্থার অধীনেও বহাল থাকে। অথচ অন্য নাগরিকদের থাকে না, কারণ তারা গরিব– এটাই কি জরুরি অবস্থার মানে?

গণমাধ্যমের 'স্বাধীনতা' থাকতে হবে। আলবৎ গণমাধ্যম ব্যবসাও বটে। তারা বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থ দেখ-ভাল করবে। সে কারণে বিউটেনিসও মইনুল হোসেনের সাথে দেখা করেছেন। তাদের বিজ্ঞাপনে অনুদানে চলবে। এই তো ব্যাপার। এই ধরনের গণমাধ্যমের 'স্বাধীনতা'র চরিত্র উদাম করে দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কী পথ আছে?

কামাল হোসেন এখন আবার আমাদের বলছেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার বৈধ' (দেখুন, *যুগান্তর* ২৭ জানুয়ারি ২০০৭)– সরকার তাঁর বক্তব্যকে কিভাবে নিয়েছে জানি না, কিন্তু নাগরিকরা এই ধরনের কথাবার্তাকে এখন বরং উস্কানিমূলক বলেই মনে করবে। কারণ আমরা রাষ্ট্রের যুক্তি মেনে নিয়েছি। এই সরকারের বৈধতা বা অবৈধতা আমাদের কাছে মোটেও প্রশ্নবোধক আর নাই। কে বলেছে এই সরকার 'অবৈধ'? 'বৈধ'? 'অবৈধতা'র তর্ক তোলাটাকে আমরা সেই কারণে উস্কানিমূলক বলে মনে করি। এখন ২২ তারিখের পর এটা আর তর্কের বিষয় নাই। এটা বাস্তবতা। এই বাস্তবতার নিরসন আগামী দিনে আইন বা সংবিধান দিয়ে আর

করা যাবে না। এমনকি আদালতে অযথা আরেকটি মামলা করে নির্বাচন স্থগিত রাখবার মতো রায় আদায় না করে আনলেও চলতো। এতে জটিলতা বাড়লো। কমলো না। এখন শুধু বলে রাখতে পারি অস্ট্রিয়ান আইন শাস্ত্রবিদ হান্স কেলসনের (Hans Kelsen 1881–1973) তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা জানি এবং বুঝি। বলপ্রয়োগের সঙ্গে আইন, সংবিধান ও বৈধতার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী– এই বিষয়গুলো এখন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা আইনশাস্ত্রে বিতর্কের ব্যাপার হয়ে আর নাই। আইন, রাষ্ট্রনীতি ও দর্শন এই ধরনের তর্কবিতর্ক সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। এই সরকারের বিচার বিদ্যমান সংবিধান বা আইনের মধ্যে করা হবে কি হবে-না সেই সীমারেখা আমরা এখন অতিক্রম করে এসেছি। তাহলে বৈধতা ও অবৈধতার প্রশ্ন এখন তোলার কী অর্থ হতে পারে? কেন তুলেছেন আপনি ড. কামাল হোসেন?

ইতোমধ্যে মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর সংকলন করে জানিয়েছে ১১ জানুয়ারি জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর থেকে ২১ জানুয়ারির মধ্যে ১৯ জন মানুষ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে প্রাণ হারিয়েছে। এদের মধ্যে ৮ জন র‍্যাবের হাতে ক্রসফায়ারে; একজন পুলিশের ক্রসফায়ারে; একজন পুলিশের কাস্টডিতে থাকাকালীন নির্যাতনে; দুইজন পুলিশ গ্রেফতারের পর হাসপাতালে নিয়ে আসার পরে; তিনজন সেনাবাহিনীর হাতে নির্যাতনে; এক জন সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতারের পর ভ্যান থেকে পালাতে গিয়ে; যৌথ বাহিনীর হাতে ধরা পড়ার পর কাস্টডিতে থাকাকালীন একজন ছয় তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে; একজন যৌথ বাহিনীর হাতে ধরা পড়ার পর পুলিশ কাস্টডিতে এবং একজন সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার পর হাসপাতালে।

যে ১৯ জন প্রাণ হারিয়েছে তাদের মধ্যে ৮ জন বিএনপির, ২ জন আওয়ামী লীগের, ২ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির (জনযুদ্ধ), একজন গণমুক্তি ফৌজের, একজন শ্রমজীবী মুক্তি আন্দোলনের, ১ জন কৃষক, একজন ওষুধ বিক্রেতা এবং ছয়জন অপরাধী বলে অভিযুক্ত।

জরুরি অবস্থায় মৌলিক মানবাধিকার স্থগিত আছে বলে ঘটনাগুলো ঘটবার কারণ তদন্তের জন্য অধিকার আবেদন জানিয়েছে। সাংবিধানিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের নালিশ রাষ্ট্রকে জানায়নি। লাভ নাই কারণ সেই অধিকার 'স্থগিত'। এটাই কি আমরা চেয়েছিলাম? নির্বাচিত সরকারের আমলেও মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি। এই সরকারের আমলে কি একই ঘটনা ঘটতে থাকবে? অথচ জরুরি অবস্থা জারি আছে বলে সাংবিধানিক বা মৌলিক মানবাধিকারের জায়গা থেকে নালিশ জানাবার জায়গাটুকুও আমাদের আর নাই।

অধিকারের প্রতিবেদনের পর দেশে বিদেশের অনেক মানবাধিকার সংস্থা উদ্বেগ জানিয়েছে। এতোটুকু ভরসা আমরা পেয়েছি যে এই ধরনের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য সরকার কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিন্তু এরপরেও

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে, ঘটছে। গণহারে ধরপাকড়েরও যুক্তি আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। সাধারণ মানুষের কাছে এই সবই এখন উদ্বেগের বিষয়।

ক্ষমতার হাত বদল হওয়ার পরপরই দেখলাম অবৈধ স্থাপনা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। দেখলাম যে ধনীদের কেউ কেউ লেকের জায়গা দখল করায় তাদের বাড়িঘর ভাঙা হচ্ছে। কারণ দুই একজনের কারণে সকল ধনীর হাঁটার জায়গাটা বেদখল হয়ে গিয়েছিল। সকল ধনীর হাঁটাপথটা উদ্ধার করবার জন্য বেশ চোটপাট দেখানো হলো। তারপর সব স্টপ। কিন্তু রাস্তায় ফুটপাতে যেসব অতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা কিছু মালামাল বিক্রি করে তাদের সংসার চালায় তাদের নির্মমভাবে উৎখাত করা হয়েছে। সত্যি যে তারা সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি ছিল। তাদের চাঁদা না দিয়ে তারা ফুটপাতে দোকান করতে পারতো না। প্রয়োজন ছিল এই অভাবী মানুষগুলোকে একটা নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসা– সন্ত্রাসীদের হাত থেকে মুক্ত করে তাদের জীবন ও জীবিকায় সহায়তা করা। কিন্তু উল্টা দেখলাম 'অবৈধ স্থাপনা' ভেঙে দেওয়ার নামে গরিব মানুষগুলোর রিজিক বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

বস্তি উচ্ছেদ চলছে। বস্তিতে আগুন লাগছে। গরিব ও অসহায় মানুষগুলোর মাথা গুঁজবার স্থানগুলো বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ উচিত ছিল বিগত সরকারগুলো এই মানুষগুলোর ওপর যেভাবে অত্যাচার, নিপীড়ন করেছে, যেভাবে তাদের বঞ্চিত করেছে– সেই বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করা। আমাদের সেনাবাহিনী খুব সহজেই এই মানুষগুলোর মন জয় করতে পারতেন যদি তাঁদের আবাসনের ব্যবস্থাটা তাঁরা আগে করতেন এবং একটা নিয়মের মধ্যে মানুষগুলোর প্রতি সদয় থেকে তাঁদের সরিয়ে আনতে এই সরকারকে উপদেশ দিতেন। তাঁরা যদি কোথাও অবৈধভাবে বস্তি করে থাকেন সেই বস্তি তাঁদেরই– জনগণেরই উদ্যোগে সাফ করা যেত। 'জরুরি অবস্থার' অধীনে এই কাজগুলো করা সহজ ছিল এবং মানুষগুলোও প্রাণভরে দোয়া করতো। কিন্তু এই ধরনের কাজে– যার সঙ্গে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনোই সম্পর্ক নাই– সেনাবাহিনীকেই গরিব ও বঞ্চিত মানুষগুলোর বিপরীতে দাঁড় করানো হচ্ছে।

আশা করি, আমাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে। যারা মানুষকে গরিব, অসহায় ও বস্তিবাসী করেছে আজ দরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যদি এই ব্যবস্থার যারা শিকার সেই নিরীহ মানুষগুলোকে এই সরকার শত্রুর অবস্থানে ঠেলে দেয়, তাহলে এই সরকারের সমর্থনের ভিত্তিটাকেই দুর্বল করা হবে। নানান স্বার্থের প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপরিচ্ছন্ন এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যাঁরা দেশের হাল ধরেছেন তাঁরা যেন গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে সরে না যান– এটাই আমার প্রার্থনা। সকলের মঙ্গল হোক।

১৩ মাঘ, ১৪১৩। ৩১ জানুয়ারি, ২০০৭। শ্যামলী।

ধরপাকড় শুরু হয়েছে। বলাবাহুল্য, শেখ হাসিনা কিছুদিন আগে সহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে নির্বাচন বানচাল করে চারদলীয় জোটকে ক্ষমতায় আসতে না দেওয়ার সাফল্যে আনন্দিত ছিলেন। খবরে তো তা-ই দেখেছি। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর এই সরকার সবই সুন্দর ঠিকঠাক ভালই করছে বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। এখন শেখ হাসিনা তাঁর দলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার হয়ে যাওয়ায় নিশ্চয়ই সবকিছুকে আর ঠিকঠাক ভাবছেন না। কিন্তু নেতাকর্মীদের সব ঠিকঠাক আছে এই কথাটিও আর বলতে পারছেন না। পত্রিকায় পড়েছি তিনি গ্রেফতার হয়ে যাওয়া নেতাকর্মীদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তাঁর জন্য মায়া হয়।

খালেদা জিয়াও উদ্বিগ্ন। এই পরিস্থিতিতে অবশ্যই তাঁকে উদ্বিগ্ন হতে হবে। শুধু এই কারণে নয় যে যাঁরা ধরা পড়ছেন তাঁদের অধিকাংশই বিএনপির নেতাকর্মী। তাঁকে জননী হিশাবে পুত্র তারেক রহমানের ভবিষ্যৎ- বিশেষত রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবতে হচ্ছে। আমি রাজনীতিবিদ হিশাবে অবশ্যই তাঁর সমালোচনা করি, তারেকের শক্তি তৈরি হয়েছে তাঁর সন্তান হিশাবে। জিয়াউর রহমানের পুত্র তিনি। আজ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য খালেদা জিয়াকে অবশ্যই ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু সন্তানের জন্য মায়ের স্বাভাবিক আবেগ-ভালোবাসাকে আমি খাটো করে দেখি না। প্রেম-ভালবাসা ছাড়া সমাজ চলতে পারে না, সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু এই শিক্ষা যেন আমরা পাই যে রাজনীতি যদি পারিবারিক পক্ষপাতিত্ব চর্চার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে একটি জনগোষ্ঠীর জন্য সেটা চরম অধঃপতনের কারণ হয়ে ওঠে। আজ আমরা সেই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ *'প্রথম আলো'*য় একটি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন : "চমক নয়, আইনের শাসনে দ্রুত বিচার কাম্য" (৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭)। আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই। প্রথমত এই গ্রেফতারকে আমি 'চমক' দেওয়া বলি না। ঠিক।

এখন এই সময় একে 'চমক' বলা বরং বিপজ্জনক বলেই মনে করি। কারণ গ্রেফতার পর্ব এখনো শেষ হয়নি। রাজনৈতিক দলের নেতারা যদি দেশকে একটা মন্দ জায়গায় নিয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে তাদের মন্দ কাজের জন্য দমন করবার জন্য। যাঁরা এই কঠিন ও বিপজ্জনক কাজ হাতে নিয়েছেন 'চমক' বলে তাঁদের

কাজকে খেলো করে দেওয়া আমি ঠিক মনে করি না। গ্রেফতারপর্ব শেষ নয়, মাঝপথে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করাও আমাদের কাজ নয়। তিনি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের পক্ষে বাংলাদেশকে বিশ্বের চরম দুর্নীতিবাজ দেশ বলে এতোকাল প্রচার করে আসছিলেন। আমি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল তো অন্য জিনিস। তাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে আমি অবহিত। ফলে আমরা কোথায়, কীভাবে, কার কাছে কী উদ্দেশ্যে দেশকে তুলাধুনা করি সেই সম্পর্কে আমাদের প্রায়ই হুঁশ থাকে না। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের একটা সুনির্দিষ্ট রাজনীতি আছে। সেই রাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের মতো ছোটো– বিশেষত ইসলাম-প্রধান দেশগুলোকে ব্যর্থ ও অকার্যকর প্রমাণ করা এবং তারা যে নিজেরা নিজেদের শাসন করতে অক্ষম এই সত্যটাই প্রচার করা। যেহেতু তারা অক্ষম অতএব আমাদের স্থানীয় কূটনীতিবিদ বা কূটনৈতিক দূতাবাস, তাদেরই টাকায় পরিচালিত কয়েকটি এনজিও, তাদেরই পুরস্কারে ও প্রচারে বানিয়ে তোলা তথাকথিত 'বিশিষ্ট নাগরিক' এবং কয়েকটি অতি চেনা গণমাধ্যম দেশের 'সুশাসন' প্রতিষ্ঠা করবে, দেশের নীতি নির্ধারণ করবে এমনকি সংকটজনক পরিস্থিতিতে কারা 'উপদেষ্টা' হবে, কারা হবে না সেই সিদ্ধান্ত নেবে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, রাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রাম দিয়ে ঠিক হবে না, ঠিক হবে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ ও দূতাবাসগুলোর 'টুয়েসডে গ্রুপ' দিয়ে। কোনো দেশপ্রেমিক নাগরিক এই পরিস্থিতি মেনে নিতে পারে না।

তিনি বলেছেন, "আমরা যেমন অপশাসন থেকে মুক্তি চাই, তেমনি আমরা আইনের শাসন চাই"। কিন্তু কোন আইন? কোন সংবিধান? বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধান, আইন ও রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে ন্যায়বিচার অসম্ভব। তার ওপর সবসময়ই রয়েছে বিদেশি হস্তক্ষেপ ও খবরদারি। তিনি বাংলাদেশে শাসনব্যবস্থায় বিদেশি হস্তক্ষেপকে অপশাসন বলে কখনও সমালোচনা করেছেন বলে দেখিনি। বরং তাদেরই পক্ষ হয়ে তাদেরই ভাষায় 'গভর্নেন্স' বা 'সুশাসন' কায়েমের জন্য জেহাদ করে এসেছেন দেখেছি। আর আমরা 'সুশাসন' বলি নি, বলেছি গণতান্ত্রিক অধিকার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার কথা। বলেছি বাংলাদেশের গণমানুষের ভাষা, ভাব, সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একটি গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করেই কেবল সকলের জন্য আমরা 'ইনসাফ' প্রতিষ্ঠা করতে পারি। আমরা সকল বে-ইনসাফির, দুর্নীতির, দুর্বৃত্তায়নের খোদ ব্যবস্থাকেই উপড়ে ফেলতে চাই, বদলে দিতে চাই, বদলিয়ে ইনসাফ কায়েম করতে চাই, আর বিদেশি শক্তি চায় এমন এক শাসনব্যবস্থা যাতে তাদের বহুজাতিক কোম্পানি আমাদের দেশ লুটপাট করতে পারে; বিদ্যমান, শাসন, শোষণ ও দুর্নীতি অব্যাহত রাখতে পারে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ও শোষণেরই ধারাবাহিকতা দেখি এখনকার

বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা ও আইএমএফ আদলে গড়ে ওঠা বাংলাদেশে। এই পরিস্থিতিতে 'আইনের শাসন' কথাটা বড়োই হাস্যকর।

তাছাড়া কীসের আইনের শাসন? বাংলাদেশে চলছে 'জরুরি অবস্থা'– জরুরি বিধানাবলী ২০০৭ জারি রয়েছে। তার মানে রাষ্ট্র তো বলেই দিয়েছে যে আইনের শাসন এখন গরহাজির– জরুরি অবস্থা চলাকালীন সময়ে আমরা রাষ্ট্রের কাছে আইনের শাসনের জন্য যেন নালিশ না করি। এই বিষয়ে আমি আগেই লিখেছি। আমরা বলেছি, যেহেতু ঘটনা ঘটে গিয়েছে আমরা তা মানতে বাধ্য। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ কি তাহলে জরুরি অবস্থা মানেন না? সেই কথা তাহলে তাঁকে স্পষ্টভাবেই বলতে হবে। বাঁকাচোরা পথে নয়। জনগণের পক্ষ থেকে আমাদের কথা হবে নতুন শাসকদের বিদ্যমান সংবিধান বা আইন দ্বারা আমরা বিচার করবো না, বরং তারা কী করতে চাইছেন, কী করবেন তার দ্বারাই বিচার করবো। তার জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকবো না। তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপকেই আমরা গণমানুষের রাজনৈতিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের জায়গা থেকে বিচার করবো। গণমানুষের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপরায়ণ হলে অবশ্যই সমর্থন দেবো। অতএব তাঁরা কী করতে চাইছেন, তাঁদের করতে দেওয়া হোক। তাঁরা দুর্নীতিবাজ ও দুর্বৃত্তদের ধরছেন, তাতে জনগণের আতংকিত হবার কিছুই নাই। কিন্তু অল্প কয়েকজন– যতো বড়ো চাঁই আর সর্দারগোছেরই হোক– ব্যক্তির ধরপাকড়ে গণমানুষের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। বিদ্যমান ব্যবস্থাকে তাঁরা কোথায় কাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছেন, কী করবেন– সেটাই হবে আমাদের বিবেচ্য বিষয়। সত্য যে উপদেষ্টা পরিষদের মধ্য দিয়ে তাঁদের ইচ্ছার একটা ছবি আমরা পাই, তাঁদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েও। কিন্তু পূর্ণ বিবেচনার সময় এখনো আসেনি। এই ক্ষেত্রে তাঁদের কাজ করতে দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।

কিন্তু কেউ যেন 'কাজ করতে দেওয়া' আর 'সময় দেওয়া'র মধ্যে যে গুরুতর পার্থক্য আছে সেই ফারাক গুলিয়ে না ফেলেন। মতিউর রহমান 'প্রথম আলো'য় বলেছেন 'নির্বাচনের জন্য সময় দিতে হবে' (৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭)। না। আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই। যদি নির্বাচন অনুষ্ঠানই ক্ষমতাসীন সরকারের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে– এই কথা বলেই তাঁরা সরকার গঠন করেছেন এবং সেইভাবেই এখন অবধি তাঁদের ইচ্ছাকে আমরা বুঝেছি– তাহলে জনগণ অবশ্যই তাঁদের ছয় মাসের বেশি সময় দেবে না। সেই ক্ষেত্রে বাছাই করা শীর্ষস্থানীয় কতিপয় দুর্নীতিবাজ, দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসীদের ধরপাকড় ও নিদর্শনমূলক শাস্তিই নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট। এর অর্থ হচ্ছে বিদ্যমান রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা আছে তাই থাকছে– শুধু কিছু সংস্কার করে নির্বাচনী পরিস্থিতি তৈরির জন্যই এই 'জরুরি অবস্থা'। কিন্তু যদি তাঁরা বিদ্যমান ব্যবস্থার কোনো গুণগত পরিবর্তনের কথা ভেবে থাকেন তাহলে তাঁরা বিপজ্জনক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। সেই বিতর্ক হবে রাজনৈতিক ও

আদর্শগত বিতর্ক– সেখানে অবশ্যই জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের শর্ত তৈরি করতে হবে। তাঁদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডই তখন রাজনৈতিকভাবে জনগণ বিবেচনা করবে। তাঁদের পক্ষে বিপক্ষে সামাজিক ও রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটবে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মেরুকরণও ঘটবে। আমার ধারণা, জনগণ বা শাসক পক্ষ– কেউই এই পরিস্থিতির জন্য তৈরি নয়। সেই কাজ তাঁরা জরুরি অবস্থার অধীনে করতে পারেন না। সেটা করতে হবে রাজনৈতিকভাবে–নিজেদের রাজনৈতিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জনগণের কাছে পরিষ্কার দেখিয়ে। রাজনৈতিক পক্ষবিপক্ষ বিভাজনের ভিত্তিতেই তাঁদের সফলতা নির্ভর করবে। আমার ধারণা, সেটা বিপজ্জনক পথ। যতোদূর আমি দূর থেকে বুঝেছি এই কঠিন কাজ করবার জন্য তাঁদের কোনো প্রস্তুতি নাই। গণমানুষেরও প্রস্তুতি নাই। অতএব নির্বাচনের জন্য সময় দেবার জন্য মতিউর রহমান যে কাকুতি জানিয়েছেন তাকে বিপদের ঘনঘটা বলেই আমি গণ্য করি।

মতিউর রহমান এতোদিন বিদেশিদের হস্তক্ষেপে উৎফুল্লই ছিলেন। এখন বিদেশিদের প্রতি তাঁর গোস্বা দেখে আমি নিজেও খানিক বিচলিত বোধ করছি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরো অনেকের সঙ্গে সৎ মানুষের খোঁজ করছেন। বিদ্যমান ব্যবস্থার কোনো সমালোচনা না করে তার গুণগত রূপান্তরের কোনো কথাবার্তা বলেছেন বলে দেখিনি। তাঁর ও তাঁর বন্ধুদের সৎ মানুষের খোঁজে তাঁকে বিদেশিরাও সাহায্য সহযোগিতা করেছে। কারণ বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা টিকে থাকুক, শুধু দরকার কিছু 'ভালো মানুষ'কে ইলেকশানে দাঁড় করিয়ে দেওয়া– এই আজগুবি ও হাস্যকর ধারণা বিদেশিরা নিজেরাও বিশ্বাস করে না। না করলেও বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা বিদেশিদের অর্থ ও অনুপ্রেরণায় যেভাবে বাংলাদেশ চষে বেড়িয়েছে তাতে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিতার স্তর সম্পর্কে তাদের ভালই ধারণা হয়ে গিয়েছে। আমরাও আমোদ বোধ করেছি।

মতিউর রহমান 'জরুরি অবস্থা'কে দীর্ঘস্থায়ী করতে চান। সাংবিধানিকভাবে তা অসম্ভব। সম্ভবত তিনি সরাসরি সামরিক শাসন প্রবর্তনেরই পরামর্শ দিচ্ছেন। বিদেশিরা এটা চাইবে কি? কারণ তারা এর আগে বলেছে সামরিক শাসন জারি করা হলে শান্তিমিশনে বাংলাদেশের সৈনিকরা চাকরি হারাবে। এই বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে কেউ পড়তে চায় না। অন্যদিকে দীর্ঘস্থায়ী অরাজনৈতিকতার বিপদ আছে এই কারণে যে, চারদল ও মহাজোট উভয়েই বিদেশিদের স্বার্থই দেখভাল করত। তারা চুরিদারি বেশি করেছে বলেই তাদের এখনকার এই দুর্দশা। এমনকি শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য তাদের কাকুতিমিনতিও কোনো পক্ষই শোনেনি। অথচ তাদের আবার ক্ষমতায় নিয়ে আসাও দরকার। কিন্তু মতিউর রহমান জরুরি অবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে চান কেনো? এতে কার স্বার্থ নিহিত রয়েছে?

আমরা যেন ভুলে না যাই যে বহু দিন ধরেই বাংলাদেশ যে তালেবান হয়ে যাচ্ছে দেশে-বিদেশে তার তুমুল প্রচার চলছে। এবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবার পরপরই বিদেশি পত্রিকায় দাবি করা হয়েছে বাংলাদেশ তালেবানি আফগানিস্তান হতে যাচ্ছে শিগগিরই। বিদেশি কিছু পত্রপত্রিকায় যখন এই ধরনের খবর ছাপা হয়, তখন তাকে ঠিকমতো পড়বার একটা নিয়ম আছে। এই প্রচারগুলোকে পড়তে হবে এইভাবে যে আসলে তারাই– সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যারা আফগানিস্তান, ইরাক, প্যালেস্টাইনসহ ইসলাম-প্রধান দেশগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে– তারাই বাংলাদেশকে 'আফগানিস্তান' বানাতে চায়। বাংলাদেশকে নতুন যুদ্ধক্ষেত্র বানাতে চাইছে তারা এবং তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই প্রচারগুলো তারই লক্ষণ। বাংলাদেশ তেল-গ্যাস-কয়লা, প্রাণসম্পদ ও আরো নানা অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও ভূ-রাজনৈতিক কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রশ্ন হচ্ছে আমরা বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদীদের নতুন যুদ্ধক্ষেত্র বানাতে দেব কিনা। নিশ্চয়ই দেব না। সেই কারণে আগেই বলেছিলাম জনগণ বা যাঁরা শাসনক্ষমতা হাতে নিয়েছে তাঁরা যদি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকে বাংলাদেশের কোনো গুণগত পরিবর্তনঘটাতে চান তাহলে সেটা একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে সঙ্গে নিয়েই করতে হবে। আদের আশা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছাকে আমলে নিয়ে এবং পরাশক্তির নগ্ন বেইনসাফির বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভের প্রতি পূর্ণ সচেতন থেকেই সেটা সম্ভব। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজনৈতিকভাবে তাঁরা ক্ষমতায় আসেননি। এখন অল্প কয়েকটি গণমাধ্যম কোথায় দাঁড়িয়ে কী পরামর্শ দিচ্ছে তা জনগণের কাছে পরিষ্কার। গায়ে পড়ে এতো পরামর্শও কেনো দিচ্ছে তাও। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোকেই এইসব পরামর্শকে বিচার করতে হবে। শুধু বাংলাদেশের পরিস্থিতির মধ্যে এইসব পরামর্শের অর্থ আমরা ধরতে পারবো না।

নিউজ উইক ফেব্রুয়ারির ৫ তারিখে (২০০৭) লিখেছে Rhymes with Afghanistan (আফগানিস্তানের গলায় কণ্ঠ মেলানো)। সেখানে তারা বলছে, 'দক্ষিণ এশিয়ার ১৫ কোটি মানুষের এই দেশটি শুধু ব্যর্থ রাষ্ট্রই হয়ে উঠছে না বরং রাজনৈতিক পরিবেশ যতো খারাপ হচ্ছে ততোই জঙ্গি ইসলামপন্থীরা ফাঁকফোকরে ঢুকে পড়ছে'। Center for International-এ ডিরেক্টর সেলিগ হ্যারিসনের বরাতে নিউজ উইক বলছে, 'যদি সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে তাহলে সরকারের প্রধান পদগুলোতে ইসলামপন্থীরাই বসে পড়বে'। বাংলাদেশ তখন 'সন্ত্রাসের আঞ্চলিক ঘাঁটি' (regional hub of terrorism) হয়ে উঠবে। এই পরিস্থিতির কারণেই পরাশক্তির দূতাবাসগুলো 'জরুরি অবস্থা' দীর্ঘদিন থাকুক চায় না। তাছাড়া বর্তমান পরিস্থিতির পেছনে তাদের হাত রয়েছে বলেও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে কথা উঠেছে। বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানাবার ক্ষেত্রে তারাই খোদ অবদান রাখছে কিনা এই অভিযোগও উঠেছে। এই অবস্থায় মতিউর

রহমান গায়ে পড়ে কেনো 'জরুরি অবস্থা' দীর্ঘদিন থাকুক চাইছেন তা যথেষ্ট ভাবনার বিষয়। তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন তাতে রাজনীতি সচেতন কোনো মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

নিউজ উইক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক সুমিত গাঙ্গুলির বরাতে বলছে, বাংলাদেশে নাকি তালেবানি ধরনের মাদ্রাসার বিস্তার ঘটেছে। সেলিগ হ্যারিসন আরো বলছেন, 'সেনাবাহিনীর মধ্যে যারা ইসলামবাদী তারা 'জরুরি অবস্থা'-কে অনির্দিষ্ট কালের জন্য দীর্ঘস্থায়ী করতে চায়'। দেখা যাচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ মতিউর রহমানের অবস্থানের সঙ্গে নিউজ উইকের কথামতো কাল্পনিক 'ইসলামবাদী সেনাবাহিনী'-র পরিকল্পনায় আশ্চর্য মিল আছে। যদি নিউজ উইক প্রথম আলো'র মতিউর রহমানের লেখাটি আগে পেতো তাহলে নিশ্চয়ই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এই আন্তর্জাতিক অপপ্রচারে নামতো না। বড়োই বিচিত্র এই দেশ!

নিউজ উইক আরো বলেছে যে, যদি পুরাপুরি সেনাশাসন আসে তাহলে অধিক সংখ্যায় মানুষ ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতি ত্যাগ করে ইসলামী রাজনীতি করবে। বাংলাদেশের ভেতরেই জঙ্গী ইসলাম শক্তিশালী হবে এবং বাংলাদেশ এখনকার চেয়েও আরো বেশি বিদেশি সন্ত্রাসীদের লালনক্ষেত্র হবে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আলোকে শেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত গাঙ্গুলি বাবুর– আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের যদি জঙ্গী ইসলামপন্থীদের তাড়া দেওয়া হয় তাহলে তারা এসে বাংলাদেশে ঘাঁটি গাড়বে। এটা বেলুন টেপাটিপির মতো ব্যাপার–একদিকে টিপ দিলে অন্যদিকে গিয়ে বাতাস জমা হওয়ার মতো।

আমরা নিউজ উইক, সেলিগ গ্যারিসন ও গাঙ্গুলি বাবুদের যুদ্ধ পরিকল্পনাকে খুবই গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। বাংলাদেশের ১৫ কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা ছিনিমিনি খেলতে পারি না। আফগানিস্তান ও ইরাকে প্রতিদিন কী ঘটছে আমরা দেখছি। হত্যা ও রক্তপাতের বীভৎসতায় আমরা কাতর হয়ে এই দেশের সরলপ্রাণ নিরীহ মানুষগুলোকে রক্ষা করবার জন্য যখন গভীরভাবে ভাবছি, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কথা ভেবে যেখানে আমরা রীতিমতো উদ্বিগ্ন– তখন মতিউর রহমান আমাদের সুপরামর্শই দিয়েছেন বটে! মতিউর রহমান যতো সহজে 'জরুরি অবস্থা'কে দীর্ঘায়িত করে বাংলাদেশকে জঙ্গী ইসলামের ঘাঁটি বানাতে চান– আমরা তা চাই না। এই ক্ষেত্রে বরং আমরা দ্রুত নির্বাচনেরই পক্ষপাতী।

চারদিক সামলে সতর্ক হয়ে চলাই এখনকার কাজ।

২৩ মাঘ ১৪১৩। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭। শ্যামলী।

সংকটের মূল্যায়ন এবং দেশ ও দশের স্বার্থ : এক

'জরুরি অবস্থা' ঘোষণার আগে ও পরে বাংলাদেশের সংকট সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের স্বার্থের জায়গা থেকে আমি লিখে আসছি। আমার কলমের ক্ষুদ্র শক্তিতে আমি চেষ্টা করেছি সমাজে যাঁরা শক্তিশালী ও নীতিনির্ধারক তাঁরা যেন মনে না করেন বাংলাদেশ শুধু ব্যবসায়ী, ধনী ও উচ্চমধ্যবিত্তদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা মুনাফার কাজে ব্যবহারের কাঁচামাল মাত্র এবং তাঁরা চাইলেই পরাশক্তি ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কাছে এই দেশ ভাড়া বা বিক্রি করে দিতে পারেন। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ আফগানিস্তান, ইরাক বা প্যালেস্টাইনের মতো সহিংস যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠুক এটাও আমরা চাইতে পারি না। অথচ এই ধরনের সম্ভাবনা পুরামাত্রায় আছে। জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধের লক্ষ্য থেকে আমরা বাদ আছি এই ধারণা যদি কেউ পোষণ করে থাকেন আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিকতার বৈশিষ্ট্য– বিশেষত অর্থনীতি ও সামরিক শক্তির দিক থেকে চীনের দৃশ্যমান আবির্ভাব এবং চীন-মায়ানমার ও ভারতের মধ্যবর্তী মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান, সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম ইসলাম এবং ইসলামকে বর্বরদের ধর্মজ্ঞান করে পাশ্চত্য সভ্যতার দুশমন হিশাবে গণ্য করা, প্রতিবেশী ভারতের সাত রাজ্যে দীর্ঘদিনের মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের প্রতি ভারতের বৈরী মনোভাব, বিশ্ব অর্থনীতি ও পরাশক্তির নিরাপত্তার কেন্দ্রীয় বিষয় হিশাবে তেল-গ্যাস-কয়লা বা এনার্জির অনিবার্য ভূমিকা, মুনাফার নতুন ক্ষেত্র ও জৈবমারণাস্ত্র (bioweapons) হিশাবে বায়োটেকনলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নামক কৃৎকৌশলের বিকাশ এবং প্রাণবৈচিত্রে সমৃদ্ধ সবুজ বাংলাদেশ তার কাঁচামাল জোগাড় ও পরীক্ষা নিরীক্ষার টার্গেট হয়ে ওঠা– ইত্যাদি নানা কারণে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করবার প্রচেষ্টা চলে আসছে। এই সত্যও আমাদের মনে রাখা দরকার যে বাংলাদেশের জনসংখ্যাও পরাশক্তিগুলো তাদের হুমকি হিশাবে সবসময়ই দেখেছে। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে পনেরো থেকে ত্রিশ বছরের মানুষের সংখ্যা বেশি এটা দীর্ঘদিন পরাশক্তিগুলোর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে আছে। তারা তাদের নীতিনির্ধারণী কাগজপত্রে সবসময়ই বলে আসছে যে এত জনসংখ্যা তাদের বাণিজ্য ও নিরাপত্তা স্বার্থের জন্য হুমকি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বা লোকসংখ্যা কমানোর নীতি তাদের যুদ্ধনীতিরই অংশ হিশাবে তারা

বিবেচনা করে থাকে। একজন মুক্তিযোদ্ধাকে যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করতে যতো খরচ হয় তার চেয়ে অনেক কম খরচে মায়ের পেটেই তার আগমন বন্ধ বা ভ্রূণেই তাকে হত্যা করার খরচ কম। এই সকল বিষয়ে আমি সাধ্যমতো লেখালিখি করার চেষ্টা করি।

আমি কোনো দল করি না, লেখালিখি করেই গরিব, খেটে খাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থের কথা যেভাবে বুঝি সেইভাবেই অন্য সব শ্রেণীর কাছে পৌঁছাবার চেষ্টা করি। সমাজে নানান শ্রেণী আছে এবং তাদের স্বার্থ একরকম তো নয়ই বরং বিপরীত ও সংঘাতসংকুল। এই বাস্তবতাকে আমি অস্বীকার করি না। ফলে এই প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে সমাজের সাধারণ স্বার্থ কোথায় এবং কোন্ শ্রেণী সেই স্বার্থের কথা তার অবস্থানের কারণেই বলছে বা বলতে বাধ্য হচ্ছে সেইদিকেই আমি মনোযোগ রাখার চেষ্টা করি। যাতে আমার কথা ও পথনির্দেশ সংখ্যাগরিষ্ঠের চিন্তা, ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং একটা গণতান্ত্রিক শ্রেণীমৈত্রী গড়ে তুলে আমরা আমাদের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারি এবং চিন্তা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আত্মবিকাশের পথ বাঁধতে পারি।

আমার সৌভাগ্য আমার এই চেষ্টা শ্রদ্ধেয় সাদেক খানের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তিনি আমাকে "তৃণমূল সমাজের ক্ষমতায়নের আদর্শবাদী তাত্ত্বিক" বলে যে বিরল সম্মান দিয়েছেন তাতে আমি কুণ্ঠিত হয়েছি (দেখুন 'অযাচিত বৈদেশিক মুরুব্বিয়ানা সংযত করুন' (*নয়াদিগন্ত,* ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৭)। তবে সাদেক খান আমার লেখালিখির সঙ্গেই পরিচিত, আমার কাজের সঙ্গে ঠিক নন, ফলে তিনি আমাকে 'আদর্শবাদী তাত্ত্বিক' বলেছেন। আমাদের সমাজে কথাটা নিন্দার্থেও ব্যবহার হয়। এই অর্থে যে বাস্তবতার সঙ্গে যাদের যোগ নাই তারাই 'আদর্শবাদী'। আমি 'তাত্ত্বিক' বা তত্ত্বের লোক নই, কাজের লোক। প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন গড়া ও সফলতার সঙ্গে পরিচালনা আমার কাজের গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাছাড়া পানিতে কাদায় রৌদ্রে বৃষ্টিতে বাংলাদেশের কৃষকদের সঙ্গে থেকে একসঙ্গে কাজ করা আমার পেশা এবং নেশা। কাজ করেই আমরা সকলে মিলে দেখিয়েছি সার এবং কীটনাশক ব্যবহার না করেও কীভাবে আমরা বাংলাদেশে কৃষির ফলন বাড়াতে পারি, খাদ্যে সার্বভৌমত্ব ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি এবং বহুজাতিক কোম্পানির শোষণ থেকে কৃষি ও কৃষকদের মুক্ত করে বাংলাদেশের শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি হিশাবে কৃষির গতিশীল রূপান্তর ঘটাতে পারি। পনেরো বছর আগে রাসায়নিক সার ও বিষ সম্পর্কে বাংলাদেশের কৃষক যে গবেষণা ও সমাধান করেছে আজ দেখছি আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ধানগবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো তার চেয়েও পিছিয়ে আছে। তারা এখন সার ব্যবহার কমাবার জন্য রাসায়নিক সারের গুটি ব্যবহার করছে। কৃষক নাকি হাতে রঙের চার্ট নিয়ে নামবে আর পাতার রঙ মিলিয়ে সার ব্যবহার করবে। দারুণ বুদ্ধি!!

যাই হোক আমার কাজের প্রধান লক্ষ্য বাংলাদেশের প্রাণসম্পদের সুরক্ষা ও বিকাশ, কারণ তা না হলে আমরা কেউই প্রাণে বেঁচে থাকতে পারব না। আমার রাজনৈতিক আদর্শ বা নীতির গোড়াও ঐখানেই– প্রাণ। যদি বেঁচে থাকতেই না পারি তো রাজনীতি আর বড়ো বড়ো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দিয়ে কী হবে? বাংলাদেশে একসময় প্রায় পনেরো হাজার জাতের ধান ছিল, আমরা তা হারিয়েছি। নয়াকৃষি আন্দোলনের কৃষক কমপক্ষে দুই হাজারেরও বেশি ধানের জাত কৃষকের মাঠে ও ঘরে সংরক্ষণ করছে এবং সেই সব ধানের জাত চিহ্নিত করেছে যাদের ফলন তথাকথিত আধুনিক জাতের চেয়েও অনেক বেশি। আমার সৌভাগ্য কৃষকরা আমাকে তাঁদের একজন সহকর্মী গণ্য করেন। ধানদূর্বা শস্যসবুজ গাছপালা পশুপাখি জীব-অণুজীব ইত্যাদি প্রাণবৈচিত্র্য ও প্রাণসম্পদ, মিষ্টি পানি এবং সাধারণ মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান যে আমাদের অর্থনীতির শক্তিশালী চালিকাশক্তি হতে পারে এই কথাই কাজ দিয়ে বাস্তবে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এখানে আদর্শ আর বাস্তবতার মধ্যে কোনো ভেদরেখা নাই।

ছোটো একটা বাস্তব নজির দেই। বাংলাদেশ মিষ্টি পানিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী দেশ। আজ এই পানির দাম তেলের চেয়ে বেশি, দুধের চেয়ে মূল্যবান এবং মদের চেয়েও দামি। এটা নিশ্চয়ই তত্ত্ব আর আদর্শের কথা নয়। এটাই সত্য এটাই বাস্তবতা। অথচ এই বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে আমরা শিল্পায়নে ভুল নীতি অনুসরণ ও অর্থনীতির চাবি বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরা ধ্বংস করছি। এই ধরনের অবাস্তব নীতির বিরুদ্ধেই আমি লড়াই-সংগ্রাম, হাটঘাটের বাস্তবতা নিয়েই বাস করি। সেখানে আদর্শ আছে নীতিগত দৃঢ়তায়, সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রতি নির্মোহ ভালবাসায় এবং তাদের পক্ষে দাঁড়াবার সৎসাহসের মধ্যে। তিনি আমাকে 'আদর্শবাদী তাত্ত্বিক' বলেছেন, সেই মুকুটও আমি সানন্দে গ্রহণ করি– কারণ আসলেই আমি পড়াশোনা তত্ত্বচর্চা বা বিশ্লেষণের শক্তিকে খাটো করে দেখি না। চিন্তা ও বিশ্লেষণের শক্তি যেখানে বাস্তবতার হাত ধরাধরি করে একসঙ্গে চলে সেই মাটির জগতেই আমার বিহার। আমি মাটির মানুষ, শহুরে লোক নই। যারা টেলিভিশানে কোম্পানির বিজ্ঞাপন দেখে জীবনযাপন করে– দৈনন্দিনের কেনাকাটা সারে– নিজের জ্ঞানবুদ্ধি নয় অপরের বিজ্ঞাপন দিয়ে যাদের জীবন আপাদমস্তক মোড়া– নিজের জীবনকে কোম্পানির বিজ্ঞাপন মোতাবেক যারা সাজায় আর তাকেই 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' বা 'ব্যক্তির অধিকার' বলে চিৎকার করে বেড়ায়– কসম ভবিষ্যতের, আমি তাঁদের লোক নই।

সাদেক খানের প্রসঙ্গ টানছি এই কারণে যে সম্প্রতি তাঁর কয়েকটি লেখা আমার নজরে এসেছে। তাঁর চিন্তা ও মতকে আমি সম্মান করি। কিন্তু একমত হতে পারিনি। একমত হতে হবে এমন কোনো কথা নাই এবং একমত নই বলে তাঁর মতের গুরুত্ব আমার কাছে কমে না। কিন্তু নিজের মত প্রকাশ করতে গিয়ে

এই লেখাগুলোয় তিনি আমার লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি সজ্জন। ফলে মুখফুটে না বললেও পাঠককে ঠিকই বুঝিয়ে দিয়েছেন– বর্তমান জরুরি অবস্থা সম্পর্কে আমাদের দুজনের চিন্তা ও অবস্থানের মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে।

এই অমিল বা বিরোধিতার জায়গায় বাংলাদেশের ও বাংলাদেশের জনগণের ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে বলে আমি এই লেখাটি লিখতে তাগিদ বোধ করেছি। আমার ধারণা আমার কথাগুলো তিনি গুরুত্বের সঙ্গে নেবেন। আমাদের চিন্তার মিল ও অমিলগুলো পরিচ্ছন্নভাবে হাজির করে পাঠককে বিচার করতে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। যতো পরিচ্ছন্নভাবে আমরা হাজির করতে পারবো ততোই বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণের কর্তব্য সম্পর্কে জনগণ সচেতন ও সজ্ঞান হয়ে উঠবে। শুধু পার্থক্য হাজির করবার জন্য নয়, ঐক্যের জায়গাগুলো নির্দিষ্ট করবার তাগিদে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করবার চেষ্টা করবো, যে বিষয়ে অন্যেরাও লেখালিখি করতে পারেন। আমার আশা এই সকল বিষয়ে শ্রদ্ধেয় সাদেক খান তাঁর চিন্তাও হাজির করবেন এবং আমরা চেষ্টা করবো যাতে বাংলাদেশের ও বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে একটা জায়গায় দুইজনে আরো অনেককে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়াতে পারি। একটা অভিন্ন অবস্থান পরিচ্ছন্ন করতে পারি। পাঠকের সুবিধার জন্য আমি সাদেক খানের দুটো লেখার সূত্র ধরেই কথা বলবো কিন্তু তাঁর সামগ্রিক চিন্তা সম্পর্কে তাঁর অন্যান্য লেখা থেকে আমার ধারণা মনে রেখে। এই দুটো লেখা হলো, (১) 'অযাচিত বৈদেশিক মুরুব্বিয়ানা সংযত করুন' (*নয়াদিগন্ত* ৭ নভেম্বর ২০০৭) এবং 'জাতিরাষ্ট্র কারো মর্জিনির্ভর নয়' (*আমার দেশ,* ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭)। আমার যে লেখাগুলোর প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন সেগুলো হচ্ছে (১) 'প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে শীত কমেনি' (*নয়াদিগন্ত* ২৩ জানুয়ারি ২০০৭), (২) 'মেরেছো কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেবো না' (*নয়াদিগন্ত,* ৩০ জানুয়ারি ২০০৭), (৩)' কেউ কেউ এতো 'খুশি' কেনো? (*নয়াদিগন্ত,* ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭) 'বেলুন টেপাটিপি' (*নয়াদিগন্ত,* ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৭)। আগেই বলেছি আমার চেষ্টা হবে আমাদের চিন্তার পার্থক্য ও ঐক্যের জায়গাগুলো চিহ্নিত করা এবং যে সকল বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই বিষয় হিশাবে সেগুলো শনাক্ত করা। আজ শুধু একটি বিষয় নিয়ে বলবো সেটা হলো, 'জরুরি অবস্থা' কেনো?

সাদেক খান 'জরুরি অবস্থা' সম্পর্কে লিখছেন : "অথচ জরুরি অবস্থা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সংকট মুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশের একান্ত নিজস্ব প্রক্রিয়ায় এই বলিষ্ঠ উদ্যোগকেও জাতিসংঘের মাধ্যমে এবং দূতাবাসগুলোর তৎপরতায় সৃষ্টি বৈদেশিক কূটনৈতিক চাপের ফসল বলে জোরালো প্রচারে রত রয়েছে দিল্লিভিত্তিক বৈদেশিক সংবাদদাতাদের একটি গোষ্ঠী'। সাদেক খান 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণার পেছনে বৈদেশিক কূটনৈতিক চাপ অস্বীকার করছেন। বলছেন দিল্লিভিত্তিক বৈদেশিক সংবাদদাতাদের একটি গোষ্ঠী এটা 'প্রচার' করছে। অতএব এটা

নিছকই প্রচার। বাস্তব কোনো সত্য নয়। দিল্লির বাইরে *দি ইকনমিস্ট* পত্রিকা সরাসরি একে সামরিক অভ্যুত্থানই বলেছে যে অভ্যুত্থানের নাম তার কর্তারা নিজের মুখে নিতে পারছে না। তিনি সেই বিষয়ে কিছু বললেন না। আমরা তথ্য দিয়ে আমাদের কথা বলেছি। তিনি আমাদে তথ্য অপ্রমাণ করে নতুন কোনো তথ্য-প্রমাণ দেন নি। ফলে তথ্যের দিক থেকে আমাদের কথাই আমরা এখনো ছহি ধরে নেব।"

শ্রদ্ধেয় সাদেক খান দাবি করেছেন 'জরুরি অবস্থা' হচ্ছে 'বাংলাদেশের একান্ত নিজস্ব প্রক্রিয়া'। যদি তাই হয় তাহলে তিনি 'অযাচিত বৈদেশিক মুরুব্বিয়ানা' (তাঁর লেখার মূল শিরোনাম) নিয়ে এতো উৎকণ্ঠিত কেনো? 'জরুরি অবস্থা' জারির ক্ষেত্রে কি কোনো অযাচিত বিদেশি মুরুব্বিয়ানা ছিল না? সেটা কি জরুরি অবস্থা জারির আগে আর পরেই শুধু ছিল আর কোনো এক দৈববলে মাঝখানে ছিল বাংলাদেশের 'একান্ত নিজস্ব প্রক্রিয়ার বলিষ্ঠ উদ্যোগ'! এটা কী করে সম্ভব? বাংলাদেশ তো দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপে বাস করে না। কোনো গণঅভ্যুত্থান বা গণআন্দোলনের ফলে নয়, একদমই ওপর থেকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বাইরে ক্ষমতার পট পরিবর্তনের এই অরাজনৈতিক বলিষ্ঠ উদ্যোগ সম্পর্কে আমরা সাধারণ মানুষ কিছুই জানি না। তাহলে সাদেক খানের দায়িত্ব হচ্ছে এই মহৎ উদ্যোগ সম্পর্কে আমাদের জানানো।

তিনি 'দিল্লিভিত্তিক সংবাদ দাতাদের একটি গোষ্ঠী'র জোরালো প্রচারে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা কারা? আমি সুনির্দিষ্টভাবে যাঁদের নাম উল্লেখ করেছি তার মধ্যে সোমিনী সেনগুপ্তের খবর আছে। আমি তা বিশ্লেষণ করেছি এবং আমার মত দিয়েছি। পাঠক তা বিচার করবেন। আমি নিজে খবরাখবর নিয়ে ও বাংলাদেশের খবরাখবরের সঙ্গে মিলিয়ে সেই খবর সত্য বলেই জেনেছি। আমার ভুল হতে পারে। যদি সেই খবর মিথ্যা হয় তাহলে সাদেক খান আমাদের নতুন তথ্য দিয়ে আমার ভুল শুধরিয়ে দেবেন এটাই আমার আশা। কিন্তু আমি অবাক হয়েছি তিনি নিউ ইয়র্ক টাইমসের দিল্লি ব্যুরোর প্রধান সোমিনী সেনগুপ্তের কথা নিয়ে অনেক কথা বললেন কিন্তু আমার লেখার মূল কেন্দ্রবিন্দু *দি ইকনমিস্ট* পত্রিকার 'জরুরি অবস্থা'র বিশ্লেষণ এবং উস্কানিমূলক ছবি–সে সম্পর্কে কিছুই বললেন না। মার্কিন-ইহুদিবাদী-হিন্দুত্ববাদী শক্তির শক্তিশালী মুখপাত্র *দি ইকনমিস্ট*। তাঁর নজরে শুধু দিল্লি কেনো? মার্কিন ইহুদিবাদী শক্তিকে কি তিনি বাংলাদেশের জনগণের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক মনে করেন না?

আমার বিশ্লেষণের উপসংহার হচ্ছে কতিপয় পরাশক্তি ও জাতিসংঘ আমাদের একটা শাঁখের করাতে ঢুকিয়েছে। আমাদের তারা বলেছে, যদি আমাদের সেনাবাহিনী ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে সহযোগিতা করে তাহলে শান্তিমিশনে সেনাবাহিনীর আয়-উপার্জনের সুযোগ সংকটাপন্ন হবে। অথচ এই সহযোগিতা সেনাবাহিনীর সাংবিধানিক দায়িত্বের অংশ, যে-সংবিধান রক্ষা করবার জন্য

সেনাবাহিনী শপথ নিয়েছে। অন্যদিকে সেনাবাহিনী যদি দেশের সংকট মুহূর্তে নিজেদের হাতেই দেশ শাসনের ভার তুলে নেয় তাহলে শান্তিমিশনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের সুযোগ তারা হারাবে। তার মানে সেনাবাহিনী ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে সহযোগিতা করতে পারছে না আবার সরাসরি সামরিক শাসনও জারি করতে পারছে না। এই শাঁখের করাত অবস্থায় সেনাবাহিনীকে মেনে নিতে হচ্ছে এমন একটি সরকার যাদের সঙ্গে জনগণের কোনো সংযোগ নাই। এই সরকারকে কখনও 'তত্ত্বাবধায়ক' আবার কখনো বা 'অন্তর্বর্তী' সরকার বলা হচ্ছে কারণ সাংবিধানিক বিধিবদ্ধতার মধ্যে তাদের কোনো পরিচিতি খাড়া করা যাচ্ছে না। কর্মসূত্রে ও চিন্তাচেতনায় তাঁরা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা, বহুজাতিক কোম্পানি, এডভারটাইজিং কোম্পানি, 'এইডস' নামক ব্যাধি নিবারণের দোহাই দিয়ে মানুষের পারিবারিক জীবন ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের মার্কিন নীতি– ইত্যাদির সঙ্গেই সম্পৃক্ত। একজন কি দুইজন ব্যতিক্রম থাকতে পারেন। কিন্তু সমষ্টির চরিত্র তো পরিষ্কার।

তাহলে যেখানে খোদ জনগণই অনুপস্থিত এবং সেনাবাহিনী শাঁখের করাতে এদিকেও নয় ওদিকেও নয় সেখানে এটা বাংলাদেশের 'একান্ত নিজস্ব প্রক্রিয়ার বলিষ্ঠ উদ্যোগ' হয় কীভাবে? সাদেক খানের কাছে এটাই আমার প্রশ্ন।

এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এখনকার কর্তব্য হিশাবে আমাদের প্রতিরক্ষার অবলম্বন সেনাবাহিনীকে রক্ষা করাই দেশপ্রেমিক কর্তব্য বলে মনে করেছি। সাদেক খান কী চাইছেন বুঝতে পারিনি। আমরা আমাদের দেশ, জনগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের ঘাড়ে এসে পড়া মহাবিপদ সম্পর্কে সচেতন এবং সাধারণ জনগণের পক্ষে থাকার কথাই সেনাবাহিনীকে বলেছি এবং বলে যাবো। আমার সিদ্ধান্ত আমি পরিষ্কারভাবেই বলেছি: "সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ও দেশপ্রেমিক সৈনিকদের মৈত্রী ছাড়া বাইরের বিপদ থেকে আমরা বাংলাদেশকে রক্ষা করতে পারবো না।"।

এই মৈত্রীর আলোকেই বর্তমান সরকারের ক্ষমতারোহণের প্রক্রিয়া, নীতি ও কর্মকাণ্ডের দায়ভার সেনাবাহিনী কতোটুকু শাঁখের করাতে পড়ে মেনে নেবে, কতোটুকু নেবে না সেই সিদ্ধান্ত সেনাবাহিনীকেই নিতে হবে। সেনাবাহিনী যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন না হয়, এই প্রতিষ্ঠানটিকে যেন আমরা বিপদের মুখে না ফেলি সেই কারণেই বর্তমান সরকারের কর্মকাণ্ড ও নীতির দায়ভারের সঙ্গে সেনাবাহিনীকে জড়ানো হবে বিপজ্জনক পথ। কিন্তু আমার মনে হয়েছে সাদেক খান এই দিকটা খেয়ালে রাখছেন না, ভেদ করছেন না, সরকার ও সেনাবাহিনী সমার্থক গণ্য করছেন। কারণ কার কথা ভেবে তিনি 'বলিষ্ঠ উদ্যোগ' বলেছেন আমি বুঝতে পারিনি। নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রপতি 'জরুরি অবস্থা' সাংবিধানিকভাবে ঘোষণা করতেই পারেন। কিন্তু এই দায়দায়িত্ব একান্তই রাষ্ট্রপতির– এখানে সেনাবাহিনীকে আমরা যেন

টেনে না নিয়ে আসি। এই জন্যই আমি বলেছি, একটি ঘটনা যখন ঘটে গিয়েছে আমরা নাগরিকরা তা মানতে বাধ্য। কিন্তু তার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। আমরা যেমন অতিশয় 'খুশি' বা 'উল্লসিত' হবো না– আবার তাকে 'বাংলাদেশের একান্ত নিজস্ব প্রক্রিয়ার বলিষ্ঠ উদ্যোগ'– ও বলবো না। কী অবস্থায় সেনাবাহিনী এই সরকারকে সমর্থন দিতে বাধ্য হয়েছে তা যদি জানি তাহলে ক্ষমতারোহণ প্রক্রিয়ায় যদি কোনো অসাংবিধানিকতার দায়দায়িত্ব কারো থাকে তবে তা সেনাবাহিনী নেবে না– এটা পরিষ্কার থাকা উচিত। এই প্রক্রিয়া ও পরিস্থিতির ফল যদি শুভ না হয় তার দায়দায়িত্ব পরাশক্তি ও জাতিসংঘকেই নিতে হবে। একটি 'স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের নাগরিকের অহংকার' থাকা চাই আমাদের। সেনাবাহিনী সরাসরি ক্ষমতায় নাই, দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়নি, অথচ সেনাবাহিনীর সমর্থন ছাড়া এই সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারে না, এতোটুকুই আমরা আপাতত মেনে নেবো। কিন্তু ক্ষমতার এই হঠাৎ বদলের প্রক্রিয়া এবং সরকারের নীতি ও কর্মকাণ্ড থেকে সেনাবাহিনীকে আলাদা রাখাই আমাদের কাজ–'বাংলাদেশের একান্ত নিজস্ব প্রক্রিয়ার বলিষ্ঠ উদ্যোগ' বলে আমরা সেনাবাহিনীরই জন্য অযথা বিপদ কেনো টেনে আনছি?

কিন্তু সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জানিয়ে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে। তাহলে তাঁর 'তত্ত্বাবধায়কের' দায়িত্বের মধ্যেই তাঁদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ রাখলে এটা সকল পক্ষের জন্যই মঙ্গলজনক হবে। কিন্তু তাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ করছেন যার সঙ্গে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ ও প্রতিরক্ষার প্রশ্ন জড়িত। শুধু তেল-গ্যাস-কয়লা ও অবাধ কর্পোরেট বাজার বিস্তারের নীতির কথাই বলছি না। চট্টগ্রাম বন্দরের প্রশ্ন তো প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত।

গভীর সমুদ্রে নতুন বন্দর বা বর্তমান চট্টগ্রাম বন্দরের প্রশ্ন নিছকই দক্ষ ও কর্মমুখর বন্দর গড়ে তোলার ব্যাপার বা সাফকে সাফ আমদানি–রপ্তানি কেচ্ছাও নয় যা আমাদের শোনানো হচ্ছে। এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছে চীন এবং ভারত-মার্কিন-ইসরায়েলের নিরাপত্তা প্রতিযোগিতা। অতএব আমাদের নিজেদের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রশ্ন। এই বিষয়ে সাদেক খানের চিন্তাভাবনা শোনার ইচ্ছাও আছে আমার। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বলয় ও পরাশক্তির প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাস্তবতার অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা করেই আমাদের নীতি নির্ধারণ করতে হবে। সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় রাজনৈতিক বিবেচনা এবং একমাত্র নির্বাচিত সরকারেরই পক্ষেই এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি। আমরা মেনে নিয়েছি এখনকার রাজনৈতিক বাস্তবতায় একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সরকারের আবির্ভাব সম্ভব নয়। যদি তাই হয় তাহলে বর্তমান সরকারকে কেবল সেই সব দিকেই মনোযোগ দেওয়া উচিত

যেসকল দিক গণতান্ত্রিকতার পথে বাধা। সম্পদ ও সুরক্ষার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নীতির জন্য অবশ্যই জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। অরাজনৈতিক সরকার এই সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিলে বাংলাদেশের জনমত বিভক্ত হবে এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ ত্বরান্বিত হবে। বর্তমান বাস্তবতায় সেটা হবে বাংলাদেশকে কঠিন বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়ারই নামান্তর।

৩০ মাঘ, ১৪১৩। ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭, শ্যামলী।

সংকটের মূল্যায়ন ও দেশ ও দশের স্বার্থ : দুই

ইকনমিস্ট পত্রিকার 'জরুরি অবস্থার' বিশ্লেষণ ও উস্কানিমূলক ছবি সম্পর্কে সাদেক খান কিছুই বলেননি বলতে আমি বুঝিয়েছি তিনি দিল্লিভিত্তিক সংবাদদাতাদের একটি গোষ্ঠীর জোর প্রচারের নিন্দা করলেন, কিন্তু ইকনমিস্ট পত্রিকার বিশ্লেষণ ও উস্কানি সম্পর্কে বললেন, 'সেনাবাহিনী যথার্থ অবস্থানই নিয়েছে'। ইকনমিস্টের বিশ্লেষণ, সেনাবাহিনী একটি অভ্যুত্থান করেছে অথচ তারা যে অভ্যুত্থান করেছে সেই কথা মুখে বলছে না–এটা কি তাহলে ঠিক কাজ হয়েছে? তিনি বললেন না ইকনমিস্ট মিথ্যা বলছে বা অপপ্রচার করছে। কিন্তু যুক্তি দিলেন, মহাজোটকে সমমনা সাব্যস্ত করে উদারনৈতিক গণতন্ত্রবাদী বৈদেশিক শক্তিজোট এদেশের সংসদীয় নির্বাচনে 'সবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমতল ক্ষেত্র' তৈরির সহায়তার অজুহাতে মহাজোটের সংঘশক্তি প্রয়োগকৌশল তথা অবরোধপন্থার পক্ষে তদবির করে চলেছিল। মহাজোটের বয়কটের ফলে যে একপেশে নির্বাচন অনুষ্ঠান সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় সম্পন্ন হতে চলেছিল তাকে বানচাল করলে মহাজোটের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যদি বৈদেশিক শক্তিজোট ২২ জানুয়ারির বাতিলকৃত নির্বাচনকে আগেই অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করে থাকে, সেনাবাহিনীকে দূরে রাখার জন্য চাপ প্রয়োগ করে থাকে, জাতিসংঘের নীতিবহির্ভূতভাবে বৈদেশিক শান্তিরক্ষার চাকরির কথা তুলে আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার কর্তব্য থেকে বিরত থাকতে বলে থাকে, তবে সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। জাতিরাষ্ট্রের অনুগত কর্তব্যনিষ্ঠ সেনাবাহিনী জরুরি অবস্থা জারির পরামর্শ দিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানকে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই সংকট মোচনের বিকল্প পথে অগ্রসর থেকে পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনের অঙ্গীকার করেছে।

বেশ জটিল বিশ্লেষণ! আমরা খানিক বোঝার চেষ্টা করি। (১) 'উদারনৈতিক গণতন্ত্রবাদী বৈদেশিক শক্তিজোট' মহাজোটকে সমমনা সাব্যস্ত করেছে; (২)

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট হরতাল, ধর্মঘট, সন্ত্রাস, সহিংসতা- বিশেষত অবরোধ কর্মসূচির যে পথ ও পদ্ধতি প্রয়োগ করছিল; উদারনৈতিক গণতন্ত্রবাদী শক্তিজোট তাদের পক্ষেই তদবির করে চলছিল। কীভাবে? কারণ তারা দুই পক্ষের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের কথা বলছিল- তার মানে মহাজোট ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোটের তুলনায় ছিল দুর্বল ও অসম অবস্থায়, তাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী চারদলীয় জোটের সমান করার কথা বলছিল তারা (৩) বৈদেশিক জোট ২২ জানুয়ারি তারিখের বাতিল হয়ে যাওয়া নির্বাচনকে আগেই অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করেছে, অতএব এই নির্বাচন আর হতে দেওয়া যায় না (৪) বৈদেশিক শক্তিজোট সেনাবাহিনীকে জাতিসংঘের চাকুরির কথা বলে আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার কর্তব্য থেকে দূরে থাকতে বলে (৫) এই পরিস্থিতিতে 'জাতিরাষ্ট্রের অনুগত সেনবাহিনীই রাষ্ট্রপ্রধানকে জরুরি অবস্থা জারির পরামর্শ দেয় এবং পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনের অঙ্গীকার প্রদান করে (৬) জরুরি অবস্থা জারির মধ্য দিয়ে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকে। (৭) অতএব সেনাবাহিনী রাষ্ট্রপ্রধানকে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরামর্শ দিয়ে যথার্থ কাজই করেছে।

প্রতিটি অনুমান দিয়ে আমরা তর্ক করবো না। একটি কথা আগে বলে রাখি- আফগানিস্তান, ইরাক ও প্যালেস্টাইনের ঘটনাবলী আমরা কমবেশি জানি, চোখের সামনে নির্বিচার বীভৎস যুদ্ধ ও হত্যাযজ্ঞ দিনের পর দিন দেখে যাচ্ছি, আমরা বিচারের প্রহসন করে সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা টেলিভিশানে প্রত্যক্ষ করেছি, আমরা দেখছি কীভাবে ইরানের ওপর পারমাণবিক আক্রমণের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউনাইটেড কিংডম, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া কিম্বা প্রতিবেশী ভারত নিয়ে গঠিত 'শক্তিজোট'কে 'উদারনৈতিক গণতন্ত্রবাদী বৈদেশিক শক্তিজোট' বলছি কোন মানদণ্ডে? 'শক্তিজোট' হিশাবে তারা সভ্যতা, নীতিনৈতিকতা বা গণতন্ত্রের খোদ দুশমন নয় কি? তবে যদি আমরা এইসব দেশের যুদ্ধবিরোধী, গণতন্ত্র ও বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাসী জনগণের কথা বলি তাহলে তা ভিন্ন কথা। যদি এই শক্তিজোটকে আমরা 'উদারনৈতিক গণতন্ত্রবাদী' বলে ধরে নিয়ে থাকি তাহলে এই দেশ ও দেশের মানুষকে রক্ষা করবার নীতি ও কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা মারাত্মক ভুল করবো। সারা দুনিয়ার- সেটা ভারতেরই হোক কিম্বা হোক ইউরোপ, ইংলন্ড, উত্তর আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়া- যাঁরাই ইনসাফ, গণতন্ত্র, নীতিনৈতিকতা, বিশ্বশান্তি ও সমষ্টির সমৃদ্ধির পক্ষে তাঁরা প্রত্যেকেই আমাদের মিত্র- তাঁদের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক বন্ধন দৃঢ় করতে হবে- আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মৈত্রী চর্চা করেই দাঁড়াতে হবে সকলের দুশমন এই শক্তিজোটের বিরুদ্ধে। এটাই আমাদের মর্যাদা ও আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার পথ। যাদের বিরুদ্ধে লড়াই তাদেরকেই যদি আমরা 'উদারনৈতিক', 'গণতন্ত্রবাদী' ইত্যাদি উপাধি দিতে থাকি তাহলে জনগণ কি বিভ্রান্ত হবে না?

একটা প্রশ্ন উহ্য থেকে গিয়েছে, যায় বা যাচ্ছে। মহাজোট কি বলেনি যে চারদলীয় জোটকে "যে কোনো মূল্যে" নির্বাচন করতে তারা দেবে না? তাহলে 'জাতিরাষ্ট্রের অনুগত সেনাবাহিনী রাষ্ট্রপ্রধানকে জরুরি অবস্থা জারির পরামর্শ দেওয়া' এবং 'পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনের অঙ্গীকার প্রদান করে ২২ তারিখের নির্বাচন ভণ্ডুল করে দেওয়া মহাজোটের 'যে কোনো মূল্যে নির্বাচন' করতে না দেওয়ার সমার্থক হয়ে যাচ্ছে বলেই আমার মনে হয়। বরং ঘটনাঘটনে জনগণের মনে যদি কোনো সংশয় তৈরি হয় তবে তা তথ্য ও ব্যাখ্যায় কাটিয়ে তোলাই তো দরকার। সাদেক খান তা করেননি।

তাছাড়া ঘটনাটি এগারো তারিখে ঘটলো কেন? কেন ১৩ তারিখে কিম্বা পনেরো তারিখে নয়? তার মানে যে 'অবরোধপন্থা'র কথা সাদেক খান বলছেন সেই পন্থা কতোদূর কার্যকর হয় তা ১৪ তারিখে দেখে নেওয়া যেত। চৌদ্দ তারিখে মহাজোটের ঘোষিত কর্মসূচিতে তাদের দলীয় সমর্থক ছাড়া সাধারণ মানুষের সমর্থন ছিল কিনা জনগণ তা নিজেই বিচার করে নিত। যদি সত্যিই দাঙ্গ-হাঙ্গামার পরিস্থিতি তৈরি হতো সেই অবস্থায় জরুরি অবস্থা জারির ন্যায্যতা আমরা আরো ভালো হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম। মহাজোট যদি তাদের পক্ষে জনমত তৈরি করতে ব্যর্থ হতো তাহলে যে 'জাতিরাষ্ট্র' নিয়ে সাদেক খান উদ্বিগ্ন, তার গায়ে কোনো আঁচড় লাগত কিনা সন্দেহ। অন্যদিকে জনগণ একপেশে নির্বাচনে আদৌ অংশগ্রহণ করে কিনা, কতো ভাগ করে, নাকি সেই নির্বাচন সম্পূর্ণ পরিহার করে– বৈদেশিক শক্তিজোট বা জাতিসংঘ কী চায় না-চায় তারও আগে– জনগণের মনের কথা বুঝে নিলে সঠিক সময়ে গণমানুষের ইচ্ছাশক্তির ওপর দাঁড়ানো যেত।

আমরা দুর্নীতির কথা শুনছি। যে সকল লক্ষ লক্ষ টন পচা খাদ্যদ্রব্য ও ভোগ্যপণ্য উদ্ধার হলো তাদের হদিস কী? কই আমরা তো তাদের কোনো উন্মুক্ত জায়গায় জ্বালিয়ে দিতে বা নষ্ট করতে দেখলাম না? তারা কি আবার আমাদের খাদ্যচক্রে ফিরে আসবে? আসবে না যে তার গ্যারান্টি কী? আমরা দেখতে চাই সকলের সামনে এইসব বিষাক্ত দ্রব্য জ্বালিয়ে দেওয়া ও নষ্ট করে দেওয়া হলো। সাধারণ মানুষ এইসব কথা তুলছে। এর দায়ভাগ কি শেষাবধি সেনাবাহিনীর ওপর পড়বে না?

ইতিমধ্যে ১১ জানুয়ারি বিভিন্ন খবর কাগজে আমরা পাবনার শালগাড়িয়ায় স্কয়ার কনজুমার কারখানার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের খবর দেখেছি। এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যে উপদেষ্টার সম্পর্ক তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন– 'বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ মন্ত্রণালয়'। তাঁর কারবার আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি দাহ্য পদার্থ নিয়ে, যার ব্যবহার হেরফেরে একটি দেশও পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে। যখন ভোগ্যপণ্যের ভেজালবিরোধী অভিযান চলছে তখন তাঁর অন্য কোনো কারখানায় শর্টসার্কিট হলো না, কিন্তু পাবনায় ঠিক ভোগ্যপণ্যের

কারখানায় আগুন লেগে সব ভস্মীভূত হলো। হয়তো খবরটি সঠিক, হয়তো নয়। কিন্তু আমরা লক্ষ করলাম গণমাধ্যমগুলো এই বিষয়ে আর কোনো খবর ছাপলো না। এটা কি জরুরি অবস্থা বিধিমালা ২০০৭-এর প্রয়োগ? আমরা জানি না। বিশেষত তিনি যখন ভারতের সঙ্গে তেল ও বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি করছেন তখন এই ধরনের ঘটনা যেন জনমনে সন্দেহ তৈরি করতে না পারে তার জন্য স্বচ্ছ থাকা দরকার। অস্বচ্ছতার দায়দায়িত্বও সেনাবাহিনীর ওপর যেন না বর্তায়, তার জন্য অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্তের দরকার।

বর্তমান সরকারকে সহযোগিতা করার একটা নজির আমরা দেখেছি দেশের 'বিশিষ্ট নাগরিক'দের সঙ্গে সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদসহ সশস্ত্র বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের (দেখুন *সমকাল* ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭)। 'বিশিষ্ট' নাগরিক হিশাবে যাঁদের ওখানে দেখেছি তাঁদের মধ্যে এমন সব মানুষ ছিলেন যাঁরা বছরের পর বছর সেনাবাহিনীর বাজেট কমানোর জন্য তীব্র ওকালতি করেছেন। এদের বিরুদ্ধে আমাদের কলম ধরতে হয়েছে। এমনকি আদৌ বাংলাদেশের সেনাবাহিনী থাকার যৌক্তিকতা আছে কিনা সেই সন্দেহও তাঁরা তুলেছেন। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী কোনোভাবেই লড়ে যে দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখতে অক্ষম এই ধরনের যুক্তিও তাঁরা তুলে ধরেছেন। ভারতই আমাদের প্রতিরক্ষা করবে, অতএব ভারতীয় প্রতিরক্ষা বলয়ের মধ্যে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার কথাই তাঁরা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে আসছেন। অনেকে সরাসরি সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করার পক্ষেও অবস্থান নিয়েছেন। সেই অবস্থান তাঁদের এখনও আছে। সেখানে একজন বীজ কোম্পানি ব্যবসায়ীও ছিলেন, যিনি বাংলাদেশের বীজ ও প্রাণসম্পদ বিদেশে পাচার ও বাংলাদেশের কৃষি ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর জিএমও বা 'বিকৃত' বীজ আনবার জন্য বদ্ধপরিকর। হয়তো গোপনে আনছেনও। এর ফল বাংলাদেশের প্রাণ ও প্রাণবৈচিত্র্যের জন্য মারাত্মক। বায়োটেকনলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং যে একই সঙ্গে যুদ্ধাস্ত্র ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অংশ এই কথা আমি এর আগে বলেছি, পরাশক্তিগুলো যার পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এই ধরনের ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশের কয়েকজন মুখচেনা বিজ্ঞানীর ওপর নির্ভরশীল। বিশিষ্ট নাগরিকদের সেই সভায় আমরা শ্রদ্ধেয় সাদেক খানকেও দেখেছি।

এই ধরনের পরামর্শ সভা বিশেষত এই 'জরুরি' অবস্থায়, সেনাবাহিনী কাদের তাদের কাছের মানুষ মনে করে তার রাজনৈতিক অর্থ আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ কি ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করতে পারে? এর পরপরই আমরা দেখলাম যে পত্রিকায় মতিউর রহমান "বিলম্বিত নির্বাচন" যেন 'দেশি–বিদেশি সকল পক্ষ মেনে নেয় তার জন্য আকুতি জানাচ্ছেন। মতিউর রহমান চাইছেন নির্বাচন দেরিতে হোক। "জরুরি অবস্থা" দীর্ঘায়িত হোক এবং যা চলছে তার মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে একটা "গুণগত" পরিবর্তন আসুক। তারপর হবে নির্বাচন।

(দেখুন "নির্বাচনের জন্য সময় দিতে হবে", *প্রথম আলো,* ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭)

"জরুরি অবস্থা" জারি করে বা অরাজনৈতিক কায়দায় "রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন" ঘটানো যায় এই ধরনের আজগুবি ও অবাস্তব চিন্তা করছেন মতিউর রহমান। হয়তো তাদের পরামর্শেই সেনাবাহিনীকে মহাবিপদের দিকে *ঠেলে* দেওয়া হচ্ছে। সাদেক খানের কাছে অন্তত আমি আশা করেছিলাম তিনি ভিন্ন অবস্থান নেবেন। কিন্তু তিনি বলছেন, মতিউর রহমানের "ওই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমার দ্বিমত নাই।" বলাবাহুল্য এখানে আমি ও সাদেক খান সম্পূর্ণ দুই মেরুতে অবস্থান করছি। মতিউর রহমান এবং সাদেক খানের চিন্তার ঐক্যও আমাকে চিন্তিত করে তুলেছে। একে আমি বিপদসংকেত হিশাবেই গণ্য করছি।

'জরুরি অবস্থায়' ও জরুরি অবস্থার বিধানাবলী ২০০৭ মোতাবেক গণমাধ্যমের 'স্বাধীনতা' থাকবে, কিন্তু গরিব মানুষদের স্বাধীনতা থাকবে না– এই স্ববিরোধিতা দেখিয়ে জরুরি ব্যবস্থা বলতে যে এটাই বোঝায় আমি তা ব্যাখ্যা করেছি। বলেছি সমাজের স্বল্প কিছু ওপরতলার অভিজাত শ্রেণীর 'স্বাধীনতা' জরুরি অবস্থার অধীনেও বহাল থাকে কিন্তু অন্য নাগরিকদের থাকে না, কারণ তারা গরিব।

সাদেক খান বলেছেন, জরুরি অবস্থার মানে সেটা নয়। কেন? কারণ প্রশাসনিকভাবে 'নালিশ' আমলে নেয়ার কিছু প্রাথমিক ব্যবস্থা হয়েছে। সেটা কী? যাদের দুর্নীতিবাজ বলে ধরা হয়েছে তাদের আবার কোর্টে হাজির করা? আদালতে তাদের 'স্বাধীনতা' রক্ষার ব্যবস্থা? তার মানে দুর্নীতিবাজদের জন্য 'জরুরি অবস্থা'র মধ্যেও আদালত আছে, তাদের 'নালিশ' শুনবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু যে গরিব মানুষগুলোর ঘর ভেঙে দেওয়া হলো, যেসব হকারদের রাস্তা থেকে উৎখাত করা হলো তাদের 'নালিশ' জানাবার ব্যবস্থা কোথায়? তাছাড়া 'নালিশ' জানাবার কী ক্ষমতা আছে তাদের?

গরিব মানুষ যদি কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর ঘরবাড়ি বানায় বা অন্যের সম্পত্তির অধিকারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাহলে তা অবশ্যই "অবৈধ"। কিন্তু যদি তারা সরকারি জমির ওপর ঘর তোলে তাহলে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের নীতি ও বিধানাবলী মতে তা "অবৈধ" কি? আসুন আমরা সেই তর্ক করি। সরকার বা রাষ্ট্র যদি জনগণের বাসস্থান নিশ্চিত করতে না পারে তাহলে তার অপরাধ কি সরকার ও রাষ্ট্রের নয়? যে সরকার বা রাষ্ট্র নিষ্ঠুরভাবে গরিব মানুষের ঘর ভেঙে দেয় সেই সরকার বা রাষ্ট্র তার নৈতিক বৈধতাও হারায়।

কিন্তু জরুরি অবস্থায় অভিজাত শ্রেণীর 'স্বাধীনতা'র আরেক নমুনা আমরা দেখছি। রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতি করতে পারবে না। কিন্তু ড. ইউনূস রাজনীতি করতে পারবেন। তিনি রাজনৈতিক দল করবার জন্য চিঠি দিচ্ছেন, জনমত সংগ্রহ করছেন, রাজনীতি করবেন সেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এবং রাজনৈতিক বক্তব্য গণমাধ্যমে দিচ্ছেন। গণমাধ্যমে তা ফলাও করে প্রচারিত

হচ্ছে। তার মানে ড. ইউনূস রাজনীতি করতে পারবেন কিন্তু শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া পারবেন না। এইতো কথা? এখানে জরুরি অবস্থায় 'স্বাধীনতা'র আরেক রূপ আমরা দেখছি। ড. ইউনূস কি একাই রাজনীতি করবেন? অন্য কোনো দল ছাড়া ফাঁকা মাঠেই তিনি গোল দেবেন। তাঁর দল করার পক্ষে জনগণ আছে কি নাই সেই জরিপ করার জন্য তিনি খুবই ভালো সময় বেছে নিয়েছেন। কারণ রাস্তায় মিটিং-মিছিল করে তার বিরুদ্ধে নিজের মত জানানোর গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে আমরা বলতেই পারি জনগণ আমাকে চায়, আমি অতএব...

এইসব কেচ্ছা আমরা এর আগেও শুনেছি। এখন নোবেল শান্তি বিজয়ীর কাছে শুনতে হচ্ছে– এটাই পার্থক্য।

আজ মনে ভারী দুঃখ ও অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে দৈনিক সমকালে পড়লাম (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭) যে নয়া নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার (অব.) সাখাওয়াত হোসেন পার্বত্য চট্টগ্রাম 'শান্তকরণ' প্রকল্পের আওতায় ২০ হাজার টন গম আত্মসাতের দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তাও আবার সেনাবাহিনীরই নিয়ম অনুযায়ী সেনাবাহিনীরই 'কোর্ট অব এনকোয়ারিতে'। সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ও মর্যাদার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণের জন্য ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত ও তাঁর সহযোগী মেজর মাহবুবকে ডিসমিস করার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সময়ের বিএনপি সরকার সেনাসদরের এই আদেশ বাস্তবায়নে বাধা দেয় এবং ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াতকে ডিসমিস না করে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। (দেখুন, 'সেনাবিধান অনুযায়ী তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন', দৈনিক সমকাল ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭)। এর সত্যমিথ্যা বিচারের দায়িত্ব আমার নয়। একজন সৈনিককে নির্বাচন কমিশনার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু যদি দৈনিক সমকালের এই খবরটির পূর্ণ ব্যাখ্যা না দেওয়া হয় তাহলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের অভিযান নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠবে, সেনাবাহিনীকেও বিতর্কিত করা হবে।

অতএব 'শাঁখের করাত' কথাটা আমি হালকাভাবে বলিনি। সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আমরা নতুন দেখছি না। কিন্তু কখনই আমরা 'শাঁখের করাতে'দেখিনি। ফলে তার পক্ষে বা বিপক্ষে তর্ক করতে আমি নামিনি। যদি আমরা দেশ ও দশের স্বার্থ রক্ষা করতে চাই তাহলে আমাদের প্রতিরক্ষার বর্তমান বা এখনকার শেষ অবলম্বন সেনাবাহিনীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে ভুল রাজনীতি। এতোটুকু বুঝতে পারলে আমরা 'জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ' নামক আরেকটি বিপজ্জনক ধারণার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবো এবং সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়েই আমাদের গণনিরাপত্তা ও গণপ্রতিরক্ষা নিয়ে ভাববার সুযোগ পাবো– জনগণ যেখানে সেনাবাহিনীর মিত্র, শত্রু নয়। 'জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ' দাবি করছে সেনাবাহিনীকে ক্ষমতার অংশীদার করা হবে, আসলে এই প্রস্তাবে দেশের সার্বভৌমত্ব ও গণমানুষের স্বার্থবিরোধী শক্তি বলছে সেনাবাহিনী তাদের

পাহারাদারে পরিণত হোক। যেন এশিয়া এনার্জি, তেলগ্যাস কোম্পানি, লুটেরা ব্যবসায়ী শ্রেণীসহ দেশি-বিদেশি শক্তির স্বার্থই শুধু সেনাবাহিনী দেখভাল করবে। আর বিপরীতে আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের সেনাবাহিনীকে যেন দেশের সার্বভৌমত্ব, গণনিরাপত্তা ও গণপ্রতিরক্ষার কর্তব্য সাহস ও গৌরবের সঙ্গে করতে পারে তার জন্য গণসমর্থনের ভিত্তি তৈরি করা এবং সবপক্ষকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া সৈনিকরা যদি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াইয়েই নেমে গিয়ে থাকে তাহলে কারো সঙ্গেই তাদের ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, কারণ জনগণই তখন তাদের অপ্রতিরোধ্য শক্তি হয়ে ওঠে– এটাই ইতিহাস যুগে যুগে সাক্ষী দিয়েছে।

তাহলে (১) ক্ষমতা বদলের প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন, (২) 'জরুরি অবস্থার চরিত্রে কারো স্বাধীনতা হরণ আর কাউকে অবাধ স্বাধীনতা দান– এই স্ববিরোধিতা এবং (৩) বর্তমান সরকারকে দীর্ঘস্থায়িত্ব দিয়ে কার্যত সেনাবাহিনীর ক্ষতিসাধন– এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আমাদের দ্বিমত। বিচারের ভার আমি পাঠকদের কাছেই ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু যেন দুইজন একই জায়গায় আসতে পারি– সেই আশায় এই দীর্ঘ লেখা।

২ ফাল্গুন, ১৪১৩। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭। শ্যামলী।

র‍্যাংগস ভবন, বস্তি উচ্ছেদ ও পেন্টাগন

নয়া দিগন্তে (১৭ ফেব্রুয়ারি) দুটো খবর পড়লাম। প্রথম খবর হলো, 'ভেঙে ফেলা হবে র‍্যাংগস ভবন'। 'নগরীর প্রবেশদ্বার' বিজয় সরণি সংলগ্ন র‍্যাংগস ভবনের মালিক পক্ষকে নাকি ভেঙে ফেলার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বিজয় সরণি হয়ে তেজগাঁও সাত রাস্তা পর্যন্ত যে সংযোগ রাস্তার পরিকল্পনা তাকে নস্যাৎ করে দিয়ে এই ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নগরে ভয়াবহ যানজটের একটি প্রধান কারণ এই র‍্যাংগস ভবন। ভবনটি যেহেতু দৃশ্যমান এবং সততই যানজটে আটকে পড়া মানুষদের চোখের ওপর ভূতের মতো দিনে রাতে দাঁড়ানো– মনে করিয়ে দেয় যে রাস্তাটি সিধা তেজগাঁও অবধি যদি চলে যেত তাহলে ঢাকার এই অংশের চরিত্র বদলে যেত।

এই ভবন সবসময়ই অন্যায় দখলদারি ও দুর্নীতির প্রকট প্রতীক হয়ে নাগরিকদের অট্টহাসি করে চলেছে। আমাদের বিবেক ও নীতিবোধের পীড়া হয়ে

আছে। দ্বিতীয়ত, র‍্যাংগস ভবন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় রাজনৈতিক দলেরও দুর্নীতির প্রমাণ। কারণ এই দুই সরকারের আমলে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ভবনটি ভাঙার উদ্যোগ নিলেও রাজনৈতিক দলগুলোর যোগসাজশেই বহাল তবিয়তে অক্ষত থেকেছে। তৃতীয়ত, নয়া দিগন্তের খবর অনুযায়ী রাজউকে ছয় তলার একটি প্লান পাশ হলেও ১২ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়। (যদিও প্রশ্ন থেকে যায়, যদি এই জমি অবৈধ দখলদারি হয়ে থাকে তাহলে রাজউকে প্লান পাশ হল কীভাবে?)। ইত্যাদি নানা কারণে এই সংবাদটি গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় খবর হলো, 'বস্তি' উচ্ছেদে বা 'অবৈধ স্থাপনা' উচ্ছেদে অনুমতির প্রয়োজন হবে। খবরটি পড়ে ভালো লাগলো, কারণ বস্তি উচ্ছেদের ফলে গরিব মানুষের কষ্ট, তাদের কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না করে ঘরবাড়ি–ছাড়া করে দেয়া কেউ মেনে নিতে পারেনি। নারী সংগঠন, বিশেষ করে সম্মিলিত নারী সমাজও বস্তি উচ্ছেদ বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে। গার্মেন্ট শ্রমিকরা অধিকাংশ বস্তিতেই থাকে। তারাও বস্তি উচ্ছেদ বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে। এই সময় বস্তি উচ্ছেদ করতে হলে অন্তত অনুমতি লাগবে এটা শুনে ভালো লাগারই কথা। সরকার যদি আসলেই জনগণের উদ্বিগ্নতার কথা ভেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তাহলে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আমরা একটু চিন্তিত হচ্ছি যখন দেখছি ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, বস্তি বা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির এবং জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে উচ্ছেদ করতে হলে জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির অনুমতি লাগবে।

দুটো খবর যখন পাশাপাশি পড়লাম তখন মনে হলো ছোটখাট স্থাপনা ভাঙা বা নির্বিচার বস্তি উচ্ছেদের সময় কোনো অনুমতির প্রয়োজন হয়নি, এখন হঠাৎ কেনো? তখনই দুটো খবরকে যুক্ত করে পড়তে চেষ্টা করলাম। আমার কাছে মনে হয়েছে এখন যখন সরকারি ভাষায় 'রুই কাতলা'দের অবৈধ স্থাপনা ভাঙার কথা উঠেছে তখনই যেন হঠাৎ 'অনুমতি' নেবার কথা মনে পড়েছে সরকারের। আরও প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে কি বস্তি উচ্ছেদ অনুমতি নিয়ে করা হবে? অর্থাৎ বস্তি উচ্ছেদ বন্ধ হবে না?

তাহলে কি র‍্যাংগস ভবন ভাঙা হবে না? অনুমতির কথা বলে ভাঙ্গার কাজ বিলম্বিত করা হবে? যদি এর আগের সকল রাজনৈতিক সরকারকে র‍্যাংগস নিজের পকেটে রাখতে সক্ষম হয়, তাহলে এই সরকার কীভাবে আলাদা? র‍্যাংগস কেনো, যে সকল ভূমিদস্যু আমাদের চাষের জমি, ঢাকার চারদিকে বন্যাবিধৌত অঞ্চলকে বিনষ্ট করে নানান অবৈধ স্থাপনা গড়ে তুলেছে তাদের বিরুদ্ধে কি কিছুই করবে না এই সরকার? 'অবৈধ' শুধু মালিকানার ব্যাপার নয়, যদি পরিবেশ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয় তাহলে সেই সকল স্থাপনাও অবৈধ। তাহলে এই হঠাৎ অনুমতির নিয়ম করার ব্যাপারটাকে সন্দেহ করা ছাড়া আমার আর কী উপায় আছে। এই সন্দেহ মোচনের পথ হচ্ছে র‍্যাংগস ভবন ভাঙা।

এই হঠাৎ অনুমতি নেওয়ার নিয়ম করবার সঙ্গত কারণ সরকারের থাকতেই পারে। আমরা জানি না। কখন কীভাবে কোন নীতির ভিত্তিতে অবৈধ স্থাপনা বা বস্তি উচ্ছেদ করা হবে তার কোনো নীতিমালা সরকার জারি করেনি। অতএব অনুমতি দেওয়া না-দেওয়ার এখতিয়ার উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি বা আইনশৃঙ্খলা কমিটির ঐচ্ছিক ব্যাপার হিশাবেই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। তাহলে কি ইচ্ছা হলেই ভাঙবো আর ইচ্ছা হলে অবৈধ স্থাপনা ভাঙবো না? এটা তো উপদেষ্টা পরিষদ বা আইনশৃঙ্খলা কমিটির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার নয়। নীতিটা কী?

র‍্যাংগস ভবন বহু নাগরিকের গাড়ির তেল পুড়িয়েছে, যানজট তৈরি করে দিনের পর দিন নগরের পরিবেশ ধ্বংস করেছে। যে সীসা নিঃশ্বাসে নিয়ে আমাদের শিশুরা অসুস্থ হয়েছে সেই সীসা বাতাসে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে র‍্যাংগস ভবনের কীর্তি আছে। যাত্রীদের সময়ের অপচয় এবং বহু নাগরিকের কাজের ক্ষতি করেছে। অর্থের অপচয় ঘটিয়েছে সকলেরই। অতএব র‍্যাংগস ভবন ধরিয়ে দিলেও এই অপরাধের বিচার হবে না। কেনো অবৈধভাবে নগরের একটি মূল সড়কে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হলো তার জন্য এই ভবনের মালিকের কি কোনো বিচার হবে না?

যতোদূর জানি ১৯৯৫ সালের দিকে 'হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়ার্লেস' সংক্রান্ত একটি রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলার সঙ্গে র‍্যাংগস জড়িত থাকার পরেও আজ অবধি সেই বিচারের কোনো মীমাংসা হয়নি। আরো মামলা নিশ্চয়ই আছে। র‍্যাংগস এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে, বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কীভাবে কাদের মাধ্যমে এদেশে ব্যবসা করতে আসে তাদের অবশ্যই আমরা চিনতে চাই। তাদের চিনলে 'অবাধ বাজার' ব্যবস্থার কথা বলে স্মাগলিং ব্যবসা করা বন্ধ করতে পারবো আমরা এবং বিনিয়োগের সুষ্ঠু নীতি কী হতে পারে সেই বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে।

বস্তি উচ্ছেদের প্রশ্নে সরকারের জারি করা নির্দেশে বলা হয়েছে সন্ত্রাসী গডফাদাররা বস্তি নিয়ন্ত্রণ করে। এসব বস্তিতে মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়, ফলে এই ধরনের বস্তি উচ্ছেদ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

সন্ত্রাসী গডফাদাররা বস্তি নিয়ন্ত্রণ করে বলেই বস্তি মানেই অপরাধের ঘাঁটি– এই ধারণা ভয়ংকর এবং বিপজ্জনক। সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি কিম্বা অপরাধবিজ্ঞানের মধ্যে এই ধরনের আজগুবি ব্যাখ্যা পড়ে না। বস্তিতে গডফাদাররা থাকে না এবং যারা অপরাধ করে, করায় ও অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণ করে তারা বস্তিবাসী নয়। তাদের অধিকাংশই গুলশান বনানী বা অভিজাত এলাকার অধিবাসী। অনেকে মন্ত্রী, এমপি ইত্যাদিও। সরকার নাকি গডফাদারদেরই ধরছে? সন্ত্রাসীদেরকেই ধরপাকড় করছে? তাহলে বস্তি তো অপরাধ ও সন্ত্রাসমুক্ত হচ্ছেই। তবে বস্তি উচ্ছেদের দরকার কেনো? বরং গরিব মানুষের দোয়া ও আশীর্বাদ নিয়ে সরকার

চাইলে তার সমর্থনের ভিত্তি তৈরি করতে পারে। সেটাই এখন যুক্তিসঙ্গত কাজ। সন্ত্রাস ও অপরাধমুক্ত বস্তিকে আমরা এখন বরং পৌর নিয়মনীতি, নগরায়ন ও আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে নিয়ে আসতে পারি। যাতে বস্তি আর বস্তি না থাকে। সেই দিকেই তো চিন্তাভাবনা যাওয়া উচিত। এখানে যে মানুষগুলো বাস করে তারা পরজীবী নয়, লুটেরা নয়, বরং খেটে খাওয়া মানুষ। শহরের অর্থনীতি এদের ওপর নির্ভরশীল। এরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতো বেঈমানও নয়। যদি সরকারের সদিচ্ছা তারা টের পায় তাহলে সংবিধান লঙ্ঘন হলো কি হলো না, কার ট্রেন কোথায় লাইনচ্যুত হয়েছে কি হয় নাই সেই ধরনের ভুয়া ব্যারিস্টারি বিতর্কে জড়াবে না। তারা একবার টের পেলেই হয় যে, এই সরকার তাদের উপকার করতে না পারুক, অন্তত ক্ষতি করবে না। আমাদের আবাস নীতি নাই বলেই মানুষের বসবাস বস্তির রূপ পরিগ্রহণ করেছে, এই অবাধ বাজার ব্যবস্থার নোংরা দিক। অবাধ বাজার ব্যবস্থা দাবি করে বাজারই সব ঠিক করবে। আবাসনও। এই ক্ষেত্রে সরকার বা রাষ্ট্রের কোনো দায়দায়িত্ব থাকবে না। আর্থ-সামাজিক নীতি বা নগরায়ন পরিকল্পনার মধ্যে হাত দেবো না, বাজারই সবকিছুর সমাধান করবে, এই যদি নীতি হয় তাহলে সেই সমাজে বস্তিও থাকবে। কিন্তু অবাধ বাজারও চাইবো আবার বস্তি উচ্ছেদও করবো – তা হয় না।

ভুল বলেছি। হ্যাঁ, এখন বহুজাতিক কোম্পানির জন্য অবাধ বাজারও চাই, আবার বস্তিও উচ্ছেদ করবার কথা উঠেছে। করতেও হচ্ছে একটি ক্ষেত্রে যখন সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধ নীতি'র বাস্তবায়ন হয়। বস্তি উচ্ছেদ আসলে ইঙ্গ–মার্কিন সন্ত্রাস দমন পরিকল্পনার অংশ। এই নীতি বলে যে ঢাকার মতো তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলো থেকেই মূলত মার্কিন যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম চলবে। কমিউনিস্ট কিম্বা ইসলামি জঙ্গিরা এই গরিব, ঘরছাড়া সর্বহারাদের মধ্য থেকে তাদের লড়াইয়ের জনশক্তি সংগ্রহ করবে। যখন ধনী ও শোষকদের দুর্নীতিবাজ পার্টিগুলোকে হটিয়ে আন্তর্জাতিক পুঁজি নিজের আধিপত্য সরাসরি কায়েম করবার জন্য প্রস্তুতি নেয়, যখন বহুজাতিক পুঁজি বলে যে আমরা আমাদের মুনাফার কোনো অংশ আর স্থানীয় লুটেরা বা দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে শেয়ার করব না, পুরোটাই আমরা খাবো– তখন শহরের বস্তিগুলোকেই পুঁজি তার প্রধান দুশমন আকারে দেখে। দেখতে বাধ্য হয়। এই বস্তিগুলো আগে নিয়ন্ত্রণ করতো পরাশক্তিরই সমর্থনপুষ্ট রাজনৈতিক দল বা শক্তি। তাদের অনুপস্থিতিতে একে নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের নতুন কর্তব্য এসে পড়ে। তখন শহর থেকে যে কোনোভাবেই হোক দুটো জিনিস উৎখাত করতেই হয়। এক, বস্তি বা ঘরহারা সর্বহারা মানুষ আর দুই শ্রমিক। শ্রমিকদের বড়ো অংশই বস্তিবাসী। তাহলে বস্তি উচ্ছেদ মানে কিছু মানুষকে আবাসহীন করা নয়, সংগঠিত ও অসংগঠিত দুই ধরনের শ্রমিককেও শহরের বাইরে স্থানান্তর করা। কারখানাগুলো থাকবে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় যেমন, রপ্তানিমুখী অঞ্চলে।

আর শ্রমিকরা আসবে শহরের বাইরে থেকে, আবার কাজ শেষে শহর ত্যাগ করে চলে যাবে। যাতে শহরের ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিরাপদে সন্ত্রাসহীন জীবন উপভোগ করতে পারে। মিটিং, মিছিল প্রতিবাদ বিক্ষোভের ঝামেলা যেন শহরের ধনী ও মধ্যবিত্তদের পোহাতে না হয় তার জন্যই এই ব্যবস্থা। তাছাড়া এই শ্রেণীর নিরাপত্তা ও শান্তির কথা তো ভাবতেই হবে, কারণ তারাই ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসন ও যুদ্ধনীতির মিত্র।

বস্তি উচ্ছেদ আর শহর থেকে পোশাক তৈরি কারখানাগুলো দ্রুত স্থানান্তরের কথা এই ধরনের আশংকা তৈরি করবে। শহরে এলোপাতাড়ি কারখানা তৈরির একটা সমস্যা সবসময়ই ছিল, এখনও আছে। আবাসিক এলাকায় কারখানা স্থাপন মোটেও সুস্থ নগর পরিকল্পনার অংশ হতে পারে না। সেই সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন আর হঠাৎ বস্তি উচ্ছেদ, কারখানা স্থানান্তর এক কথা নয়।

পাঠকের মনে হতে পারে আমি বাড়াবাড়ি করছি। এটা যে মার্কিন সেনা প্রতিষ্ঠানে পেন্টাগনের সম্প্রতি গৃহীত নীতি বিশেষ বাগদাদের শহরকেন্দ্রিক গেরিলা যুদ্ধের আলোকে– সেটা আর কারোরই এখন অজানা নাই। আমি খুশি হয়েছি যে ইংরেজি দৈনিক *নিউ এইজ* এ বিষয়ে ইতোমধ্যেই আমাদের সতর্ক করে দিয়েছে। তারা নিক টার্সের (Nick Turse) যে লেখাটি ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখে ছেপেছে (Pentagon war-gaming, the battle for a planet of slums) সেখানে বলা হয়েছে :

Cities are obviously on Pentagon's hit list–today. it's Baghdad; tomorrow 2015 or 2025, if military planners are right, it could be Accra, Bogota, Dhaka, Karachi, Kinshasa, Lagos, Mogadishu or even a perennial favourite, port au Prince. Regardless of the exact locala, Pentagon strategist, looking into DARPA crystal ball of the future, have drtermined that urban slums will be a crucial battleground, and slum dwcwllers a crucial enemy.

–'শহরগুলো অবশ্যই পেন্টাগনের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। আজ না হয় বাগদাদ, কিন্তু ২০১৫ বা ২০২৫ সালে, যদি (মার্কিন) সামরিক পরিকল্পনাবিদরা সঠিক হয়ে থাকেন– তাহলে তা হবে আক্রা, বোগোটা, ঢাকা, করাচি, কিনসাসা, লাগোস, মোগাদিসু অথবা সবসময়ের পছন্দের পোর্ত অব প্রিন্স। ঠিক কোথায় সেটা হবে তা ঠিক না– জানলেও পেন্টাগনের পরিকল্পনাবিদরা ডিফেন্ড এডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সির ক্রিস্টাল বল দিয়ে ভবিষ্যৎ দেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শহরে বস্তিগুলোই হবে আগামী দিনের জয়-পরাজয় নির্ণায়ক যুদ্ধক্ষেত্র আর বস্তিবাসীরাই প্রধান দুশমন'।

তাহলে 'একুশ শতকের প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র' হবে বস্তি এবং বস্তিবাসীরাই হবে প্রধান দুশমন– পেন্টাগনের এই নীতির আলোকেই আমরা আমাদের দেশের বস্তি উচ্ছেদকে দেখতে বাধ্য। ঢাকার বস্তি পেন্টাগনের যুদ্ধনীতির বাইরে নয়। এই আলোকে এখনকার নীতিনির্ধারকদের বস্তি উচ্ছেদকে আমরা দুইভাবে বুঝতে পারি। এক. ইতিবাচক অর্থে। দুই. নেতিবাচক অর্থে। নেতিবাচক অর্থ মানে আমরা বস্তি উচ্ছেদ করে আসলে পেন্টাগনের যুদ্ধটাই আগে শুরু করে দিয়েছি। কিন্তু এখন এই অবস্থান নেওয়া হবে ভুল। কারণ হয়তো আমরা পূর্বাপর এখনো ভেবে দেখিনি বা ভেবে দেখবার সামর্থ্য আমরা এখনো অর্জন করিনি। হয়তো আমরা ভাবতে পারি না যে গোলোকায়ন বা গ্লোবালাইজেশানের এই যুগে সকল স্থানীয় ইস্যু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আলোকেই বিবেচনা করতে আমাদের শিখতে হবে। ইতিবাচক এই অর্থে যে, ঢাকার বস্তি যদি ২১১৫ কি ২০২৫ সালে পেন্টাগনের লক্ষ্যবস্তুই হয়, তাহলে তার একটা সমাধান তো আমাদের এখনই খুঁজে বের করতে হবে। সেই আলোকে বস্তি উচ্ছেদ কেনো ভুল নীতি সেটা ইতিবাচকভাবে বস্তি সমস্যার সমাধানের দিকনির্দেশনা দিয়ে নীতিনির্ধারকদের সহায়তা করেই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি। সেই দিকেই, যতক্ষণ না নীতনির্ধারকরা আমাদের কথা শুনছেন, আমি পরামর্শ দেবার পক্ষপাতী।

বলেছি যে, বস্তি যদি পেন্টাগনের লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকে তাহলে আমাদের নিরাপত্তার জন্যই বস্তির প্রশ্নের একটা মীমাংসা আমাদের দরকার। আমরা ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসন ও যুদ্ধনীতির বিরোধী। সেই বিরোধিতার রাজনীতি গণবিচ্ছিন্ন সন্ত্রাস এবং দুর্বল বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে আরো দুর্বল করবার নীতি হতে পারে না। আমাদের অবশ্যই শক্তিশালী অর্থনীতি এবং জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের ওপর দাঁড়িয়ে শক্তিশালী বাংলাদেশ রাষ্ট্র পুনর্গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এটাই সঠিক পথ। সেই দিক থেকে দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতা ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর দমন ব্যবস্থা ও শাস্তি সঠিক পদক্ষেপ। একে আমাদের সমর্থন করতে হবে। সেখানে রাজনৈতিক দলকে যেমন ছাড় দেওয়া যাবে না, তেমনি র‍্যাংগস, কিংবা কোনো ভূমিদস্যুকেও আমরা ছাড় দেবো না। 'অবাধ বাজার ব্যবস্থার' নামে বহুজাতিক কোম্পানির একচেটিয়া কায়েমের বিপরীতে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে যে বাজার ব্যবস্থা কাজ করে সেই ব্যবস্থা আমরা চাই এবং সেখানে রাষ্ট্রের শক্তিশালী নীতিনির্ধারক ভূমিকা থাকতেই হবে। প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিবাচক ফলটা আমাদের অর্থনীতি গড়বার জন্য এই মুহূর্তে খুবই দরকার।

এই ধরনের ব্যবস্থা যদি আমরা চাই তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে বস্তির জনগণ-বিশেষত সংগঠিত– এবং অসংগঠিত– বাজারের শ্রমিক বা খেটে খাওয়া মানুষগুলোর প্রতি আমাদের আন্তরিক ও পরিপূর্ণ নজর দেওয়া। এরাই আমাদের

শক্তি এবং এদেরকে সঙ্গে নিয়েই শক্তিশালী বাংলাদেশ গড়তে হবে, গণপ্রতিরক্ষার আর্থ-সামাজিক ভিত্তি তৈরি শুরু করে দিতে হবে। ব্যবসায়ীরাই শুধু ব্যবসা ও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের মুরুব্বি হবেন এটা চলবে না। কারণ এখানে শুধু মজুরি ও মুনাফার ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপার নাই, জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার প্রশ্ন জড়িত। অন্যদিকে দাবি-দাওয়া আদায়ের নামে কারখানা ভাংচুর করবো-এই নৈরাজ্যকেও আমরা বরদাশত করতে পারি না। কারা কেনো কী কারণে বাংলাদেশের কলকারখানা ধ্বংস করতে চায় সেই দিকগুলো আমরা কমবেশি জানি। তার মানে বিশ্বপরিস্থিতির আলোকে সমষ্টিকে কেউ যেন বিভক্ত করতে না পারে সেই ধরনের নীতিই আমাদের নিতে হবে। এতদিন ধনী ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই শুধু নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এখন সকলের স্বার্থ ও জাতীয় নিরাপত্তা (অর্থাৎ গণনিরাপত্তা) নিশ্চিত করবার নীতি গ্রহণ করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

এটা সকল পক্ষকে সবসময়ই মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়াব্যাপী জারি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধে আমরা ক্রসফায়ারে পড়ে যেতে পারি এবং কখনই আমাদের এমন কোনো কাজ করা ঠিক হবে না যা ক্ষুদ্র কোনো গোষ্ঠীর তৎপরতার জন্য কিম্বা সরকার ও রাষ্ট্রের ভুল নীতির কারণে সমষ্টির ঘাড়ে এসে পড়ে। পাশাপাশি এই ধরনের অন্তর্ঘাতী শক্তিকেও আমরা বরদাশত করতে পারি না যারা ক্রমাগত বাংলাদেশ রাষ্ট্র 'ব্যর্থ' এবং বাংলাদেশ ইসলামী জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্য হয়ে গিয়েছে এই উম্মাদ প্রচারণা ছাড়া পত্রিকার কাটতি বাড়াতে অক্ষম। খেয়াল করতে হবে আমি বাংলাদেশের 'ভাবমূর্তি' রক্ষার কথা বলছি না- আমাদের প্রাণে বেঁচে থাকার কথা বলছি। গণমাধ্যম বা তথাকথিত 'বিশিষ্ট নাগরিক' মাত্রই দেশ ও দশের অধীন- যার অর্থ সংবিধান, আইন ও জাতীয় নিরাপত্তার উর্ধ্বে তাঁরা নন। আমরা তাঁদের মাথায় তুলে রাখতে পারি না। অবশ্যই তাঁরা তাঁদের পত্রিকায় অন্তর্ঘাতী তৎপরতা চালান, চালিয়েছেন এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নামে গণবিরোধী অপকর্ম করে আসছেন। তাঁরা ফেরেশতা নন। বলাবাহুল্য, গণবিচ্ছিন্ন জঙ্গি রাজনীতি যেমন আমাদের আত্মহত্যার শামিল হবে, তেমনি নীতিনির্ধারকরা যদি আর্থ-সামাজিক নীতি, নগরায়ন, আবাসন ও পরিবেশ পরিকল্পনা ছাড়া এলোপাতাড়ি বস্তি উচ্ছেদ করে যান তাহলে প্রতিক্রিয়ায় তা সন্ত্রাস ও সহিংসতারই জন্ম দেবে। সেটা হবে ক্ষুদ্র ও গণবিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলোকে তৎপর করবার ধ্বংসাত্মক নীতি। এটা আমরা হতে দিতে পারি না। ছবিটা আমরা একটু ভাবতে বলি: একদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গি তৎপরতা আর অন্যদিকে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নামে চেনা গণমাধ্যমগুলোর তারস্বরে দেশ ও দশের স্বার্থবিরোধী চিৎকার- এই কী বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ?

নিঃসন্দেহে দুনিয়া আমাদের পক্ষে নাই। আপোশ ও লড়াইয়ের স্ববিরোধী অবস্থানের মধ্য দিয়ে কৌশলী হয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। যুদ্ধ, আগ্রাসন,

বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া ব্যবসা ও অল্প কিছু লোককে ধনী আর দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষকে গরিব করবার নীতি ও প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে জনমত ও শান্তির সপক্ষে বিশ্বব্যাপী গণশক্তির যে উত্থান আমরা দেখছি, তার আশ্রয়েই– সেই বিশ্ব– আন্দোলনে সকলের সঙ্গে মিশে থেকেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ নয়, বিচ্ছিন্নতা যেমন আমাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারে, তেমনি গণমানুষকে নীতি ও পরিকল্পনা যেমন আমাদের স্থানীয় নীতি ও পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করে ঠিক তেমনি আমাদের যে কোনো স্থানীয় উদ্যোগ ও পরাশক্তিগুলো তীক্ষ্ণ নজরের অধীন। সকল দিক সামাল দিয়েই আমাদের চলতে শিখতে হবে।

৭ ফাল্গুন ১৪০৭। শ্যামলী।

তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি

'ড. ইউনূস সমাবর্তনে যাবেন, বর্জনের হুমকি শিক্ষকদের একাংশের'– শিরোনামে পেছনের পাতায় ছাপা *প্রথম আলোর* খবর হলো, ড. ইউনূস একজন 'নোবেল বিজয়ী' হিশাবেই ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। তিনি যদি 'সমাবর্তন বক্তা' হিশাবে যোগ দেন তাহলে নীল প্যানেলের শিক্ষকরা সমাবর্তন বর্জন করবেন। বাংলাদেশ ছাত্রমুক্তি ড. ইউনূসকে বর্জন করবার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক ও ছাত্রদের আহ্বান জানিয়েছে (*প্রথম আলো* ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৭)। একই তারিখে ইংরেজি দৈনিক *নিউ এইজ* প্রথম পাতায় ছাপা খবরে বলছে, 'DU to hold convocation without Yunus as speaker'—বক্তা হিশাবে ইউনূস ছাড়াই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ৪৩ আগামী বুধবার হতে যাচ্ছে, কোনো সমাবর্তন বক্তা থাকবেন না। তাঁকে সমাবর্তনে সম্মানসূচক 'ডক্টরেট অব ল' দেবার কথা। ইউনূস সমাবর্তন বক্তৃতা করতে ও ডক্টরেট অব ল পাবার জন্য এর আগে সাদরে সম্মতি দিয়েছিলেন। এখন, নিউ এইজের কথা অনুযায়ী পনেরো তারিখে তাঁর সঙ্গে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যোগাযোগ করেন, তখন তিনি 'সম্মানসূচক' ডক্টরেট পেতেই শুধু চান, জানিয়েছেন। তিনি আদৌ যদি বক্তৃতা করেন তবে করবেন এই ডিগ্রিটার প্রাপক হিশাবে। অর্থাৎ তিনি ডিগ্রি চান, সমাবর্তনের সম্মান চান না। সমাবর্তনে আরো ছাত্র থাকবে, তাদেরকেই ডিগ্রি দেওয়া হবে, পার্থক্য শুধু এই যে

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়ে অন্য ছাত্রদের মতো ডক্টরেট ডিগ্রি পাচ্ছেন না। কিন্তু কেনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই ধরনের ডিগ্রি দেয়? কাজের স্বীকৃতি দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা রেওয়াজ। শেখ হাসিনা ওয়াজেদও বিদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট পেয়েছেন।

কিন্তু সমাবর্তনের বক্তা হওয়ার সম্মান আর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি এক কথা নয়। সমাবর্তনের মূল বক্তার সম্মান খুইয়েও ড. ইউনূস ডিগ্রি পেতে রাজি– এই খবরে আমি বিস্মিত হয়েছি। এই দিকগুলো একটি মানুষকে বিচার করতে আমাদের সহায়তা করে। খবরটা কতোটা সত্যি আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়, পত্রিকার খবরের ওপর আমি পুরোপুরি নির্ভর করি না। যাঁরা খবর রাখেন তাঁদের কাছ থেকে জেনেছি খবরটা সত্যি।

প্রথম আলো আর *নিউ এইজের* খবর উদ্ধৃত করবার কারণ আছে, দুটো পত্রিকা একই খবর কীভাবে হাজির করে তার নমুনা প্রদর্শনের জন্য। ড. ইউনূস হচ্ছেন প্রথম আলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালসহ নানান এনজিও, চ্যানেল আই ও বর্তমান ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বাংলাদেশের জনগণ ও সেনাবাহিনীর স্বার্থের বিরুদ্ধে তৎপর আইনজীবী, ব্যবসায়ী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের মধ্যে যে আঁতাত তারই রাজনৈতিক এজেন্ডার ঘুঁটি। অনেকে এই আঁতাতকে নিছকই ষড়যন্ত্র হিশাবে দেখছেন। লেখালিখি বা বৈঠকী আলাপে আমরা তা দেখি। যদি একে আমরা রাজনৈতিকভাবে বুঝতে না পারি এবং একে রাজনৈতিকভাবেই মোকাবিলা করবার চেষ্টা না চালাই তাহলে তার বিরোধিতাও হবে ষড়যন্ত্রমূলক এবং দেশ ও দশের জন্য আত্মঘাতী। কারণ ষড়যন্ত্র কেবল তখনই সফল হতে পারে, যদি জনগণ রাজনীতি ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বসংঘাত সম্পর্কে অপরিচ্ছন্ন থাকে, শত্রু-মিত্র ভেদজ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং কী করতে হবে তার দিকনির্দেশনা না পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। যখন এই বিভ্রান্তি আসে তখন আমরা ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ ও বিরোধিতা করলেই মুক্তি পাবো মনে করি, অন্যদিকে ব্যক্তি যে রাজনীতির প্রতিনিধি সেই রাজনীতি অক্ষত ও শক্তিশালীই থেকে যায়। এমনকি এই রাজনীতির অযোগ্য বা ব্যর্থ প্রতিনিধির জায়গায় আরো যোগ্য প্রতিনিধি খুঁজে নিয়ে আগের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী হয়।

ব্যক্তিকে রুখে দিতে পারা খুব সহজ –যেমন, ড. ইউনূসকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আওয়ামীবাদী ব্লু প্যানেলের শিক্ষকরা আসতে দিচ্ছেন না। কেন ব্লু প্যানেলের শিক্ষকদের জন্য এটা সহজ হলো? কারণ জনগণের মধ্যে এই সচেতনতা এসেছে যে ড. ইউনূস দেশ ও দশের স্বার্থের পক্ষের লোক নন। কিন্তু এই নীল প্যানেলের শিক্ষকদের রাজনীতিটা কী? তারা কি দেশ ও দশের স্বার্থের পক্ষে রাজনীতি করেন? অবশ্যই না। তাঁরা একটা দলবাজিতার জায়গা থেকে আপত্তি করছেন, সেটা তাঁদের বক্তব্য থেকেও পরিষ্কার। আগামী দিনে গণতন্ত্র ও

গণরাজনীতির ধ্বংসাবশেষের ওপর গড়ে তোলা পরাশক্তির সমর্থনপুষ্ট যে দল আসছে তার সঙ্গে একটা রফায় আসবার জন্য এই আগাম প্রতিরোধ। যে শত্রু রাজনৈতিকভাবেই আমাদের ধ্বংস করবার জন্য তৎপর তার রাজনীতিকেই যদি আমরা মোকাবিলা করতে না পারি তাহলে ব্যক্তিকে বদলালেই কি সেই রাজনীতির বিনাশ হবে? হবে না। সেটা আরো শক্তিশালী হবে। ড. ইউসুসের জায়গায় ডবল ডক্টরেট লোক আসবে কিনা জানি না, কিন্তু আরো ধূর্ত ও দক্ষ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে।

প্রথম আলোর খবরটিকে পড়তে হবে ব্লু প্যানেলের শিক্ষকদের প্রতিবাদের আলোকে। বলা হচ্ছে যতোই প্রতিবাদ হোক, ড. ইউনূস যাবেন, আর বর্জনের হুমকি তো শিক্ষকদের একাংশের মাত্র। সব শিক্ষক তো আর ড. ইউনূসের বিপক্ষে নয়। *নিউ এইজ* সত্য কথা বলছে, ড. ইউনূস যাবেন, কিন্তু এই যাওয়া সেই যাওয়া নয়– তিনি সমাবর্তনের বক্তা হবেন না। শুধু ডিগ্রির পুরস্কারটা নেবেন আর পুরস্কার প্রাপক হিশাবে হয়তো দুই একটা কথাও বলবেন। খবর পেশের মধ্যেও রাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রাম চলে– পাঠককে সেই স্বাদটুকু উপভোগ করতে জানতে হবে।

ব্যক্তি এবং রাজনীতির পার্থক্যের কথা তুলেছি। ব্লু প্যানেলের শিক্ষকরা যদি ইউনূসের রাজনীতিরই বিরোধিতা করতেন তাহলে তাঁদের উচিত ছিল এবারের একুশে বইমেলায় গ্রামীণ ব্যাংকের স্পনসরশিপের বিরুদ্ধে কথা বলা। বই মেলা পুরা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর দখল করে রাখে বলা যায়। বইয়ের সঙ্গে শুধু বাংলা একাডেমি নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগও অন্তর ও বাহির উভয় দিক থেকেই। এবার যখন একুশে বইমেলায় প্রবেশ করছি তখন দেখলাম মেলার ব্যানার, প্যান্ডেল সর্বত্রই বিপুলভাবে গ্রামীণফোন– অর্থাৎ টেলিনর কোম্পানির বিজ্ঞাপন। নীল রঙের ইংরেজি 'T' অক্ষর ঝুলছে, ঘুরছে, পতপত করে উড়ছে। মেলার প্রবেশ দ্বারে পুলিশ আর র‍্যাবের পাশে অঙ্কিত হয়ে প্রহরী সেজে বসেছে ইরেজি 'T' বর্ণ। কালোর মধ্যে 'T' সাদার মধ্যে নীল রংয়ের 'T'। পুরো মেলার মধ্যে টকটক করে বেড়াচ্ছে টি এবং টি এবং টি...

যে জনগোষ্ঠী নিজের আত্মপরিচয়, ভাষা, সংস্কৃতির উৎসব নিজে পালন করবার আর হিম্মত রাখে না সেই জনগোষ্ঠীর ধ্বংস সময়ের ব্যাপার মাত্র। সরকার বইমেলা নিজের খরচে করতে পারে না, এটা অবিশ্বাস্য। এর আগে কোম্পানির আনুকূল্য গ্রহণ করা হয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এবারই কোম্পানির আধিপত্য দৃশ্যমান ও দৃষ্টিকটু হয়েছে। বিদেশি মোবাইল ফোন কোম্পানির অর্থানুকূল্য ছাড়া আমরা আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি আর রক্ষা করতে পারছি না, এর চেয়ে লজ্জার আর কী আছে? বিশেষত মহান একুশে ফেব্রুয়ারির সবচেয়ে স্পর্শকাতর অনুষ্ঠান 'একুশে বইমেলা'-এর চেয়ে বিনাশের চিহ্ন আর কী হতে পারে!

বাংলাদেশে পরাশক্তির আধিপত্য কায়েম ও বহুজাতিক কোম্পানির অবাধ বিনিয়োগ ও উচ্চহারে মুনাফা নিশ্চিত করবার রাজনীতির বিরোধী পক্ষ নন ব্লু প্যানেলের শিক্ষকরা। বাংলাদেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও একুশে বইমেলা টেলিনর কোম্পানির যাক, ক্ষতি নাই, উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ তো থাকতেই পারে না। কিন্তু তাঁরা অবশ্যই ব্যক্তি ড. ইউনূসের বিরোধী। কেনো তারা ড. ইউনূসের বিরোধী? কারণ তাঁরা প্রমাণ করতে চাইছেন ড. ইউনূস পরাশক্তি ও বহুজাতিক কোম্পানির যে সেবা নিশ্চিত করতে পারবেন তার চেয়ে অনেক ভাল পারবেন শেখ হাসিনা ওয়াজেদ। ইতিমধ্যে শেখ হাসিনা বলে দিয়েছেন যে, তাঁর কাছে 'সুদখোর' আর 'ঘুষখোর' একই কথা। উভয়েই দুর্নীতিবাজ। অতএব দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান যদি হয়ই তবে তা 'সুদখোর'-দের বিরুদ্ধেও হওয়া উচিত। শেখ হাসিনা পরিষ্কার ড. ইউনূসকে হামলার লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করেছেন।

তিনি পরিষ্কার এই সত্যও ঘোষণা করেছেন যে তিনিই আন্দোলন-সংগ্রাম করে এই কেয়ারটেকার সরকার এনেছেন। অথচ এই সরকারের আমলে তিনি রাজনীতি করতে পারছেন না, কিন্তু ড. ইউনূসকে সেই অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে অভিযান করছে তিনি তা সমর্থন দিচ্ছেন, কিন্তু তিনি চান দুর্নীতির অভিযান শুধু বিএনপির বিরুদ্ধে চলুক। তিনি বলেছেন 'প্লিজ, সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলুন'। প্রায় সবগুলো পত্রপত্রিকায় ফলাও করে তাঁর দীর্ঘ লেখা ছাপা হয়েছে। তিনি বলেছেন: "কোনো একটা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ঢালাওভাবে এক পাল্লায় ফেলবেন না। চোরকে চোর বলেন, সাধুকে সাধু বলেন। সাদাকে সাদা বলেন, কালোকে কালো বলার সৎসাহস দেখান, সেটাই হলো বিবেকের কথা। বিবেক জাগ্রত করুন। তাহলে সততারই জয় হবে। মিথ্যার আশ্রয় নিলে মিথ্যাবাদীরাই উৎসাহিত হবে এবং অনিয়ম বাড়বে। দোষী ও নির্দোষকে এক সঙ্গে দোষারোপ করলে দোষীরাই উৎসাহিত হয়। এখানে ব্যালান্স করার ব্যর্থ প্রয়াস না করাই উত্তম"।

ব্যালান্স করা যাবে না। বেশ। তাঁর সঙ্গে খালেদা জিয়াকে যেমন ব্যালান্স করা যাবে না, তেমনি ড. ইউনূসকেও নয়। ব্লু প্যানেলের শিক্ষকরা শেখ হাসিনার কথায় প্রেরণা বোধ করেছেন। শেখ হাসিনা যখন ড. ইউনূসকে 'সুদখোর' বলে একটা রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েছেন তার পরপরই আওয়ামী লীগ সমর্থক শিক্ষকরাও রাজনৈতিক অবস্থান থেকেই ড. ইউনূসকে বিরোধিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ড. ইউনূস নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন বলেই তাঁকে সমাবর্তন বক্তা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁর ডিগ্রি পাওয়াও একই কারণে। এখন কেউ যদি উদ্ভট দাবি করে যে তাঁর একাংশ আমি স্বীকার করি, নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ড. ইউনূস কিন্তু আরেক অংশ নয়– অর্থাৎ নাগরিক শক্তির ড. ইউনূসকে নয়– তাঁর এই রাজনৈতিক পরিচয় আমি মানি না– তাহলে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান ও রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞান উভয়েরই এখানে ঘাটতি আছে লক্ষ করা যায়। ড.

ইউনূসের পুরস্কার তাঁর এখনকার রাজনৈতিক ভূমিকার জন্যই। দুটো আলাদা কিছু না।

অবাক হয়েছি ড. ইউনূস একে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা না করে পিছুটান দিয়েছেন। তিনি শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগের বিরোধিতার জবাব দেননি। শিক্ষকদের বিরোধিতা মোকাবিলা না করে তিনি এখন শুধু পুরস্কারটা চান, কিন্তু সমাবর্তনের বক্তা হতে চান না। বিশ্ববিদ্যালয় যদি তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তিনি যাবেন। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে অন্যদের নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ বিক্ষোভ সবকিছু করার অধিকারও তিনি মেনে নেবেন। তাহলে তাঁর মর্যাদা বাড়তো।

তিনি একটি রাজনৈতিক দলের নেতা, সেটা তাঁর অপরাধ হতে পারে না। অতএব তাঁর আচরণও রাজনৈতিক নেতার মতোই হতে হবে। তিনি নাকি বিভেদের রাজনীতি করবেন না। কিন্তু তাঁর রাজনীতিতে পদার্পণ মানেই তো রাজনীতিকে নতুন বিভক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া। অসুবিধা কী? শিক্ষকরা বলছেন যেহেতু তিনি রাজনীতি করেন অতএব তিনি সমাবর্তনে এলে তাঁরা সমাবর্তন বর্জন করবেন। কিন্তু এর কোনো যুক্তি নাই। যদি বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক নেতা এই নোবেল শান্তি পুরস্কার পেতেন, ধরুন শেখ হাসিনা, তাহলে কি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সমাবর্তন বক্তা রাখতে পারবে না? আমন্ত্রণ জানাবে না? এটা কেমন যুক্তি? তার মানে রাজনীতি করলেই বিশ্ববিদ্যালয় কাউকে সমাবর্তন বক্তা হিশাবে আমন্ত্রণ জানাতে পারবে না। জানালে অসুবিধার কী আছে?

পরাশক্তির পক্ষে উন্নয়ন ধারণা অর্থাৎ পুঁজির স্ফীতি, বিস্তার ও পরিবর্ধনের রাজনীতিতে ইউনূসের অবদানের কারণে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন আগে, তারপর রাজনীতি করছেন। ড. হেনরি কিসিঞ্জার রাজনীতি করেই শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। গণমানুষের শত্রু এবং দুনিয়ায় অশান্তির কারণ হয়েছেন বা হবেন এমন ব্যক্তিরাই সাধারণত নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়ে থাকেন। একান্তই পাশ্চাত্যের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই শান্তি পুরস্কারের প্রবর্তন হয়েছে। মনে রাখতে হবে, সাহিত্যে বা বিজ্ঞানে মৌলিক কোনো অবদানের জন্য এই পুরস্কার নয়। নোবেল পুরস্কার আর নোবেল শান্তি পুরস্কার মোটেও এক কথা নয়। পরাশক্তিগুলোর স্বার্থ ও সভ্যতার আধিপত্য বজায় যারা রাখে পরাশক্তি তাদেরকেই এই পুরস্কারটি দিয়ে থাকে। ড. ইউনূস আমাদের শান্তি নয়, অশান্তির কারণ হবেন, এখানেই আমাদের আশংকা। ইউনূসের মোকাবিলা করতে হবে। তাঁকে 'সুদখোর' বলে গালি দিলে চিঁড়া ভিজবে না। রুচির দিক থেকেও অসুন্দর। কেন মাইক্রোক্রেডিট সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির বাহক হয়ে উঠলো তাকে জনগণের কাছে সহজভাবে ব্যাখ্যা করাই ছিল শিক্ষকদের কাজ। কিন্তু আওয়ামী সমর্থক নীল রঙের শিক্ষকরা (অন্য রঙও) সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক শক্তি, বিরোধী শক্তি নয়। ব্যতিক্রম নাই বললেই চলে। উন্নয়নের যে টাকা ইউনূস পেয়েছেন, সাদা

নীল বেগুনি যে রঙেরই হোক- সকল রঙের শিক্ষকরাই তার ভাগ কমবেশি পেয়েছেন। অতএব তাদের আপত্তি ব্যক্তি ইউনূসের বিরুদ্ধে, তাঁর চিন্তা বা রাজনীতি নয়। সুদে টাকা খাটিয়ে দারিদ্র্য নিমোচন সম্ভব- এই উন্নয়ন রাজনীতির বিরোধিতা করবার হিম্মতও তাঁদের নাই। শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা স্মার্ট, বুদ্ধিমান ও অর্থলোভী তাঁরা ড. ইউনূসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, সমর্থক ও বন্ধু। তাঁরা কনসালটেন্সি করেন বা কোনো কোনো এনজিওর সঙ্গে যুক্ত। ব্যতিক্রম তো আমরা খুবই কম দেখি। যদি তাঁরা কী করে আমাদের উন্নতি হবে সেই বিষয়ে গবেষণা ও শিক্ষা চর্চা করতেন তাহলে শেখ হাসিনাকে 'সুদখোর' বলে এখন মুখ খারাপ না করলেও চলতো। আমরা আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থায় লগ্নি পুঁজির বিবর্তন এবং সমান্তরালে এনজিও কর্মকাণ্ডের স্বরূপ বুঝতাম। দুর্ভাগ্য আমাদের, এই কাজগুলো হয়নি।

ড. ইউনূসের রাজনীতিটা আমি বুঝি কিন্তু এখনো তাঁর রাজনীতির ভাষা ফোটেনি। আমরা একটা বিশেষ ধরনের রাজনীতির চরিত্র সম্পর্কে খানিক নোক্তা দিয়ে শেষ করব- আগামীতে এই বিষয়ে এই রাজনীতির সঙ্গে পরাশক্তির রাজনীতি- বিশেষত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধের সম্পর্ক বিচার করবার ইচ্ছায়। এই বিশেষ ধারার রাজনীতি দাবি করে, আমরা ভাষা ও সংস্কৃতিসূত্রে এমন এক 'বাঙালি' যার মধ্যে ইসলামের কোনো নামগন্ধ থাকতে পারবে না। এরা নিজেদের 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে দাবি করে। আর আমরাও এদের প্রায়ই 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনীতির প্রবক্তা বলে মহা ভুল করি। ইউরোপীয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রগতিশীল শ্রেণীর চিন্তাচেতনা হিশাবে ব্যক্তির সার্বভৌম ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের ওপর রাষ্ট্র গড়বার দাবি যেমন উঠেছে, তেমনি রাষ্ট্র ও ধর্মকে আলাদা করবার দাবিও উঠেছিল। পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের দ্বন্দ্বের রাজনীতি আলাদা বিচারের জায়গা। কিন্তু ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে ধর্মের উচ্ছেদ ইউরোপীয় অর্থেও ধর্মনিরপেক্ষতার দাবি ছিল না। উত্তর আমেরিকা বা ইউরোপীয় সমাজ মোটেও ধর্মহীন সমাজ নয়। তাঁদের চিন্তাবিদ- দার্শনিকরা বারবারই বলেছেন এই সমাজ গ্রিক-খ্রিস্টীয় ধ্যানধারণা ও চিন্তা দিয়ে গড়া। এর ভালমন্দ নিয়ে বিস্তর তর্কবিতর্ক আছে। পাশ্চাত্যের গ্রিক-খ্রিস্টীয় সমাজে রাষ্ট্র আর ধর্ম আলাদা থাকার কারণে সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কোনো বিরোধ ঘটেনি। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের রাজনীতি অতএব ইউরোপের ইতিহাস দিয়ে সস্তা কায়দায় ও শর্টকাটে আমরা বুঝবো না।

'ধর্মনিরপেক্ষতা' নামে যে-রাজনীতি বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে, তার স্বভাবের মধ্যে ইসলাম বিরোধিতা ও ইসলামের প্রতি ঘৃণার চর্চা বদ্ধমূল। এই রাজনীতিটি গড়ে উঠবার বাস্তব কারণ আছে। কারণ আমরা ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয় আত্মপরিচয়বোধকে রক্ষা করবার জন্য পাকিস্তানের সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়েছি। কাজে কাজেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের ইসলামবাদিতার সঙ্গে

আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার ধারা ইসলামের প্রতি ঘৃণার রাজনীতি চর্চার জন্য একাত্তর বা মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবহার করে আসছিল। এখনও করে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় সেটা খুবই সহজ কাজ। জনগণকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত করে রাখাই এই রাজনীতির চরম ও পরম লক্ষ্য। কিন্তু একই সঙ্গে এই রাজনীতি ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে ক্রমাগত ইসলাম বিরোধিতা এবং এই দেশের জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রচারণা ও চক্রান্তের ব্যাপকতার কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে ঠাঁই হারিয়েছে– এদের গণসমর্থনের ভিত্তি ক্ষয় পেয়েছে। যে কারণে আওয়ামী লীগকেও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের এই বিশেষ ধারার সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্বিচার করতে হচ্ছে, এই ধারার থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে দেখছি আমরা। ফলে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গেও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনীতির এই বিশেষ ধারার বিরোধ তৈরি হয়েছে। এতোকাল এই ধারা আওয়ামী লীগকে সহজে ব্যবহার করতে পেরেছে, কিন্তু এখন অতো সহজে আর পারছে না। বরং আওয়ামী লীগের সঙ্গে ইসলামী দলগুলোর চুক্তি ও আওয়ামী রাজনীতির অভিমুখ বদলে যাওয়ায় এই ধারা বিব্রত ও দিশাহারা। কিন্তু শেষ অবধি আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতার এই বিশেষ ধারার খপ্পর থেকে উদ্ধার পাবে কিনা আমরা এখনও জানি না। ধর্মনিরপেক্ষতার এই বিশেষ ধারার রাজনীতি যদি এখন টিকে থাকতে চায় তাহলে বাংলাদেশ বহুজাতিক কোম্পানি ও পরাশক্তির স্বার্থ রক্ষা করা ছাড়া জনগণের সমর্থনের ওপর টিকে থাকতে পারবে না। থাকার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে।

অতএব এই ধারা বাংলাদেশে নিজেকে টিকিয়ে রাখবার জন্যই জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধের' ঘনিষ্ঠ মিত্র হতে বাধ্য। এই বাধ্যতাকে আমরা যেন নিছকই ষড়যন্ত্র বলে মনে না করি। এই রাজনীতির চরিত্র ও তার ঐতিহাসিক পরিণতি এই চরমপন্থা ছাড়া অন্য কোনো পথে যেতে পারবে না। যাবে না। কারণ এই ধারা গণবিরোধী এবং গণবিচ্ছিন্ন। এই আলোকেই ধর্মনিরপেক্ষতার এই বিশেষ রাজনীতির সঙ্গে আমরা বহুজাতিক কোম্পানি বা পরাশক্তির কোনো বিরোধ দেখি না। *প্রথম আলো*, সিপিডি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালসহ নানান এনজিও, ব্যবসায়ী ও তথাকথিত নাগরিক সমাজে তৎপর শ্রেণীকে আমরা আজ ড. ইউনূস, বহুজাতিক কোম্পানি ও পরাশক্তির পক্ষে রাজনীতি করতে দেখছি। একে শুধু পরাশক্তির অর্থে পুষ্ট হয়ে এবং তাদের রাজনৈতিক সাহায্যের অধীনে থেকে বহুজাতিক কোম্পানির বিনিয়োগের সুযোগ দেবার যড়যন্ত্র শুধু নয়। এই আঁতাতের রাজনীতিও পরিষ্কার থাকা দরকার। যার সামনে ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকা ওড়ে। এই পতাকাটিকে ইউরোপের বুর্জোয়া সামাজিক বিপ্লবের ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। জর্জ বুশের ক্রুসেডের পতাকা ও ক্রুসেডের চিহ্ন এই পতাকায় ডেভিডের স্টারসহ খচিত।

তাই মনে হয় ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে ব্লু প্যানেলের শিক্ষক বা আওয়ামী লীগেরও এই বিরোধিতা একান্তই এই পতাকা কার হাতে থাকবে সেই নেতৃত্বের বিরোধিতা ছাড়া অধিক কিছু হয় না। আওয়ামী লিফলেটবাজরা ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে যেসব লেখালিখি করছে সেইসব লেখা থেকে আমি এই দিকটাই উদ্ধার করতে পেরেছি। তাদের মূল ভাষা হচ্ছে এই রকম যে, আমরাই তো পরাশক্তি ও বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা বিশেষত রাজনৈতিক ইসলামের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত। তুমি আবার কে হে?

হয়তো এটা ঠিক– কিম্বা চট্টগ্রাম বন্দর সবার জন্য খুলে দেওয়া বলতে ড. ইউনূস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই 'সবাই' বুঝিয়েছেন। আওয়ামী লীগ হয়তো জানতে চায় সেই ক্ষেত্রে ভারতের নিরাপত্তা স্বার্থ নিশ্চিত করার ফর্মুলাটা কী? বিরোধ এখানেও থাকতে পারে। সময়ই সব বলে দেবে।

১৫ ফাল্গুন ১৪০৭। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৭। শ্যামলী।

রাজনৈতিক গতিপ্রক্রিয়া ও নতুন মেরুকরণের সম্ভাব্য ফলাফল

অনেকে আমার লেখালিখি নিয়ে এই বলে আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন যে, যেসব কথা আমি বলতে চাইছি তা বলার সুযোগ আগামী দিনে আরো কমে যাবে। অসম্ভব নয়। যাঁরা বলছেন তাঁদের মতামত এবং বিশ্লেষণকে আমি সম্মান করি। কারণ তাঁরা রাজনীতি বোঝেন। জানুয়ারির ১১ তারিখের পর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতির পরিমণ্ডল বদলে গিয়েছে সন্দেহ নাই। বাংলাদেশ ঠিক আগের বাংলাদেশ আর নাই, ১১ জানুয়ারির আগের জায়গা থেকে বাংলাদেশকে আর বোঝা যাবে না। আগামী দিন কী হতে যাচ্ছে সেটা বুঝতে হবে এখনকার রাজনৈতিক গতিপ্রক্রিয়া এবং নতুন মেরুকরণের চরিত্র দিয়ে। কিন্তু এখনকার রাজনৈতিক গতিপ্রক্রিয়া বলতে আমরা কী বুঝি? নতুন মেরুকরণটাও কীভাবে ঘটতে যাচ্ছে?

এখনকার রাজনৈতিক গতিপ্রক্রিয়া বুঝব কী করে? সাধারণ মানুষ ব্যাপারটা বোঝে তাদের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব দিয়ে যেমন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, বস্তি নির্মূল অভিযান, বিদ্যুত সংকট এবং তা সমাধানের

জন্য দোকানপাট সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করা ইত্যাদি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান ক্ষমতাসীন সরকারের সমর্থনের ভিত্তি তৈরির জন্য দরকার ছিল এবং শুরুর দিকে তা কাজ করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো আগামী দিনে কী কাজ করবে? সন্দেহ আছে। এর কারণ খুব সহজ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানের ক্ষেত্রে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল প্রধানত বিএনপি ও আওয়ামী লীগ। মানুষ সত্যি সত্যিই রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু দুর্নীতি কি শুধু রাজনৈতিক দলগুলো করেছে? কর্পোরেশান, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, দাতাসংস্থা, এনজিও, সামরিক-বেসামরিক আমলা প্রত্যেকেই দুর্নীতির জন্য দায়ী।

এমনকি বিশ্বব্যাংকও। বিশ্বব্যাংক বরং এই ক্ষেত্রে দুর্দান্ত উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। বিশ্বব্যাংক তার দুর্নীতি ও অপকর্মের ব্যাপারে নিজেও এতোটাই সচেতন যে আগের সরকারের আমলে আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদকে দিয়ে তারা একটি 'দায়মুক্তি'র বিধান পাশ করতে সচেষ্ট হয়েছিল। তারা বিভিন্ন দেশে কীভাবে কাজ করবে তার একটা বিধান জারি ছিল : The International Finance Organization Order ১৯৭২। কিন্তু এই বিধানের অধীনে বিশ্বব্যাংককে তার সম্পদ ও আয়ের জন্য কোনো কর দিতে হয় না। বিশ্বব্যাংকের আদেশ-নির্দেশে তার কর্মচারীরা কোনো কাজ করলে এই বিধানের অধীনে এর বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। বিশ্বব্যাংকের যাঁরা বিদেশি অর্থাৎ বাংলাদেশী বা স্থানীয় নাগরিক নন, তাঁদের এক্ষেত্রে ইমিগ্রেশান সংক্রান্ত নিয়মকানুন প্রযোজ্য হবে না ইত্যাদি।

এইসব সুবিধা থাকার পরেও বিশ্বব্যাংক গত সরকারের আমলে সাবেক আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদকে দিয়ে একটি নতুন 'দায়মুক্তি আইন The International Financial Organization (Amendment Act 2004) পাশ করবার জন্য জোর প্রয়াস চালিয়েছে যার বিরুদ্ধে লেখালিখি করতে হয়েছে, আন্দোলন-সংগ্রাম করে জনগণকে প্রতিরোধ করতে হয়েছে। এই নতুন দায়মুক্তির মানে হচ্ছে যদি বিশ্বব্যাংকের কারণে কোনো নাগরিক বা জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে আদালতে মামলা করা যাবে না। সরকার যদি কোনো কাজকে 'উন্নয়ন' বলে গণ্য করে তাহলে সরকারের সেই উন্নয়নমূলক কাজের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করার সুযোগ নাই বললেই চলে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় সরকারি উন্নয়নই তো চলে। দায়মুক্তির এই সুবিধা থাকার পরে বিশ্বব্যাংক কেন সরাসরি আরো দায়মুক্তির জন্য গত সরকারের ওপর চাপ দিচ্ছিল তা আন্তর্জাতিকভাবে সন্দেহ তৈরি করে। বিশ্বব্যাংক উন্নয়নের নামে কোনো বড়ো ধরনের দুর্নীতি বা অন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত কি?

বিশ্বব্যাংকের ফ্লাড একশান প্লান বা বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার কথাই ধরা যাক যা দেশে-বিদেশে প্রচণ্ড সমালোচনা তুলেছিল। এই পরিকল্পনার অধীনে

বিশ্বব্যাংক চেয়েছে নদীমাতৃক বাংলাদেশ ও বন্যাবিধৌত অঞ্চলগুলোকে শুকনা জমিনে রূপান্তর। খেয়াল করতে হবে 'বন্যা ব্যবস্থাপনা' ও 'বন্যা নিয়ন্ত্রণ' দুটো আলাদা ধারণা। নদী শাসন আর নদী ব্যবস্থাপনাও দুটো ভিন্ন ধারণা। নদী, বৃষ্টি, বন্যাবিধৌত অঞ্চলের সঙ্গে কৃষি, প্রাণ ও পরিবেশের জটিল সম্পর্ক বজায় রেখেই বানভাসী বাংলাদেশে বেঁচে থাকার জ্ঞান ও কৃৎকৌশলের জনক এই দেশের জনগোষ্ঠী হাজার বছর ধরে টিকে আছে। বিশ্বব্যাংকের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠল এই বলে যে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে মরুভূমি বানাতে চায়। এই দেশের জনগোষ্ঠীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার হদিস না নিয়ে বিদেশি কন্ট্রাক্টর ও কনসালটেন্টদের কাছে মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা পাচার করবার জন্য বন্যা ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে 'বন্যা নিয়ন্ত্রণ'-এর কথা বলছে। সত্যি বলতে কি ফ্লাড একশান প্লানের নামে যে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে তা অল্প কয়েকটি বিদেশি ফার্ম ও কনসালটেন্টের পকেটেই গিয়েছে আর একই সঙ্গে তার উপকারভোগী হিশাবে বাংলাদেশেও গড়ে উঠেছে একটা মুৎসুদ্দি শ্রেণী।

একটি উদাহরণই আমাদের বক্তব্য হাজির করবার জন্য যথেষ্ট। তাহলে বিদেশি কর্পোরেশান, কনসালটেন্ট ও ব্যবসায়ী শ্রেণীকে বিশ্বব্যাংকের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সহজে অর্থ পাচার এবং তার ফলাফল হিশাবে বাংলাদেশের প্রাণ, পরিবেশে, নদী, কৃষি ইত্যাদির ভয়াবহ পরিণতি ঘটানোর দায় নেবে কে? বিশ্বব্যাংক বলছে, আমি নেবো না। নেবো তো নয়ই এমনকি আইন করে আমাকে আমার সকল অপকর্ম থেকে দায়মুক্তি দিতে হবে। যদি ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন আদালতে গিয়ে নালিশ করে যে বিশ্বব্যাংক যে উন্নয়ন আর উন্নতির কথা বলে তা ভুয়া, প্রতারণামূলক এবং আদতে তা বিদেশি ব্যবসায়ী, কর্পোরেশান, কনসালটেন্টদের সহজে টাকা বানাবার ফন্দি তাহলে বিশ্বব্যাংক বিপদে পড়ে যেতে পারে। কারণ আদালতে প্রমাণ হয়ে যেতে পারে যে ব্যাপারটা আসলেই তাই। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের কাজের নিশ্চয়ই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন দরকার আছে। যদি তারা ভালো কিছু করে থাকে তাহলে আদালত নিশ্চয়ই তা অস্বীকার করবে না। কিন্তু বিশ্বব্যাংক বলছে, না, তা হবে না, আমরা কোনো মূল্যায়নই চাই না। আমরা যা করি সেটাই ঠিক, সেটাকেই বিনা বিচারে মেনে নিতে হবে।

এই যদি হয় বিশ্বব্যাংকের নজির তাহলে আর অন্যদের কী বলবো? সাধারণ মানুষ বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ বিশ্ব বাণিজ্যসংস্থা কী করে তা জানে না। কর্পোরেশগুলোর দুর্নীতির হদিস রাখে না। যদি আমরা দুর্নীতির উচ্ছেদ করতে চাই তাহলে উপদেষ্টাদের মধ্যে কে যেন বলেছিলেন– তিনি 'রাঘব বোয়ালের' ব্যবসা করবেন, 'চুনোপুঁটির নয়– আমি তাঁর সঙ্গে একদমই একমত। আসুন না তাহলে বড়ো বোয়ালগুলো ধরি– এই বোয়াল কর্পোরেশান, যাদর পেছনে আছে বিশ্বব্যাংক ও দাতাসংস্থা।

কী দাঁড়াল? দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে জনগণের সমর্থন আছে অবশ্যই, কিন্তু তারা অচিরেই দেখবে যে আসলে দুর্নীতি অভিযানের কথা বলা হচ্ছে শুধু লিস্টি ধরে রাজনৈতিক দলের অল্প কয়েকজন হাতে গোনা দুর্নীতিবাজদের। সেটা ভালো কাজ সন্দেহ নাই, কিন্তু দুর্নীতির খোদ জায়গার টিকির খবরও নাই। বিদ্যমান যে-ব্যবস্তা দুর্নীতিকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে সেখানে আঁচড় দেবার সংকল্প ও ক্ষমতা থাকা চাই। তা না হলে দুর্নীতিবিরোধী এই অভিযানের প্রতি জনগণের সমর্থন সাময়িক হতে বাধ্য। সরকার না হয় জরুরি অবস্থা অধ্যাদেশ জারি করে আমাদের মুখে কুলুপ এঁটে দিলো– তাতে কি শেষ রক্ষা হবে? আমরা কি বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিরুদ্ধে আমাদের দুনিয়াব্যাপী লড়াই সংগ্রামের ময়দান ছেড়ে যাবো? যাবো না। কারণ এই লড়াইয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের স্বার্থ এবং ইজ্জতের সঙ্গে বিশ্বসভায় আমাদের টিকে থাকার প্রশ্ন জড়িত।

ঠিক তেমনি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের নামে আমরা দেখলাম শক্তিমানের স্থাপনাগুলো ঠিকই অক্ষত রয়ে গেছে। বাংলাদেশের প্রাণ ও পরিবেশ রক্ষার জন্য অনেক আইন আছে। তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আইন হচ্ছে Wetland Protection Act ২০০০। এই আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বন্যাবিধৌত অঞ্চল ও পানিনির্ভর প্রকৃতির প্রাণ ও পরিবেশ রক্ষা করা। যদি আমরা রক্ষা করতে না পারি তাহলে প্রাণে বেঁচে থাকাই দুঃসাধ্য হবে। এই আইন ভঙ্গ করে ব্যবসায়ীদের বাঘা বাঘা প্রতিষ্ঠান BGMEA, FBCCI, BTMA ইত্যাদি সংস্থাকে এই ধরনের অঞ্চলে বিল্ডিং বানাবার জন্য জমি দেওয়া হয়েছে। বিজিএমইএ-র ১৫ তালা ভবন এই ধরনের একটি জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা সুস্পষ্টভাবে আইনের লঙ্ঘন। কই বিজিএমই-এর কোনো ব্যবসায়ীকে তো দেখলাম না যে তাঁরা যে আইন ভঙ্গ করে একটি অবৈধ স্থাপনা তুলেছেন তার বিষয়ে একটি কথা বলতে? এই বিল্ডিং বানাবার জন্য ওপরে উল্লেখ করা আইনের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের জন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তাঁরা অনুমতি নিয়েছেন? অথচ এঁদেরই একাংশ এই সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সরকার ও জনগণের মধ্যে আরো দূরত্ব তৈরি করবার জন্য আবদার শুরু করলেন যে শুক্রবার ছুটি খারিজ করে দিতে হবে, তথাকথিত উন্নত দেশের সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের ছুটি হবে রবিবার। টেলিভিশানে একটি টক শোতে বিজিএমইর এক প্রতিনিধিকে আমি প্রশ্ন করলাম, আপনারা কি মনে করেন বাংলাদেশ রাষ্ট্র নিছকই একটা পোশাক তৈরি কারখানা? শুক্রবার ছুটির দিন হওয়ার কারণে আপনাদের ব্যবসার কোনো ক্ষতি হয়েছে তার তো কোনো প্রমাণ নাই, তাহলে আপনারা মিথ্যার বেসাতি করছেন কেন? মতলবটা কী আপনাদের? আমাদের কি কোনো পরিচয় থাকবে না, সংস্কৃতি থাকবে না, ধর্ম থাকবে না? বাংলাদেশ খালি কাপড় বানাবে আর বিদেশে বেঁচবে?

এই জন্যই কি আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি? এই জন্যই কি আমরা একটি রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী? একটি রাষ্ট্র?

বাংলাদেশের ছুটি শুক্রবারেই হতে হবে তার কোনো কথা নাই। কিন্তু আমাদের ধর্মপ্রাণ মানুষগুলোর জন্য এই দিনটি ছুটি থাকলে তাঁদের সুবিধা হয়, তাঁরা দাবি করেছেন এবং আসলেই সেটা সত্য। এর মধ্যে ধর্ম টেনে এনে পক্ষে বিপক্ষে নানান ফতোয়া পড়েছি। একটা বাজে কূটতর্ক তেরি করেছে ব্যবসায়ীদের একাংশ। তাদের ব্যবসা ও টাকার এতোই লোভ যে বিদেশিদের একটা মহল– যারা শুক্রবার ছুটি থাকা সেক্যুলার নয় বলে দাবি করে, কিন্তু রোববারে আপত্তি তোলে না– শুধু তাদের মনোরঞ্জনের জন্য খামাখা এই তর্কটা তাঁরা তুলেছেন। তাঁদের ধৃষ্টতা কতোটুকু হতে পারে তার প্রমাণ হলো এই যে, তারা বারবার বলেছে যে একটি রাজনৈতিক সরকার দিয়ে এই কাজটা করা যাবে না অতএব একটি অরাজনৈতিক সরকারকে দিয়েই এই অপ্রিয় কাজটি করতে হবে। তারা জানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ব্যাপারটাকে ভালো চেখে দেখবে না, তবুও এই সরকারকে দিয়েই তারা শুরুতেই এই অপ্রিয় কাজটি করিয়ে নিতে চাইছে। আর তারাই, আমরা দেখছি আমাদের প্রাণ ও পরিবেশ বিধ্বংসী কাজ করতে একবারও নিজেদের বিবেককে প্রশ্ন করেনি। এখন দুর্নীতিবাজ কাকে বলি? লোম বাছতে তো কম্বল উজাড় হবার দশা। আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না? কেনো? তারা শক্তিশালী বলে?

বস্তি উচ্ছেদ নিয়ে আমি কয়েকবারই লিখেছি। মানবিক দিক ও নাগরিকদের আবাসনের অধিকার নিশ্চিত করা ছাড়াও পেন্টাগন এখন সারা দুনিয়ায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু হিশাবে বস্তিকে চিহ্নিত করেছে। শহর হিশাবে ঢাকাও অন্তর্ভুক্ত। এই তথ্যও আমরা এখন জানি।

জিনিসপত্রের মূল্য বাড়ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ কী করে বেঁচে থাকবে তা এক কঠিন প্রশ্ন হয়ে সামনে চলে আসছে। র‍্যাবের দুজন সদস্যের নৃশংস হত্যার ঘটনায় সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করছে যদি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিজের নিরাপত্তা নিজেই নিশ্চিত করতে না পারে তাহলে তাঁরা আমাদের কী করে রক্ষা করবেন। সবকিছু মিলিয়ে আমরা জটিল একটি পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তাহলে দেখা যাচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান এই সরকারের জনপ্রিয়তাকে স্থায়িত্ব দেবে না। বরং পরিস্থিতি থিতু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপজ্জনক প্রশ্নের মুখোমুখি করবে।

সমাজের মেরুকরণের যে ধারা আমরা লক্ষ করছি তাতে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার। কয়েকটি গণমাধ্যম এবং তথাকথিত সিভিল সোসাইটির একটি অংশ এই সরকারের সময়সীমা বেঁধে দিতে চাইছে না। সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ যতোদিন তৈরি না হয় ততোদিন এই সরকার থাকুক– এই কথা তাঁরা বলছেন। কিন্তু কখন কীভাবে নির্বাচন হবে এবং কী লক্ষণ দেখে আমরা বুঝবো যে বাহ্

এইবার নির্বাচন করা যায়, সেই বিষয়ে তাঁদের কোনো ব্যাখ্যা নাই। আমরা ধরে নিতে পারি তাঁরা চাইছেন বাংলাদেশে দীর্ঘদিন একটি অরাজনৈতিক সরকার থাকুক। *প্রথম আলো, ডেইলি স্টার* এই ধারার সমর্থক এবং তাদের সঙ্গে আছে সিপিডি বা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জাতীয় সংগঠনগুলো। এইসব সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের টাকায়। অর্থাৎ ইউএসএইডের টাকায়। ইউএসএইডের টাকা অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য পায়, সেটা আলাদা বিষয়। কিন্তু সিপিডি বা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জাতীয় সংগঠনগুলোই গড়া হয়েছে খোদ মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অর্থাৎ ইউএইসএইডের (United States Agency for International Development) অর্থে। তারা যেন নিজেদের গঠন ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার জন্য দরকারি আদি অর্থটা ইউএসএইড (মার্কিন সাহায্য সংস্থা) দিয়েছে। এদের রাজনৈতিক অবস্থান বুঝতে হলে এই ইতিহাসটুকু অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

ড. ইউনূস এঁদের প্রতিনিধি ছিলেন এবং আছেন। চট্টগ্রাম বন্দরকে গভীর সমুদ্র বন্দর বা মহাবন্দর হিশাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন ঠিক ড. ইউনূসের কিনা এই প্রশ্ন আছে। আমি এর আগে আমার লেখায় বলেছি বিষয়টি বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়– নিছকই অর্থনৈতিক প্রশ্ন নয়। চট্টগ্রাম বন্দরকে দক্ষ করবার জন্য সংস্কার হতেই পারে। কিন্তু ড. ইউনূস সেই কথা বলছেন না। তিনি বন্দর, তাঁর ভাষায়, 'খুলে দিতে' চাইছেন। আর এই 'খুলে দেওয়ার' অর্থ বুঝেই চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কায়কারবারটা আমাদের বুঝবে হবে।

অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলো তাড়াতাড়ি নির্বাচন চাইছে। এটা স্বাভাবিক। কারণ দীর্ঘ সময় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ না করার ক্ষতি সুদূরপ্রসারী হতে পারে। এই ক্ষেত্রে যেসব রাজনৈতিক দলের সত্যি সত্যিই গণসমর্থন আছে তারা অবশ্যই দ্রুত নির্বাচনের পক্ষপাতী। অন্যদিকে ড. ইউনূসও নির্বাচন তাড়াতাড়ই চান। তাঁর চাইবার কারণ হচ্ছে ইমার্জেন্সির অধীনে নির্বাচন তাঁর পক্ষেই হবে। তবে এটা যে তাঁর ভুল হিশাব সেটা এখনই তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর চ্যালেঞ্জ দেখে যেমন আমরা টের পাচ্ছি, তিনি দ্রুতই বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন।

কিন্তু রাজনৈতিক মেরুকরণের মূল জায়গা ঠিক নির্বাচন নয়, বরং নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে প্রস্থানের একটা পথ আবিষ্কার করা। এইখানেই বাংলাদেশের রাজনীতির ঝড়টা কেন্দ্রীভূত হবে। তার কয়েকটি দৃশ্যমান কারণ আছে।

এক. এই সরকার নিজেকে এখনও তত্ত্বাবধায়ক সরকারই বলছে। যদিও মুখ ফসকে আমরা 'অন্তর্বর্তী কালীন' সরকার কথাটিও শুনেছি। যদি বর্তমান সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার হয়ে থাকে তাহলে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেবার এখতিয়ার বাংলাদেশের সংবিধান এই ধরনের সরকারকে দেয়নি। নির্বাচন করা ও দৈনন্দিন

কাজ চালানোই তত্ত্বাবধানের কাজ। নীতিগত সিদ্ধান্ত দিতে পারে একমাত্র নির্বাচিত সরকার। নতুন নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে তাহলে এই বিষয়টির মীমাংসা করতে হবে। নইলে জরুরি অবস্থার পরে বিভিন্ন নীতিগত বিষয়ের মীমাংসার জন্য আদালতে মামলা আসতে পারে। সংবিধান পূনর্বহাল হলে এই সরকার বিপদে পড়তে পারে। এই কারণেই এই সরকারকে কোনো প্রকার নীতিগত সিদ্ধান্ত দেওয়া বা নেওয়া থেকে বিরত থাকার কথা। আমরা এর আগে বলেছি।

দুই. নির্বাচন যখনই হোক, এই সরকার বলছে যারা দুর্নীতিবাজ বলে আদালতে প্রমাণিত হবে তাঁদের নির্বাচন করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু নির্বাচিত সরকারের অধীনে সংবিধান পুনর্বহালের পর প্রশ্ন উঠবে সরকার যা কিছু করেছে তা কতোটা সংবিধানসম্মত ছিল? সরকার মাত্রই সংবিধান ও আইনের অধীনে। বলাবাহুল্য, রাজনৈতিক দলগুলো এই সরকার আসায় খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু তাদের হাজারো দুর্নীতি ও অপকর্মের ফলে তাদের গণসমর্থনের ভিত্তি চলে গিয়েছে ভাবা মারাত্মক ভুল হবে। জনগণ নিশ্চয়ই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে অভিযান সমর্থন করেছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ভোট দেবার সময় তারা তাদের নিজ নিজ দলের আনুগত্য পরিহার করে নতুন কোনো দল বা দলের বাইরের স্বতন্ত্র কোনো ব্যক্তিকে ভোট দেবে। ধরা যাক, দুর্নীতিবাজরা ক্ষমতায় এলো না। খুব ভালো কথা। কিন্তু আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলগুলোই তো সংসদে বসবে। সংসদে বর্তমান সরকারের সব কাজকে বৈধতা দেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। এই সরকার কী করে বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে সেটা আদায় করবে?

বর্তমান পরিস্থিতি থেকে প্রস্থানের জন্য ত্রিদলীয় জোটের রূপরেখার অভিজ্ঞতা কাজে লাগে না। বর্তমান সরকার গণআন্দোলন-সংগ্রামের ফসল নয়। কেউ সংবিধান রক্ষার শপথ নিলে তার ক্ষেত্রে অপরাধ মারাত্মক। এরশাদ দায়মুক্তির পর নিশ্চিত করে গিয়েছিলেন গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পথ রুদ্ধ করে– ত্রিদলীয় জোটের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে।

তিন. সাংবিধানিকতা নিয়ে নানা কথা উঠেছে, যা অস্বীকার করা মুশকিল। এই সরকার বলতে পারে দেশ ও দশের স্বার্থে সংবিধানের বাইরে আমাদের কাজ করতে হয়েছে। ভালো কাজের পক্ষে জনসমর্থন আদায় করা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু তার মানে নিজেদের নিছক আর তত্ত্বাবধায়ক বলে দাবি করা যাবে না। যদি তাই হয় তাহলে বিদ্যমান সংবিধানের অধীনে একটি নির্বাচিত সংসদে বর্তমান সরকারকে বৈধতা দানের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। একটি জটিল আবর্তের মধ্যে বাংলাদেশ নিক্ষিপ্ত হয়েছে, বেরুবে কী করে?

২১ ফাল্গুন ১৪০৮। ৫ মার্চ ২০০৭। শ্যামলী।

জটিল আবর্তে পড়েছে বাংলাদেশ

বলছিলাম, বাংলাদেশ একটা জটিল আবর্তের মধ্যে এবং এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে প্রস্থানের নীতি ও কৌশল আবিষ্কার ও কার্যকর করতে পারা বা না-পারার মধ্যেই নির্ভর করছে আগামী দিনের অবশ্যম্ভাবী রাজনৈতিক তুফানের চরিত্র। নির্বাচন হওয়া বা না-হওয়া এখন একদমই গৌণ একটি বিষয়। প্রশ্ন হচ্ছে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে একটি প্রস্থান-পথ আবিষ্কার করা কি সম্ভব? এই ব্যাপারে নানা কারণে সন্দেহ দানা বেঁধেছে।

এটা এখন আর অস্বীকার করার আর উপায় নাই যে ১১ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখের পরে যা কিছু ঘটেছে বা ঘটবে তাকে সাংবিধানিক বৈধতা দেবার একটা দায় থেকেই যাচ্ছে। অন্যদিকে বর্তমান পরিস্থিতি ১৯৭৫ সালের পরে সিপাহি-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক বাস্তবতা নয় যার ওপর দাঁড়িয়ে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গড়ে তুলেছিলেন, এমনকি বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে ১৯৮২ সালের প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন জারির গুণগত পার্থক্যও পরিষ্কার। তখন সরকারের সর্বময় ক্ষমতা সরাসরি সেনাবাহিনীর হাতে ছিল এবং পরবর্তী রাজনৈতিক গতিপ্রক্রিয়া মোটামুটি সেনাবাহিনীই নিয়ন্ত্রণ করেছে। কূটনৈতিক দূতাবাস বা দাতাসংস্থার প্রভাব ছিল অবশ্যই, কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন যে ধরনের দৃশ্যমান কূটনৈতিক নিয়ম বহির্ভূত হস্তক্ষেপ আমরা দেখছি সেটা ছিল না। দুর্বল দেশগুলোর সার্বভৌমত্বের প্রতি নিদেনপক্ষে লোকদেখানো সম্মান প্রদর্শন করা এখন পরাশক্তিগুলো একদমই জরুরি মনে করে না। জাতিসংঘের চরিত্র বদল হয়েছে এবং ইকনমিস্টের মতো পত্রিকাও বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছে যা জাতিসংঘকে আমরা এর আগে অন্য দেশে সৈনিকরা নিজেদের হাতে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিক তার জন্য কখনো প্ররোচিত করতে দেখিনি, কিন্তু বাংলাদেশে দেখলাম। ইকনমিস্ট তাদের ওয়েবসাইটে লিখছে : "জানুয়ারির দশ তারিখে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মইন উ আহমদের কাছে যে চিঠি পাঠানো হয়েছে তা হল ৬০ বছরের ইতিহাসে জাতিসংঘের নানান হস্তক্ষেপের তুলনায় অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। এই চিঠি তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলে যে যদি তাঁর সেনাবাহিনী জানুয়ারির ২২ তরিখের টালমাটাল নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারকে নিরাপত্তা প্রদান

করে তাহলে সেনাবাহিনী জাতিসংঘের শান্তিমিশনে আয় উপার্জন করবার কন্ট্রাক্টগুলো হারাবে"।

জাতিসংঘের এই হুমকিতে ঠিক ফলটিই পাওয়া গিয়েছে। তার পরদিন জেনারেল আহমেদ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিনের অফিসে মার্চ করে যান এবং তাঁকে জরুরি অবস্থা ঘোষণা, ইলেকশান বাতিল এবং সেনাবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট একটি বেসামরিক সরকার গঠনের নির্দেশ দেন। এই ঘটনা থেকে ইকনমিস্ট সারমর্ম টানছে যে "ব্যাপারটা আসলেই ভারী বিচিত্র, কারণ সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতা নিয়ে নেবার জন্য প্ররোচিত করে বেড়াতে জাতিসংঘকে এর আগে আমরা দেখিনি" (The intervention was strange on the face of it, because the UN is not known to go around inciting army takeovers.)

সেনাবাহিনী ১৯৮২ সালে দেশের ক্ষমতা হাতে তুলে নেবার পক্ষে নিজেরাই যুক্তি দিয়েছে, জাতিসংঘের কাছ থেকে কোনো চিঠি সরবরাহ করতে হয়নি। সেনাশাসন কেউ মেনেছে আর কেউ তা মানেনি, সেটা ভিন্ন বিতর্ক। কিন্তু এর পরেও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ জাতীয় পার্টি গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং জাতীয় সংসদে তাঁর সেনাশাসনের এবং ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় সকল নীতিগত সিদ্ধান্ত সাংবিধানিকভাবে বৈধ করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও শক্তির ভারসাম্য এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তাঁর অনুকূলে ছিল।

সাংবিধানিক বৈধতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য 'ত্রিদলীয় জোটের রূপরেখা'র ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর। যদি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হত তাহলে সেনাশাসন ও নয় বছরের ক্ষমতাকে সাংবিধানিকভাবে বৈধতা দেওয়া সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। "ত্রিদলীয় জোটের রূপরেখা"-র মাধ্যমে এরশাদ সরকার তাঁর শাসনামলকে শুধু বৈধই করেননি, এমনকি পুরো নব্বই দশক জুড়ে তাঁর বিরুদ্ধে যে গণআন্দোলন চলছিল তা গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হওয়ার এবং একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটবার সম্ভাবনাকে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও বামপন্থী দলগুলোর সঙ্গে যোগসাজশে নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে দিকটা বিশেষভাবে বোঝার দারকার তা হল, এই কাজে ৮,৭ ও ৫ দলীয় জোট তাঁর বিরোধী পক্ষ ছিল না, বরং তাঁর মিত্র ছিল। কারণ হলো যদি গণঅভ্যুত্থান ঘটতো তাহলে একাত্তর সালের পর থেকে প্রতিটি সরকারের কর্মকাণ্ডই জনগণের বিচার ও পর্যালোচনার অধীন হয়ে পড়তো, 'সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা'-র নামে তাকে আপসে-আপ বৈধ প্রমাণ করা যেত না। অর্থাৎ একটা সংসদীয় নির্বাচন করে সেই সংসদের নিজের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের পাশ করিয়ে এনে

সবকিছুকে মেজরিটি ভোটের মাধ্যমে “বৈধ” করে নেবার যে রাজনীতি চালু করা হয়েছে সেই রাজনীতি মুখ থুবড়ে পড়তো।

আসলে ক্ষমতা হস্তান্তরের সেই রূপরেখা “ত্রিদলীয়” ছিল না, ছিল “চারদলীয় রূপরেখা”– কারণ ক্ষমতাসীন শক্তিও একটি পক্ষ ছিল। সেনাবাহিনী জনগণের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এরশাদের পক্ষাবলম্বন সুবিবেচনার কাজ মনে না করায় হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। চারপক্ষের এই মৈত্রী গড়ে উঠেছিল জনগণের রুদ্ররোষ থেকে শাসক ও শোষক শ্রেণীর গণবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্ষা করবার তাগিদে। অর্থাৎ একদিকে ছিল ডান/বাম ইত্যাদি গণবিরোধী অগণতান্ত্রিক শ্রেণী আর তার প্রতিপক্ষ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ গণতান্ত্রিক জনগণ। ইতিহাসের এই পরাজিত অধ্যায়গুলো আমাদের অবশ্যই বর্তমানকে বিচার করবার সময় মনে রাখতে হবে। পুরা একটি দশক জনগণ একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়বার জন্য লড়াই-সংগ্রাম করেছে। কিন্তু তথাকথিত “ত্রিদলীয় জোটের রূপরেখা”র ভিত্তিতে বা চার পক্ষের আঁতাতে জনগণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে নস্যাৎ করে দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর হলো, তথাকথিত “তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা” চালু করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু সবকিছুর পেছনে যে সত্যকে আড়াল করা হলো তা হলো “সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা” বজায় রাখবার কথা বলে এর আগের সকল সরকারের অসাংবিধানিক কার্যকলাপকে স্বীকৃতি বা বৈধতা দান করা। রাজনীতিতে সংবিধান লঙ্ঘন করা রেওয়াজে পরিণত হলো, কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদ নির্বাচিত করে এনে সংসদে সকল অসাংবিধানিক কাজ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে বৈধ করে নেওয়া যায়– এই রীতি চালু হলো।

“ত্রিদলীয় জোটের রূপরেখা” বা চারপক্ষীয় আঁতাত তাহলে সামরিক শাসন জারি ও নয় বছর শাসনকর্ম থেকে প্রস্থানের রূপরেখাও বটে। বলাবাহুল্য, এই রূপরেখা কাজ করেছে, কারণ এই আঁতাতে প্রধান তিন পক্ষেরই স্বার্থ নিহিত ছিল, একমাত্র ‘বাম দল’ নামে কথিত শাসক ও শোষক শ্রেণীর লেজুড়ের ভূমিকা পালনকারী ৫ দল ছাড়া। জনগণের পক্ষাবলম্বন না করে ৫ দল নির্লজ্জভাবে শাসক ও শোষক শ্রেণীর পক্ষাবলম্বন করায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের লেজুড়বৃত্তির ভূমিকাই চিরস্থায়ী হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতির পরবর্তী ইতিহাস ও বামপন্থী দলগুলোর বর্তমান দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থাই তার প্রমাণ। প্রধান তিনপক্ষ নিজেদের মধ্যে প্রতি পাঁচ বছর কারা এই দেশকে লুটপাট শোষণ শাসন করবে তা নির্ধারণ করবার জন্য একটা আজব নিয়ম আবিষ্কার করে নিয়েছে– একেই বলা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। গণআন্দোলনের উত্তাপে পর পর দুইবার ক্ষমতা হস্তান্তরের এই আজব নিয়ম কাজ করলেও জনগণের নিস্পৃহতায় এখন তা মুখ থুবড়ে পড়েছে–রাজনীতি হয়ে গিয়েছে শাসক ও শোষক শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ বিবাদ ও সহিংস হানাহানির ময়দান। রাজনীতি যদি স্বেচ্ছাচারেই পরিণত হয়, যা

খুশি তাই করে এরপর সংসদে বৈধ করে নেওয়াই যদি রেওয়াজ হয়ে ওঠে তাহলে সহিংসতা ও হানাহানি রাজনীতির প্রধান চরিত্র-লক্ষণ হয়ে উঠতে বাধ্য।

দেখা যাচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে প্রস্থানের জন্য যে রূপরেখার আমরা সন্ধান করছি, ত্রিদলীয় জোটের রূপরেখার ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগে না। বর্তমান সরকার আন্দোলন-সংগ্রামের ফল নয়। সেই রূপরেখা এমনভাবে প্রণীত করা হয়েছিল যাতে সাপও মরে এবং লাঠিও না ভাঙে। সংবিধান উৎখাত করে সামরিক শাসন জারি নিঃসন্দেহে সাংবিধানিকভাবে ভয়ংকর অপরাধ। কেউ যদি সংবিধান রক্ষার জন্য শপথ নেয় তার ক্ষেত্রে এই অপরাধ আরো মারাত্মক। কিন্তু এই অপরাধ থেকে দায়মুক্তির পথ এরশাদ নিশ্চিত করে গিয়েছিলেন গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় না আসার পথ রুদ্ধ করবার জন্য ত্রিদলীয় জোটের সঙ্গে সমঝোতা করে। যদি গণঅভ্যুত্থান ঘটতো তাহলে সেই বিপ্লবী সরকারের বৈধতার ভিত্তি হতো গণআন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থান– উকিলদের মুসাবিদা করা ও হাজারো কাঁটাছেঁড়া করা সংবিধান নয়। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার নামে নিজ শাসনামলের বৈধতাও বিরোধী দলগুলোর কাছ থেকে এরশাদ আদায় করতে পেরেছিলেন। মনে রাখতে হবে এটা ঘটেছিল তীব্র গণআন্দোলনের মুখে।

এই দিকগুলো আমাকে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে এই কারণে যে রাজনীতি বলতে আমরা সাধারণ রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পরের প্রতি অশোভন উক্তি বিনিময়, সহিংসতা ও তীব্র প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই তো দেখি। সাধারণত এই সকল সামরিক বাহ্যিক ঘটনা দেখে আমরা রাজনীতি ব্যাখ্যা করতে অভ্যস্ত। অন্যদিকে আমরা ইতিহাস ভুলে যাই, পর্যালোচনা করি না, কাজে কাজেই ইতিহাসের তাৎপর্য ধরতে পারি না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও পক্ষের শ্রেণীগত চরিত্র, গণবিরোধী স্বার্থ এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে তাদের নেতিবাচক ভূমিকার বিচার আমরা এখনও করতে শিখিনি। অতএব বর্তমান পরিস্থিতি থেকে কীভাবে আমরা বের হয়ে আসবো তার সন্ধান এখনও জানি না। যদি সেই দিকে আমরা মনোযোগ নিবদ্ধ করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের সংবিধান সচেতন হতে হবে। কারণ আমরা চাই বা ন-চাই সংবিধান কেন্দ্র করেই আগামী দিনের রাজনীতি আবর্তিত হবে এবং সরকারের বৈধতা বা অবৈধতার প্রশ্নের মীমাংসা হবে। একই সঙ্গে নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন ও কায়েমের জন্য গণতাগিদও তৈরি হতে থাকবে। একটি জনগোষ্ঠী যখন রাজনৈতিকভাবে তাদের গড়ে তোলে, নিজেদের রাজনৈতিকতার বিকাশ ঘটায় তখন সেটা তাদের সাংবিধানিক তর্কবিতর্ক দিয়েই সবচেয়ে স্পষ্ট বোঝা যায়। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রশ্ন এখনও অবধি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের কর্তব্য হয়ে আছে। হয়তো বাংলাদেশের রাজনীতি বিদ্যমান সংবিধানের মধ্যে আর

আটকা পড়ে থাকবে না। জনগণের কাছ থেকে নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধানের দাবি উঠবে। কারণ ইতিহাসের অভিমুখ সেই দিকেই দ্রুত ধাবিত হচ্ছে।

গত কয়েক দশকে আমরা রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে যাইনি। বরং রাজনৈতিক প্রশ্নগুলো ক্রমশ আরো পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি বিদ্যমান সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে বর্তমান সংকটের সমাধান সন্ধান করবো? সেটা কি এখন আর আদৌ সম্ভব? সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতান্ত্রিক ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও অভিপ্রায়ের সঙ্গে সরকার ও রাষ্ট্রের যে দূরত্ব ও বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে তা আরেকটি উদগিরণের জন্য থম ধরে বসে আছে বলেই আমার মনে হয়। আমরা কি দেয়ালের লিখন পড়তে পারছি?

আমার ধারণা, আমরা পারছি না। ভোলার চরফ্যাশনে ২১ ফেব্রুয়ারিতে যুবদল নেতা দুলালের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘটেছে তা এমনি একটি দেয়ালের লিখন– সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের মনমানসিকতা চিন্তাচেতনা এখন ঠিক কোথায় আমরা যেন তা বুঝতে ভুল না করি। মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ইতোমধ্যেই ভোলার ঘটনা সম্বন্ধে তাঁদের নিজেদের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। এই প্রতিবেদন থেকে আমরা গণমানুষের ক্ষোভ ও প্রতিরোধের ক্ষমতার অনেক ইঙ্গিত পাই। এই অভিজ্ঞতা থেকে বহু কিছু শিক্ষা নিতে পারি।

বর্তমান পরিস্থিতি আরো নানা কারণে এর আগের পরিস্থিতি থেকে আলাদা। বিশেষত বর্তমান সময় হচ্ছে ৯/১১-এর পরের সময়– অর্থাৎ আমরা একটি বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতির মধ্যে বাস করছি। এই যুদ্ধের দুই পক্ষের এক পক্ষ রাষ্ট্র আর অন্য পক্ষ বিপুল একটি জনগোষ্ঠী যারা বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধবিগ্রহ, পরদেশ দখল, সহিংসতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ। এই ক্ষোভের প্রকাশ তারা শান্তিপূর্ণভাবে যেমন করছে তেমনি সহিংসভাবেও করতে বাধ্য হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' চালাচ্ছে এবং সেই যুদ্ধের দিক থেকে বাংলাদেশ একটি যুদ্ধক্ষেত্রই বটে। কারণ এই দেশটির লোকসম্পদ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী হবার কারণে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির ভাষায় 'হাই রিস্ক' কান্ট্রি– অর্থাৎ অতিশয় বিপজ্জনক একটি দেশ। বাংলাদেশ কেনো এতো বিপজ্জনক এবং কেনই বা প্রবলভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই প্রচার চলছে? এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অভিমত হচ্ছে একদিকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও প্রাণসম্পদ, অন্যদিকে বাংলাদেশে নতুন এক ভোগী শ্রেণীর আবির্ভাবের কারণে বড়ো একটি বাজার গড়ে ওঠার অনেক কারণের মধ্যে প্রধান। অর্থাৎ বাংলাদেশকে রাজনৈতিকভাবে অধীন করে রাখলে অর্থনৈতিক লাভ আছে। গ্যাস, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ এবং প্রাণসম্পদ ও বৈচিত্র্য বাংলাদেশের জন্য কাল হয়েছে হয়তো। তবে অনেকে বাংলাদেশকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে বিপজ্জনক দেশ বলে গণ্য করে। এই দেশের জনগণের ওপর

পরাশক্তির সহায়তায় একনায়কী শাসন জারি করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এর অর্থ হচ্ছে এই যে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বেরুবার চাবি পুরোটা আমাদের হাতে নাই। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি পরাশক্তিগুলোর জন্যও অস্বস্তিদায়ক। অতএব তারা দ্রুত নির্বাচনের পক্ষপাতী।

এটা পরিষ্কার যে ধনী ও ক্ষমতাবান শ্রেণীর দুটো পক্ষের দাঙ্গাহাঙ্গামা থেকে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। বর্তমান পরিস্থিতি সৈনিক-জনতার অভ্যুত্থান বা গণআন্দোলনের ফল নয়। এর অর্থ হচ্ছে জনগণ শেষাবধি কী পথ গ্রহণ করে, কোন পথে যায় কিংবা কোন ঘটনায় বড়ো ধরনের প্রতিক্রিয়া জানায় আমরা জানি না। তবে যে অস্বস্তি ও থম ধরা ভাব আমরা চতুর্দিকে দেখছি তা ঝড়ের পূর্বাভাস কিনা আমরা এখনো তা জানি না। হতেও পারে। এই পরিস্থিতিতে, বিশেষত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ফলে পরাশক্তির হাতে জিম্মি হয়ে থাকার কারণে বাংলাদেশ আদৌ কোনো প্রস্থান পথ বের করতে পারবে কিনা আমি সন্দেহ করি। নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে এবং আগামী সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে জিতে এসে এখনকার কর্মকাণ্ডকে সাংবিধানিকভাবে বৈধ করবার পথ আগের তুলনায় এখন অনেক কঠিন। ড. ইউনূস যদি এই পরিকল্পনার অংশ হয়ে থাকেন তাহলে তা এখন পর্যন্ত ব্যর্থই মনে হচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমি দাবি করে আসছি সৈনিক ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের সঙ্গে মৈত্রীই আমাদের সুরক্ষার একমাত্র রক্ষাকবচ। দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে যে অভিযান চলছে তার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সমর্থন আছে, এই সমর্থনকে আরো গভীর করাবার জন্য জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জানবার জন্য সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা নেওয়ার দরকার রয়েছে। অনির্বাচিত সরকার কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত নিক তা কাম্য নয় বলে আমরা বলেছি। কিন্তু জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে জ্বালানি নীতি, কৃষি নীতি, আবাসন নীতি, শিল্প ও শ্রম নীতি, পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য নীতি প্রণয়ন ও তা জনগণের কাছে প্রস্তাব করবার মধ্য দিয়েই সরকার জনগণের কাছে কতোটা ঘনিষ্ঠ তা প্রমাণ করতে পারে।

জনগণের দিক থেকে যদি বলি, সরকারকে আগের মতো সাংবিধানিক খেলাই খেলতে হবে এই মুহূর্তে এমন কোনো দাবি নাই, এই সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ দেখছে কিনা সেটাই এখন প্রধান বিবেচ্য। সত্যি কথা কি, এখন পর্যন্ত সরকারের দিক থেকে এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি যাতে সাধারণ মানুষ স্বস্তি বোধ করতে পারে। ওপর থেকেই দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় নীতি প্রণয়ন হচ্ছে, এমনকি প্রণয়নের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে সকল নির্বাহী কাঠামো নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে তাও ওপর তলার। জনগণের সঙ্গে যুক্ত থাকার বা জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জানবার কোনো প্রক্রিয়া বা কাঠামো নিয়ে ভাবনাচিন্তা আমরা দেখছি না। এর ফলে দ্রুত সরকারের গণবিচ্ছিন্নতা ঘটছে এবং

রাজনীতিহীন পরিস্থিতিতে এই ধরনের অবস্থা অকস্মাৎ যে কোনো সময়ে নৈরাজ্য ও চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে পারে।

জনগণ গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য গঠনমূলক আন্দোলন-সংগ্রামে সবসময়ই রাজি, কিন্তু নৈরাজ্য ও অরাজকতায় নয়। যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে অন্তত এই সচেতনতা আছে তাদের নিয়ে যে কোনো দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব বহু দূর এগিয়ে যেতে পারে। বিদ্যমান সংবিধানের সীমানার মধ্যে প্রস্থান বিন্দু খুঁজে বের করতে হবে এমন কোনো দাসখৎ জনগণের শক্তিতে বিশ্বাসী কোনো নেতৃত্ব দেয় না।

হয়তো আমরা ভয়ানক বিপদে পড়বো, হয়তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে আরেকটি নতুন ভবিষ্যৎ। কে জানে!

৭ মার্চ ২০০৭। ২৩ ফাল্গুন ১৪১৩ শ্যামলী।

আমি কোকাকোলা খাই না

বারবারই আমি কয়েকটি দিকের ওপর নজর দিয়েছি। এক. এই সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান করতে নেমেছে এবং এই কাজ করতে গিয়ে 'জরুরি অবস্থা' জারি করা হয়েছে। আমরা তা মেনে নিয়েছি। ভালো কাজ করলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ হিশাবে আমরা তাঁদের সঙ্গে আছি, কিন্তু মন্দ কাজের ভাগিদার আমরা হতে রাজি না। দুই. এই সরকার সাংবিধানিক কি অসাংবিধানিক তার একটা তর্ক আছে কিন্তু সেটা এই সরকারেরই মামলা। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কিচ্ছু যায়-আসে না। আমরা শুধু আমাদের সেনাবাহিনী ও সৈনিকদের রক্ষা করবার জন্য বারবার বলেছি এই সরকারের দায়দায়িত্ব বাংলাদেশের সেনাবাহিনী নেবে না। জরুরি অবস্থা রাষ্ট্রপতি জারি করেছেন। বিদেশি পত্রপত্রিকা এখন সমস্বরে সেনাবাহিনীকে দায়ী করে চলেছে। পরিস্থিতিও এমনভাবে গড়াচ্ছে যাতে সৈনিকদের জনগণের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে পরাশক্তিগুলো নিজেদের হাত সাফ রাখতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতির যেন উদ্ভব না হয় তার জন্য আজ সৈনিক ও জনগণ উভয়কেই সতর্ক থাকতে হবে।

সাংবিধানিক তর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠের কিছু আসে-যায় না কেনো? কারণ এই সংবিধান আমাদের নয়– অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সংবিধান নয়, এর প্রণয়নে জনগণের কোনো ভূমিকা নাই। এর কাটাছেঁড়া যা হয়েছে সেই সকল কর্মকাণ্ডের

সময়ও কেউই জনগণকে পোছেনি। জনগণের মতামত বলে যে একটা ব্যাপার আছে সেটা কেউই কখনো শোনার প্রয়োজন বোধ করেনি। ড. কামাল হোসেনের মুসাবিদা করা সংবিধান বহুবার বদল হয়েছে। আমরা দেখেছি হাতে ক্ষমতা থাকলেই সেটা হয়ে যায়। এসব বদলে তিনিও সময় সময় শামিল হয়েছেন। এখনও হয়তো আবার বদলানো হবে। জনগণের যদি কখনো শক্তি হয় তাহলে নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের কাজে তারা সময়মতোই হাত দেবে। যেমন, এখন নেপালের জনগণ আমাদের চোখের সামনেই কাজটি করছে। একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানই দুর্নীতিকে চিরতরে নির্মূলের সাংবিধানিক ও আইনি শর্ত তৈরি করতে পারে।

ড. কামাল হোসেনের কথাটা তুলছি এই কারণে যে তিনি আমাদের উপদেশ দিয়েছিলেন, আমরা যেন শুধু আশপাশ দেখে যাই আর বসে বসে কোকাকোলা খাই। আমার জন্য মুশকিল হচ্ছে এই যে আমি কোকাকোলা খাই না, কারণ এটা পানি না, 'পানীয়'। এর কোনো পুষ্টিগত মান তো নাই-ই, এমনকি কোক-পেপসি তেষ্টা মেটানো দূরে থাকুক বরং তেষ্টা বাড়ায়। অন্যদিকে আমাদের হাতে কোকাকোলা তুলে দিয়ে কোক-পেপসি কোম্পানি আমাদের খাবার পানি প্রাইভেটাইজেশান করে, পানি নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। যে পানি ছাড়া দুনিয়ায় কোনো প্রাণই বাঁচে না সেই প্রাণ এখন বোতলবন্দী হয়ে গিয়েছে, নদীগুলো কোম্পানির দখলে চলে যাচ্ছে যেন তারা পানির ব্যবসা করতে পারে। মাটির তলার পানিও বহুজাতিক কোম্পানির ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হচ্ছে। যে পানি ছিল সকল প্রাণের জন্য উন্মুক্ত, তার প্রাইভেটাইজেশান চলছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তির অধীনে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সেবাখাত 'উদার' করার জন্য দুর্বল দেশগুলোকে বাধ্য করছে। সেবাখাত চুক্তির অধীনে বাজার উদার করা বলতে বোঝায়, পানি খাতকেও কোম্পানির ব্যক্তিগত দখলে হস্তান্তর করা।

কোম্পানি ও বেনিয়াদের ভাষা হলো 'প্রাইভেটাইজেশান', 'ফ্রি মার্কেট ইকনমি' ইত্যাদি। কিন্তু যাঁরা অর্থশাস্ত্রের দিক থেকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রাইভেটাইজেশানকে বিচার করেন, তাঁরা একে ইংরেজিতে বলেন 'enclosure' অর্থাৎ ঘিরে ফেলা। ঘিরে ফেলার অর্থ কী? তার অর্থ হচ্ছে যাতে আগে ছিল সকলের অবাধ অধিকার, এখন সেই অধিকার আর থাকবে না। ঘিরে ফেললে সেখানে প্রবেশ নিষেধ। প্রবেশ করতে গেলেই সেখানে দখলদারের মাস্তান বাহিনী বাধা দেবে, এমনকি প্রাণও যেতে পারে। একবার ঘেরাও হয়ে গেলে প্রাণধারণের প্রধান শর্ত হওয়া সত্ত্বেও তার অধিকার আর থাকবে না। যেমন, পিপাসায় কাতরাতে কাতরাতে মারা গেলেও অবাধে পানি আর পাওয়া যাবে না। পানি তখন ঘেরাও হয়ে থাকবে। পাওয়া যাবে যদি কোম্পানির কাছ থেকে টাকা দিয়ে কিনতে পারি, অথবা সকল ন্যায়নীতি, ধর্ম বিসর্জন দিয়ে কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করি, পরাজয় মেনে নিয়ে তাদের দাস হয়ে যাই।

এই কারণে প্রাইভেটাইজেশান, enclosure বা ঘিরে ফেলার কথা শুনলেই আমার ফোরাত নদীর তীরে ইমাম হোসেনের কথা মনে পড়ে। প্রাণধারণের সকল অমূল্য শর্ত ও সম্পদ আজ ঘিরে ফেলা হচ্ছে। ফোরাত নদীর পানি ইয়াজিদের সৈন্যবাহিনী ঘিরে রেখে কারবালায় পানির অভাবে ইমাম হাসান ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যার ইতিহাস যাঁরা জানে তাঁরা পানি ঘিরে ফেলা বলতে আমি কী বোঝাচ্ছি বুঝতে পারবেন। কারবালা মানবেতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, যে ইতিহাসের শিক্ষা থেকে সকল ধর্মের মানুষই একটি সার্বজনীন নীতির জায়গায় দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত বোধ করে। সেই নীতির পক্ষেই আজ দেশে দেশে নির্যাতিত– নিপিড়িত– অত্যাচারিত মানুষের লড়াই চলছে। কী সেই নীতি? মানুষের প্রাণধারণের শর্ত– পানি, মাটি, আলো, বাতাস কেউ 'ঘেরাও' করে রাখতে পারবে না। অন্য কোনো প্রাণ বা প্রাণীকে জীবনযাপন ও জীবিকার ওপর কোনো কোম্পানি বা ব্যক্তির ব্যক্তিগত দখলদারি মানা হবে না, প্রাণধারণের শর্তের ওপর দখলদারি কায়েম রেখে কিম্বা জীবন ও জীবিকার সম্পর্কে মানুষকে শৃঙ্খলিত রেখে কোনো মানুষ, কোম্পানি বা দেশ অন্য জনগোষ্ঠীর বশ্যতা আদায় করতে পারবে না। করতে দেওয়া যাবে না। পানির ওপর দখলদারি চলবে না, প্রাণের ওপর পেটেন্ট– অর্থাৎ বীজ ও প্রাণসম্পদের ওপর কোনো প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিকে সম্পত্তির অধিকার মানা যাবে না। কারবালায় ইয়াজিদ যে কৌশল অবলম্বন করেছিল, সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলো জীবন ও জীবিকার শর্ত ঘিরে ফেলার একই কৌশল অবলম্বন করছে। আজ সারা দুনিয়ায় অধিকারহারা মানুষ 'ঘিরে ফেলা'-র বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে।

বলছিলাম ড. কামাল হোসেন যতো তাড়াতাড়ি কোকাকোলা খেয়ে ফেলেন আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। এ রঙ দেখলেই আমার মনে হয়ে আমি মানুষের রক্ত পান করছি। তাছাড়া আমি মনে করি না রাজনৈতিক দলগুলোর কারণে বা রাজনীতির কারণে দেশ লাইনচ্যুত হয়েছে। বরং রাজনীতিহীনতার কারণেই আজ দেশের এই অবস্থা। যারা রাজনীতি করেছেন তারা আসলে 'রাজনীতি' করেন নি, সিন্ডিকেটবাজি করেছেন, রাজনৈতিক দলকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন, দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য কায়েম করেছেন, এখানেই আমাদের মূল সমস্যা। এই কারণে সরকার যখন বললো তাঁরা দুর্নীতি উচ্ছেদ করবে, আমরা নাগরিকরা রাজি হয়েছি। রাজনৈতিক দলগুলোকে আমরা নিন্দা করেছি, কিন্তু বলিনি যে রাজনীতিই দোষের মূল। আমরা তো যখন রাজনীতি করেছিলাম তখন দেশ স্বাধীন করতে পেরেছিলাম। আমরা লড়াকু জনগোষ্ঠী, লড়তে জানি। এখন রাজনীতি করেই এই ১৪ কোটির মানবসম্পদে মহাসম্পদশালী দেশকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশে রূপান্তর করতে হবে। আমরা রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী ছিলাম, কিন্তু তার বিকাশ ঘটাইনি। ফলে আমাদের মধ্যে অবসাদ, জড়তা, ক্ষয়, লুটেরা মানসিকতা এসে গিয়েছে। লুটপাটকেই রাজনীতি বলে ভুল করেছি। দলবাজি

করেছি। বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করার কথা যারা বলছে এখানেই তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য। সিন্ডিকেটবাজি নির্মূল করে রাজনীতি চর্চার পরিবেশ ও শর্ত তৈরি করার কথা এই সরকার যখন বলছে আমরা নাগরিকরা রাজি হয়েছি।

এই যুক্তি থেকেই তৃতীয় যে কথা আমরা বারবার বলছি তা হলো এখনকার অগ্নিময় জাতীয় লক্ষ্য থেকে আমাদের কিছুতেই বিচ্যুত হওয়া চলবে না। এখনকার চরম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই আমরা রাজনৈতিক হয়ে উঠব। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমি– কাকুতি মিনতি আবদার দাবি যে যাই বলুক– এই বলে চলেছি যে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্দলীয় নির্বাচনের পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ ছাড়া সরকার যেন অন্য কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত না নেয়, যা নেবার আগে সমাজের সকল স্তরে আলাপ-আলোচনা তর্কবিতর্কের প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষত আমাদের জীবন ও জীবিকার জন্য যা বিপদসংকুল– আত্মরক্ষা ও সার্বভৌমত্বের জন্য যা বিপজ্জনক এবং সামষ্টিক সমৃদ্ধির পথে অন্তরায়। বিশেষত বিনিয়োগ ও আর্থ-সামাজিক নীতির দিক থেকে যাকে 'ঘিরে ফেলা' বলে পণ্ডিতেরা দেশে-বিদেশে গণমুখী সরকারকে সতর্ক করে দিচ্ছেন, সেই সকল নীতির বিচার ছাড়া তাঁরা যেন কোনো সিদ্ধান্ত না নেন, আমরা সেই অনুরোধ জানিয়ে আসছি। এই সরকার যখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে, যখন তাঁরা অত্যন্ত ব্যস্ত, তখন এই সরকারকে সহায়তা করবার পরিবর্তে তাদের অজান্তে কোনো শক্তি এই জনগোষ্ঠীকে 'ঘিরে ফেলা'-র কোনো তৎপরতায় লিপ্ত কিনা সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমরা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করছি।

আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত যে আমাদের এই কাতর ও সতর্ক পরামর্শ আমরা সরবে পেশ করিনি বলে হয়তো উপেক্ষিত হয়েছে। যেমন, এশিয়া এনার্জি যখন নতুন নামে– গ্লোবাল কোল ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশে পূর্ণোদ্যমে আবার আসছে, আমরা বিপদ গুনছি। প্রথমত নাম বদলিয়ে আসাটাই সন্দেহের। নাম বদলানো হয়েছে এই বছরই জানুয়ারির ১১ তারিখে, তাদের ওয়েবসাইট এই তথ্যই দিচ্ছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সেই কথা এখন উঠছে কারণ এই কোম্পানির উকিল ড. কামাল হোসেন বাংলাদেশের রাজনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁর কোকাকোলা খাবার পরামর্শ আমার গ্রহণ না করবার এটাও একটা বড়ো কারণ। খোলামুখ কয়লা খনি জনগণের জীবন ও জীবিকা ধ্বংস করবে এই বিষয়ে বিস্তর লেখালিখি হয়েছে, কিন্তু আমাদের বোধহয় আবার এইসকল বিষয় নিয়ে নতুন করে লিখতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে দুনিয়াব্যাপী যে যুদ্ধবিগ্রহ চলছে তা জ্বালানি যুদ্ধ এবং আমরা তার বাইরে নই। ফুলবাড়িয়ায় নিজেদের প্রাণরক্ষার তাগিদে বিগত সরকারের আমলে এশিয়া এনার্জির বিরুদ্ধে সেই এলাকার জনগণ সংগ্রাম করেছে। শহীদ হয়েছে। বহু মানুষ পঙ্গু ও আহত হয়েছে।

নীতিগতভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিজীবন বা পেশাগত ভূমিকা আমার রাজনৈতিক পর্যালোচনার লক্ষ্যবস্তু নয়। কিন্তু আমি সবসময়ই দাবি করে এসেছি বাংলাদেশের

রাজনৈতিক দুর্দশার জন্য বাহাত্তর সাল থেকে ড. কামাল হোসেন যে ভূমিকা রেখেছেন এবং এখনকার বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে যে ভূমিকা পালন করছেন, তাকে আমরা পর্যালোচনার বাইরে রাখতে পারি না। তিনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হবার কারণে তাঁকে আমরা মূল্যায়ন করবো– এটাই তো স্বাভাবিক। এশিয়া এনার্জি ও পরিবর্তিত নামে গ্লোবাল কোল ম্যনেজমেন্টের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রশ্ন রাজনৈতিক প্রশ্ন– নিছকই পেশাগত সম্পর্কের ব্যাপার নয়। এটা তাঁর পেশাগত দায়িত্বের বিরোধিতাও নয়, কাজে কাজেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বিবর্তনে তাঁর ভূমিকা পর্যালোচনারও ব্যাপার বটে। কতোটুকু তা বাংলাদেশের আর কতোটুকু কোম্পানির স্বার্থরক্ষা? একই কারণে আন্তর্জাতিক ল ফার্মগুলোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আমাদের রাজনীতিতে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে তার পর্যালোচনাও জরুরি। অনেকগুলো ল ফার্মের পেশাগত সুনামও আমরা জানি। ক্লিফোর্ড চান্স (Clifford Chance), এভারশিডস এলএলপি (Eversheds LLP), লিংকলেটারস (Linklaters), হোয়াইট এন্ড কেইস (White & Case)। ড. কামাল হোসেন একা নন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে সম্মানিত ও সামনের সারির আরো অনেকেই সরাসরি বিদেশি ল ফার্মের সঙ্গে যুক্ত। বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করবার পেশাগত দায়িত্বের সঙ্গে দুর্বল দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব ও স্বার্থের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব থাকতেই পারে। এই সংঘাত ও দ্বন্দ্ব আমাদের রাজনীতিতে কী প্রভাব ফেলছে, সেই দিকগুলো আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে। এই দিকগুলো নিয়ে বিচার–বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাংলাদেশের নাগরিকদের আগে ছিল না– কিন্তু বাংলাদেশ নিশ্চয়ই আর 'অন্ধকার' যুগে নাই। ছোটো হয়ে আসছে পৃথিবী ...

তাছাড়া ধারণাগতভাবেও তথাকথিত আইনজীবী ও সংবিধানবিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আমরা নাগরিকরা পত্রপত্রিকায় কথাবার্তা তর্কবিতর্কে আগ্রহী। আগে আইনজীবী ও বিচারপতিরা ফেরেশতা তুল্য ছিলেন, এখন যখন তাঁরা মুখ খুলতে ও লিখতে শুরু করেছেন তাঁদের বিদ্যার দৌড় দেখে আমরা দিন দিন মুগ্ধ হয়ে চলেছি!!! এতোই তাঁরা ফেরেশতা যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা একমাত্র বিচারপতি না হলে নাকি হবে না। আগে বিচারপতি খুঁজতে হবে, তারপর 'নিম্ন' পেশার অন্যরা। খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ঘটেছে। এবার প্রধান উপদেষ্টা বানাবার জন্য কোনো বিচারপতি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আমরা দেখেছি হাইকোর্টের বিচারপতিরা অত্যন্ত খারাপ রায় দিয়েছেন, কিন্তু তার চেয়েও আরো খারাপ কাজ দেখেছি, আইনজীবীরা সেই রায় মানেননি বলে আদালত ভাঙচুর করেছেন। রায় পছন্দ হয়নি বলে আদালত একবার রায় দিয়ে গোটা রায় বিজ্ঞ সংবিধানবিশারদদের চাপে আবার প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। যদি আদালতে বলপ্রয়োগ করেই নিজের মনোমত রায় আদায় করা যায় তাহলে আদালত আছেই বা কেনো? আদালতের রায় গণতন্ত্র, সংবিধান বা আইনি

পরিমণ্ডলে বিপরীত বা বিরোধী হতে পারে। কিন্তু আইন-আদালতের সীমার মধ্যে সমাধান নিশ্চয়ই বল প্রদর্শন নয়। এই ঘটনাগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব আমাদের রাজনীতিতে অবশ্যই পড়বে।

সংবিধান ব্যাপারটা কী সেটা আমাদের বোঝা দরকার। যদি সেটা এতোই গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে যাঁরা লিখেন তাঁরাই আবার তা ভাঙেন কী করে? এই কারণেই উকিল-ব্যারিস্টারদের কাছ থেকে সংবিধানের কেচ্ছা আমরা আর খুব একটা শুনতে আগ্রহী না। গণতন্ত্র ও সংবিধানের মধ্যে সম্পর্ক, জনগণ কী করে সংবিধান প্রণয়ন করে, সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সংবিধানসভা কাকে বলে, কীভাবে তা দানা বাঁধে ইত্যাদি বিষয় বরং এখন আমাদের আলোচনা করতে হবে। একাত্তর সালে আমরা আমাদের জনগোষ্ঠীকে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানসভা গঠন ও প্রণয়নের প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত করেছি– এই সত্য সকল পক্ষকেই মানতে হবে। যদি আমরা মানি, তাহলে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বেরুবার পথও সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের সংকল্পের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

বাইরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চলছে আর ভেতরে কী ঘটছে তার আরো কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আমরা জানি বা অন্তত আন্দাজ করতে পারি যে বাংলাদেশ শুধু তেল, গ্যাস ও প্রাণসম্পদেই সমৃদ্ধ নয়– খনিজ সম্পদেও ধনী। সাবেক জ্বালানি উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) রুহুল আমিন চৌধুরী যে অল্প কয়দিন মন্ত্রণালয়ে ছিলেন তিনি কিছু কাজ করে গিয়েছেন যা স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় হয়েছে কিনা তদন্ত হওয়া দরকার। বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য অপরিচিত কোম্পানিকে চারটি লাইসেন্স দিয়েছেন। যদি আমরা এর আগের পাঁচ বছরে কোম্পানিকে লাইসেন্স দেবার ব্যাপারগুলো খতিয়ে দেখি তাহলে দেখবো এতো অল্প সময়ে এতোগুলো লাইসেন্স দেওয়া বেশ বিস্ময়েরই ব্যাপার। বিশেষত কোম্পানিগুলো যখন অপরিচিত। এর আগের পাঁচ বছরে খনিজসম্পদ অনুসন্ধানের জন্য তিনটি লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল। এশিয়া এনার্জিকে দেওয়া হয়েছিল ২০০২ সালে, অস্ট্রেলিয়ার টাইটানিয়াম রিসোর্সকে কক্সবাজারে বীচে অনুসন্ধানের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিন ২০০৩ সালে এবং খালিশপুর কয়লা জোনে অনুসন্ধানের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল হোসাফকে ২০০৩ সালে।

সাবেক জ্বালানি উপদেষ্টা চারটি লাইসেন্স দিয়েছেন তিনটি কোম্পানিকে : (১) বাংলাদেশ কেডিএস গ্রুপ, (২) অস্ট্রেলিয়ান প্রিমিয়ার মিনারেলস এবং ব্রিটিশ কারবন মাইনিং। কেডিএস গ্রুপকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে ১১ জানুয়ারি তারিখে। তারা ভারী ধাতব পদার্থ অনুসন্ধান করবে রংপুর মিঠাপুকুর অঞ্চলে ৩৫০০ হেক্টর জমিতে। ডিসেম্বরের ২৪ তারিখে প্রিমিয়ার মিনারেল নামের কোম্পানিকে দুটি লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। তারা বেলাভূমির বালিতে ভারী খনিজ পদার্থ অনুসন্ধান করবে। কক্সবাজারে বেলাভূমির ৩৯৬৮ হেক্টর জমি আর দ্বীপাঞ্চলের ৪০০ হেক্টর জমিতে তারা অনুসন্ধান চালাবে। আর ব্রিটিশ কারবন

মাইনিংকে দেওয়া হয়েছে কুড়িগ্রামের চিলমারী এলাকার ৪০০ হেক্টর জমিতে ভারী ধাতব পদার্থ অনুসন্ধানের লাইসেন্স। এই ধরনের লাইসেন্স এক বছরের জন্য দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য, প্রতিবছরই তা নবায়ন করা যায়।

এগুলো তাৎপর্যপূর্ণ নজির। খুবই সংবেদনশীল। খুবই সংবেদনশীল বিষয়ের মধ্যে টাটার বিনিয়োগও আরেকটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে বলে কথাবার্তা চলছিল, আগের সরকারের আমলে তা এগোয়নি। টাটা এখন তা আবার শুরু করছে। ইউএনবির একটি খবরে জেনেছি যে তারা পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টার সঙ্গে ফেব্রুয়ারির পনেরো তারিখে দেখা করে কথা আবার শুরু করেছে। তারা ২.৪ মিলিয়ন টন ইস্পাত করাখানা, একটি সার কারখানা এবং ১৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং বড় পুকুরিয়ায় খোলামুখ কয়লা খনির প্রস্তাব দিয়েছে। টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে লেখালিখি হয়েছে অনেক, বিশেষত গ্যাসের দাম নিয়ে তর্কে গিয়ে ঠেকেছে, আমরা তা দেখেছি। অর্থনৈতিক দিক তো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোম্পানি হিশাবে টাটাকে প্রাণ, পরিবেশ ও সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবিকার দিক থেকে মূল্যায়নের একটা ব্যাপার থেকেই যাচ্ছে। বিশেষত 'ঘেরাও' হয়ে যাবার যে বিপদ নিয়ে আমরা কথা বলছি সেই দিক থেকে টাটার ব্যাপারটা বোঝা দরকার। যে বিষয় নিয়ে আমরা কথা তুলছি– প্রাণ ও পরিবেশ রক্ষা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবিকার দিক থেকে বিচার করা।

২৮ ফাল্গুন, ১৪১৩। ১২ মার্চ, ২০০৭, শ্যামলী।

টাটার প্রস্তাব কি আসলেই 'বিনিয়োগ' প্রস্তাব

টাটা বাংলাদেশকে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলারের 'বিনিয়োগ' প্রস্তাব দিয়েছে। কথা হলো, বিনিয়োগ মানে তো এক কাঁড়ি ডলার নিয়ে এসে বাংলাদেশের ব্যাংকে জমা দেখিয়ে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে বলে টাল্টিবাল্টি হিশাব কষা নয়। টাটার পক্ষে-বিপক্ষে যেমন লেখালিখি পড়েছি সেখানে 'বিনিয়োগ' কথাটার কোনো পর্যালোচনামূলক ধারণা চোখে পড়েনি। যারা পক্ষে লিখেছেন তারা এই ভাব দেখিয়েছেন যে এক কাঁড়ি ডলার আসবে বাংলাদেশে, অতএব টাটা যে গ্যাস চাইছে তার একটা দাম ধরে দিয়ে আমাদের উচিত টাটাকে বাংলাদেশে 'বিনিয়োগ' করতে দেওয়া। যদি সেই দাম ধরা রীতিমতো লুণ্ঠনের পর্যায়েও পড়ে তবুও 'বিনিয়োগ' যেন এমনই

ঐশ্বরিক ব্যাপার যে এই কর্ম আমাদের করতেই হবে। আর যারা বিরোধিতা করেছেন তাদের কথা হলো গ্যাসের যে দাম টাটা দিতে চায় তাতে আমাদের ক্ষতি হবে— এটা আসলেই শোষণ ও লুণ্ঠন-আমাদের অতএব টাটার সঙ্গে কোনো চুক্তি করা ঠিক না। তাঁরা টাটার বিনিয়োগের অর্থনৈতিক পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে টাটার বিনিয়োগ আসলেই আমাদের জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন প্রস্তাবের অধিক কিছু নয়। তাছাড়া বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সুবিধার যেসব কথা টাটা বলছে তা ঠিক না।

যে অর্থনৈতিক যুক্তিতে টাটার বিনিয়োগের সমালোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে টাটা কোনো যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারেনি। অন্তত আমার চোখে পড়েনি। এই যুক্তির মুখে গত সরকার টাটার বিনিয়োগ অনুমোদন করেনি। কিন্তু ক্ষমতার পরিবর্তনে দেখা যাচ্ছে টাটা আবার তৎপর হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে টাটার রেডিডেন্ট ডিরেক্টর এস মানজের হোসেইন ফেব্রুয়ারির ১৬ তারিখে বলেছেন, “আমরা কথাবার্তা যেখানে থুয়ে এসেছি সেখান থেকে আবার শুরু করতে পারার সম্ভাবনা খুঁজে বেড়াচ্ছি।” তিনি পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ইফতেখার আহমেদ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করবার পর ইউএনবিকে এই কথা বলেছেন। টাটা অর্থনীতি বা বিনিয়োগ উপদেষ্টার সঙ্গে কথা না বলে পররাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব পাওয়া উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করায় একটা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। টাটাকে বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া কি তাহলে ‘বিনিয়োগ’ সংক্রান্ত প্রশ্ন নয়, পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপার? ভারতের শাসক শ্রেণীকে খুশি করবার জন্যই কি নতুন করে এই আলোচনা? এই সরকার ঠিক কীভাবে ব্যাপারটা দেখছে আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। টাটা ২৪ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন কারখানা, গ্যাসচালিত ৪৭৫ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কারখানা, গ্যাস দিয়ে সার কারখানা এবং বড়পুকুরিয়াতে খোলামুখ কয়লা খনি দেবে বলে বলছে। এর মধ্যে ইস্পাত কারখানার ক্ষেত্রে টাটার অভিজ্ঞতা আছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে টাটার অভিজ্ঞতা নাই, কিম্বা থাকলেও প্রশ্নবোধক। যেমন খোলামুখ কয়লাখনি। খোলামুখ কয়লাখনির বিরুদ্ধে ফুলবাড়িয়ার জনগণ লড়াই করেছে। তাহলে টাটার বিরুদ্ধেও আমাদের আবার সংগ্রাম করতে হবে?

প্রাণ ও পরিবেশের দিক থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে ইস্পাত কারখানার ব্যাপারটাকে ঠিক বিনিয়োগ বলা যাবে না। টাটা নতুন কোনো কৃৎকৌশল আনছে বলে তাদের কাগজপত্রে দেখিনি। প্রাণ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর যে কৃৎকৌশলের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণ ও পরিবেশবাদীরা দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করছেন সেই কৃৎকৌশলই কি টাটা বাংলাদেশে পাচার করতে চাইছে? অর্থাৎ ভারতে বা অন্য দেশে এই কৃৎকৌশল আর বজায় রাখা যাবে না, এখন বাংলাদেশের জনগণের ওপর চলুক– এই কি উদ্দেশ্য? অন্য যেসব বিনিয়োগের কথা টাটা বলছে সেই সকল বিনিয়োগে আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থাগুলোর সহায়তায়

বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীরাও তো অনায়াসেই বিনিয়োগ করতে পারে। টাটাও হয়তো নিজের তহবিল নয়, অন্যদের তহবিলই ব্যবহার করবে। টাটাকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বা ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি বসাবার অনুমোদন দেওয়ার কী যুক্তি থাকতে পারে? তর্ক করা যায় আগে দুর্নীতিবাজ সরকার ছিল, অতএব এইসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ দুর্নীতিগ্রস্ত হতে পারত বা হয়েছে। কিন্তু দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই জেহাদি সরকারের তো এখন উচিত যে বাংলাদেশের বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে সহায়তা করা এবং যেসব উন্নত কৃৎকৌশল আমাদের দরকার তা কম দামে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আমরা কীভাবে পেতে পারি তার জন্য অবিলম্বে খোঁজখবর করা। আমি টাটার ইস্পাত কারখানার বিনিয়োগকে অতএব মোটেও বিনিয়োগ আকারে দেখছি না, বরং প্রাণ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কৃৎকৌশল স্থানান্তরের একটা কৌশল বলেই দেখছি। এই স্থানান্তরে আমাদের যে নগদ ক্ষতি সেটা অর্থনীতিবিদ ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন। প্রাণ ও পরিবেশের ক্ষতির বিরুদ্ধে ভারতের জনগণই লড়ছেন দীর্ঘদিন। তাহলে টাটার 'বিনিয়োগ' কি আসলে বিনিয়োগ? নাকি ধ্বংসের উদ্যোগ?

কিন্তু বিনিয়োগ আমাদের দরকার। এটা সত্যি যে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের লাভের শর্তে বাংলাদেশকে বিনিয়োগকারী সন্ধান করতে শিখতে হবে। কৃৎকৌশল অর্জন, শ্রমের বিকাশ ও দক্ষতা অর্জনের দরকারে অনেক দিক থেকে আমাদের আপোশ করতেও হতে পারে। কারণ বিনা খর্চায় কেউ আমাদের কিছু করে দেবে না। কিন্তু অনেক বিনিয়োগকারীকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের জায়গায় দাঁড়িয়ে সরাসরি দুশমনও গণ্য করতে হবে। বিনিয়োগ আমাদের দরকার অবশ্যই, যদি সেটা সত্যিই বিনিয়োগ হয়। অর্থাৎ আমাদের জীবন, জীবিকা, প্রাণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, রক্ষা ও বিকশিত করে বাংলাদেশের নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায়। কিন্তু ঘটা করে যাকে প্রায়ই আমরা 'বিনিয়োগ' প্রস্তাব বলে থাকি তা আসলে শোষণ লুণ্ঠনের নগ্ন প্রস্তাবের অধিক কিছু কি? বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থের সঙ্গে তার কি পড়তা হয়? হয় না। এমনকি সার্বভৌমত্ব নিয়েও টানাটানিতে পড়তে হয়। টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে যথেষ্ট লেখালিখি হয়েছে, এই দিক থেকে পর্যালোচনা চোখে পড়েনি। যাঁরা লেখালিখি করেছেন তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে-যেমন, জ্বালানি, বিনিয়োগনীতি, অর্থনীতি, কর্পোরেট সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। যা আমরা ইতোমধ্যেই জানি তা নিয়ে নতুন করে এখন লিখার দরকার নাই। যদি সকলের কথাবার্তা সারমর্ম করে ভবিষ্যতে লেখালিখির দরকার হয়। সেটা ভবিষ্যতে করা যাবে। আমি বিষয়টিকে অন্য কয়েকটি দিক থেকে তোলা জরুরি বলে মনে করছি। প্রথম প্রসঙ্গ নিয়ে এতক্ষণ বললাম। টাটার 'বিনিয়োগ' কি আসলেই বিনিয়োগ, নাকি একটি দুর্বল দেশে হাত মুচড়িয়ে ক্ষতিকর টেকনোলজি স্থানান্তর করা?

এতোই যে দুর্নীতিবাজ জোট সরকার তার পক্ষেও টাটার যে বিনিয়োগে সম্মতি দেওয়া সম্ভব হয়নি সেই বিনিয়োগের আলোচনা পররাষ্ট্র বিভাগের মারফত হচ্ছে। এটাই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। ইতোমধ্যে পশ্চিম বাংলায় বুদ্ধদের ভট্টাচার্যের সরকারের সঙ্গে আঁতাতে কলকাতার প্রায় ২২ মাইল পশ্চিমে সিঙ্গুরে একটা মোটর গাড়ি বানাবার কারখানার কথা বলে কৃষকদের চাষের জমি কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে দখল করে নিতে গিয়ে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছে টাটা এবং পশ্চিম বাংলায় তার রাজনৈতিক মিত্র সিপিএম সরকার। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সেটা তুঙ্গে উঠল। একটি ঘটনায় দেখা গেল কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে এক কিশোরীর লাশ পড়ে আছে, তাকে গলা টিপে এবং পুড়িয়ে মারা হয়েছে। সারা দুনিয়ায় এই ঘটনা এখন আলোচনা-সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। বুদ্ধদেব বাবু টাটার পক্ষে কৃষকের জমি দখল করে নিয়ে কৃষি ও কৃষক উভয়কেই উৎখাত করে প্রমাণ করতে চাইছেন, পশ্চিম বাংলায় কমিউনিস্ট সরকার নামে কিছু আর থাকছে না। কর্পোরেশানের মিত্র হয়ে ওঠাই তাঁর এখনকার রাজনৈতিক সাধনা।

কৃষিজমিকে মোটর গাড়ির কারখানায় পরিণত করে জীবন, জীবিকা, প্রাণ ও পরিবেশ ধ্বংস করবার এই লড়াইকে বুদ্ধদেব বাবু টাটার হয়ে একে নিছকই বিনিয়োগের বিতর্কে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, আমাদের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে। কিন্তু সক্ষম হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না। নিশ্চয়ই একটি জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক বিকাশের জন্য বিনিয়োগ দরকার, আগেই বলেছি এটা তর্কের বিষয় নয়। কিন্তু বিনিয়োগ তো কোনো বিমূর্ত ব্যাপার নয়। কীসের বিনিয়োগ? এতে লাভ কী? ক্ষতি কেমন? কিম্বা যারা বিনিয়োগের কথা বলছে তারাই বা কেমন? কৃষিজমি ধ্বংস করে মোটর গাড়ি বানালে বড়োলোক না হয় গাড়িতে চড়বে, কিন্তু মানুষ খাবে কী? আবার সেই গাড়ি যেন দৌড়াতে পারে তার জন্য কৃষিজমির বুক চিরে মাঝ বরাবর চলে যাবে পিচঢালা রাস্তা। মানুষ বাঁচবে কী করে? না, শুধু গরিব মানুষের কথা বলছি না। ধনী-গরিব সকলের বাঁচার কথাই বলছি। খাদ্য কি খালি কৃষক খায়, গরিব মানুষেরই কি শুধু খাদ্য দরকার? আর বড়োলোক বুঝি মোটর গাড়ি চড়ে হাওয়া খেয়ে আসলেও পেট ভরে যায়!

'বিনিয়োগ' কথাটি দেখা যাচ্ছে যারপরনাই বিমূর্ত এরং কাজে কাজেই বোগাস বা ভুয়া তর্কে খাটানো হয়। মূল প্রশ্ন হচ্ছে একটি জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং উৎপাদন সংক্রান্ত সুবিবেচনা ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা কী করে নেয়? একটি জনগোষ্ঠী খেয়েপরে প্রাণে-পরিবেশে যেমন বাঁচতে পারে তেমনি জ্ঞানবিজ্ঞান কৃৎকৌশলেও এগিয়ে যাবে কীভাবে? গণমানুষের সমৃদ্ধির প্রশ্ন নিছকই কয় কাঁড়ি ডলার কোম্পানি বস্তা বেঁধে আনবে সেই তর্ক হতে পারে না। কী ধরনের বিনিয়োগ আমরা চাইছি, কী ধরনের কারখানা, কৃৎকৌশল, ব্যবসা আমরা উৎসাহিত করবো, আমাদের তুলনামূলক সুবিধা ও লাভ কোনো ধরনের বিনিয়োগ বেশি আর কোন ধরনের 'বিনিযোগ'-কে ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক গণ্য করে

প্রতিরোধ করবো তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকেই বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত বলা হয়। বিনিয়োগ একান্তই একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, কস্মিন কালেও তা অর্থনৈতিক ব্যাপার ছিল না। হত পারে না। অতএব 'বিনিয়োগ' 'বিনিয়োগ' বলে বিমূর্ত ও হাওয়াই কথাবার্তা যারা বলে তাদের গণশত্রু হিশাবে চিহ্নিত করা ও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া আমাদের কাজ। গণমানুষের এই লড়াইকে বিনিয়োগের বিরোধিতা বলে কর্পোরেশানগুলো প্রপাগান্ডা চালায়। এতে বিচলিত হবার কিছু নাই।

সিঙ্গুরে বুদ্ধদেব বাবুর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা তাঁর ভুল বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের সুযোগ নিয়ে বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু ভারতের কৃষক আন্দোলন, ভারতের পরিবেশ আন্দোলন ও জনগণের জীবন ও জীবিকার লড়াইয়ের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা প্রশ্ন তুলেছিলেন সিঙ্গুরে টাটার তথাকথিত বিনিয়োগে কার লাভ? জনগণের নাকি কোম্পানির মুনাফাবাজদের? বলাবাহুল্য জনগণ টাটার উর্বর কৃষিজমি ধ্বংস করে মোটর গাড়ির কারখানা বসাবার প্রস্তাবকে বিনিয়োগ প্রস্তাব হিশাবে মূল্যায়ন করেনি, তাকে জীবন, জীবিকা, প্রাণ ও পরিবেশ ধ্বংসের পাঁয়তারা হিশাবেই গণ্য করেছে। টাটা বা বুদ্ধদেব বাবু কোনো যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারেননি।

ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনের সাংবাদিকদের একটি রিপোর্টেও দেখলাম সবাই স্বীকার করে বলছে, সিঙ্গুরের জমি খুবই উর্বর। তিন থেকে চার ফসলি জমি এইসব। এই ধরনের চাষের জমি কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে জোর দখল করে একটি কোম্পানির কাছে মোটরগাড়ি বানাবার কারখানা বসাবার জন্য দিয়ে দেওয়া আর যাই হোক বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নয়। কী তাহলে? প্রথমত বুঝতে হবে যে পশ্চিম বাংলার কমিউনিস্ট সরকারের গণসমর্থনের ভিত্তি কমে গিয়েছে। অন্যদিকে নকশাল রাজনীতির উত্থান ঘটায় তাদের পক্ষে আর কর্পোরেশানগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমর্থন ছাড়া টিকে থাকা সম্ভব নয়। অন্যদিকে দেশের ভেতরে ও বাইরে টাটা যে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হচ্ছে, এমনকি ভারতের অন্যান্য কোম্পানির সঙ্গেও– তার পরিপ্রেক্ষিতে সিপিএম সরকারের ক্যাডার ও সংগঠনের আশ্রয়ে পশ্চিম বাংলায় বিনিয়োগ টাটা সুবিধাজনক মনে করেছে। কারণ প্রাণ, পরিবেশ, জীবিকার ক্ষতির বিরুদ্ধে গণমানুষের সংগ্রামকে দাবিয়ে দেওয়া সহজ মনে করেছিল টাটা ও সিপিএম উভয়েই। ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনে বুদ্ধদেব বাবু বলছেন : 'all start this project. For us, there is no space.'

“আমাদের আর ফেরার জায়গা নাই'–পশ্চিম বাংলার জন্য এ এক নতুন রাজনীতি। বাংলাদেশের জনগণকে এই দিকগুলো বুঝতে হবে। কারণ আমরাও নতুন রাজনীতির পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেছি। এই পরিমণ্ডলের আলোকেই আমাদের টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাবকে বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশের জনগণের কাছে যদি প্রতীয়মান হয় যে টাটার বিনিয়োগ বিনিয়োগ নয়, রাজনৈতিক হাত

মোচড়ানি, তাহলে তা দুই দেশের জনগণের জন্য সুফল বয়ে আনবে না। আমি পশ্চিম বাংলার উদাহরণ টানছি এই কারণে যে টাটা ভারতীয় কর্পোরেশান বলে আমরা তার বিরোধিতা করবো না। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ– বিশেষত কৃষক, আদিবাসী ও গরিব জনগণ যে কারণে টাটার বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করছে আমরাও সেই একই কারণে বিরোধিতা করছি। উপমহাদেশের কৃষক, আদিবাসী ও গরিব মেহনতি জনতার দুশমন হিশাবে টাটা এখন খোদ ভারতেই চিহ্নিত। ভারতের জনগণের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করবার জন্যই আমরা টাটার বিনিয়োগ আদৌ 'বিনিয়োগ' কিনা সেই সন্দেহ প্রকাশ করছি। ভারতের জনগণ 'The Ugly face of Tata' (টাটার কুৎসিত রূপ) নামে যে প্রচারাভিযান চালাচ্ছে সে সম্পর্কে এখানে কিছু লিখছি না। আমি বাংলাদেশ ও ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বরং কয়েকটি সতর্ক মন্তব্য করে শেষ করবো।

ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ক্রিকেটে জিতেছে। এটা নিছকই খেলা। কিন্তু এই জেতার খবর বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা যেভাবে ছেপেছে তা ভারত সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণের অনুভূতি বোঝার জন্য যথেষ্ট। আমি ১৮ মার্চ তারিখে কয়েকটি পত্রিকার শিরোনাম দিচ্ছি। 'ভারতকে গুঁড়িয়ে দিল বাংলাদেশ' *(মানবজমিন)*, 'টাইগারদের বোলিংয়ে লণ্ডভণ্ড ভারত' *(জনকণ্ঠ)*, 'ভারতকে উড়িয়ে দিয়ে বাংলাদেশের শুভসূচনা' (আজকের কাগজ), 'টাইগারদের আক্রমণে ধরাশায়ী ভারত' *(সমকাল)*, 'টাইগারদের গর্জনে কাঁপছে ভারত' *(ইত্তেফাক)*, Bangladesh send India crashing (New Age), 'টাইগারদের কাছে ধরাশায়ী ভারত' (*নয়া দিগন্ত*)।

বাংলাদেশের পক্ষে ভারতকে 'গুঁড়িয়ে দেওয়া', 'লণ্ডভণ্ড করা', 'উড়িয়ে দেওয়া' ইত্যাদি হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু খেলায় অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু ভাষার মধ্য দিয়ে যে অচেতনকে ক্রিয়াশীল দেখছি, তাকে যেন আমরা উপেক্ষা না করি। আমি ভারত ও বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের সেই বিষয়ে সতর্ক থাকতে অনুরোধ জানাবো। দুই দেশের শাসক শ্রেণী যদি মৈত্রী ও সুসম্পর্ক চর্চা করে এগিয়ে যায় তাহলে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রক্রিয়ার মধ্যে দুই দেশের জনগণের জন্য তা উপকার বয়ে আনবে। সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম জনগোষ্ঠী হিশাবে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। বিশেষত বাংলাদেশের আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে ভারত যেন বাংলাদেশের প্রতিবন্ধক না হয়। বিনিয়োগ প্রস্তাব যেন সত্যি সত্যিই বিনিয়োগ প্রস্তাব হয়।

দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি ও অর্থনৈতিক সুসম্পর্ক আজও গড়ে ওঠেনি। এই অভাবের মধ্যে টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব সন্দেহ বাড়াবে, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক সহজ করবে না।

৯ মার্চ ২০০৭। ৫ চৈত্র ১৪১৩। শ্যামলী।

টাটা কাহিনি

টাটা নিয়ে এর আগের লেখার আমাদের মূল প্রশ্ন ছিল বিনিয়োগের বিচার। কাকে আমরা বিনিয়োগ বলবো আর কাকে বিনিয়োগ বলবো না। টাটার নজির আমরা টেনেছি আমাদের নিজেদের কিছু বদ্ধমূল ধারণা নস্যাৎ করবার জন্য। যেমন, কোনো কোম্পানি বাংলাদেশে কয়েক কাঁড়ি ডলার খাটাবার কথা শুনলেই আমাদের ভাবা উচিত নয় যে এটা বিনিয়োগ প্রস্তাব। হয়তো সেই কোম্পানি নিজ দেশে আগের মতো পরিবেশ ধ্বংস করে, গরিব ও অসহায় মানুষের জোতজমি সম্পদ ঘেরাও, লুণ্ঠন ও শোষণ করে যেভাবে পুঁজি কামিয়েছিল এখন সেটা আর সম্ভব হচ্ছে না। তার নিজের দেশেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, রক্তক্ষয়ী ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। নিজে দেশের অন্যান্য কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও পেরে উঠছে না। একসময় সে গড়ে উঠেছিল নিজ রাষ্ট্রের সহায়তায়। রাষ্ট্র তাকে ভেতর-বাইরের প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে আড়াল ও সংরক্ষণ করেছে। বিভিন্ন নীতি– যেমন বাইরে থেকে আমদানি না করে নিজ দেশে উৎপাদন খরচ অধিক হওয়া সত্ত্বেও– বিশেষত প্রাণ ও পরিবেশ যথেচ্ছা ধ্বংস করেও নিজেদের শিল্প চাই নীতি অনুসরণ (import substitution)। এই অনুসরণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় গরিব অসহায় জনগণ। ভারতের ক্ষেত্রে এই ক্ষতির সিংহভাগ বহন করেছে আদিবাসী জনগণ, গরিব কৃষক, সংখ্যালঘু জনগণ, ইত্যাদি। টাটা আজ এই ধরনেরই একটি কোম্পানির প্রতীকে পরিণত হয়ে গিয়েছে। যে টাটাকে আগে ভারতের জাতীয়তার চিহ্ন বলে গণ্য করা হত সেই টাটার বিরুদ্ধে আজ ভারতের জনগণই ফুঁসে উঠেছে। তাদের এই ফুঁসে ওঠার মধ্যে যে জঙ্গি চেহারা টাটা দেখছে তার কারণেই টাটা নিজের দেশের বাইরে বিনিয়োগের সুযোগ সন্ধান করছে। টাটার সঙ্গে ইতোমধ্যেই মায়ানমারের সামরিক শাসকদের আঁতাত গড়ে উঠেছে। ভারত ও মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্ক এবং কাজে কাজেই নিরাপত্তা সম্পর্ক রচনার ক্ষেত্রে রতন টাটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। বিশেযত ২০০৫ সালে ভারত-মার্কিন অর্থনৈতিক সম্পর্ক রচনার জন্য নীতিমালা তৈরির জন্য যে ফোরাম গঠন করা হয়েছে রতন টাটা তার কো-চেয়ার। এই ফোরামের নীতিগত প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে : শ্রম আইন দুর্বল ও শিথিল করা, ভারতের আইন বাণিজ্য ও বিনিয়োগের দিক থেকে গণমুখীনতা বিসর্জন দিয়ে কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার জন্য উপযোগী করে তোলা, বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা

(Special Economic Zones) গড়ে তোলা, কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা করে তাদের অপকর্মের জন্য দায়ী করবার আইনি সুযোগগুলো শিথিল করে দেওয়া যাতে ভুপালের গ্যাস দুর্ঘটনার মতো কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে কোম্পানির বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের মামলা করা কঠিন হয় ইত্যাদি।

টাটার বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ চলছে। আজ আমরা International Campaign for Justice in Bhopal-এর 'Ugly Face of Tata' নামক প্রচারাভিযানে টাটার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগগুলো পাঠকদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

বহুজাতিক কোম্পানি টাটা গ্রুপের মালিক একটি পরিবার। টাটা নিজ দেশে বড়ো কোম্পানি হয়েছে অর্থনৈতিক সংরক্ষণনীতির মধ্যে লাইসেন্সবাজি করে– ভারতের জনগণ এ কারণে ব্রিটিশ রাজ কথাটার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে টাটার নাম দিয়েছে 'লাইসেন্স রাজ'-এর অবিতর্কিত শাহেনশাহ। ২০০৫ সালে টাটা তার আয় দেখিয়েছে ভারতীয় রুপিতে ৭৬,৫০০ কোটি (মার্কিন ডলার হিশাবে ১৭.৮ বিলিয়ন)। এর মূল কোম্পানি টাটা স্টিল ধনসম্পদের পাহাড় ও মুনাফা কামানোর পেছনে রয়েছে ঝাড়খন্ড এবং উড়িষ্যায় আদিবাসীদের জমি দখলের ইতিহাস ও ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগসাজশ। জামশেদজি টাটার ইতিহাস থেকে এই সত্য বাদ দেওয়া যাবে না যে তিনি মধ্য আঠারো শতক থেকে শেষের দিকে ভারত থেকে চীনে ইংরেজদের মাধ্যমে আফিম সরবরাহ করে ধনী হয়েছেন।

টাটার বিরুদ্ধে ভারতের জনগণ বলছে, "উদার বাজারব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে টাটা ছিল লাইসেন্স– রাজের অবিতর্কিত শাহেনশাহ– দরাজ দানখয়রাতি কর্মকাণ্ড দিয়ে যে কোম্পানি মানবাধিকার, শ্রমের অধিকার এবং পরিবেশ বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড আড়াল করে রাখতে সক্ষম হয়েছে। যখন গোলোকায়নের জগতে কর্মকাণ্ড পরিচালনার বাস্তবতা টাটার মধ্যে থিতু হতে শুরু করলো, এতদিনকার জাতিগঠন ও কোম্পানির সামাজিক দায়িত্ব (Corporate Social Responsibility) মার্কা কথাবার্তা ছাড়িয়ে ক্রমে ক্রমে টাটার অনুগত কর্মচারীসহ লোকজন বুঝতে শুরু করলো নিজেদের শেয়ারহোল্ডার ছাড়া টাটা কোম্পানির আর কারো কাছেই কোনো দায় নাই।"

খুনি কারবাইডের সহায়ক টাটা

ভারতের ইউনিয়ন কারবাইড কারখানার গ্যাস বিস্ফোরণ একটি কুখ্যাত ঘটনা। ভারত সরকার ১৯৮৪ সালে ইউনিয়ন কারবাইডের চেয়ারম্যান ওয়ারেন এন্ডারসনকে কারখানায় গ্যাস বিস্ফোরণের জন্য দায়ী গণ্য করে গ্রেফতার করে। তখন জে আর ডি টাটা সেই গ্রেফতারের নিন্দা করেন। এন্ডারসন কারখানার খরচ কমাবার জন্য তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাদ দিয়েছিলেন এবং কাজ করে কিনা পরীক্ষা না করে বা অপরীক্ষিত টেকনলজি অনুমোদন করেছিলেন।

ডিসেম্বরের ৩ তারিখ সারা দুনিয়ায় 'রাসায়নিক কারখানার হিরোসিমা' হিশাবে কুখ্যাত। অর্থাৎ হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমার যে ধ্বংসাত্মক ভয়াবহতা ভুপালের ইউনিয়ন কারবাইড কারখানার গ্যাস বিস্ফোরণের ভয়াবহতার সঙ্গে তুলনীয়। গ্যাস বিস্ফোরিত হয়ে বিষাক্ত মিথাইল আইসোসায়ানেট এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। উনিশ চুরাশি সালের এই দিনে সেই সময় ভূপালে যে ৮০০,০০০ মানুষ বাস করত তাদের মধ্যে ২০০০ মানুষ সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। 'ভূপাল মেডিকেল এপিলে'র হিশাব অনুযায়ী আজ পর্যন্ত এই গ্যাস বিস্ফোরণে কমপক্ষে ২০,০০০ মানুষ মারা গিয়েছে– শ্বাসকষ্টে, ক্যান্সারে, জন্মকালীন বিকলাঙ্গতায়, নারীর প্রজনন ব্যবস্থার জটিলতা আরো নানান সমস্যায়। কমপক্ষে ৫০,০০০ মানুষ এতোই পঙ্গু হয়ে গিয়েছে যে তাঁদের পক্ষে আর কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে এই যে, ইউনিয়ন কারবাইডের ভুপাল কারখানার পয়োঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করে টাটা কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ার্স।

ইউনিয়ন কারবাইড এরপর কিনে নেয় ডাও ক্যামিক্যালস। দুই হাজার ছয় সালের নভেম্বর মাসে রতন টাটা ইউনিয়ন কারবাইডের সহায়তায় এগিয়ে আসে। এর নতুন মালিক ডাও ক্যামিক্যালস যেন আবার ভারতে ব্যবসা করতে পারে, তার জন্য ভুপালের বিস্ফোরণের পরে যে বিষাক্ত আবর্জনা এখনো জমে আছে তা পরিষ্কার করবার প্রস্তাব জানায়। রতন টাটা এই কাজটি করতে চাইছেন এমন সময় যখন ভারত সরকার এই পরিষ্কারের কাজের জন্য ডাও ক্যামিক্যালসকেই দায়ী করেছে এবং এই মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানির ওপর একশ কোটি ভারতীয় টাকা ধার্য করেছে। ভারত সরকার যেখানে ডাও ক্যামিক্যালসকে দায়ী করে তাদেরকে আইনগতভাবে ভুপালের বিষাক্ত আবর্জনা পরিষ্কারের জন্য বাধ্য করছে, রতন টাটা স্বেচ্ছামূলক দয়াদাক্ষিণ্যের প্রস্তাব দিয়ে জনগণের সেই আইনি বিজয়কে রুখে দেবার প্রয়াস চালাচ্ছেন। ডাও ক্যামিক্যালস ভারতে বিনিয়োগ করতে ভীত, কারণ ভুপালের জনগণ ইনসাফ পাবার জন্য যে লড়াই-সংগ্রাম করছে তার মুখে এই কোম্পানির বিনিয়োগকে বিপজ্জনক মনে করে। এই আন্দোলন এবং টাটা ও ডাও ক্যামিক্যালসের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রচার তাদের সব বিনিয়োগ পরিকল্পনা বানচাল করে দিতে পারে।

আদিবাসীদের জমি দখল

টাটার বিরুদ্ধে ভারতের জনগণের যে অভিযোগ ক্রমশ সোচ্চার হয়ে উঠছে তা হল আদিবাসী ও কৃষকদের জমি দখল। টাটার ইস্পাত শহর এমন জায়গায় করা হয়েছে যার পাশেই ঘন বন, যে মাটিতে– আদিবাসী দুঃখই বলতে হবে– আছে বিপুল খনিজ সম্পদ। কোম্পানি প্রথম দিকে আদিবাসী গ্রাম উচ্ছন্ন করে ৪৫৬৪ একর জমি জবর দখল করেছিল ভারতীয় ৪৬,৩৩২ রুপি দিয়ে। যখন এই জমি

নোয়ামুন্ডিতে কনি এবং জামশেদপুর টাইনশিপের জন্য টাটার হাতে তুলে দেওয়া হলো, একই সঙ্গে আদিবাসীদের নিজের জমি থেকে উৎখাত করা হলো।

১৯০৭ সালে টাটা যখন নোয়ামুন্ডি এলাকায় খনির কাজ শুরু করলো তখন শ্রমিক পাওয়া কঠিন ছিল। স্থানীয় আদিবাসীরা খনিতে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানাল। অভিযোগ আছে যে টাটা এলাকার কুসুমগাছগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এর কারণ, এই গাছে যে লাক্ষা পোকা বাসা বাঁধত লাক্ষা তৈরি করতে আদিবাসীরা তা সংগ্রহ করত। কিন্তু এই গাছগুলো ধ্বংস হবার পরে তাদের জীবিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নষ্ট হয়ে যায়। তারপর বাধ্য হয়ে ধীরে ধীরে খনিতে মজুর হতে শুরু করে। দুই হাজার সালে টাটা স্টিল আগরিয়াটোলায় পানির একমাত্র উৎস একটি ঝর্ণা বুলডোজার দিয়ে নষ্ট করে দেয়। টাটার বিরুদ্ধে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে এই ধরনের নির্যাতনের অভিযোগ জানাচ্ছে ভারতের জনগণ।

পরিবেশ রাসায়নিক দ্রব্যে বিষাক্ত

টাটা ইস্পাত কারখানার বর্জ্য পরিবেশকে দূষিত করবার অভিযোগ বহু দিনের, নতুন করে কিছু বলার নাই। পরিবেশ রাসায়নিক ক্রোমে (hexavalent Chromium) বিষাক্ত করবার অভিযোগ তুলেছে খোদ ভারত সরকারই। সুখিন্দা উপত্যকায় ক্রোমাইট খনির কারণে পুরো এলাকাই অত্যন্ত বিষাক্ত করেছে টাটা। এই এলাকায় টাটাই সবচেয়ে বড়ো খনি কোম্পানি। দোমশালা নদী এবং প্রায় তিরিশটি শাখাপ্রশাখার পানি ক্রোমিয়ামে মারাত্মক মাত্রায় দূষিত। উড়িষ্যা সরকারের পরিবেশ কর্মসূচির সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে নরওয়ে সরকারের একটি গবেষণায় দেখা গেছে ক্রোমিয়াম খনির এক কিলোমিটারের মধ্যে যারা বাস করে তাদের মধ্যে কমপক্ষে ২৫ ভাগ মানুষ দূষণজনিত অসুখে ভুগছে।

পরিবেশ বিষাক্ত করবার ক্ষেত্রে টাটার জুড়ি নাই। তাছাড়া মিঠাপুকুরে টাটা ক্যামিক্যালসের সোডা এশ ফ্যাক্টরি থেকে দূষিত বর্জ্য, হায়দ্রাবাদে পাটেনচেরু ক্যামিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি টাটার সাবসিডিয়ারি র‍্যালিস ইনডিয়ার বিরুদ্ধে পরিবেশ দূষণের অভিযোগ এতো প্রকট যে পাটেনচেরুকে 'দুনিয়ার নরক' বলে অভিহিত করা হয়।

টাটার সন্ত্রাস ও সহিংসতা

টাটার সন্ত্রাস ও সহিংসতার ইতিহাস দীর্ঘ। ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সালে গুয়া হত্যাযজ্ঞ মনে আছে অনেকের। নোয়ামুন্ডিতে আদিবাসীদের জমি নিয়ে টাটার এরোড্রাম বানানো হয়েছিল। টাটা স্টিলের চেয়ারম্যান রুসি মোদি আসবার কথা শুনে তাকে আদিবাসীরা এরোড্রামে একটি মেমোরেন্ডাম দিতে গেলে আদিবাসীদের দেখে মোদি এরোড্রামে না নেমে ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে ফিরে

আসে। টাটা এবং আরো অনেকে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবার জন্য রাজ্য সরকারকে চাপ দেয়। গুয়া বাজারে তার পরদিন ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে নিরীহ আদিবাসীদের ওপর গুলি চালানো হয় এবং পরে একটি হাসপাতালে নিরস্ত্র আটজন আদিবাসীকে হত্যা করা হয়।

উড়িষ্যার কলিঙ্গনগরে পুলিশ ব্যাটেলিয়ন টাটার পক্ষ নিয়ে ২ জানুয়ারি ২০০৬ তারিখে আদিবাসী গ্রামের মানুষদের ওপর গুলি চালায়। টাটা স্টিল আদিবাসীর জমির ওপর অবৈধভাবে একটি দেয়াল তুলছিল, আদিবাসীরা ঐতিহাসিকভাবে তাদের জমির ওপর এই অবৈধ দেয়াল তোলার প্রতিবাদ জানাচ্ছিল বলে এই সন্ত্রাস ও সহিংসতা। স্থানীয় অধিবাসীরা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিল যে তাদের এলাকায় টাটা ইস্পাত কারখানাকে তারা স্বাগত জানাবে না। এই ধ্বংসযজ্ঞের আগে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে টাটা স্টিলের মিটিং হয়। পোস্টমর্টেমের পরে আদিবাসীদের যেসব লাশ ফেরত দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে নির্যাতন অত্যাচারে পাঁচটির ওপর বিকৃত ক্ষতচিহ্ন পাওয়া যায়, একজন মৃত মহিলার স্তন কাটা পাওয়া যায়। এবং একটি তরুণ ছেলের লিঙ্গ বিকৃত করে ফেলার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্যেকেরই হাতের তালু কাটা। টাটা এরপরেও ঐ এলাকায় ইস্পাত কারখানা বসাবার পরিকল্পনা বাদ দেয়নি।

কলকাতার কাছে সিঙ্গুরের ঘটনায় এখন তোলপাড় চলছে। এখানে টাটার মোটর কারখানার জন্য প্রায় এক হাজার একরেরও বেশি কৃষিজমি বুদ্ধদেব বাবুর বাম সরকার টাটাকে দখল দিয়েছে এবং সেই দখল কায়েম রাখতে দিনরাত দাঙ্গা পুলিশের উপস্থিতি জারি করে পুরো এলাকাকে রীতিমতো যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে।

টাটা নগরের কেচ্ছা

ভারতের একটিমাত্র ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শহর বা প্রাইভেট সিটি জামশেদনগর বিখ্যাত। জামশেদজি টাটা ১৯০৪ সালে এই শহরটি পত্তন করেছিলেন। টাটা সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকেও অনেক সাংবাদিক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের তাদের মালিকানা ও পরিচালনার অধীন এই শহর দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। ইদানীং জামশেদনগর দেখাবার জন্য টাটার চেষ্টা একটু বেশিই লক্ষ করা যাচ্ছে। রাজনৈতিক দিক থেকে ব্যাপারটা তাৎপর্যপূর্ণ। একটু ব্যাখ্যা করা যাক।

টাটা প্রাইভেট সিটি জামশেদপুরের সকল পানি, বিদ্যুত সরবরাহসহ সব ধরনের সেবা দেবার দায়িত্বে। লোকসংখ্যা প্রায় ৬ লাখ। জামশেদপুর ইউটিলিটিস এন্ড সার্ভিস কোম্পানির মালিক টাটা স্টিল। এই শহরে কোনো পৌরসভা বা স্থানীয় সরকার নাই। কারণ মালিক ও পরিচালক টাটা কোম্পানি নিজেই। ভারতীয় সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নগর ও গ্রামের সকল পৌরসভা বা স্থানীয় সরকারকে অবশ্যই নির্বাচিত হয়ে আসার বিধান রয়েছে। সব

রাষ্ট্রকেই সংবিধান মেনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইন করতে হবে। কিন্তু জামশেদনগরে একটি গণতান্ত্রিক ও নির্বাচিত স্থানীয় সরকার বা মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে টাটা প্রচণ্ড প্রতিরোধ করে যাচ্ছে। টাটার বক্তব্য হচ্ছে নির্বাচিত বা গণতান্ত্রিক সরকারের কী দরকার? কোম্পানি যদি সদয় থাকে আর জনগণের উপকারই করে তাহলে কীসের আবার স্থানীয় সরকার, কিম্বা নির্বাচিত মিউনিসিপ্যালিটি? তবে এই ধরনের একটি প্রাইভেট সিটি নিজের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে টাটা কতোদিন রাখতে পারবে তা ভারতেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বাংলাদেশের জন্য টাটার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের আন্দোলন - সংগ্রামের সাফল্য বিপদের কারণ হয়ে উঠছে কি? বাংলাদেশ থেকে– বিশেষত গণমাধ্যমগুলো থেকে সম্প্রতি জামশেদনগর দেখাতে নিয়ে গিয়ে টাটা কী বোঝাতে চায় যে বাংলাদেশ আরেকটি জামশেদনগর হয়ে উঠুক? আমাদের কোনো নির্বাচিত সরকার লাগবে না, কোনো ভোটাভুটি নাই দাঙ্গাহাঙ্গামা নাই কোম্পানির কাছে বাংলাদেশের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণভার তুলে দিলেই তো আমাদের জন্য ভালো। আরো বৃহৎ জামশেদনগর হয়ে ওঠাই কি বাংলাদেশের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ? যার মালিক ও পরিচালক হবে বহুজাতিক কোম্পানি? এই প্রশ্নগুলো উঠছে এবং উঠতে বাধ্য। টাটার তৎপরতাকে আমরা রাজনীতির বাইরে ভাবতে পারি না। যারা বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করবার জন্য কাজ করছে তাদের কাছে জামশেদনগর একটি আদর্শ পরীক্ষাস্থল।

টাটা ৪০টি দেশে কাজ করে এবং ১৪০টি দেশে তার বাণিজ্য রয়েছে। টাটার ইকুইটির শতকরা ৬৬ ভাগের মালিক দুটো 'জনকল্যাণমূলক' ট্রাস্ট, টাটা পরিবারই যার নিয়ন্ত্রক বা পরিচালক। তার মধ্যে দোরাবজি টাটা ট্রাস্ট ভারতীয় এনজিওদের একটা বড় অংশকে অনুদান দিয়ে থাকে যে অনুদানের পরিমাণ ভারতে ফোর্ড ফাউন্ডেশানের অনুদানের চেয়েও বেশি। রতন টাটা নিজে ফোর্ড ফাউন্ডেশানের বোর্ডে বসেন। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড ফাউন্ডেশানের পরিচালকমণ্ডলীর তিনি একজন। বাংলাদেশের এনজিওমহলও এই ধরনের দাতাসংস্থা দ্বারা উপকৃত। টাটার 'জনকল্যাণমূলক' অর্থভাণ্ডার থেকে শুধু ভারতের এনজিও নয়, বাংলাদেশের তথাকথিত সিভিল সোসাইটিওয়ালারাও উপকৃত হয়। বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করবার যে এনজিওধারা বর্তমান, তারা বাংলাদেশকে বৃহৎ জামশেদনগর বানাবার খায়েশ করছেন কিনা আমরা জানি না, কিন্তু টাটা নিছকই একটি কোম্পানি নয়, ইন্দো-মার্কিন নয়া রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুও বটে।

ভুপালের জনগণের জন্য ইনসাফ চেয়ে যাঁরা 'টাটার কুৎসিত মুখ' উদাম করছেন তাঁরা বাংলাদেশের জনগণ নয়, ভারতেরই জনগণ। আমরা ভারতের সাধারণ জনগণের সঙ্গে একাত্ম, আমাদের কথা হচ্ছে টাটা বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশে আসেনি। নিজ দেশে ভারতীয় জনগণের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মুখে টাটা এমন সব 'বিনিয়োগ' স্থান চাইছে যেখানে বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থার গণবিরোধী

হিংস্রতা ও গণতন্ত্রহীনতাকে টাটা মুনাফা কামাবার কাজে খাটাতে পারে। প্রাণ ও পরিবেশ ধ্বংস করলেও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' বাংলাদেশকে বিপজ্জনক প্রমাণ করে ও প্রচার চালিয়ে অনায়াসেই দমন করতে পারে। এই সকল কারণে টাটার কাছে বাংলাদেশ খুবই আকর্ষণীয়।

টাটা বলছে সময় চলে যাচ্ছে, বাংলাদেশ সরকার কোনো সিদ্ধান্ত না দিলে তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবে কিনা নিশ্চিত বলতে পারবে না। টাটা যদি বাংলাদেশে বিনিয়োগ না করে তাহলে সেটা বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার শক্তি এবং বিনিয়োগের বিষয়কে জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে বিচার করবার সামর্থ্যই প্রমাণ করে। বাংলাদেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে দীর্ঘসূত্রতার কথা টাটা বলছে তার কোনো ভিত্তি নাই। এই প্রচারে আমরা যেন কান না দেই।

২৪ মার্চ ২০০৭। ১০ চৈত্র ১৪১৩। শ্যামলী।

বার্ড ফ্লু : পরাধীন সময় ও পরাধীন চিন্তা

হাঁস-মুরগির রোগ হলে তার মাংস খাওয়া যায় না। ডিমও খাওয়া যায় না। আমরা যারা গ্রামেগঞ্জে বড়ো হয়েছি, এই কথা সবসময় জেনে এসেছি। এমনকি মফস্বল শহরেও। এদেশে হাঁস-মুরগি গ্রামে ঘরে ঘরে ছিল। পোল্ট্রি ফার্মের বয়স তো বেশি দিনের নয়। কাজেই আমরা জানি ঘরে হাঁস-মুরগি পালন করতে হলে কী করতে হয়। অসুখ বিসুখ হলে কী করতে হয়। মহিলাদের জন্যে গরু-ছাগল, হাঁস মুরগি পালন পরিবারে সন্তান পালনের মতোই একটি ব্যাপার। গ্রামের কৃষক পরিবারে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগিকে পরিবারের সদস্য হিসেবেই দেখা হয়। ঝড় তুফানের সিগনাল শুনেও অনেক মহিলা ঘর ছেড়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আশ্রয়স্থলে যাননি কারণ তাঁর সাথে হাঁস-মুরগি নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। একাত্তরের যুদ্ধের সময় আমরা অনেকে ঘর ছেড়ে যেতে পারিনি, কারণ মায়েরা মুরগি পালতেন। তাঁরা মুরগি ফেলে যেতে রাজী ছিলেন না। মানুষের প্রাণ আর গৃহপালিত পশুপাখির প্রাণের মধ্যে আমাদের মায়েরা যখন ফারাক না করে আমাদের হাজার অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও গরু-ছাগল হাঁস-মুরগি রেখে পালিয়ে যাননি– আজ স্বাধীনতার ৩৬ বছর যখন পার হচ্ছি, তখন এই জগৎজননীদের জন্য বুক ফাটিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে আমার। শহর কি গ্রামে হাঁস-মুরগির পালন আমাদের জীবনের সাথে গভীরভাবে জড়িত।

হাঁস-মুরগি পালন এক সময় উন্নয়ন কর্মসূচির একটি অন্যতম প্রধান আয় উপার্জনকারী কর্মসূচি হয়ে গেল। ষাট ও সত্তর দশকেই। অবশ্য এই সময় থেকেই গ্রামের মহিলারা যে দেশীয় জাতের মুরগি পালন করতেন তা বদলাতে শুরু করে। হাঁসের মধ্যে খাকি কেম্বেলের কথা আমরা সেই সময় শুনি। আর সাদা সাদা মুরগি আসতে শুরু করলো। বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে বাধ্য করে সাদা তুলতুলে বিদেশি মুরগির বাচ্চা গছিয়ে দেয়া হয়। মহিলারা এই মুরগি নিতে চান না। কিন্তু ঋণ বলে কথা। টাকার সাথে হাইব্রিড মুরগি, ধানের বীজ সব নিতে হবে। এভাবে আমাদের কালো, বাদামি, লাল মুরগি, গলা ছিলা মুরগি সব হারিয়ে যাওয়া শুরু করলো। মোরগগুলো ধরে জবাই করা হলো। নইলে জাত মারবে কী করে! এই 'মোরগ' নিধন কর্মসূচির জন্য বিদেশিরা উন্নয়নের টাকাও আমাদের দিল। এই বদলানোর প্রক্রিয়ার মধ্যেই এক সময় কখন মুরগি "পোল্ট্রি' হয়ে গেল তা আমরা যেন টেরও পেলাম না। অতো গরজ করিনি। ভেবেছিলাম ওটা তো ব্যবসায়ীদের ব্যাপার। আমরা তো এখনও মহিলাদের ইনকাম জেনারেটিং কর্মসূচি নিয়েই আছি। এ তো হাঁস-মুরগি পালনকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

তখন দেখা যেত মুরগি প্রকল্পের কতগুলো অসুবিধা ছিল। হঠাৎ মড়ক লাগলেই শেষ। রানীক্ষেত রোগ মহামারী আকারে হয়ে যেতে পারে। এক বাড়িতে রোগে ধরলে অন্য বাড়ি, এমনি করে সারা গ্রামও ছড়িয়ে যেত। ছুটোছুটি শুরু হতো পশুপালন দফতরে। কিন্তু একসময় মহিলারা মেনে নিতেন তাদের এই ক্ষতি। নীরবে দুঃখ করে আবার নতুন করে পালন শুরু করতেন। কিন্তু কখনোই দেখিনি, অসুস্থ মুরগির মাংস কাউকে খাওয়াতে। মহিলারা নিজেরা হাঁস-মুরগির রোগের চিকিৎসা করেছেন, কিন্তু মরা বা অসুস্থ মুরগির মাংস কাউকে খাইয়েছেন বলে শোনা যায়নি। এই ভাবেই এক সময় হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ডিম ও মুরগির সরবরাহ বাজারে ঘটেছে। আমরা সে হিসেব কখনোই করিনি। দেশের অর্থনীতিতে নারীদের এই অবদানের কথা অনেকেই মনে রাখেননি। মনে রাখিনি প্রাণের প্রতি দরদ, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির গভীর ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কের আনন্দের কথা।

এরপর আমরা দেখলাম পোল্ট্রি ফার্মের মুরগি মারা যাচ্ছে বলে দেশে হৈ চৈ পড়ে গেছে। কেউ বলছে রোগ লেগেছে, কেউ বলছে রোগ নয়, রোগের ভয় দেখানো হচ্ছে। তাদের উপকারে এগিয়ে এসেছিলেন বিগত সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী। চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানে বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী চিরাচরিত গরুর মাংস খাওয়ানোর নিয়ম ভেঙ্গে এই প্রথম ফার্মের মুরগির মাংস নিজে খেলেন এবং সকলকে খাওয়ালেন। হঠাৎ গরুর মাংস না দিয়ে মুরগির মাংস দেয়ার কারণ আর কিছুই নয়, চট্টগ্রাম ব্রিডার অ্যান্ড হ্যাচারী এসোসিয়েশন আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নিয়েছিলেন যে দেশের ফার্মের মুরগিতে বার্ডফ্লু রোগের আক্রমণ ঘটেনি, এই কথা প্রমাণ করা দরকার। হাজার

হোক দেশের বাণিজ্যমন্ত্রীর মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি না জেনে নিশ্চয় খাবেন না। তিনি যদি খেতে পারেন তাহলে সবাই ফার্মের মুরগির মাংস খেতে পারবে। তাহলে মানুষের অসুখ বিসুখ যদি হয়ও, তাহলেও পোল্ট্রি ফার্ম তো অন্তত বিরাট ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে। বাণিজ্যমন্ত্রী, খোদা না করুক, অসুখ হলে চিকিৎসার জন্যে সরকারি তহবিল আছে, তাঁর নিজেরও আল্লার রহমতে ক্ষমতা আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের অসুখ হলে এর খরচ কে বহন করবে, এই আশ্বাস দিয়ে মাংস তিনি খাননি। আর সবচেয়ে বড় কথা, পোল্ট্রি ফার্মের ক্ষতি এতো বড় হয়ে গেল যে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী নিয়ম ভাঙ্গা হলো। আর আমাদের চট্টগ্রামের ভাই বোনেরা তা মেনেও নিলেন? চট্টগ্রামের মেজবানিতে পোল্ট্রি ফার্মের মাংস খাওয়ানো হলো–এ বড়ো বিচিত্র দেশ, সেলুকাস!!

বাণিজ্যমন্ত্রীর মুরগির মাংস খাওয়া দেখে দুঃখ পেলাম, কিন্তু অবাক হলাম না। বরং এই ঘটনা আমাকে আরো সতর্ক হয়ে উঠতে সহায়তা করেছে। কিন্তু এ কাজ তিনি একা করেননি। বার্ড ফ্লু এশিয়ার আরও কয়েকটি দেশে ছড়িয়েছে। সেই সময় (২০০৪) জানুয়ারি ২৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ৮ তারিখ পর্যন্ত থাইল্যান্ডের ৪০,০০০ পোল্ট্রি ফার্মের ২ কোটি ৬০ লক্ষ মুরগিকে অনুপোযোগী ঘোষণা করা হয়েছিল। একই ঘটনা লাওস ও ভিয়েতনামেও হয়েছে। এই সময় থাইল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা দেশে বার্ড ফ্লু আছে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও মুরগির মেলা বা চিকেন ফেস্টিভেল করলেন, বিনা পয়সায় মুরগির মাংস বিলালেন, এবং পত্রিকায় এবং টেলিভিশনে ছবি তোলার পোজ দিয়ে মুরগির মাংস নিজে খেলেন (এইসব শেষাবধি তাঁর ক্ষমতা পাকাপোক্ত করেনি)। চিকেন খাদ্য ব্যবসায়ী এবং ফাস্ট ফুড চেইন যেমন কেন্টাকি ফ্রাইড চিকেন এবং চেস্টারস গ্রিল এই ধরনের প্রচারণার পেছনে বড়ো ভূমিকা রেখেছে। তারা প্রায় ৫০,০০০ চিকেন খাবারের বাক্স বানিয়ে মেলায় আগত মানুষকে বিনে পয়সায় বিতরণ করে। অবশ্য দুর্মুখেরা বলে, প্রধানমন্ত্রীর খাওয়া মুরগি নাকি অন্য দেশ থেকে আনা হয়েছিল। থাইল্যান্ডের মুরগি তিনি খাননি। অবশ্য এতো প্রচারণাতেও খুব কাজ হয়নি। থাইল্যান্ডে রেস্টুরেন্টগুলোতে, থাই এয়ারলাইন্সের চিকেন দেওয়া কিছুদিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছে যে পোল্ট্রি শিল্পের অর্থনৈতিক ক্ষতির দিকে তাকানোর চেয়ে মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করা উচিত। সেই সময় এশিয়ায় ১৯ জন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল ভিয়েতনামে ১৯ জন Pathgenic H5NI Virus-এ আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে ১৪ জন মারা গেছে। থাইল্যান্ড ৫ জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছে। এই তথ্য আমি The Nation (February 11. 2004) এবং The Bangkok Post (February 8 ও February 11, 2004) থেকে পেয়েছি। অর্থাৎ বার্ড ফ্লু শুধু মুরগির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। তাই বিশ্ব

স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে H5NI-এর সাথে যদি ইনফ্লুয়েঞ্জা যুক্ত হয় তাহলে তা মৃত্যুর কারণ ঘটাতে পারে। তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাবে। যদিও এতোখানি মারাত্মক পর্যায়ে এখনও রোগটি পৌঁছেছে কিনা বলা যাবে না। কিন্তু ভিয়েতনামের একই পরিবারে দুই বোনের মৃত্যু তাদের ভাইয়ের H5NI Virus-এ আক্রান্ত হবার পর ঘটেছে। কাজেই এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। এদিকে চীন দেশে ১৪টি প্রভিন্সে মুরগির মধ্যে H5NI Virus এবং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ হয়েছে বলে জানা গেছে। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, যেসব দেশে বার্ড ফ্লু ধরা পড়েছে সেখানে অর্থনৈতিক ক্ষতির চেয়েও মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতিকেই প্রাধান্য দেয়া উচিত হবে।

মুশকিল হলো এই সতর্কবাণী বাংলাদেশ খুব একটা গ্রহণ করেনি। শুধু বার্ড ফ্লু নেই নেই বলে চিৎকার করলেই তো বার্ড ফ্লু চলে যাবে না, কারণ সমস্যাটা ইনডাস্ট্রিয়াল পোল্ট্রির মধ্যে। এ কথা তো অস্বীকার করা যাবে না যে যেসব দেশে বার্ড ফ্লু হয়েছে সেখান থেকেই পোল্ট্রি ফার্মের মুরগির বাচ্চা আমদানি করা হয়। বাংলাদেশ কয়েকটি দেশ থেকে পোল্ট্রি ফার্মের জন্য মুরগি আনা বন্ধ ঘোষণা করেছিল, সত্য। কিন্তু ব্যবসায়ীদের ওপর নজরদারি রাখবার প্রশাসনিক ক্ষমতা বাংলাদেশের নাই। মজার দিকটা হলো এই যে পোল্ট্রির আমদানি এশিয়া থেকে সরে ইউরোপে চলে গেল। বলা হলো এরপর থেকে নাকি ইউরোপ থেকে আমদানি করা হচ্ছে। ইউরোপ পোল্ট্রির বাজার দখল করবার জন্য বার্ড ফ্লু নিয়ে হৈ চৈ করছে কিনা সে কথাও উঠল। কিন্তু যেগুলো ইতিমধ্যে আমদানি হয়ে গেছে তার মধ্যে কি রোগ ছাড়াতে পারে না? বাণিজ্যমন্ত্রী তখন ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন, তিনি বাণিজ্যের স্বার্থ দেখছেন। স্বাস্থ্যে সমস্যা হলে তাঁর তো কিছু করার নেই। কিন্তু কৃষিমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কোনো ভূমিকা আমরা সেই সময় দেখিনি। এমনকি ইনডাস্ট্রিয়াল পোল্ট্রি অর্থনৈতিক ভাবে বারবার মার খাবার পরেও বাংলাদেশের মোরগ-মুরগি পালন এবং মাংস ও ডিম সরবরাহের জন্য ইনডাস্ট্রির ওপর নির্ভর হওয়া আদৌ বাণিজ্য, অর্থনীতি, স্বার্থ ও প্রাণের নিরাপত্তার প্রচণ্ড ঝুঁকিপূর্ণ কিনা সেই প্রশ্নটি কেউ তোলেনি।

স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক ভাবে মুরগি পালন বাদ দিয়ে প্রযুক্তিনির্ভর মুরগি পালনের মধ্যেই রয়েছে প্রকট গলদ এবং বাংলাদেশের মানুষের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য প্রচণ্ড ঝুঁকিও এখানেই নিহিত। নীতি নির্ধারকদের এই দিকটা আগে স্বীকার করে নিতে হবে। তাছাড়া বার্ডফ্লু না হলেও পোল্ট্রি মুরগি কি খাওয়া নিরাপদ? পোল্ট্রি ফার্মের মুরগিকে যতো ওষুধ দেয়া হয়, পোল্ট্রি খাদ্যের জন্যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে যে-খাদ্য বানানো হয়, আমদানি হয়ে যা আসে, তা কি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো? বাংলাদেশে অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দেশের পোল্ট্রি ফার্মের জন্যে হাইব্রিড (কিম্বা জেনেটিক) ভুট্টা উৎপাদনের কাজ করছে কিছু এনজিও। কৃষকের খাদ্য উৎপাদন বাদ দিয়ে তারা অস্ট্রেলিয়ার পোল্ট্রি ইনডাস্ট্রির জন্যে

বাংলাদেশের জমি দখল করে নিচ্ছে। বাংলাদেশে পোল্ট্রি খাদ্য আমদানি হয় বিদেশ থেকে। এর আগে বাংলাদেশে পোল্ট্রি খাদ্যে আফলাটক্সিনের ঘটনা আমরা শুনেছি। তখনও হৈ চৈ। ব্যবসা গেল, ব্যবসা গেল। যেসব পত্রিকা এই সব খবর ছেপেছে তাদের ওপর পোল্ট্রি মালিকরা রেগে গেলেন। অথচ কথাটা সত্যি। গরুর মাংস নিয়েও এখন যুক্তরাষ্ট্রে সমস্যা হচ্ছে। ম্যাডকাউ রোগ ধরা পড়েছে। এশিয়াতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গরুর মাংস আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। এতে ব্যবসায়িক ক্ষতি হয়েছে কিন্তু রোগ এতোই মারাত্মক যে এই ক্ষতি মেনে নিতে হচ্ছে। খাদ্যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি ব্যবহারের এই ভয়াবহ দিকগুলো আমরা দেখতে শুরু করেছি।

বুশ সাহেবের একটি ঘটনা বলি। ছয় বছর আগে, ১৪ মে ২০০১ Alternet -এর একটি সংবাদ ভাষ্যে জানা যায় যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ নিজে জেনেটিক খাদ্য খেয়ে থাকেন। অনেকের মতে, এজন্যই বুশ সাহেবের বুদ্ধি একটু কম! তিনি এতো যুদ্ধবাজ! কারণ মানুষের স্বাভাবিক যে দয়া মমতা ইত্যাদি তাঁর খাদ্যদোষে তাঁর মধ্যে আর নাই। হোয়াইট হাউসের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুধু জর্জ বুশ নিজেই খাবেন তা নয়, সরকারি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিশ্বের অন্যান্য নেতাদেরও জেনেটিক খাদ্য খাওয়াবেন। সে বছর জুন মাসে ফরাসি প্রধানমন্ত্রী লিওনেল জসপিনের আগমন উপলক্ষে লাঞ্চ-ডিনারের যে মেনু করা হয়েছিল তার মধ্যে জেনেটিক খাদ্য ছিল। কিন্তু এরপরও ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ভোক্তারা জেনেটিক খাদ্য খেতে নারাজ। শিল্পোন্নত দেশগুলো এখন এই সকল খাদ্য ও টেকনলজি আফ্রিকা, এশিয়ার গরিব দেশে চাপিয়ে দেবার প্রয়াস চালাচ্ছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বুশ-জসপিনের ডিনারে জেনেটিক খাদ্য ছিল কি না নিশ্চিত জানা যায়নি। তবুও প্রশ্ন এসেছে, কেনো এই আয়োজন? এটা করা হয়েছিল শুধু এই কারণে যে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতারা জেনেটিক খাদ্য খেতে ভয় পায় এবং এর চাহিদা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। তাই বুশ সাহেব নিজেও খাচ্ছেন এবং তারই আমন্ত্রণে আসা অতিথিদেরও খাওয়াচ্ছেন। কোম্পানির মুনাফা রক্ষা করা এক বিরাট দায়িত্ব!! বায়োটেক কোম্পানিগুলো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল প্রার্থীদের পেছনে অনেক অর্থ খরচ করে। তাহলে তাদের স্বার্থ না দেখে উপায় কী?

মানুষের বহু বছরের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বিচার পদ্ধতির মধ্যেই কৃষি ও পশুপাখি সম্পদ উন্নয়নে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। অর্থাৎ ইনডাস্ট্রিয়াল দেশগুলোর পথই আমাদের পথ– এই বিকৃত চিন্তা ত্যাগ করতে হবে। যদি আমরা তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে চাই তাহলে প্রাণ ও পরিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট চিন্তাভাবনা বাদ দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষা করে সত্যিকারের বিজ্ঞানচর্চা ও কৃৎকৌশল আবিষ্কার করতে হবে আমাদের। তারা তাদের প্রাণ ও পরিবেশ ধ্বংস করেছে। এখন লেজ কাটা শেয়ালের মতো

আমাদের লেজ কাটতে শুরু করেছে। এই হামলা রুখে দিতে হবে। আমাদের পরাধীনতা থেকে মুক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠের বুদ্ধি ও আবিষ্কার ক্ষমতার মধ্যেই নিহিত, কর্পোরেট ব্যবসা পরিকল্পনার মধ্যে নয়। যাকে 'বিজ্ঞান' ও 'কৃৎকৌশল' বলা হয় তা আসলে অধিকাংশ সময়ই কোম্পানির ব্যবসায়িক প্রপাগান্ডা। বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশল আমাদের খুবই দরকার কিন্তু সেটা কোম্পানির প্রপাগান্ডা বাস্তবায়ন নয়। এই হুঁশ যতদিন নীতিনির্ধারকদের মধ্যে না আসছে, যতদিন আমরা চিন্তা চেতনায় দেশ শাসনে পরাধীন থাকব ততোদিন আমরা পথ খুঁজে পাব না।

এটা তো স্বীকার করতেই হবে যে পোল্ট্রির মাংস আর ঘরে পালা মুরগির মাংসের স্বাদে অনেক পার্থক্য। হোটেলওয়ালারা মানুষের জিহ্বার খবর রাখে। তাই তারা বড় গলায় ঘোষণা দেয় আমাদের রেস্টুরেন্টে দেশীয় মুরগির মাংস পাওয়া যায়। আর তাই শুনে মানুষ আগ্রহ ভরে খায়। গ্রামের মহিলাদের আয় উপার্জনের একটি বড় উপায় ছিল হাঁস-মুরগি পালন। তাতে কখনোই কোনো বড় ধরনের বিপর্যয় হয়নি। কিন্তু পোল্ট্রি ফার্মের মুনাফা যেমন, তেমনি এর আশে পাশে হাঁটতে গেলে টের পাওয়া যায় কি বিকট দুর্গন্ধ! এই দুর্গন্ধ প্রতীকী অর্থে এর নেতিবাচক অবস্থার কথাই বলে দেয়।

পোল্ট্রি ফার্ম বন্ধ হলে ৫০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান বন্ধ হবে বলে আফসোস শুনেছি বহুবার। অথচ পোল্ট্রি ফার্মের কারণে গ্রামের কোটি কোটি মহিলার আয়ের পথ বন্ধ হয়েছে, কই তখন কারও তো একটু দুঃখ হয়নি। কিন্তু এখনও সময় আছে। গ্রামের প্রতিটি ঘরই পশুপাখি হাঁস-মুরগির সমৃদ্ধ সরবরাহকারী হতে পারে। আমাদের জনবল আছে, আমাদের পরিবেশ প্রাণের পালন ও বিকাশের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত। আমরা পুরো ইউরোপের খাদ্য জোগাতে পারি যদি পরাধীন চিন্তা ও পরাধীন শাসন থেকে মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হই।

অতএব 'জরুরি অবস্থা'র অধীনে বাংলাদেশ বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ার খবর খুব সুখবর নয়। বাংলাদেশের অস্বাভাবিক ও অরাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে বাংলাদেশ নানানভাবে আক্রান্ত হতে পারে। বাংলাদেশের প্রাণ ও পরিবেশ নানা দিক থেকে বিপন্ন। বড়ো বড়ো গালভরা কথাবার্তা অনেকে বললেও 'নিরাপত্তা' বা 'সিকিউরিটি'র ধারণা নিয়ে বাংলাদেশে কার্যকর কোনো আলোচনা নাই বললেই চলে। এই দিক থেকে বায়োসিকিউরিটি বা প্রাণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নীতি ও কৌশল কি হবে সেটা তো অনেক দূরের প্রশ্ন। আজ কাগজে দেখছি সাভার ও গাজীপুরে বাড়ি বাড়ি গৃহস্থের মোরগ-মুরগি নিধন শুরু হয়েছে। এর দায়দায়িত্ব কে নেবে?

কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের মতো ফ্যাক্টরির মতো করে গবাদিপশু-হাঁস-মুরগি উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বিগত দুই দশকে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, আমিষজাতীয় খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি এবং নগদ খরচ করা যায় এমন আয়ের বৃদ্ধি ঘটাতে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের গ্রামে গ্রামে গরিব পরিবারের মহিলাদের দ্বারা হাঁস-মুরগি পালনের বিপরীতে হাঁস-মুরগি পালনের

শিল্পায়নের উদ্ভব ঘটেছে এবং এর নামকরণ করেছে গবাদিপশু-পাখী বিপ্লব — অর্থাৎ গ্রামের উৎপাদন ধ্বংস করে পোল্ট্রি কোম্পানির অধীনে হাঁস-মুরগির উৎপাদন কেন্দ্রীভূত করবার ধনী দেশগুলোর পরিকল্পনা এটা। হাঁস-মুরগি গবাদি পশু পালনের বিষয়টি গ্রামের ঘরে ঘরে উৎপাদনের বিকাশের বিষয় হবে না– হবে বড়ো বড়ো উৎপাদন কারখানা, বিশাল পোল্ট্রি ইনডাস্ট্রি, বিক্রির জন্যে সুপার মার্কেট ইত্যাদি। অর্থাৎ সারা দুনিয়ার অল্প কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানি আমাদের খাদ্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবে।

কিন্তু মাত্র দুই দশকে এই তথাকথিত গবাদিপাখি-বিপ্লবের কারণে আধুনিক কৃষির মতো স্থানীয় জাতের হাঁস-মুরগি আমরা হারিয়েছি। দেশী মুরগি পালন না করে বিদেশি জাত পালনের জন্যে গ্রামের মহিলাদের বাধ্য করা হয়েছে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে বিদেশি মুরগি পালন বাধ্য করা হয়েছে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা স্বীকার করে যে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থায় হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে বেশি উৎপাদন করা গেলেও এর পরিবেশগত দিক এখনো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে স্থানীয় জাতের মুরগি পালনে খরচ কম এবং পরিবেশের সাথে সহজে খাপ খায়। এমনকি বাজারে এর দামও বেশি পাওয়া যায়। সমালোচনার মুখে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা আবার স্থানীয় জাতের মুরগির উৎপাদন বাড়ানোর প্রতিও তাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে।

বার্ড ফ্লুর মতো ব্যাধি ছড়ানোর পেছনে এককাট্টা বা একই জাতের মুরগি ব্যাপক উৎপাদন প্রক্রিয়া যে প্রধান একটি কারণ– এই নিয়ে তর্ক নাই। যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (FDA) বার্ড ফ্লুর মতো ব্যাধি ছাড়ানোর জন্যে পোল্ট্রি ফিডকে দায়ী করেছে, যা মাত্র গুটিকয় কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ফার্মের মুরগির খাদ্যের একটি অন্যতম প্রধান অংশ হচ্ছে মুরগির মল, পাখা, ময়লা (Poultry Litter) অর্থাৎ ফার্মের ভেতর যতো ময়লা আছে তাই আবার খাদ্য হয়ে ফার্মের মুরগির পেটে যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বার্ড ফ্লুর প্রভাব মুরগির মলের মধ্যে ৩৫ দিনের মতো থাকে, এবং এক ফার্ম থেকে অন্য ফার্মের মুরগির মধ্যে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে।

বার্ড ফ্লু মুরগিরই রোগ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দুই শতাধিক মানুষকে এই রোগে আক্রান্ত শনাক্ত করেছে এবং শতাধিক মৃত্যুর ঘটনা পেয়েছে যা মূলত বার্ড ফ্লু আক্রান্ত মুরগির মাধ্যমে এসেছে। এই ভাইরাস ১৯৯৭ সালে প্রথম হংকং-এ দেখা যায়। সবচেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয় হচ্ছে, মুরগির মাধ্যমে খুব দ্রুত মানব দেহে সংক্রমিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ দেখছি সাভার ও গাজীপুরে ঘরে ঘরে গৃহস্থের মুরগি নিধন চলছে। গ্রামের মানুষের হাঁসমুরগি পালন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করবার নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছে কিনা কে জানে। তবে অচিরেই আমরা তা বুঝবো এবং সময়মতো আমাদের পাঠকদের সতর্ক করবো।

২৬ মার্চ ২০০৭। ১২ চৈত্র ১৪১৩। শ্যামলী।

দিল্লী ১৪ সার্ক সামিট ও বাংলাদেশের রাজনীতি

এপ্রিলের ৩ থেকে ৪ তারিখে দিল্লীতে যে ১৪ সার্ক সামিট হতে যাচ্ছে তাকে ঘিরে ইতোমধ্যে বেশ উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। তেরো নম্বর সামিট থেকেই পরাশক্তিগুলো ও দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যবসাবাণিজ্যে ফিকির সন্ধানী দেশগুলো সার্কের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। আফগানিস্তান সার্কের সদস্য হওয়া গত সামিটের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীন, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া এখন সার্কের পর্যবেক্ষক হিশাবে সামিটে অংশগ্রহণ করবে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সার্কের পর্যবেক্ষক থাকতে চায় বলে ইচ্ছা জানিয়েছে। বিশ্বব্যাংক সার্ক-প্রক্রিয়া থেকে দক্ষিণ এশিয়ার ব্যবসায়ীরা কী করে আরো মুনাফা তুলতে পারে সে ব্যাপারে সদাই তৎপর রয়েছে। ব্যবসা ও মুনাফার পক্ষে তারা সার্কের ব্যবসায়ীদের দ্বিতীয় সভার আয়োজন করেছে যার উদ্দেশ্য তাদের ভাষায়, "দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিকে কঠোর নিয়মের অধীনতা থেকে মুক্তি দেওয়া" বা সোজা কথায় কাছাখোলা অবাধ বাজার ব্যবস্থা কায়েম করা। বাস্তবে যার অর্থ দাঁড়ায় দক্ষিণ এশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থের বিপরীতে বহুজাতিক কোম্পানি ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি এবং অল্প কয়েকটি কোম্পানির হাতে দক্ষিণ এশিয়ার সম্পদ কেন্দ্রীভূত করা।

সার্কের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ক্রমশ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে– এবারের সামিটে বিপুল আগ্রহ ও উৎসাহের এটা একটা বড়ো কারণ। দিল্লীতে সার্ক সামিট হওয়ার অর্থ দিল্লী এই সামিট থেকে পুরোপুরি নিজের ফায়দা তুলে নিতে চাইবে। পারবেও। প্রথমত অর্থনৈতিক স্বার্থ, দ্বিতীয়ত তার নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা স্বার্থ। এই লক্ষ্য সামনে রেখে ভারত 'আঞ্চলিক সহযোগিতা' (Co-operation) কথাটির পরিবর্তে ক্রমশ 'একত্রীভবন' (Regional Integration) কথাটি ব্যবহার করছে। এই ধারণা ছোটো দেশগুলোর গণবিরোধী ও গণতন্ত্রবিরোধী শাসক শ্রেণীর কাছে এখন খুবই গ্রহণযোগ্য। ভারতের সঙ্গে একত্রীভবনের মধ্য দিয়ে তারা আশা করছে ভারতের বিশাল বাজারের ফায়দা তারাও নিতে পারবে। তাদের নিজেদের লুটেরা চরিত্র, অন্যদিকে তাদের নিজ নিজ দেশের জনগণের আন্দোলন-সংগ্রাম– এই দুই মুখে ভারতের অধিপতি শ্রেণীর গোলামি ও তাঁবেদারি না করে তাদের পক্ষে টিকে থাকাও এখন অসম্ভব হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান এর আগে ভারতের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাত,

পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির কারণে সেই ক্ষেত্রেও ভাটা পড়েছে। ফলে বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী চাইছে বাংলাদেশের জনগণের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব জলাঞ্জলি দিয়েও 'একত্রীভবন' ত্বরান্বিত করা। চতুর্দশ সার্ক সামিটে এটাই ঘটতে যাচ্ছে।

এই আলোকেই ভারত বাংলাদেশের বর্তমান শাসকদের প্রতি খুশি। বাংলাদেশে বর্তমান সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত না হলেও এই ধরনের সরকারই 'সাউথ ব্লকের' পছন্দ বলে ভারত সোৎসাহে জানিয়েছে। মনে রাখা দরকার জনগণের নির্বাচিত সরকার প্রতিনিধিত্ব না করলে সার্ক অর্থহীন এই বায়না তুলে সার্ক পাকিস্তান ও নেপাল নিয়ে এর আগে অনেক নখরামি করেছে। এবার যেন বাংলাদেশকে তারা কোলে তুলে নিয়ে দিল্লী যেতে প্রস্তুত।

ভারতের শাসক শ্রেণীর স্বার্থই এই অঞ্চলে মার্কিন ও ইসরায়েলি স্বার্থ– এই ধারণা ২০০০ সালের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক মহলের যুদ্ধবাজ অংশ মন্ত্রের মতো বলে গিয়েছে। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা চুক্তির কারণে এই মন্ত্রই দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক মহলে এই তর্কও রয়েছে যে, ভারত ও মার্কিন স্বার্থ সবসময় সমার্থক নয় এবং নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা চুক্তি সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের স্বার্থই মার্কিন স্বার্থ– এই মন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য শেষাবধি কুফল বয়ে আনতে পারে। কিন্তু জর্জ বুশ ইন্দো-মার্কিন-ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা আঁতাতের যে রূপটা দক্ষিণ এশিয়ায় দাঁড় করালেন, দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যত এর দ্বারাই নির্ধারিত হবে, এটা নিশ্চিত। এই নীতির প্রধান কার্যকর দিক হচ্ছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। বাংলাদেশের সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস ঠিকই ২০০৩ সালের ৭ অক্টোবরের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক স্টাডিজে (BIISS) বলেছিলেন, 'Counterterrorism has been a key factor for US policy in South Asia-and worldwide since September 11. 2001' –সন্ত্রাস মোকাবিলাই দক্ষিণ এশিয়ায় এবং সারাবিশ্বে ১১ সেপ্টেম্বরের পরে মার্কিন নীতির প্রধান নির্ণায়ক। এটাও তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল কাজটি 'সহজ' নয় এবং 'দ্রুত' হবে না। এই নীতির অর্থ হচ্ছে হ্যারি টমাসের কথায় গণতন্ত্র বলি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলি বা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বলি– সবকিছুর সঙ্গেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই কাউন্টার টেররিজম নীতি ও তা কঠোরভাবে কার্যকর করবার নীতি জড়িত। হ্যারি টমাস যখন এইসব কথা বলছিলেন তখনই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভাগ্যও নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছিল।

ভারতের শাসক শ্রেণীর স্বার্থই দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন স্বার্থ, কাজে কাজেই যুক্তরাজ্যেরও স্বার্থ। এই নীতির আলোকে আগামী দিল্লী সার্ক সামিটে পরাশক্তিগুলো ভারতের সঙ্গে আঁতাতের মধ্য দিয়ে সার্ককে যেদিকে নেবে এবং নিতে সক্ষমও হবে তা আমরা আগাম আন্দাজ করতে পারি। একই নীতির

পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতার পরিবর্তনের পরে ভারতীয় স্বার্থ পরিস্ফুট হয়ে ওঠার তাৎপর্যও আমরা সহজে বুঝতে পারি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত বিউটেনিস এবং যুক্তরাজ্যের হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরী বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনে সরাসরি ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিল কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। সেখানে আমরা ভারতকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিনি। দেখবার কারণও নাই, দরকারও নাই। কারণ পরাশক্তির এই জেটের নেতৃত্বদানকারী দুইটি দেশ দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের স্বার্থের পক্ষেরই শক্তি। ক্ষমতা পরিবর্তনের পরপরই এই সরকার কেনো ভারতঘেঁষা নীতি গ্রহণ করেছে বা ভারতকে তুষ্ট করবার পথ অবলম্বন করেছে বা ভারতের স্বার্থই আমাদের স্বার্থ, এই মার্কিন নীতি মনে রাখলে আমরা তার মর্মোদ্ধার করতে পারবো।

জামায়াতুল মুজাহেদিনের ছয়জন রাজনৈতিক নেতার ফাঁসি কার্যকর করবার সময়ও বেছে নেওয়া হয়েছে দিল্লী সার্ক সামিটের আগে। সামিটের আগে ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলি আঁতাতের সন্তুষ্টি বিধানই এই সময়টা বেছে নেবার কারণ। কাউন্টার টেররিজম মোকাবিলা করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গুয়ানতানামো বে-তে বন্দীদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করেছে। তার বিরুদ্ধে দুনিয়াব্যাপী নিন্দা হয়েছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো ইসলামী জেহাদি বন্দীকে ফাঁসি দেয়নি। ভারত কাশ্মিরে কিম্বা উত্তরপূর্ব ভারতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে– কিন্তু তার সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ফল বিবেচনা করে কাউকে ফাঁসি দেয়নি। রাজনৈতিক ব্যক্তিকে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলিয়ে দিলে সেই চিন্তা ও রাজনীতির মৃত্যু ঘটে না। অনেকে মন্তব্য করেছেন মিশরে সৈয়দ কুতুবের ফাঁসির পর দীর্ঘদিন পরে এই ধরনের একটি ঘটনা ইসলাম প্রধান দেশে ঘটল– যা আসলে কাউন্টার টেররিজম মোকাবিলার পরিবর্তে সন্ত্রাসকে আরো তীব্র করবে ও দীর্ঘস্থায়িত্ব দিতে পারে। হয়তো এটাই বাংলাদেশে ভারত-মার্কিন-ইসরায়েলি নীতি। এই ধরনের একটি নীতি বাস্তবায়ন কতোটুকু সম্ভব হবে একমাত্র আগামী ইতিহাসই বলতে পারে।

একই কারণে প্রশ্ন উঠেছে, ভারতের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই কি দিল্লী সার্ক সামিটের আগে জাতির জনক সংক্রান্ত তর্কটি চাঙ্গা করে তোলা হচ্ছে? এটাই কি এখন বাংলাদেশে আমাদের প্রধান সংকট? শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া বাংলাদেশের অভ্যুদয় চিন্তাই করা যায় না। কিন্তু 'জাতির জনক' প্রশ্নে রাজনৈতিক দল, মত ও ধারার মধ্যে তর্ক আছে আমরা জানি। একটি অনির্বাচিত সরকারের কাছ থেকেই কি শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জাতির জনক' সার্টিফিকেট নিতে হবে? এতে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান আদৌ স্বীকার ও তাঁকে সম্মান জানানো হয় কিনা আমি নিশ্চিত নই। সত্যি যে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা আমরা তাঁকে দিতে পারি নি। সেটা তো কোনো নেতাকেই পারিনি। সকল পক্ষের মন জয় করে শেখ

মুজিবকে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকায় অভিষিক্ত করা যাদের কর্তব্য ছিল, তারা বিভক্তির রাজনীতিই চর্চা করেছে। কিন্তু মওলানা ভাসানী নামে একটি মানুষও যে বাংলাদেশের ইতিহাসে আছে, তাঁকে ছাড়া বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম দূরে থাকুক শেখ মুজিবুর রহমানের মতো নেতৃত্বের বিকাশ কি ঘটত? কই মওলানা ভাসানীর নাম তো আমরা নিই না, তাঁর কোনো রাজনৈতিক দল নাই বলে? ঠিক তেমনি শেরেবাংলা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকেও তো আমাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। জিয়াউর রহমানের প্রসঙ্গও রয়েছে।

আমরা কি আসলে কোনো একটি রাজনৈতিক দলকেই শুধু খুশি করতে চাইছি? খুশি করতে চাইছি সার্ক সামিটের আগে কোনো বিশেষ দেশকে? এটাই কি এখন কাজ? অথচ এখন আমাদের কর্তব্য আমাদের ইতিহাসের ক্ষত, বিভক্তি, পার্থক্য ও পারস্পরিক দূরত্ব কমিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিশাবে বিকাশের পথ প্রশস্ত করা।

দিল্লী সার্ক সামিট বাংলাদেশের জন্য সুখবর বয়ে আনবে আশা করা মুশকিল। কিন্তু এবারের সামিট আমাদের আরো ঘনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। বিশেষত নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার দিক থেকে। কারণ দক্ষিণ এশিয়ায়– হ্যারি কে টমাস ঠিকই বলেছেন– নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার প্রশ্নই প্রধান নির্ণায়ক। জনগণের দিক থেকে এই ব্যাপারটি কীভাবে দেখা হচ্ছে সেই সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে শেষ করবো।

দক্ষিণ এশিয়ায় যাঁরা জনগণের সঙ্গে সরাসরি কাজ করছেন তাঁরা 'নিরাপত্তা' ও 'প্রতিরক্ষা' সংক্রান্ত ধ্যানধারণা ও রাষ্ট্রীয় নীতি ও পরিকল্পনার প্রশ্নগুলো তাঁদের কাজের ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত করে ভাবতে শুরু করেছেন। সে কাজ কৃষিতে হোক, খাদ্য নিয়ে হোক, দেশে দেশে মানুষের চলাচল কিম্বা নারী শিশু পাচার নিয়ে হোক কিম্বা হোক টেকনলজি সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নেই। এটা নিছকই মিলিটারি মার্কা ধারণা নয়। তারই খুবই ভালো একটি নজির পাওয়া গেল এবার টাঙ্গাইলের 'রিদয়পুর বিদ্যাঘরে ২৮ থেকে ৩০ মার্চ পঞ্চম 'সার্ক পিপলস ফোরামে'। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা থেকে ৭৫ জন প্রতিনিধি এবার অংশগ্রহণ করেন। এঁরা সরকারের প্রতিনিধি কেউ নয়, সার্কভুক্ত দেশে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য কাজ করেন। প্রায় প্রত্যেকেই কোনো না কোনো গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ধারণার বিপরীতে তাঁরা যে ধারণায় বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন সেটা হচ্ছে 'জনগণের সার্বভৌমত্ব'। 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' কথাটা আমরা এর আগে শুনেছি, ফলে শব্দ হিশাবে কথাগুলো আমাদের অপরিচিত নয়। কিন্তু পঞ্চম সার্ক সম্মেলনের কথাটিকে খুবই পরিষ্কারভাবে তোলা হয়েছে এবং জনগণের সার্বভৌমত্বের আলোকে কৃষক, কৃৎকৌশল, মানুষের চলাচল, খাদ্য সার্বভৌমত্ব, জমি পানি ও

প্রাকৃতিক ও প্রাণসম্পদের অধিকার ইত্যাদি নানা বিষয়ে একটি অবস্থানপত্র দাঁড় করানো হয়েছে।

সার্বভৌমত্ব কথাটার মানে কী? এর মানে হচ্ছে নিজেই নিজে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা। জনগণ কীভাবে ও কী মাত্রায় এই সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম তার ওপর নির্ভর করছে সার্বভৌমত্বের মাত্রা। পঞ্চম সার্ক ফোরামে এই বিষয়ে সকলেই একমত হয়েছেন যে রাষ্ট্র এখন আসলে ভাড়া খাটে কোম্পানির, মুনাফাবাজদের, শোষক ও লুটেরাদের। এখনকার রাষ্ট্র নির্বাচন হোক বা না হোক– জনগণের নয়। তাহলে এই রাষ্ট্র যখন সার্বভৌমত্বের কথা বলে তখন কীসের সার্বভৌমত্ব বা কার সার্বভৌমত্বের কথা বলে? আসলে রাষ্ট্র বহুজাতিক কোম্পানি বা কর্পোরেশানের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও নিশ্চিত করার কথাই বলে। একসময় রাষ্ট্র অন্তত মানত যে, বাজার ব্যবস্থা সম্পদ তৈরিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারলেও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বাজারব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্রের নির্ভর করা ঠিক না। কারণ পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থা ধনী-গরিবের ব্যবধান বাড়ায় এবং সমাজে তীব্র বিরোধ ও অস্থিতিশীলতা তৈরি করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের কাজ সম্পদ বণ্টনে সক্রিয় ভূমিকা রাখা। যেমন, ধনী শ্রেণী ও কর্পোরেশানের কাছ থেকে কর আদায়সহ অন্যান্য পদ্ধতিতে অর্থ সংগ্রহ করে তা অভাবী ও গরিবের মধ্যে বন্টন করা।

কিন্তু রাষ্ট্রের এই ভূমিকা নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতি বা অবাধ বাজারব্যবস্থার কারণে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এখন বাজারই সব করবে, এটাই হচ্ছে এখনকার রাষ্ট্রের নীতি। এমনকি গরিব যদি কোনো অর্থ চায়, তাহলে তাকে অতি উচ্চ সুদে বাজার থেকে (যেমন, গ্রামীণ ব্যাংক, ব্রাক, আশা ও নানান কিসিমের এনজিও) নিতে হবে এবং সুদে-আসলে ফেরত দিতে হবে। তার মানে নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্র কোনো দায়িত্ব পালন করবে না। যদি তাই হয় তাহলে এই রাষ্ট্রের উপযোগিতা কী?

নিজের উপযোগিতা প্রমাণ করবার জন্যই রাষ্ট্র 'নিরাপত্তা', 'প্রতিরক্ষা' ইত্যাদি কথা বলে। কিন্তু কার নিরাপত্তা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে? কার 'প্রতিরক্ষা' করবে রাষ্ট্র? দক্ষিণ এশিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সঙ্গে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা বলছেন রাষ্ট্র আসলে 'নিরাপত্তা' বিধান করে কর্পোরেশানের, জনগণের নয়। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মানে বিভিন্ন কর্পোরেশানের সাম্রাজ্য বিস্তার, প্রতিযোগিতা, ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাতিয়ার হওয়া। এই তো রাষ্ট্র।

যদি তাই হয় তাহলে সময় এসেছে জনগণকে নতুন ধরনের লড়াই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার। এই লড়াই হচ্ছে জনগণের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করার লড়াই। এই লড়াই যদি আমরা করতে চাই তাহলে কর্পোরেশানগুলো যেমন আমাদের বিভক্ত রাখতে চায় আর যখন ইচ্ছা 'একত্রীভবন' করতে চায় সেই খেলায় সায় দিলে চলবে না। 'একত্রীভবন' বা regional integration বলতে রাষ্ট্র ও কর্পোরেশান বোঝে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণকে শোষণ ও লুণ্ঠনের ময়দানে পরিণত

করা। আর একত্রীভবন বলতে জনগণ বোঝে দক্ষিণ এশিয়ার মাটি, বন, নদী, পরিবেশ, প্রাণ ও প্রাণবৈচিত্র্য, জ্ঞান ও সংস্কৃতির ওপর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিনিধিরা সার্ক পিপলস ফোরামে তিনটি 'নিরাপত্তা' নীতি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে। এই তিনটি নীতি হচ্ছে : এক. প্রাণের নিরাপত্তা, দুই জীবিকার নিরাপত্তা এবং তিন. চলাচলের নিরাপত্তা। এই তিন নীতির ওপর দক্ষিণ এশিয়ার গণসংগঠনগুলোর মধ্যে শক্তিশালী আদর্শিক ও কর্মতৎপরতার সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে। রাষ্ট্র ও কর্পোরেশানের কোনো তৎপরতা, কর্মসূচি বা নীতি যদি প্রাণ ও পরিবেশের ক্ষতি করে, জীবিকা বিনষ্ট করে, মানুষের অবাধ চলাচলে বাধা দেয়– তাহলে দক্ষিণ এশিয়াব্যাপী সেই সরকার ও কর্পোরেশানের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম চালানো হবে। দক্ষিণ এশিয়ার মাটি, জল, বন, প্রাকৃতিক ও প্রাণ সম্পদে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করাই হবে দক্ষিণ এশীয় জনগণের সার্বভৌমত্ব কায়েমের লড়াই।

সম্ভবত এই প্রথম দক্ষিণ এশিয়া থেকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ধারণাকে আদতে কর্পোরেশানের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ধারণা বলে নাকচ করে দিয়ে জনগণের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব কায়েমের কথা এতো জোর দিয়ে বলা হলো। দক্ষিণ এশিয়ার এই সংগঠনগুলো 'সার্বভৌমত্ব' বলতে প্রথাগতভাবে যা আমরা এতোকাল বুঝে এসেছি তা যে আর কার্যকর নয় তা অস্বীকার করে না, কিন্তু এই কথা বলে পরাশক্তি ও আধিপত্যকারী দেশগুলো ছোটো দেশের অস্তিত্ব গিলে বসে থাকবে তা তারা মানতে রাজি নন। রাষ্ট্রের চরিত্রের মধ্যে বিপুল গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনের সুযোগে কর্পোরেশানগুলো বিদ্যমান রাষ্ট্র কাঠামো– বিশেষত তার নির্যাতন ও বিবর্তনমূলক কাঠামো টিকিয়ে রেখে রাষ্ট্রকে তাদের শোষণ লুণ্ঠনের হাতিয়ার ও পাহারাদার বানাতে চাইছে– এর বিপরীতে জনগণের কাজ হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র ও সরকারের আসল চেহারা উদাম করে দেওয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক মৈত্রী ও সংহতি শক্তিশালী করে নতুন দক্ষিণ এশিয়ার স্বপ্ন দেখা। যেখানে জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে– কর্পোরেশান নয়। আমরা অর্থনৈতিক গতিপ্রক্রিয়ার বিবর্তনে পিছু ফিরে হাঁটতে চাই না, সম্ভবও নয়। বরং তার সুযোগ গ্রহণ করে দক্ষিণ এশিয়ার আমূল রূপান্তর ঘটাতে চাই– এই ছিল সার্ক পিপলস ফোরামের অঙ্গীকার। ইন্দো-মার্কিন-ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা চুক্তির বিপরীতে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের সত্যিকারের রক্ষাকবচ হচ্ছে জনগণের মধ্যে মৈত্রী এবং কর্পোরেশান ও কর্পোরেশানের স্বার্থের বিপরীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ও জনগণের স্বার্থ রক্ষার লড়াই তীব্রতর করা।

১৯ চৈত্র ১৪১৩। ২ এপ্রিল ২০০৭। শ্যামলী।

নর্থ বেঙ্গল মাইনিং কোম্পানি! জয়েন্ট স্টক কোম্পানির রেজিস্ট্রেশান নম্বর ৫৭৬১২। রেজিস্ট্রেশান করবার তারিখ ১৬ জুন ২০০৬ সাল। অর্থাৎ কোম্পানিটির বয়স বাংলাদেশে এখনও এক বছর পূর্ণ হয়নি। এর বেশি খবর আমি গত এক সপ্তাহের মধ্যে জোগাড় করতে পারিনি। তাছাড়া পাঠকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম দুটো বিষয়ে বিশেষভাবে খোঁজখবর করব। ধানের চিটা হয়ে যাওয়া আর বার্ড ফ্লু। সেই দুটো প্রসঙ্গ আগে মনে করিয়ে দিচ্ছি। তারপর গুহ্য গুপ্ত খনিজ কথাবার্তা।

প্রথমত, বাংলাদেশে মাঠের পর মাঠ হাজার হাজার একর জমির ধান চিটা হয়ে যাবার পর হঠাৎ সত্যি কী ঘটেছে তা অনুসন্ধান না করে কেন শাইখ সিরাজ, আবেদ চৌধুরী ও আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ একটা তত্ত্ব ফেরি করা শুরু করলেন যে বাংলাদেশের ধানে চিটা লাগার কারণ 'কোল্ড ইনজুরি'। হাইব্রিড, উফশী ও অজানা ও অপরীক্ষিত ধান এই সব অঞ্চলে চাষ করার বুদ্ধি কার? কই দেশি ধানের তো সর্দি লাগে না। তাঁদের প্রপাগান্ডার মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষককে দোষারোপ করা, তাদের ভুয়া জ্ঞান ও প্রতারণামূলক প্রচারকে নয়। এই মিথ্যা প্রপাগান্ডা কি সত্য লুকিয়ে রাখার জন্য? হাওর অঞ্চল, যাকে আমরা পরিবেশের দিক থেকে ওয়েটল্যান্ড বলি, তাকে রক্ষা করার আন্তর্জাতিক আইন বা চুক্তি আছে। যাকে আমরা Ramsar Convention বলে জানি। বাংলাদেশ বহু আগেই রামসার কনভেনশান স্বাক্ষর করেছে এবং কাগজে কলমে ১৯৯২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জলাভূমির প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষার জন্য রামসার কনভেনশান বাংলাদেশে কার্যকর– এন্ট্রি ইনটু ফোর্স। যদি তাই হয় তাহলে এই সব প্রপাগান্ডাবিদদের উচিত ছিল প্রথমে প্রশ্ন তোলা আমাদের প্রাণরক্ষার জন্য যেসব জলাশয় ও জলাভূমি সংরক্ষণ অতি আবশ্যিক সেখানে হাজার হাজার ধান, মাছ, গাছপালা, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী সমূলে বিনাশ করে উফশী ধান ও হাউব্রিড ধান কৃষকদের প্রতারিত করে কীভাবে প্রবেশ করলো? উচিত ছিল পরিবেশ ধ্বংস এবং পরিবেশ বিধ্বংসী ধানের জাতের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে আমাদের কৃষক ধান, মাছ, গবাদিপশু, হাঁসমুরগি পাখপাখালি উৎপাদন ও লালনপালনের যে বিজ্ঞান হাজার বছর ধরে চর্চা করে আসছে সেখানে দাঁড়িয়ে এই বিজ্ঞানকে কীভাবে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সেই পরামর্শ দেওয়া।

না, তাঁরা তা না করে কোম্পানির ধানের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। এই বোরো মৌসুমে বাজারে আসা অপরীক্ষিত এবং বাংলাদেশের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ঘটাতে পারে এই ধরনের ধানের পক্ষে ওকালতি করতে নেমে পড়েছেন। ফলে কী কী ধান এইসব অঞ্চলে কৃষকরা লাগিয়েছেন, কেন লাগিয়েছেন? কার পরামর্শে? কিম্বা কী ধরনের প্রপাগান্ডার ফেরে পড়ে আজ তাঁদের ও আমাদের এতো বড়ো সর্বনাশ– সেই বিষয়ে খোঁজখবর করতে সময় লাগছে। এই বিষয়ে আমাদের কথা ফুরায়নি। এক চৈত্রে গরম যাবে না। আমরা এর আগে বলেছি আমাদের প্রাণ ও পরিবেশ এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত খাদ্য ব্যবস্থা রক্ষা গণপ্রতিরক্ষার অংশ। প্রপাগান্ডাওয়ালারা একবারও বলেননি যে কোন দেশি ধানে তথাকথিত 'কোল্ড ইনজুরি' হয়নি। হয় না। হয়েছে কি? তাহলে এই যে এতোকাল দেশি ধান মানেই খারাপ ধান প্রচার চললো এই মিথ্যা প্রপাগান্ডার কী হবে?

আমাদের মনে আছে ব্র্যাক হাইব্রিড আলোক ধানের উচ্চফলনশীলতার কথা বলে কৃষকদের সঙ্গে সমূহ প্রতারণা করেছিল। তাদের সেই ধানে চিটা হয়েছিল। ধান মাঠেই ঝরে গিয়েছিল। কই এইসব প্রপাগান্ডাবিদরা একবারও সেইসব কুকীর্তির ইতিহাস আমাদের জানাননি। মুখেও তোলেননি। বাংলাদেশের প্রাণ ও পরিবেশের জন্য উপযোগী ধান ধ্বংস করে ব্র্যাক হাইব্রিড ধান, জেনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তৈরি বিকৃত ধান ও অন্যান্য ফসলের বীজ আমদানি ও প্রবর্তন করে বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থাকে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষের জন্য খাদ্য উৎপাদনের জমিতে সাময়িক অর্থের লোভে কৃষককে বিদেশি ভুট্টা উৎপাদনে প্রতারিত করে জমির প্রাণশক্তি নষ্ট করে যাচ্ছে। সেই ভুট্টা যাচ্ছে দেশে ও বিদেশের পোল্ট্রি ফার্মে। আর সেই পোল্ট্রি ফার্মের কারণে ও মাধ্যমে আমরা বার্ড ফ্লুর মহামারীতে আক্রান্ত। দিশাহারা। আমাদের জীবনের ওপর হুমকি এসে পড়েছে। আমাদের কৃষকদের ঘরে পালা হাঁস-মুরগিকে নির্বিচারে কতল করা হচ্ছে– অন্যদিকে পোল্ট্রি ফার্মের মালিকদের দেওয়া হচ্ছে ক্ষতিপূরণ। যারা বাংলাদেশের হাঁস-মুরগি ধ্বংসের কারণ তারা পুরস্কৃত হচ্ছে আর কৃষিব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হচ্ছে বার্ড ফ্লু ছড়িয়ে।

আমরা বারবারই সাবধান করে দিয়ে বলেছি সেনাবাহিনীর সমর্থনের সুযোগ নিয়ে সরকার যেন আমাদের প্রাণ, পরিবেশ ও গণমানুষের কৃষি, খাদ্যব্যবস্থা, জমি, মাছ, জলজ সম্পদ ইত্যাদি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করবার কোনো নীতি বা কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে নিজেদের যেন বিতর্কিত না করেন। এই ধরনের গুপ্ত বা প্রকাশ্য কায়কারবারগুলোর ওপর নজরদারি রাখা সব নাগরিকের এখন কর্তব্য হয়ে উঠেছে। এইসকল কুকর্মে আমাদের সেনাবাহিনী ও সৈনিকদের যেন ব্যবহার করা না হয়। কারণ এই দেশের মানুষকে রক্ষা করবার ক্ষেত্রে, দুর্ভাগ্যক্রমে– সেনাবাহিনীই এখন জনগণের একমাত্র ভরসা। রাজনৈতিক দলগুলো আমাদের সঙ্গে বেঈমানি করেছে। সেই কারণে আমরা সেনাবাহিনীকেও বারবার এই কথা

বলে সতর্ক করেছি যে জনগণ অবশ্যই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানে একশ এক ভাগ তাঁদের পেছনে আছে। এই জনগণই এই অভিযানে সেনাবাহিনীর সত্যিকারে শক্তির জায়গা। সেই কারণে সেনাবাহিনী যেন কোনো অবস্থাতেই জনগণের কাছ থেকে দূরে সরে না যায়। মানবাধিকার লঙ্ঘন না করে। সেনাবাহিনীর হাতে একটি নাগরিকও যেন হয়রানি বা নির্যাতিত না হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ধরনের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যা আমাদের সকলের জন্যই বিপজ্জনক। সেনাবাহিনীর মধ্যে এমন কেউ থাকতেই পারে যারা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি বিনষ্ট করে বাংলাদেশে গণদুশমনদের নির্বিচার তৎপরতা চালিয়ে যাবার পরিস্থিতি তৈরি করবে। এই ধরনের অন্তর্ঘাতী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সাবধান থাকা দরকার। অপরাধীকে অবশ্যই শাসন করতে হবে কিন্তু মানবাধিকার বা মানুষের মর্যাদা কোনো সৈনিকের হাতে যেন লঙ্ঘিত না হয়।

সরকার এই ব্র্যাককেই স্বাধীনতা দিবসে সেনাবাহিনীর সঙ্গে একসঙ্গে স্বাধীনতা পুরস্কার দিয়েছে। এই ধরনের একটি এনজিওকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে একই কাতারে অধিষ্ঠিত করে সেনাবাহিনীকে সম্মানিত করা হলো নাকি অপমান করা হলো এই প্রশ্ন উঠতেই পারে। বলাবাহুল্য ব্র্যাক জর্জ বুশের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের একটি অন্যতম সহকারী প্রতিষ্ঠান এবং তারা আফগানিস্তানে কারজাই সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। একদিনে সেনাবাহিনীকে জনগণের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে সকল অপরাধ সেনাবাহিনীর কাঁধে চড়িয়ে পরদেশি শক্তিগুলো নিজেদের ফায়দা লুটে নিচ্ছে; অন্যদিকে আমাদের প্রাণ, পরিবেশ ও জীবনব্যবস্থা হয়ে পড়েছে সর্বনাশী হুমকির সম্মুখীন।

প্রথম আলোয় বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানী আবেদ চৌধুরীর 'হাইব্রিড শস্য নিয়ে সংশয় কেন' নিবন্ধটি আমার চোখে পড়েছে। তাঁকে আমি দীর্ঘদিন ধরেই চিনি। হাইব্রিড নিয়ে বৈজ্ঞানিক তর্ক করবার ভালো সময়ই তিনি বেছে নিয়েছেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক লেখালিখি সম্পর্কেও আমি পরিচিত। কারণ কৃষি আমার কাজের ক্ষেত্র। কিন্তু হাজার হাজার ধানের জমি হাইব্রিড ও তথাকথিত 'আধুনিক' জাত চাষ করে চিটা হওয়ার পরেও তিনি এখন হাইব্রিড শস্য নিয়ে আমাদের সংশয় কেন' এই জ্ঞান আমাদের দিতে চাইছেন (দেখুন, *প্রথম আলো* ১৪ এপ্রিল ২০০৭)। এই চিটাবাজির ঘটনাই যে আমাদের সংশয়ের কারণ, প্রতারণা ও প্রপাগান্ডাই যে বিপদের মূলে– এই সহজ সত্যটি যখন নিজের কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে তিনি বুঝতে পারেননি, অথচ অসময়ে বৈজ্ঞানিক সাজছেন, এতে আমি অবাকই হয়েছি। তাঁর লেখার উত্তর তাঁকে সময়মতোই দেবো। কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে এই যে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতার পরিবর্তনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে প্রধান ভূমিকা রেখেছিল। আবেদ অস্ট্রেলিয়াতেই থাকেন। আমরা যখন আমাদের প্রাণ, প্রাণবৈচিত্র্য ও পরিবেশ নিয়ে ঘোরতর সংকটে তখন তিনি হাইব্রিড নিয়ে

আমাদের সংশয় কাটানোর জন্য ভালো সময়ই বেছে নিয়েছেন। এই কাকতালীয় হাইব্রিড ওকালতি সম্পর্কে তাঁকেই আমি বিনীতভাবে ভাবতে অনুরোধ করবো। আমার ধারণা তিনি বিবেকবর্জিত মানুষ নন। আমি নিজে নিশ্চিত যে বাংলাদেশের তেলগ্যাস ও খনিজ সম্পদের ওপর বহুজাতিক কোম্পানির লোভাতুর দৃষ্টি যেমন বাংলাদেশের ওপর পড়েছে– ঠিক তেমনি বাংলাদেশের বিপুল প্রাণবৈচিত্র্যের ওপর লোলুপ দৃষ্টিও আজ কালো মেঘের মতো বাংলাদেশকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। কথা প্রসঙ্গে বলে রাখি অস্ট্রেলিয়া আমাদের ছোলা (Chick Pea) চুরি করে পেটেন্ট করবার ঘটনায় ধরা পড়ে গিয়ে মহা কেলেংকারি ঘটিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া ছোলার দেশ নয়, কিন্তু আমাদের মতো দেশ থেকে ছোলা চুরি করে নিয়ে গিয়ে এখন আমাদের দেশে ও ভারতে ছোলা রপ্তানি করছে। এইসকল ঘটনা বিস্তারিত আরেক দিন বলা যাবে। বাংলাদেশের ধানের বৈচিত্র্য চুরি হয়ে চলে যাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অস্ট্রেলিয়ায় আর আমরা তাদের কোম্পানিরই হাইব্রিড ধান সাত আটশ টাকা কেজি দামে কিনবো আর ধানে যখন চিটা হবে তখন বলবো এটা কৃষকেরই দোষ, এটা কি মেনে নেওয়া যায়– আবেদ, আপনিই বলুন? বলা হচ্ছে, কৃষকেরা ধান মৌসুম আসার আগেই মাঠে লাগিয়েছে। অতএব ধান ঠান্ডায় সর্দি লেগে চিটা হয়ে গিয়েছে। আজগুবি বিদ্যা আর কাকে বলে!

কৃষক আগে লাগাবার কারণও আছে, কারণ তারা সেই সব দেশি জাতই হাজার বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আবিষ্কার করেছিল যা বোরো মৌসুমে আগে আসে এবং ফসল তুলে বর্ষার আগে তারা অন্য ফসল লাগাতে পারে। যেমন পাট। চৈত্র-বৈশাখে পাট বুনতে হয়। ধান ও পাটের এই ফসলচক্রের অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা আছে মাটি ব্যবস্থাপনার দিক থেকে। অর্থাৎ মাটি ভালো রাখার জন্য পাটের জমিতে পাট বোনাও জরুরি। কৃষকের কাছে চাষ মানে ধানচাষ মাত্র নয়, সোনালি ফসল পাট উৎপাদনও বটে। মনে রাখতে হবে আধুনিক কৃষি আমাদের পাট ধ্বংসেরও একটি অন্যতম কারণ। আজ আমরা বিদেশি মুদ্রা অর্জনের জন্য কাতর। কিন্তু আমরা তো আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যে পাটের মাধ্যমে খোদ কৃষি খাত দিয়েই যুক্ত ছিলাম। পাটের আয় ইসলামাবাদ নিয়ে যেত বলে আমরা রক্তাক্ত স্বাধীনতা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। আজ কোথায় সেই পাট? কাকে আজ আমরা আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করাবো? কে উত্তর দেবে? দুর্নীতি কি শুধু রাজনীতিবিদরাই করেছে–বিজ্ঞানীরা করেনি? বাংলাদেশের ধান ও শস্য গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা কি এই দেশের কৃষিব্যবস্থা ধ্বংসের সঙ্গে যুক্ত নয়?

আমি বার্ড ফ্লুর ওষুধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্কয়ারের কথা কেনো উল্লেখ করিনি– অনেকে সেই অভিযোগ করেছেন। আমি তথ্য নিশ্চিত না হয়ে বলতে চাইনি। স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল বাংলাদেশকে তথ্যের জন্য আমরা যখন অনুরোধ করি তখন তাঁরা শুধু জানিয়েছিলেন যে তাঁদের উৎপাদনের প্রস্তুতি আছে, কিন্তু

তাঁরা এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার ওষুধ এখনও তৈরি করছেন না। কিন্তু এখন আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে তাঁরা আভিফ্লু (Aviflu) ব্রান্ড নামে বার্ডফ্লুর ওষুধ বানাচ্ছেন। ওর মধ্যে আছে ওসেলটামিভির (Oseltamivir ৭৫ মি. গ্রা.)। আমরা তাঁদের লিটারেচার হাতে পেয়েছি। আমরা এরপর ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসে জানতে চাইবো এই ওষুধগুলোর কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা সম্পর্কে তাঁদের কাছে বৈজ্ঞানিক কী তথ্য এই কোম্পানিগুলো সরবরাহ করেছে এবং কবে করেছে। ফলে এই ক্ষেত্রেও আমাদের পাঠকদের জানাতে কিছু সময় লাগবে। আমরা শুধু বলেছি ডোনাল্ড রামসফিল্ডের সঙ্গে বার্ড ফ্লুর এই ওষুধের সম্পর্ক আছে। এই কথা পাঠকদের মনে রাখতে বলবো। এটাও ভাবতে বলব বার্ড ফ্লু বাংলাদেশে আসবার আগেই ওষুধ চলে আসে– এমনকি ওষুধ উৎপাদন শুরু হয়ে যায় কীভাবে। এখন তিনটি কোম্পানি এই ওষুধ তৈরি করছে (১) স্কয়ার (আভিফ্লু), (২) এসকে এন্ড এফ (এসকে–ফ্লু) এবং (৩) বেক্সিমকো ফার্মা (ওসেফ্লু)। সময় ও সুযোগমতো এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত লিখবো। গণপ্রতিরক্ষার যে নীতি ও কৌশলের আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি তাতে আমরা মোটেও সন্দেহ বাদ দেব না যে বাংলাদেশে কিছু কিছু রোগ ছড়ানো হয়েছে ও হচ্ছে। চৌদ্দ কোটি মানুষকে রক্ষা করতে প্রতিটি কোম্পানির তৎপরতাও গণনজরদারিতে থাকতে হবে। বলাবাহুল্য স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস আমাদের একজন উপদেষ্টা তপন চৌধুরীর প্রতিষ্ঠান। এর আগে স্কয়ারের গুদামঘর জ্বলে যাওয়ার তদন্ত করতে আমরা সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোনো উদ্যোগ আমরা দেখিনি। এই ধরনের অস্বচ্ছতা অযথা যেসব প্রশ্ন তৈরি করে তা সরকারের জন্য কি মঙ্গলজনক?

আজ যে বিষয় দিয়ে শুরু করেছিলাম সেই বিষয়ে আসি। নর্থ বেঙ্গল মাইনিং কোম্পানি। এই অতি নতুন কোম্পানিটি যুক্তরাজ্যে ডেল্টা প্যাসিফিক মাইনিং কোম্পানির সঙ্গে যোগসাজশে দিনাজপুরের মতিহার অঞ্চলে কয়লা আছে কিনা অনুসন্ধান করবে বলে লাইসেন্স পাবার জন্য ফখরুদ্দীন আহমদের অরাজনৈতিক সরকারের কাছে অনুমতি চাইছে। কোম্পানিটি ব্যুরো অব মিনারেল ডিপার্টমেন্টের কাছে জোর দেনদরবার চালাচ্ছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর। (দেখুন *নিউ এইজ* ১৪ এপ্রিল ২০০৭)। এনার্জি সচিব এ এম নাসিরউদ্দিন বলেছেন যে সরকারের কয়লানীতি চূড়ান্ত হবার আগে এই দুই কোম্পানির যৌথ আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

তথ্য হলো, ডেল্টা প্যাসিফিক মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির চেয়ারম্যান হচ্ছে লেইথ রেলন্ড। ইনি এশিয়া এনার্জির নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। অর্থাৎ ভূতের মতো আবারও এশিয়া এনার্জির ছায়া এখানেও আমরা দেখছি। ফুলবাড়ি কয়লাখনির দাবিদার সেই এশিয়া এনার্জি। এর আগে আমার একটি লেখায় বলেছি যে খনিজ পদার্থ অনুসন্ধানের জন্য অনেক কোম্পানিকে তড়িঘড়ি অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

ব্যাপারটা কী? কী আছে ফুলবাড়িতে? যেটা সবচেয়ে বিস্ময়কর সেটা হলো যুক্তরাজ্যের এই কোম্পানিটি নতুন। তারা দাবি করছে তারা এ যাবত আটটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে- কয়লা, তামা, সোনা ও ইউরেনিয়াম উত্তোলনের জন্য। সেগুলো ফিলিপাইনস, ইন্দোনেশিয়া, ভেনিজুয়েলা, কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু তথ্য হলো কোথাও তারা আজ অবধি উৎপাদন শুরু করেনি।

এই যে নতুন কোম্পানি বানানো এবং বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ এলাকার ওপর শকুনের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তীব্র বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা- আমরা ক্রমাগত এই সরকারের আমলে এইসব ঘটছে দেখে অত্যন্ত চিন্তিত। বাংলাদেশে নর্থ বেঙ্গল মাইনিং কোম্পানির যিনি চেয়ারম্যান তাঁর নাম ওয়াহিদ সালাম। নিউ এইজ জানাচ্ছে যে সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন কয়লাখনির বিষয়ে এঁর কোনোই অভিজ্ঞতা নাই। বেশ বিস্ময়কর ঘটনাই বটে!

আমরা এই সরকারের কাছে স্বচ্ছতা আশা করি। অন্যদিকে আমরা লক্ষ করেছি সেনাবাহিনী বনাম ফখরুদ্দীন আহমদের অনির্বাচিত সরকারের মধ্যে একটি বিভাজন টানবার চেষ্টা চলছে। এবং বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলোর একটি শক্তিশালী অংশ দাবি করছে সেনাবাহিনী অনির্বাচিত ফখরুদ্দীন আহমদের সরকারের হুকুমদার মাত্র হয়ে থাকুক। ক্রমে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে একদিকে সেনাবাহিনীকে কঠিন ও অপ্রিয় রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে অথচ অন্যদিকে এমন সব নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে যা জনগোষ্ঠী হিশাবে আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠতে পারে। কয়লা, খনিজ সম্পদ, বার্ডফ্লুর ঘটনা, ধানের চিটা হওয়া ইত্যাদি সবকিছুই একই সূত্রে গাঁথা। হয়তো সময় হয়েছে সেনাবাহিনীর এইসব বিষয়ে আরো সজ্ঞান, সতর্ক ও সচেতন হয়ে ওঠার। এই অর্থেই আমরা বরং সেনাবাহিনীকে আরো রাজনীতিসচেতন- দেশ ও দশের স্বার্থে আরো হুঁশিয়ার থাকতে বলি। আর আমাদের বিপরীতে যাঁরা ফখরুদ্দীন আহমদের অনির্বাচিত সরকারকে সমর্থন করছেন তারা সেনাবাহিনীকে 'রাজনীতি' থেকে দূরে থাকার কথা তুলছেন আবার। রাজনৈতিক সচেতনতা ছাড়া সেনাবাহিনী কীভাবে দেশ রক্ষা করবে? সেনাবাহিনী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মৈত্রীর একটিই জায়গা- প্রাণ, পরিবেশ, প্রাকৃতিক ও প্রাণসম্পদ রক্ষা এবং আমাদের দেশটিকে বহুজাতিক কোম্পানির লুণ্ঠনের ক্ষেত্র তৈরি করবার ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া। জনগণ ও সেনাবাহিনীর মৈত্রীর ভিত্তিতে যখন ঐক্যবদ্ধভাবে ভূখণ্ড শুধু নয়- নিজেদের বেঁচে থাকা ও টিকে থাকার লড়াই আমরা করি তাকেই আমি 'গণপ্রতিরক্ষা' বলে আখ্যায়িত করি। প্রথাগত 'প্রতিরক্ষা'-র ধারণা থেকে আলাদা-কারণ এই ধারণায় জনগণ ও সেনাবাহিনী কারো হুকুম-বরদার হয়ে কাজ করে না। নিজেদের রক্ষা করবার জন্য সংগ্রাম করে। আজ সেই গণপ্রতিরক্ষায় আমরা কে কেমন সৈনিক তা প্রমাণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। অনির্বাচিত সরকারকে সেনাবাহিনীর মনিব বানাবার জন্য যারা অস্থির হয়ে উঠেছেন সে কারণেও আমরা তাদের রাজনীতি

সম্পর্কে জনগণকে হুঁশিয়ার হবার কথা বলি। এই কিছুদিন আগেও সেনাপ্রধানের ডাকে তাঁর ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনে ও ব্রিফিং নিয়ে এই সরকার যেন দীর্ঘদিন ধরেই থাকে সেই কেচ্ছা যাঁরা আমাদের শুনিয়েছিলেন, তাঁরা আসলে সেনাবাহিনীর ঘাড়ে চলে এই ধরনের অনির্বাচিত সরকার ও লুণ্ঠন প্রক্রিয়াকেই দীর্ঘস্থায়িত্ব দিতে চাইছিলেন। আমরা তখনই বলেছি এরা সেনাবাহিনী বা জনগণ কারুরই মিত্র নয়। এখন তারা তাদের মুখোশ খুলে সেনাবাহিনীর বিরোধিতা করতে নেমেছে। বিধি এখন বাম হলো কেন?

সকল পক্ষই যেন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থের দিকে হুঁশ রেখে চলেন, এটাই আমাদের প্রার্থনা। আমাদের গণনজরদারি আরো তীক্ষ্ণ করতে হবে। কারণ গণনজরদারির শক্তিবৃদ্ধি গণপ্রতিরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কি। শুধু ভূখণ্ড নয়– ভূখণ্ডের প্রাণ, পরিবেশ, খাদ্যব্যবস্থা, প্রাকৃতিক ও প্রাণসম্পদ রক্ষা প্রতিরক্ষার অংশ– এই সত্যটুকু যদি আমাদের সৈনিকরা বুঝতে পারেন তবে তাঁরা সহজেই জনগণের মনের কথাটিও ধরতে পারবেন। এই উপলব্ধির মধ্য দিয়েই জনগণ ও সৈনিকদের মধ্যে দেশ ও দশের স্বার্থ রক্ষার জন্য মৈত্রীর জায়গাগুলো তৈরি হতে থাকবে।

রাজনীতিবিদরা আমাদের সঙ্গে বেইমানি করেছে– সৈনিকরা যেন তাঁদের কর্তব্যচ্যুত না হন– এটাই এখন আমাদের প্রত্যাশা।

৩ বৈশাখ ১৪১৪, ১৬ এপ্রিল ২০০৭, শ্যামলী।

রাজনীতিই রাজনীতি মোকাবিলার একমাত্র পথ

খালিশপুরে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়ন চালিয়েছে। তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়াকে খানিক খামোশ করে দিতে পারলেও শ্রমিকদের এই আন্দোলন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে খেটে খাওয়া মানুষের প্রথম রক্তাক্ত প্রতিবাদ হিশাবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মনে রাখা দরকার হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে শ্রমিকরাই প্রথম তাদের ন্যায্য দাবি দাওয়া তুলে ধরে এবং তা আদায় করবার সংগ্রামে মাঠে নামে। এটা শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার। বলাবাহুল্য জরুরি অবস্থা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার স্থগিত রাখে। তবে জরুরি অবস্থায় বড়লোকের অধিকার বিশেষ খর্বিত হয় না। এমনকি মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার খর্বিত করবার তরবারি ঝুলিয়ে রেখেও পত্রপত্রিকায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা বহাল রাখবার আরামটুকু তত্ত্বাবধায়ক

সরকার পত্রপত্রিকাকে দিয়েছে। জরুরি অবস্থায় গণমাধ্যমের এই এক বিশেষ পুরস্কার। দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতাদের কাহিনী ফলাও করে রসালো গল্পে আমরা পড়েছি। বিশ্বাস করছি। তাছাড়া তথ্য তো সব মিথ্যা নয়। রাজনীতি দুর্নীতিতে দুষ্ট ও দুর্বৃত্তায়নে কাবু হয়েছে– বলাই বাহুল্য। খালিশপুরের শ্রমিকরা অবশ্য বুঝে গিয়েছে ধনীদের সরকার– সেটা গণতান্ত্রিক হোক আর 'জরুরি অবস্থা'-র সরকার হোক– উভয়ের জেরজবরে ফারাক অতি অল্পই। তাছাড়া দুর্নীতি বললে শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষ নিছকই কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তির দুর্নীতি বোঝে না। তারা দুর্নীতিগ্রস্ত বিদ্যমান ব্যবস্থাটাকেই বোঝে। ফলে কোনো সুনির্দিষ্ট সামগ্রিক রূপান্তরের লক্ষ্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। দরকার ছিল নাগরিকদের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার বহাল রেখে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই দুর্নীতির মোকাবিলা করা। সেটা হয় নি। জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। অথচ আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মোকাবিলা ও সমাধান চায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ। দুর্নীতির উচ্ছেদ চায়। কিন্তু সেটা অরাজনৈতিক পথে নয়– রাজনীতির সদর রাস্তাতেই হতে হবে। সেই সদর রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে এই সরকার যে পথে বিদ্যমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে চাইছে তা একমাত্র পরাশক্তির সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া অসম্ভব।

কিন্তু এই সাহায্য ও সহযোগিতার মূল্য হচ্ছে পরাধীনতা। দেশ ও দশের মানুষকে পরাশক্তির স্বার্থের অধীন করা। আজ যেখানে এসে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে একদিকে এই পরাধীনতা ও গোলামি আর অন্যদিকে দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক দল ও তাদের কতিপয় নেতা। কোন দিকে যাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ? সেই কারণে খেটে খাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের পক্ষে দাঁড়িয়ে আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই সরকারের অভিযান সম্পর্কে সতর্ক থেকেছি, নাগরিকদের সতর্ক থাকতে বলেছি। আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি এই সরকার আসলেই দুর্নীতির উচ্ছেদ চায় কিনা। আমরা লক্ষ করেছি দুর্নীতির জন্য শুধু রাজনৈতিক দলের কয়েকজন নেতা ও তাদের সঙ্গে জড়িত রাজনীতি সম্পৃক্ত কয়েকজন ব্যবসায়ীকে ধরা হয়েছে। দুর্নীতির জন্য কোনো আমলাই ধরা পড়েনি। এটা কী করে হয়। সামরিক কিম্বা বেসামরিক? একমাত্র রাজনীতিবিদরাই কি শয়তান? আর সকলেই বুঝি ফেরেশতা? কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ী? দুর্নীতিবিরোধী অভিযান অতএব একান্তই রাজনীতির বিরুদ্ধে অভিযান হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করবার কথা আমরা বারবার তুলেছিলাম। হয়তো আমাদের কথাই সত্য হয়ে উঠছে।

'সিভিল সোসাইটি' নামক পরদেশি শক্তির তল্পিবাহকদের সঙ্গে এই সরকারের শুরু থেকেই আঁতাত দেখে আমরা অবাক হইনি। কারণ এখন পরিষ্কার– উভয়েরই লক্ষ্য এক : বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করা। বেশ কয়েকটি শক্তিশালী গণমাধ্যমের রাজনীতিবিরোধী প্রচারণাতেও আমরা জিহ্বা কামড়ে

ধরিনি। বহুজাতিক কোম্পানির বিজ্ঞাপনই যাদের পত্রিকার আয়ের প্রধান উৎস হয়ে ওঠে তখন কিছু গণমাধ্যম ব্যবসায়িক স্বার্থ আর তাদের নীতিগত অবস্থানের মধ্যে গোলমাল তো পাকিয়ে ফেলবেই। বহুজাতিক কোম্পানি রাজনীতি চায় না, বিনিয়োগও চায় না। লুটপাট চায়। টেলিনর কোম্পানি (অর্থাৎ গ্রামীণ টেলিফোন), একটেল, বাংলা লিংক, সিটিসেলের রগরগে বিজ্ঞাপন যদি কোনো গণমাধ্যমের আয়ের প্রধান উৎস হয়ে ওঠে– তখন তাদের রাজনীতি সম্পর্কেও আমাদের সতর্ক থাকা দরকার। রিয়েল এস্টেট বা ভূমিদস্যুদের বিজ্ঞাপনে যাদের পাতা দিনের পর দিন ভরা থাকে তারাই দেখেছি রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্নীতি সম্পর্কে সত্যমিথ্যা সবই লিখেছে। সেটা অবশ্যই লিখবে। কিন্তু আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ নাগরিকরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে রাজনীতিকে দুর্নীতিমুক্ত করতে চেয়েছি। কারণ রাজনীতি বা রাজনৈতিকতাই আমাদের বিকাশ ও সমৃদ্ধির পথ– রাজনীতিহীনতা নয়। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিপরীতে এই একটি পক্ষকে আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠতে দেখলাম যারা প্রচার চালালো ও দাবি তুললো যে রাজনীতি মাত্রই দুর্নীতিগ্রস্ত– অতএব বাংলাদেশে রাজনীতির কোনোই দরকার নাই। তারা দুর্নীতির বিরোধিতা করতে গিয়ে বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করবার জন্য আদাজল খেয়ে নামলো। তারা দাবি করলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনির্দিষ্ট কাল ক্ষমতায় থাকুক। তারা চাইলো চট্টগ্রাম বন্দর, তারা চাইলো ফুলবাড়ি, টাটার বিনিয়োগসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত একটি অরাজনৈতিক সরকার দিক। তারা চেয়েছে আমাদের জমিগুলো লিজ নিয়ে নিক বহুজাতিক কোম্পানি– আমাদের গ্যাস, তেল, কয়লা ও খনিজ পদার্থের ওপর আমাদের আর কোনো অধিকার না থাকুক। রাজনৈতিক অধিকারহীন বাংলাদেশেই এই সকল কুকর্ম করা সহজ।

খালিশপুরের শ্রমিকদের আন্দোলন-সংগ্রাম এই অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ যে বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করবার শ্রেণীগুলো শ্রমিক, কৃষক ও খেটে খাওয়া মানুষকে রাজনৈতিক হিশাবনিকাশ থেকে খারিজ করে দিতে চেয়েছিল। চায়। পেরেছেও। এটা বিপদের দিক। তারা 'সিভিল সোসাইটি' করে, দেনদরবার করে– সেখানে শ্রমিক বা কৃষকের কথা বলার, নিজের দাবিদাওয়া তুলবার কোনো সুযোগ নাই। অতএব খালিশপুর আমাদের শেখাচ্ছে– সিভিল সোসাইটি বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করে আমাদের পরাধীন করবার শক্তি। খালিশপুর আমাদের 'সিভিল সোসাইটি' বনাম শ্রমিক-কৃষকের পার্থক্য বুঝিয়ে দিচ্ছে। শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি-কৃষক আন্দোলনের ব্যাপকতা এখনও আমরা দেখিনি। কিন্তু বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করবার যে প্রক্রিয়া তার বিপরীতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের জেগে ওঠার আওয়াজ আমরা শুনতে পাচ্ছি।

শ্রমিকদের প্রসঙ্গেও আমি মোবাইল কোম্পানির প্রসঙ্গ টানবো। গণমাধ্যমে তাদের দাপট ও গণমাধ্যমের সঙ্গে তাদের আঁতাতের দিকটার রাজনীতি বুঝিয়ে

দেবার জন্য। দুটো দিক ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করি। প্রথম দিক হলো আমরা দেখছি প্রকট ও প্রবলভাবে মোবাইলে তরুণ-তরুণীদের পরস্পরের সঙ্গে সারারাত আলাপ করবার ছাড় বা তাদের হাতে হাতে মোবাইল ফোন তুলে দিয়ে অপ্রয়োজনীয় কথা বলার প্রচার চালানো হচ্ছে। অপ্রতিরোধ্য এই আগ্রাসন। ফোন করবার প্রতিটি পয়সার সিংহভাগই চলে যাচ্ছে বিদেশি কোম্পানির কাছে। সেই টাকা বিদেশি মুদ্রায় রূপান্তরিত হয়ে চলে যাচ্ছে বিদেশে। একটি গরিব দেশের কষ্টে অর্জিত বিদেশি মুদ্রা চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে। গণমাধ্যম ও মোবাইল ফোন কোম্পানির এই আঁতাতের দিকটা আমাদের বুঝতে হবে। যে গণমাধ্যমগুলো রাজনীতিবিরোধী প্রচারণায় নেমেছে তারা টিকে আছে সেই সকল কোম্পানিরই বিজ্ঞাপনে যারা তীব্রভাবে বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করবার প্রচারণায় যুক্ত। একজনকে ছাড়া আরেকজন বাঁচে না।

যে তরুণ মোবাইলে কথা বলে সে কি জানে যে বিদেশ থেকে যাঁরা কষ্ট করে টাকা কামিয়ে দেশে পাঠান তিনি আরেকজন তরুণ– মালয়েশিয়ার রাবার বাগানে, কিম্বা মধ্যপ্রাচ্যের লু হাওয়ার মধ্যে কোনো কনস্ট্রাকশন কোম্পানির শ্রমিক? কিম্বা আরেকজন তরুণী– জর্দানে বাড়ির মেইড বা নার্স? ঘামে রক্তে আয় করা খেটে খাওয়া মানুষের টাকা– যে আয়কে উৎপাদনশীল খাতে নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশকে দ্রুতবেগে সমৃদ্ধির পথে নেওয়াই ছিল আমাদের কাজ, তা না করে আমরা শ্রমিকদের রক্তে ঘামে আয়ের টাকা মোবাইল ফোনে অকথা-কুকথা বলে বহুজাতিক কোম্পানির হাতেই কি তুলে দিচ্ছি না আবার? রাজনীতিশূন্যতা শুধু নয়– বাংলাদেশকে উৎপাদনবিমুখ করবারও একটা প্রয়াস চলছে। চলছে তরুণ-তরুণীদের নব্য এক সংস্করণ গড়ে তুলবার, বানাবার, যারা উৎপাদনে কোনো ভূমিকা রাখবে না– কিন্তু যাদের জীবনযাপন টিকিয়ে রাখবার জন্য দেশের ভেতরে ও বাইরে শ্রমিক ও কৃষকদের রক্ত ও ঘাম পায়ে ফেলতে হবে। এই বাংলাদেশই কি আমরা চেয়েছি?

নিশ্চয়ই ব্যবসাবাণিজ্যে রপ্তানি করেও আমরা বিদেশি মুদ্রা আয় করি। প্রশ্ন হচ্ছে এই আয়কে আমরা বিনিয়োগে নেবো নাকি শুধু বহুজাতিক কোম্পানিই এই দেশে ব্যবসা করবে? আমাদের ছেলেমেয়েদের কি বড়ো শিল্পপতি বা বড়ো প্রতিষ্ঠান গড়বার প্রতিভা নাই? এর আগে আমি বলেছি যে যদি এডিবির টাকায় টাটা কোম্পানি বাংলাদেশে ব্যবসা করতে চায় আর এডিবি টাটার জন্য দেনদরবার করে তাহলে টাটাকে আমাদের কী দরকার? এই বিনিয়োগ কি আমরা করতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। তাহলে এডিবি বা বিশ্বব্যাংক সরাসরি আমাদের সহায়তা করুক। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থ সংরক্ষণ করে। নানান ছলচাতুরিতে গণসমৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করে দেওয়া তাদের কাজ। এটাই পরাশক্তিগুলোর নীতি।

এই দিকটি যদি বুঝি তাহলে এটাও বুঝবো আমাদের ছেলেমেয়েরা রাত নাই দিন নাই ফালতু মোবাইলে কথা বলুক এই বিশেষ সংস্কৃতি এতো বিপুল আয়োজনে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে প্রচারের কী উদ্দেশ্য? ফালতু কথার মতো আমাদের তরুণ-তরুণীদের মধ্যেও একটা ফালতু উৎপাদনবিমুখ বকোয়াজ জেনারেশান গড়ে উঠক– এটাই কি আমরা চাই? তারা সারাদিন বাজে কথা বলুক আর মোবাইল কোম্পানি লুটেপুটে খাক! আমাদের আয় করা বিদেশি মুদ্রা বিদেশি কোম্পানির কাছেই আবার চালান করে দিক ডিজুইস! বাংলাদেশে কি বিনিয়োগ হবে না? ব্যবসা হবে না? অবশ্যই হবে। তবে ব্যবসা যদি কেউ করে করবে একমাত্র বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি। বিনিয়োগও হবে তাদের। আমরা তাদের চাকরবাকর হব। আমরা তাদের গোলাম হয়ে ধন্য হয়ে যাব? এটাই কি আমাদের স্বপ্ন? কী স্বপ্ন দেখাচ্ছে এই সকল কোম্পানি সেটা তাদের বিলবোর্ড ও গণমাধ্যমে পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখুন। যদি অনুভূতি বলে কারো কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে গা শির শির করে উঠবে। চতুর্দিকে ভয়াবহ প্রচারণার জাল পাতা হয়েছে যেন এদেশে কোনো প্রজন্ম গড়ে না ওঠে যারা স্বপ্ন দেখতে জানে। যারা দেশ গড়তে জানে। 'জরুরি অবস্থা'-র যে ভয়াবহ রাজনীতিশূন্যতা তারই সাংস্কৃতিক প্রকাশ আমরা দেখছি মোবাইল কোম্পানির বিলবোর্ড আর বিজ্ঞাপনে।

না, আমি বলছি না আমাদের কমিউনিকেশান দরকার নাই, ফোন থাকবে না। অবশ্যই থাকবে। কিন্তু কী কাজে আমরা তাকে ব্যবহার করব? আমরা কি এইভাবেই আমাদের দেশকে কোম্পানিগুলোর লুণ্ঠনের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করব? সংযোগ বা কমিউনিকেশান অবশ্যই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র– সেই ভাবে কি মোবাইল সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে বাংলাদেশ? আমি এখন 'ডিজুইসের একটি বিজ্ঞাপনের দিকে তাকিয়ে আছি। ভাষা, প্রস্তাব ও বক্তব্য দেখুন–"দুনিয়ার 'সুখ' অনলি অন মাই ডিজুইস : ম্যাসেজিং, মিউজিক, ফ্রেন্ডস এন্ড মাচ মোর"। কতো কম সময়ে বাজে কথার কালচার কায়েম করে কোটি কোটি ডলার হাতিয়ে নেওয়া যায় সেই লুটপাটকেই আমরা অবাধে কায়েম করতে দিচ্ছি। গণমাধ্যমে মোবাইলের এই ভাবমূর্তিই আমরা প্রতিষ্ঠা করছি। একই সঙ্গে বানাচ্ছি এক দঙ্গল ডিজুইস জেনারেশান। তারা কারা, দেখতে কেমন– তাদের হাবভাব ভাবমূর্তি ডিজুইসের বিজ্ঞাপনেই আমরা দেখছি। এই ধরনের তরুণ-তরুণী তৈরি করাই আমরা আমাদের আদর্শ বলে প্রচার করতে দিচ্ছি। এই তো 'জরুরি অবস্থা!'

দুনিয়ার সুখ অনলি অন মাই ডিজুইসের ছেলেমেয়েরা মালয়েশিয়ার রবার বাগানে কিম্বা মধ্যপ্রাচ্যের কনস্ট্রাকশান ফার্মে গায়ে গতরে খেটে রক্তে ঘামে আয় করে না। কিম্বা নিউ ইয়র্ক বা টরেন্টোতে ট্যাক্সি চালিয়ে কিম্বা ইংলন্ডে বা ইউরোপে হোটেলে বাসন মেজে আয় করে না। ডিজুইস জেনারেশান খরচিয়া জেনারেশান– তাদের কাজ বাংলাদেশের খেটে খাওয়া তরুণরা যা কিছু বিদেশ

থেকে আয় করে আনে তা 'সুখ' পাবার আশায় মোবাইল ফোনে খরচ করে দেওয়া। বহুজাতিক কোম্পানির টাঁকশালে জমা দিয়ে দেওয়া।

দুনিয়ার সুখ অনলি অন মাই ডিজুইস– আমাদের আর রাজনৈতিক অধিকারের দরকার নাই– জরুরি অবস্থাই জিন্দাবাদ। সুখ পেলেই হল। রাজনৈতিক দলের কী দরকার! গলিতে গলিতে তৈরি হবে ডিজুইস দল। তারা রাজনীতির বিরুদ্ধে বহুজাতিক কোম্পানি ও পরাশক্তির হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। অতএব রাজনীতির বিরুদ্ধে বহুজাতিক কোম্পানি ও পরাশক্তির হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। অতএব রাজনীতিশূন্য 'জরুরি অবস্থা'কে নিছকই সংবিধান বা আইনের সংকীর্ণ জায়গা থেকে দেখলে চলবে না। পাশাপাশি এর সাংস্কৃতিক বা বিজ্ঞাপনী আগ্রাসনও পরিষ্কার। এর ভয়াবহ ও মারাত্মক পরিণাম সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। আমাদের শিখতে হবে রাজনীতি ও সংস্কৃতি পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলে। তেমনি রাজনীতিশূন্যতা ও ডিজুইস জেনারেশান।

আমরা বারবার বলেছি পরাশক্তিগুলো আমাদের দেশকে রাজনীতিশূন্য করবার যে খেলায় মেতেছে আমরা তা মেনে নেব না। কিন্তু দুর্নীতি উচ্ছেদের প্রশ্নে জনগণের মধ্যে যে সংকল্প তৈরি হয়েছে তা যেন কোনো অবস্থাতেই বৃথা না যায়। দ্বিতীয়ত এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে বলেই আমরা এই সরকারকে মেনে নিতে বাধ্য। বাধ্যবাধকতার মধ্যে কোনো খুশি বা ফুর্তি প্রকাশ করার কিছু নাই। এটা ঘটনা। এই ঘটনাকে ইতিবাচক দিকে নিয়ে যাওয়াই আমাদের কাজ। নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, সহিংসতা, হানাহানি আমরা চাই না। আমরা বারবার বলেছি মুখে দুর্নীতির ধুয়া তুলে আমাদের দেশকে বহুজাতিক কোম্পানির লুণ্ঠনের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করবার চেষ্টা যেন না করা হয়।

কিন্তু বাংলাদেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত নড়বড়ে একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। শেখ হাসিনা বিদেশ থেকে ফিরতে চাইছেন। তাঁকে ফিরতে দেওয়া হচ্ছে না। শেখ হাসিনা বলছেন তাঁর বিরুদ্ধে যে মামলাই হোক তিনি তা আদালতে স্বয়ং মোকাবিলা করতে চান। প্রয়োজনে তিনি কারাবারণ করবেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য হোক বা মিথ্যা হোক তাঁকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া ও দেশে ফিরতে না দেওয়ার কারণে বেশ কিছু সংকট তৈরি হবে।

প্রথমত ফিরে আসা তাঁর মানবিক অধিকার। তিনি বাংলাদেশের নাগরিক। দ্বিতীয়ত, তিনি দেশ থেকে মামলা থেকে বাঁচবার জন্য পালিয়ে যান নি। যেতেও চান না। অন্যদিকে তিনি ফিরে আসতে চেয়েছেন বলেই যেন তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারের দাবি বা অভিযোগ– এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে মামলার সত্যতা থাকলেও– জনগণের চোখে এমনকি আন্তর্জাতিকভাবে তা গ্রহণযোগ্য করে তোলা এই সরকারের পক্ষে কঠিন হবে। তৃতীয়ত, যদি তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থেকেই থাকে তাহলে তাঁর ক্ষেত্রে ভিন্ন বিধান হবে

কেন? যদি রাজনীতির বাঘা বাঘা নেতাদের জেলে দেওয়া যায় শেখ হাসিনাকে দেওয়া যাবে না কেন? বিচারে এই ভেদনীতিও এই সরকারকে দুর্বল করবে।

তিনি ক্ষমতায় এলে এই সরকার যা কিছু করেছে তা 'বৈধ' করবেন বলে গিয়েছেন। বলেছেন, তিনিই আন্দোলন করে এই ধরণের অরাজনৈতিক সরকার কায়েম করেছেন। এতে তাঁর যেমন ক্ষতি হয়েছে, তেমনি বিদ্যমান সরকারেরও। অন্যদিকে খালেদা জিয়াকে গৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে কিনা সেই প্রশ্ন তুলছে হাইকোর্ট। তাঁকে প্রতিদিনই সৌদি আরব পাঠানো হচ্ছে, কিন্তু পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে তিনি যাবেন না। কিম্বা যদি যান তাহলে তাঁকে বাধ্য করেই পাঠানো হবে। ইতোমধ্যে সৌদি আরব জানিয়ে দিয়েছে যদি তিনি স্বেচ্ছায় যেতে না চান তারা তাঁকে ভিসা দিচ্ছে না। যদি তাঁকে পাঠানো না যায় তাহলে বাংলাদেশের রাজনীতি একটি গুণগত পর্যায়ে উন্নীত হবে।

আমরা অনিশ্চিত সরকার আসলেই দুর্নীতির উচ্ছেদ চায় কিনা। লক্ষ করেছি দুর্নীতির জন্য শুধু রাজনৈতিক দলের কয়েকজন নেতা ও তাদের সঙ্গে জড়িত রাজনীতি সম্পৃক্ত কয়েকজন ব্যবসায়ীকে ধরা হয়েছে। দুর্নীতির জন্য কোনো আমলাই ধরা পড়ে নি। এটা কী করে হয়। সামরিক কিম্বা বেসামরিক? দুর্নীতিবিরোধী অভিযান একান্তই রাজনীতির বিরুদ্ধে অভিযান হয়ে উঠেছে।

সম্ভবত খালেদা জিয়া টের পেয়ে গিয়েছেন যে বাংলাদেশে তাঁর নিঃশব্দ উপস্থিতিই এই সরকারের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠবে। এমনকি বিপদেরও। এই সরকারকে বৈধতা দেওয়া না দেওয়ার কথা তিনি বলেন নি। তিনি তাঁর সাম্প্রতিক একটি মন্তব্যে শুধু বলেছেন সেনাবাহিনী অটুট ও ঐক্যবদ্ধ থাকুক এবং তিনি কোনো প্রতিহিংসায় বিশ্বাস করেন না। তাঁর বক্তব্য গণমাধ্যমে ছাপা হয় না, কিন্তু শেখ হাসিনা অনবরত বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। একজনের প্রকট কথাবার্তা আর অন্যজনের নৈঃশব্দ্য ও ধৈর্য– দেখা যাক রাজনীতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

রাজনীতির প্রকট ও প্রবল দুর্নীতি দেখে আমরা ভুলে যাই যে রাজনীতি বিশ্বব্যাংক বা পল উলফোভিৎসের 'অর্থনৈতিক' গভর্নেন্স নয়। অর্থাৎ দুর্নীতিমুক্ত করার কথা বলে সাময়িক জনগণকে সন্তুষ্ট রাখা যায়। কিন্তু রাজনীতিশূন্যতা দিয়ে কতক্ষণ? রাজনীতি শেষাবধি শত্রমিত্র নির্ধারণ। শত দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার পরেও ব্যক্তিসমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও শক্তির ভারসাম্যের কারণে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিমান হয়ে ওঠে। বিশেষ বিশেষ সময়ে দুর্নীতিবাজও শত্রুমিত্র বিভাজনেব সমীকরণে রাজনীতির প্রতীক হয়ে ওঠে। আমি এর আগে বলেছি যে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান দ্বন্দ্বের একদিকে আছে বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করবার পরাশক্তি ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ধারা অর্থাৎ অরাজনৈতিক সরকার, 'জরুরি অবস্থা' বা সামরিক শাসন জারি করে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত একতরফা ও একনায়কতান্ত্রিকভাবে গ্রহণ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সচেতনতার জন্য এই ধারা এখন কাজ করবে বলে মনে হয় না। অন্যদিকে, যত দুর্নীতিবাজ,

লুটেরা ও দুর্বৃত্তই হোক– রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও রাজনীতির ধারার মধ্যেই লড়াই-সংগ্রাম অব্যাহত রেখে নিজেদের রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে গড়ে তোলার ধারা। এই দুই ধারার মধ্যে জনগণ পরাশক্তির পরাধীনতা মেনে নেবে, এটা মনে হয় না। ডিজুইস জেনারেশানকেও পুরাপুরি নেশাগ্রস্ত রাখা যাবে তাও মনে হয় না। এখন গতির যুগ। সামনে তাকাবার আর সামনে এগিয়ে যাবার যুগ। অতএব দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের গলায় ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেবে এটাও এখন অসম্ভবই মনে হয়।

তবে দেশে বা বিদেশে যদি কেউ মনে করে থাকেন যে তাঁরা এই দুই রাজনৈতিক নেত্রীকে গায়ের জোর খাটিয়ে অরাজনৈতিক কায়দায় রাজনীতির বাইরে ছুড়ে দিয়েছেন– হয়তো তাঁরা এখনও স্বপ্নের জগতেই বাস করছেন। রাজনীতিই রাজনীতি মোকাবিলার একমাত্র পথ।

১০ বৈশাখ ১৪১৪। ২৩ এপ্রিল ২০০৭। শ্যামলী।

পহেলা মে, লাল শুভেচ্ছা

পহেলা মে। লাল শুভেচ্ছা। এই দিনটির সঙ্গে শ্রম, শ্রমিকতা, শ্রমিক এই সকল দ্যোতনা, লড়াই ও সংগ্রামের অভিজ্ঞতা জড়িত। বলাবাহুল্য, দিবসটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য নানা কারণে আজ ম্লান হয়ে গিয়েছে। ম্লান হয়ে যাওয়ার মানে এই নয় যে দিনটি তাৎপর্য হারিয়েছে। মানুষ ইতিহাসের নানান পর্যায়ে নিজেকে জানবার আকুতি দেখিয়েছে এবং নিজেকে নতুনভাবে জানবার অভিজ্ঞতা যখন তার 'সত্য বলে মনে হয়েছে নিজের সেই পরিচয় প্রতিষ্ঠা করবার জন্য রাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রাম করেছে। এই লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষের ইতিহাস সামনে এগিয়ে গিয়েছে– মানুষ সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে শিখেছে। মানুষ এক সময় মনে করেছে যে নিছকই 'আধ্যাত্মিক' সত্তা নয় বা হাওয়াই 'স্পিরিট' মাত্রা নয়– মানুষ শোণিতে হাড়ে স্নায়ুতন্ত্রে বস্তুও বটে, তাকে নিছকই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার দরকারে খেতে হয়, তার আবাস দরকার, তার শরীর খারাপ হয়, অতএব চিকিৎসারও দরকার। মানুষ ইহলোকেই বাস করে। মানুষের ইহলৌকিকতার সত্য কায়েমের দরকার হয়েছিল ইতিহাসে। কারণ ইহলোক আছে বলেই, অর্থাৎ মানুষ ইহলোকে বাস করে বলেই পরলোকের কথা ভাবতে পারে, ইহলোকেই পরলোক বা 'অপরলোক' নিয়ে তার ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, কল্পনা, নীতি, আদর্শ ইত্যাদি

দানা বাঁধা। এই ইহলৌকিকতার মধ্যেই কাজে বা শ্রমে মানুষ নিজের সৃষ্টিশীলতা প্রকাশ করে এবং অন্য সকল প্রাণী থেকে নিজের পার্থক্য প্রমাণ করে। অন্য জীব বা প্রাণীর ক্ষেত্রে আমরা দেখি তার প্রাণী বা জীবের জীবন বা প্রাকৃতিক জীবনের বাইরে অন্য কোনো জীবন বা ইতিহাস নাই। অর্থাৎ প্রাকৃতিক ইতিহাসই জীবজগতের ইতিহাস, কিন্তু মানুষের ইতিহাস কেবলই তার জীবজীবনের ইতিহাস নয়– সেখানে 'মানুষ' এক পারমার্থিক আলাদা সত্তা যাকে আমরা দেখি ও অবাক হই। যখন ভাবাদর্শ বা ইডিওলজিই একমাত্র সত্য, অপ্রত্যক্ষ পরলোকই আসল, আর প্রত্যক্ষ ইহলোক মিথ্যা– এই ধরনের চিন্তার দাপট চলছিল তখন শ্রমশীল মানুষের ইহলৌকিক সত্য প্রতিষ্ঠার বড়ই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। যখন বলা হচ্ছিল 'চিন্তা'ই সব, মানুষ চিন্তাশীল সত্তা, অতএব চিন্তাশীলতাই আসল কথা, মানুষের শরীর বা দেহ কিছুই না। এটি আজ আছে কাল নাই। এই দুনিয়া থুয়ে মানুষ একদিন মাটির তলে চলে যাবে। অতএব শরীর বা দেহের প্রয়োজন অর্থাৎ মানুষের বস্তুময় জীবসত্তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য এতো কষ্টের কী দরকার? মানুষের শারীরিকতার মধ্যে বা শরীরের দাবির মধ্যে কোনো সত্য নাই– তখন মানুষ যে জীবন বা প্রাণীও বটে সেই সত্য স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়েছিল। মে দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস পালন করার অর্থ মানুষের এই জাহেলি, অজ্ঞানতা, ভুল বা বেয়াকুবিকে স্মরণ করা এবং তা যেন আবার ফিরে এসে আমাদের অধঃপতনের দিকে নিয়ে না যায় তার জন্য সংগ্রাম করা। আমরা যে ঐতিহাসিকভাবে এগিয়ে এসেছি সেই শিক্ষাও আত্মস্থ করা। ঠিক। সভ্যতা মানে বস্তুময় কিন্তু আত্মসচেতন মানুষের শ্রমশীলতাও বটে। এই সত্য কায়েমের দরকার ছিল।

কিন্তু একটি ভুল শোধরাতে গিয়ে আমরা অরেকটি ভুলের মধ্যে এখন আবার খাবি খাচ্ছি। কারণ ইহলোক প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মানুষ যে শুধু বস্তু নয়, শুধু ভোগের মেশিন নয় এই সত্য আমরা ভুলে গিয়েছি। কারণ অবশ্যই মানুষ 'আধ্যাত্মিক' ও বটে। মানুষের চিন্তা, প্রজ্ঞা বা স্পিরিটের সত্য বাদ দিয়ে শুধুই বস্তুবাদিতা কার্ল মার্কসের ভাষায় ভালগার মেটেরিয়ালিজম বা 'ইতরোচিত বস্তুবাদ' ছাড়া অন্য কিছুই নয় এবং বিপ্লবী রাজনীতির প্রথম শিক্ষাই হচ্ছে এই ভালগার বা অশ্লীল বস্তুবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো– পারমার্থিক জীবনের প্রতি মানুষের আকুতির বিরুদ্ধে নয়। কারণ এই আকুতিই মানুষকে জীবের স্তর থেকে পরমের স্তরে উন্নীত করে। আজ চতুর্দিকে আমরা ভোগবাদী অশ্লীল পাশব জীবনেরই কুৎসিত চিৎকার ও বিজয়ের উল্লাস শুনতে পাচ্ছি। আমাদের প্রাণের ডাক হল্লা ও কোলাহলে ঢাকা পড়ছে। আমাদের কর্তব্য ছিল ইহলৌকিক জৈবিক জীবনকে চিন্তাশীলতা ও প্রজ্ঞার অধীন করা, আর আমরা করে চলেছি উল্টা কাজ। আমরা আমাদের যা কিছু মনুষ্যময়, সুন্দর, প্রজ্ঞাবান ও নতুন ভবিষ্যতের ইঙ্গিতসম্পন্ন তাকে দমন করে চলেছি। অতএব আজ এটা স্পষ্ট, যে জীবনযাপন

বা তত্ত্ব মানুষকে জীবের অধিক সম্মান দিতে জানে না তার বিরুদ্ধে সংগ্রামই এই কালের বৈপ্লবিক সংগ্রাম, এই কালের বৈপ্লবিক রাজনীতি। মে দিবসে এই 'সত্য' উপলব্ধির জন্য আমি প্রথমেই আমার পাঠকদের আহ্বান জানাচ্ছি।

কিন্তু 'সত্য' আবার কী? ভাবুক বা দার্শনিকদের মধ্যে একটি শক্তিশালী ধারা রয়েছে যাঁরা মনে করেন 'সত্য'কে দেশ, কাল, পাত্রনিরপেক্ষ শাশ্বত বা সর্বকালীন ভাবার মধ্যে মারাত্মক গলদ আছে। প্রথমত এমন কোনো সর্বকালীন বা সার্বজনীন ব্যাপার নাই যাকে সর্ব অবস্থাতেই সত্য বলে প্রমাণ করা যায়। দ্বিতীয়ত সত্যকে দ্বিপক্ষীয়ভাবে মিথার বিপরীতে ভাববার অভ্যাসই রপ্ত করেছি আমরা। অর্থাৎ যা মিথ্যা নয় তাই সত্য বলে বুঝি আমরা। দাবি করবার যে অলসতা ও অজ্ঞতা তা সত্যের অপলাপ মাত্র। সত্য যদি সত্যই হয় তাহলে তার সংজ্ঞা নিছকই মিথ্যার বিপরীত ব্যাপার হবে কেন? এই অভ্যাস মানুষের ভাবুকতা ও চিন্তার বিকাশের পরিপন্থী। এই কারণে সত্যকে মিথ্যার বিপরীত ব্যাপার হিশাবে নয়, সত্য– মানুষের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যা ক্রমশ পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠছে– সেই নিজস্ব পরিচ্ছন্ন অবস্থান থেকে উপলব্ধি ও জানাকে মানুষ্যজীবনের লক্ষ্য গণ্য না করলে ইহলৌকিক মানুষের মধ্যে দিব্যজ্ঞানের আবির্ভাব অসম্ভব।

কথাটা দার্শনিক কায়দায় বললাম বলে শুনতে যতো কঠিন মনে হচ্ছে, আসলে কিন্তু খুবই সোজা। ছোটো একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আমরা যাঁকে আল্লাহ, প্রভু, ঈশ্বর বা অন্য যে কোনো নামে পরম সত্য বলে ডাকি বা চিহ্নিত করি তাকে শতকরা নিরানব্বই দশমিক নয় ভাগ ক্ষেত্রে শয়তানের বিপরীত একটি সত্তা হিশাবেই ভাবতে আমরা অভ্যস্ত। শয়তান মিথ্যা, আর তার বিপরীতে আছে এই পরম সত্তা বা সত্য। যদি এই অভ্যাসেই আমরা বন্দী থেকে যাই তাহলে কি কখনো পরমকে পরমের স্বভাব মোতাবেক উপলব্ধি করবার বা জানবার কোনো শক্তি আমাদের মধ্যে জন্ম নেবে? পরম মানে কি শয়তানের নেতি? তার থাকা না থাকা কি শয়তানের থাকা না থাকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত? তাহলে কথায় কথায় শয়তানের বিপরীতে আমরা পরমের কথা বলতে, তার নাম নিতে এতো অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি কেনো? অথচ মানুষ তো স্বভাবগতভাবেই সেই জীব যার অভিমুখ পরমের দিকেই– কিন্তু শয়তানের বিপরীতে পরমের ধারণা করবার এই বদঅভ্যাসবশতই বহু মানুষ শয়তানের অন্দরমহলেই চিরকাল বাস করে যায়। টেরটিও পায় না।

আরও বহু দিক থেকে বিচার হতে পারে। কিন্তু দৈনিক পত্রিকার কলাম নিশ্চয়ই দর্শনচর্চার উপযুক্ত নয়। কিন্তু মে দিবসে এই সকল দার্শনিক প্রসঙ্গ তুলছি কেনো? সত্যি বলতে কি এই দিবসটি পালন করা এবং তার সঙ্গে একটি বিশেষ রাজনৈতিক ধারার সম্পৃক্তি বিচার আমার প্রধান বিষয় নয়। সত্যি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে ১৮৮৬ সালের ৪ মে তারিখে হে মার্কেটের দাঙ্গার ঘটনা ও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিদাওয়ার জন্য লড়াই-সংগ্রামের স্মরণেই মে দিবস

এখন 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' হিশাবে উদযাপিত হয়। কিন্তু এগুলো জানা তথ্য। আজ আমি জাবর কাটতে চাই না।

সত্যি যে মে দিবস আমাদের দেশে বিশেষভাবে বামপন্থী বা কমিউনিস্টদের ব্যাপারস্যাপার ছিল, এখন সেই রামও নাই সেই অযোধ্যাও নাই, অতএব এই সকল দিবসও যেন অস্ত গিয়েছে। প্যারিসে কমিউনিস্টসের সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনালের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৮৮৯ ঈসায়ী সালে, ফরাসি বিপ্লবের একশ বছর পূর্তি উপলক্ষে। সেখানে শিকাগোর দাঙ্গা স্মরণ করবার জন্য পরের বছর ১৮৯০ সালে ব্যাপক বিক্ষোভ ও মিছিলের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। আমস্টারডামে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৪ সালে। সেখানে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে সকল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক বা যাঁরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী তাঁরা যেন মে মাসের এক তারিখে আটঘণ্টা কর্মদিবস ও সকলের জন্য শান্তির দাবিতে তাদের সকল শক্তি নিয়ে রাস্তায় বিক্ষোভ ও মিছিলের দাবি তোলেন। তাঁরা সকল শ্রমিক সংঠনের জন্য এই দিনটির স্মরণে সব কাজ বন্ধ করে দেওয়া বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেন। যাঁরা শ্রমিকদের সংগঠন করেন, শ্রমিকদের স্বার্থ দেখেন তাঁরা এই দিন কর্মবিরতি পালন করছেন কিনা তার দ্বারা শ্রমিকের স্বার্থের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের বিচার হয়ে যায়।

শ্রম, শ্রমিক আন্দোলন বা শ্রমিকতার তাৎপর্যের সঙ্গে বিশেষ একটি রাজনৈতিক ধারার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ঐতিহাসিক কারণে কায়েম হয়ে গিয়েছিল, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের কারণে ওখানে ক্ষয় হয়েছে। যাঁরা এই রাজনীতি করেন তাঁরা একে ন্যায্যতই তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষতি হিশাবে বিচার করবেন, কিন্তু কাজটি খারাপ হয়নি। বিশ্বব্যাপী পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিস্তার ও শক্তিবৃদ্ধির কারণে মানুষ কর্পোরেশান ও লুণ্ঠনসর্বস্ব ব্যবসার গোলামে পরিণত হয়েছে এবং গোলামির প্রতিক্রিয়া তীব্র ও ত্বরান্বিত হয়েছে। অন্যদিকে বুশ-ব্লেয়ারের নেতৃত্বে যুদ্ধ, হত্যা, সহিংসতা, পরদেশ দখল ও অপরের সম্পদ লুণ্ঠন ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এগুলো সাময়িক বিপদের দিক। 'সাময়িক' বলছি এই কারণে যে, পৃথিবী ও মানুষ প্রথমে জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারের যুদ্ধ উন্মাদনা, দ্বিতীয়ত দুনিয়াব্যাপী কর্পোরেট শাসন ও লুণ্ঠন এবং কাজে কাজেই পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার কবল থেকে মুক্ত হবেই। এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

কেনো এই লড়াইয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দুনিয়ার নিপীড়িত ও শোষিত মানুষ জিততে পারছে না? কারণ তারা বিভক্ত। কেনো? তার কারণ আগেই বলেছি। এক ভুল শোধরাতে গিয়ে আরেক ভুলের ফাঁদে আমরা পা দিয়েছি। ভুলে গেলে চলবে না একসময় কমিউনিজম ঠেকানোর জন্য 'ইসলাম'-কে ব্যবহার করা হয়েছে। 'নাস্তিক'দের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র 'আস্তিক'দের ব্যবহার করেছে। মানুষের প্রজ্ঞা, শুভবুদ্ধি ও সহনশীলতাকে নষ্ট করবার জন্য ধর্মতত্ত্ব ও গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেওয়া

হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের সেই দিনগুলো আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। আর নিপীড়িত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণও দুই শিবিরে এই ভুয়া কথা বলে ভাগ হয়ে আছে যে ইহলৌকিক জীবনের জন্য লড়াই মানুষের পারমার্থিক আকুতির সঙ্গে সম্পর্কহীন আর পারমার্থিক আকুতির ইহলৌকক বিষয় নয়– একান্তই ধর্মতাত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক আর ধর্মীয় ব্যাপার। যতোদিন এই ভুল, বেয়াকুবি বা অজ্ঞতার অবসান না হবে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে নতুন নতুন জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারের জন্ম হবে। যখন এই বিভেদাত্মক মূর্খতা আমাদের মধ্যে দূরীভূত হয়ে উঠবে তখন আমরা প্রত্যূষের লাল একটি সূর্যকে দেখবো পুবের বা প্রাচ্যের সবুজ আকাশে অপরিসীম মহিমা নিয়ে উদিত হচ্ছে। এই স্বপ্ন আমি দেখি। মে দিবসে সবুজ বাংলাদেশে লাল সূর্যের স্বপ্ন দেখাই রেওয়াজ। যেখানে সবুজ এবং লাল দুটোই সমভাবে বিপ্লবের রঙ।

আবেগের কথা থাক। সত্যি কথা বলি। মে দিবস নিয়ে লিখবার সত্যি কারণ হচ্ছে উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন। তিনি হঠাৎ ফতোয়া দিচ্ছেন যে ছাত্র, শিক্ষক ও শ্রমিকদের আইন করে রাজনীতি বন্ধ করে দিতে চান। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ভাবছেন যে যেহেতু পরাশক্তির সমর্থনে ও সেনাবাহিনীর অস্ত্রের জোরে অসাংবিধানিকভাবে তিনি ক্ষমতায় রয়েছেন, এই উপদেষ্টার পদ ও পরিস্থিতি বুঝি চিরকালের জন্য তাঁর জন্য বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে। কে রাজনীতি করবে কে করবে না সেটা আইন করে যদি বন্ধ করা যেত তো দুনিয়ার ক্ষমতা নিয়ে কোনো কোন্দল হতো না। তাছাড়া এই ধারণা একটি চরম অগণতান্ত্রিক ধারণা। প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি নাগরিকেরই অধিকার আছে রাজনীতি করবার। রাজনৈতিক দল করবার নাগরিক বা সাংবিধানিক অধিকার হরণ করা মানে পরাশক্তির পরামর্শ অনুযায়ী বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করা। এই কথাই আমি বারবার বলে আসছি। মইনুল হোসেন সরকারের পক্ষে যে চার দফা প্রস্তাব নির্বাচন কমিশনে পাঠিয়েছেন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে রাজনীতিহীন করা যাতে এই দেশ 'সুশীল সমাজ' ও বহুজাতিক কর্পোরেশানগুলোর লীলাক্ষেত্র হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ চালাবেন তাঁর মতো উপদেষ্টাগণ যাঁদের প্রধান মিত্র হবে 'সুশীলসমাজ'। ঠিকই তাঁরা শুধু 'সুশীল সমাজ' চান। কোনো ছাত্র সংগঠনই নয় যারা রাজনৈতিকভাবে তাঁদের মোকাবিলা করতে সক্ষম।

তবে আমি তাঁর এই প্রস্তাব দেখে বুঝেছি তিনি খুব ভয় পেয়েছেন। শেখ হাসিনা সম্পর্কে তাঁদের সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়েছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে আজ এই সরকার নিন্দিত। খালেদা জিয়াও আদৌ সৌদি আরব যাবেন কিনা সংশয়াচ্ছন্ন। এই পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনা যতোই খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে বিষোদগার করুক, কর্মী পর্যায়ে দেশ ও দশের স্বার্থে একটা মৈত্রী গড়ে উঠবার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আমার ধারণা এই সরকার যদি কথাবার্তা ঠিকমতো না বলে এবং আসলে কী করতে চায় তা অবিলম্বে পরিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়– রাজনৈতিক

কর্মীদের মধ্যে একটা সমঝোতা গড়ে উঠবে। নেতানেত্রীরা কর্মীদের বিভক্ত রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে। এটা কতোদূর সফল হবে আমি জানি না। কারণ রাজনীতি প্রক্রিয়া বা সবসময় চলমান যুক্তি মানে না। কিম্বা বিরাজমান দ্বন্দ্ব বা সংকট থেকে নতুন বাস্তবতার জন্ম হয়। সেই বাস্তবতা মইনুল হোসেন বা বর্তমান উপদেষ্টা সরকারের পক্ষে যাবে ভাববার কারণ নাই।

খালিশপুরে সম্প্রতি মানবাধিকার সংস্থা *অধিকার* ও *উবিনীগ* একটি সরেজমিন তদন্ত করেছে। সেখানে দেখা গেছে যে ছাত্র ও শ্রমিকরা একযোগ হয়ে জরুরি অবস্থার মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে লড়েছে। এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের সময়েও আমরা এই ধরনের মৈত্রী গড়ে উঠতে দেখেছি। ছাত্র-শ্রমিকদের মধ্যে এই সহমর্মিতা দেখেই কোনো অবস্থাতেই যেন আন্দোলন-সংগ্রাম দানা না বাঁধে তার জন্য ওপর থেকে চাপের কারণে শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন টিয়ারগ্যাস গুলি চালানো হয়েছে। এর আগে আমি বলেছি এটা অতি ক্ষুদ্র একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র। কিন্তু মইনুল হোসেন এবং উপদেষ্টারা যা করছেন তাতে মনে হয় বারুদে ম্যাচের কাঠি লাগিয়ে আগুন দেবার জন্যই প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। বলাবাহুল্য নির্বাচন কমিশনে পেশ করা এই বিপজ্জনক চারটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করাই গণতান্ত্রিক কর্তব্য। একজন আইনজীবী, যিনি সংবিধান বোঝেন, তিনি যখন এই ধরনের প্রস্তাব করেন তখন আমরা এটাই বুঝবো যে তিনি তাঁর পকেটে রাখা দেয়াশলাইয়ের বাক্স হাতে নিয়েছেন, যখন খুশি সময়মতো বারুদে আগুন দেবেন। সংবিধান, গণতন্ত্র এবং নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে নানান অকথা-কুকথা পড়ে এই বিষয়ে অনেক কথা জমা হয়েছে। দ্রুত বলতে হবে।

সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি বিষয় বিনয়ের সঙ্গে স্পষ্ট করে বলে শেষ করি। নির্বাচন কমিশন তাঁদের 'সুশীল সমাজ' নামক জীবদের তালিকায় আমার নামটি রেখেছিলেন। আমি জানি তাঁরা চান বাংলাদেশের বর্তমান সংকট উত্তরণের জন্য একটা নিয়মতান্ত্রিক– সম্ভব হলে সাংবিধানিক পথ বের হোক। এই ক্ষেত্রে অবশ্যই তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনা করা আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না। কয়েকটি কারণে আমি যাইনি।

এক : আমি 'সুশীল সমাজ' নই বা এই ধরনের কোনো সমাজের প্রতিনিধি নই। কিন্তু কিছু পত্রিকায় দেখেছি হঠাৎ 'সুশীল সমাজ' নামটি 'বিশিষ্টজন' হয়ে গিয়েছে। কারা সমাজে বিশিষ্ট আর বিশিষ্ট নয় সেই ভেদতত্ত্ব দিয়ে গণতন্ত্র হয়নি। যাঁরা আমার লেখালিখি পড়েছেন তাঁরা স্পষ্টই বুঝেছেন যে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক লড়াই-সংগ্রামে সামনের সারির দুশমন হিশাবে হাজির হয়েছে 'সুশীল সমাজ'। ছাত্র সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, কৃষক সংগঠনসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধিদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে তথাকথিত সুশীল সমাজের বিরুদ্ধে

পরিষ্কার অবস্থান নেওয়া। এর অর্থ এই নয় যে সমাজে যাঁরা চিন্তাশীল জনগণের পক্ষের মানুষ তাঁদের আমরা শত্রু গণ্য করবো। এর অর্থ হচ্ছে 'সুশীল সমাজ', 'বিশিষ্টজন' বা 'বিশিষ্ট নাগরিক' নামে যে অভিজাত শ্রেণীকে সামনে এনে কৃষক শ্রমিক ছাত্রদের কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করে দেবার চক্রান্ত চলছে তার বিরুদ্ধে আমাদের একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে।

দুই : নির্বাচন কমিশনের উচিত সবার আগে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কথা বলা। আমরা যারা লেখালিখি করি আমরা আমাদের বক্তব্য লিখিতভাবে দিতে পারি। লিখছিও। তর্কবিতর্ক করতে পারি। তাঁদের তাহলে উচিত শ্রেণী ও পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে কথা বলা– জনগণের নাড়ি বোঝা দরকার আগে।

কিন্তু তাঁরা ছাত্র, শ্রমিকদের ঠিক রাজনীতি করবার পরামর্শ না দিয়ে খোদ রাজনীতি করাই বন্ধ করবার পরিকল্পনা এঁটেছেন। সামগ্রিকভাবে যে বিপদ বাংলাদেশে ধেয়ে আসছে সেই সম্পর্কে আগামীতে লেখার সুযোগ পাবো আশা করি।

১৭ বৈশাখ ১৪১৪, ৩০ এপ্রিল ২০০৭, শ্যামলী।

'বন্দুকের নলই সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস'–কার তত্ত্ব

ড. কামাল হোসেন ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনসহ অনেক ব্যারিস্টার 'রাজনীতিবিদ' দাবি করেছেন জরুরি অবস্থা ঘোষণার ১২০ দিন অতিবাহিত হয়ে যাবার পরেও নতুন করে মেয়াদ বাড়ানোর জন্য 'কোনো ঘোষণার প্রয়োজন নেই'। এই সরকার কি তাহলে বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী 'বৈধ'? এই প্রশ্ন ১৬ মে ২০০৭ তারিখের দৈনিক *নয়া দিগন্তে* 'জরুরি অবস্থার মেয়াদ নিয়ে আইন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রশ্ন' শিরোনামের খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর পড়ে অনেকের মনে হতে পারে। ক্ষমতা অধিগ্রহণ, ক্ষমতায় থাকা এবং 'বৈধতা'– ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দুই-একটি কথা আজ বলবো।

জরুরি অবস্থার মেয়াদ ১২০ দিন পার হবার পর নতুন করে মেয়াদ বাড়াতে কোনো ঘোষণার প্রয়োজন নাই বলে দাবি করে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেছেন, 'জরুরি অবস্থার সময় কোনো বিষয় নয়। রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন মনে করলে নির্বাচন পর্যন্ত তা বাড়াতে পারেন। ...সময় দিয়ে তো 'জরুরি অবস্থা' আসে না।

জরুরি অবস্থা জরুরিভাবেই আসে'... 'মেয়াদ নিয়ে ভেবে লাভ নেই'...'অবসানের ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত (জরুরি অবস্থা) চলতে পারে... জরুরি অবস্থা বহাল রাখতে আইনগতভাবে কোন বাধা নেই'। ইত্যাদি। সময় বা মেয়াদ নিয়ে কিছু না বললেও তিনি বলেছেন "রাজনৈতিক দলগুলো 'সংশোধন' না হওয়া পর্যন্ত নাকি জরুরি অবস্থা বহাল রাখবার কোনো বাধা নাই'। অর্থাৎ জরুরি অবস্থা তোলা না তোলা নির্ভর করছে রাজনৈতিক দলগুলো সংশোধনের ওপর। তবে 'সংশোধন' বলতে তিনি ঠিক কী বুঝিয়েছেন পরিষ্কার হয়নি। নেত্রীদের বাদ নিয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পুনর্গঠনের কোশেশ আমরা দেখছি। এটাই কি? খালেদা ও হাসিনাকে বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে বিতাড়িত করা? তাছাড়া একটি রাজনৈতিক দলের দরকার হবে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের যাতে ফখরুদ্দীন সরকারের ক্ষমতা, আসা, থাকা ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে সংসদের 'বৈধতা' দান করা যায়। রাজনৈতিক দলের 'সংশোধন' মানে দল ভেঙে নতুন দল বানিয়ে তাদের ক্ষমতায় এনে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখল ও জরুরি অবস্থা জারি ও ১২০ দিন পরেও বহাল রাখাকে 'বৈধ' করতে তো হবেই। যতোদিন এই ধরনের একটি দল তৈরি না হচ্ছে ততোদিন তো জরুরি অবস্থা তুলে নেবার প্রশ্নই আসে না।

তবে নতুন দল তৈরি না করেও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় এনে এই সরকারকে বৈধতা দেওয়া যায়। আর তা করবার জন্য শেখ হাসিনা যেমন এক পায়ে খাড়া তেমনি আওয়ামী লীগও রাজি। মিয়াবিবি যদি রাজি হয়ে যায় তখন জনগণের কাজিগিরিতে কোনো ফল হবে না। অর্থাৎ এই প্রশ্ন তোলা যাবে না যে কাজটি কি ঠিক হলো কি হলো না। সেটা নৈতিক, রাজনৈতিক বা সাংবিধানিক যে দিক থেকেই হোক। শেখ হাসিনা বারবারই বলছেন তাঁর নেতৃত্বে যে আন্দোলন হয়েছে তারই ফসল পাঁচটি দূতাবাস ও সেনাবাহিনীর যোগসাজশের এই সরকার। গণমাধ্যমগুলো বারবারই এই সরকারকে সেনাসমর্থিত বলছে, কিন্তু সন্তর্পণে এই সত্য উহ্য রাখছে যে এই সরকারের ক্ষমতায় আসতে পারা ও এখনো বহাল থাকতে পারার কারণ একান্তই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা– প্রধানত এই পাঁচটি রাষ্ট্রের বাংলাদেশি দূতাবাসগুলোর সমর্থন। ভারতের স্বার্থই মার্কিন স্বার্থ– এই নীতির কারণে ভারতকে আমরা প্রকট দেখছি। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে জাতিসংঘের সেই বিখ্যাত চিঠি– যদি সেনাবাহিনী ২২ জানুয়ারি তারিখে যে নির্বাচন হবার কথা ছিল তা সম্পন্ন করতে সহায়তা দান করে তাহলে শান্তি মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ করা প্রশ্নাত্মক হয়ে উঠবে। এই চিঠি নিয়ে এখন কথা উঠছে, আদৌ এই ধরনের চিঠি জাতিসংঘ দিতে পারে কিনা; দ্বিতীয়ত, আসলে জাতিসংঘ ঠিক কী লিখেছিল? এই দিকগুলো আমাদের এখনো জানার বাকি আছে, অতএব জাতিসংঘের এই ব্যাপারটা আপাতত তোলা রইল।

তবে নির্বাচন বানচাল করে একটি সেনাসমর্থিত সরকার কায়েম করার প্রতি সমর্থন দূতাবাসগুলোর দুই-একজন কর্মকর্তার অতি উৎসাহ নাকি নিজ নিজ দেশের নীতিনির্ধারকদের অনুমোদিত তা পুরোপুরি এখনো পরিচ্ছন্ন নয়। তবে একটা অস্থিরতা দেখছি আমরা, এক ধরনের কূটনৈতিক উৎকণ্ঠা—এর নানা কারণ আছে। কারণ, এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে সামনে দুর্নীতি দমনের হাঁকডাক অথচ ভেতরে ভেতরে বহুজাতিক কর্পোরেশানগুলোর স্বার্থ রক্ষা যতো সহজ মনে হয়েছিল, বাংলাদেশে ব্যাপারটা বোধহয় ততো সহজ নয়। যেমন, এশিয়া এনার্জি ও খনিজ সম্পদ লুণ্ঠনকারী বিভিন্ন কোম্পানির কার্যকলাপ, টাটা কোম্পানিকে বিনিয়োগ করতে দেওয়া, বাংলাদেশের কৃষি, বীজ ও খাদ্য ব্যবস্থা ধ্বংস করে নানান ধরনের বাণিজ্যিক ও বিকৃত বীজে বাজার সয়লাব করে দেবার প্রয়াস, গভীর সমুদ্রে বন্দর স্থাপন, বার্ডফ্লু ছড়িয়ে ও আতংক সৃষ্টি করে গ্রামে গ্রামে হাঁস-মুরগি নিধন, দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থা ও শক্তি ধ্বংস করে উদার আমদানি নীতি দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়া– ইত্যাদি। বাংলাদেশের জনমত এই সকল ঘটনা দ্বারা দ্রুত প্রভাবিত হয়েছে এবং এই সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখাতে শুরু করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিদ্যুতের সংকট ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চড়া দাম। অতএব কূটনৈতিকভাবে এই সরকারের প্রতি অব্যাহত সমর্থন দানের রাজনৈতিক বিপদ আছে। বিপদ বুঝেই পরাশক্তিগুলো এখন তাড়াতাড়ি নির্বাচন দেবার কথা বলছে। এই ধরনের অসাংবিধানিক ও অরাজনৈতিক পরিস্থিতির অবসান চাই বলে আমরা যারা তাড়াতাড়ি নির্বাচন চাইছি তাদের যুক্তির সঙ্গে কূটনৈতিক উৎকণ্ঠা থেকে দ্রুত নির্বাচন দেবার যে দাবি পরাশক্তিগুলোর সদর দফতরগুলো এখন করছে তার মৌলিক পার্থক্য আছে। তারা সামনে সমূহ বিপদ দেখছে এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটলে তাদের ওপর যে দায়দায়িত্ব এসে পড়বে তা থেকে আগেভাগেই মুক্তি পেতে চাইছে।

কামাল হোসেন বা মইনুল হোসেন কী বলছেন তার দ্বারা আগামী দিনের রাজনীতি ঠিক হবে না। তা নির্ধারিত হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জীবন ও জীবিকার প্রশ্ন দ্বারা। সামগ্রিকভাবে প্রাণ, পরিবেশ, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষার লড়াই– সংগ্রামই ঠিক করবে বাংলাদেশ আগামী দিনে কোন দিকে যাবে। সেটা আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি কি জামায়াতে ইসলামী কেউই ঠিক করবে না। বলাবাহুল্য সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও শক্তির সঙ্গে লড়াই-সংগ্রামের ভারসাম্যই তা স্থির করে দেবে। ইতিহাস এই শিক্ষাই আমাদের দেয়। এই আলোকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দিক থেকে যে দিকটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো ক্ষমতা গ্রহণ সাংবিধানিকভাবে হয়েছে নাকি হয়নি– কিম্বা জরুরি অবস্থা জারি করার পর ১২০ দিন পার হয়ে যাবার পরেও এই সরকার আদৌ বৈধ কিনা সেই তর্ক বৃথা। রাষ্ট্রশক্তির অর্থই হলো রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ওপর

বলপ্রয়োগের একচেটিয়া কায়েম। এই একচেটিয়াকে চ্যালেঞ্জ করেই পাল্টা রাষ্ট্রশক্তি গড়ে ওঠে। বলপ্রয়োগের শক্তি দেখিয়েই এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে– তারা যে শ্রেণীরই স্বার্থ দেখুক অন্য শ্রেণীও একে চ্যালেঞ্জ করেই কেবল নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম হবে। এর অন্যথা অসম্ভব। রাষ্ট্রশক্তির এই স্বাভাবিক চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়েই মাও জে দং খুব সহজে ও অকপটে বহু বছর আগে বলেছেন, ‘বন্দুকের নলই সকল ক্ষমতার উৎস’। এই যে সংবিধান, সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা, গণতন্ত্র, নির্বাচন ইত্যাদি মুখরোচক কথাবার্তা শাসক ও শোষক শ্রেণী বলে থাকে ও জনগণকে অধিকাংশ সময়ই কপট বুলি দিয়ে শাসনে রাখে তার গোড়ায় থাকে এই বলপ্রয়োগের ক্ষমতা। এর ওপর যে নেকাব শাসক শ্রেণী পরিয়ে রাখে তার ঘোমটাটা খালি তুলে দিয়েছিলন মাও জে দং।

এই দিক থেকে আমি বরং মইনুল হোসেনকে তাঁর অকপট অবস্থানের জন্য প্রশংসাই করবো। এই সরকার তো সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতায় আসেনি, অতএব সংবিধান ধরে কতোদিন এই সরকার থাকবে কি থাকবে না তার বিচার অর্থহীন। সেই বিচারের অর্থ হলো বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী ‘বৈধতা’র তর্ক। এই তর্ক খামোখা। কতোদিন তাহলে এই সরকার ক্ষমতায় থাকবে? যতোদিন থাকা সম্ভব। কতোদিন থাকা সম্ভব? উত্তর : যতোদিন সেনাবাহিনী ও পরাশক্তি যৌথভাবে এই সরকারকে ক্ষমতায় রাখে ততোদিন তাঁরা ক্ষমতায় থাকবেন। সোজা কথা। বন্দুকের নলই যে ক্ষমতার উৎস এটা নিছক মাও জে দংয়ের কথা নয়। মইনুল হোসেনের কথাও এটাই। এটাই বাস্তবতা, এটাই সত্য। যদি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, ড. কামাল হোসেন বা অন্য কেউ মাও জে দংয়ের নাম নিতে শরমিন্দা বোধ করেন তাহলে তাঁরা অনায়াসেই আইন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ হান্স কলেসেনের বরাত দিতে পারবেন। কিম্বা আরো বিস্তর আইন বিশেষজ্ঞদের কথা ও যুক্তি তাঁদের পক্ষে খাড়া করতে পারবেন। আসলে মাও জে দং রাষ্ট্রকাঠামো ও রাষ্ট্রশক্তির ফারাক বিচার করে রাজনীতিতে বলপ্রয়োগের ভূমিকা নিয়ে যে তত্ত্বকথায় পৌঁছেছিলেন তাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আজো নস্যাৎ করতে পেরেছে বলে শুনিনি বা দেখিনি।

কেন এই তত্ত্বের গুরুত্ব অসামান্য? কারণ যে কোনো শ্রেণীর শাসনের আদত চরিত্র এই তত্ত্ব অকপটে মানে। মাও জে দংও অকপটে মানেন যে সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষমতার উৎসও বুর্জোয়া শাসক ও শোষক শ্রেণীর মতোই তাঁর শ্রেণীর বলপ্রয়োগের ক্ষমতাই হবে। বুর্জোয়া শ্রেণী যেমন শ্রমিক, কৃষক ও খেটে খাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ওপর বলপ্রয়োগের একচেটিয়া কায়েম করে, ঠিক তেমনি খেটে খাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীও ধনী ও শোষকদের ওপর বলপ্রয়োগের ক্ষমতাই প্রয়োগ করবে। শাসক ও শোষক শ্রেণী যখন ‘গণতন্ত্র’ নিয়ে কথা বলে তখন তারা আসলে বোঝায় ধনী ও শোষকদের মধ্যে ‘গণতন্ত্র’ আর শ্রমিক, কৃষক ও খেটে খাওয়া শ্রেণী বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্র। ঠিক তেমনি,

সর্বহারা শ্রেণীর গণতন্ত্র মানে হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জন্য গণতন্ত্র কিন্তু ধনী, দুর্নীতিবাজ, শোষক ও লুণ্ঠনবাজ শ্রেণীর ওপর একনায়কতন্ত্র। আসলে দুর্নীতির উচ্ছেদ যদি করতে হয় তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র কায়েমের বিকল্প নাই। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী 'গণতন্ত্র' বলতে নিজেদের মধ্যে গণতন্ত্র কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের বিরোধী শ্রেণী ও শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ও আপোশহীন লড়াই বোঝে। অথচ মইনুল হোসেন, কামাল হোসেন বা এই সরকারের আসীন বা সমর্থক শাসক ও শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধিরা কায়েম করেছেন বহুজাতিক কর্পোরেশানের জন্য বা বাজারের বড়ো ব্যবসায়ীদের জন্য গণতন্ত্র– আর অন্য সকল নাগরিকের বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্র বা সংবিধানের ভাষায় 'জরুরি অবস্থা'। তাঁরা দুর্নীতি দমন করতে চান শুধু তাদের বিরুদ্ধে যারা তাদের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী। ব্যবসায়ী শ্রেণী বা বহুজাতিক কর্পোরেশানের দুর্নীতি উচ্ছেদ তাদের লক্ষ্য নয়, বরং তাঁরা কীভাবে নিজ শ্রেণীকে তুষ্ট রাখবেন তার জন্য সদাই ব্যস্ত হয়ে আছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানের মধ্যে লক্ষ্যের এই বিশাল পার্থক্য আমাদের খেয়ালে রাখতে হবে।

পরাশক্তির স্বার্থ রক্ষার খাতিরে আমরা আমাদের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার হারিয়েছি। তাহলে কবে তাঁরা দয়া করে এই অধিকার আমাদের ফিরিয়ে দেবেন? মইনুল হোসেন বলছেন এইসব ভেবে 'লাভ নাই'। কেনো লাভ নাই? কারণ, "সময় দিয়ে তো 'জরুরি অবস্থা' আসে না। জরুরি অবস্থা জরুরিভাবেই আসে"। তিনি ঠিকই বলেছেন, "অবসানের ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত (জরুরি অবস্থা) চলতে পারে"। আলবৎ। যতক্ষণ ক্ষমতা আছে ততক্ষণ জরুরি অবস্থা চলবে।

এই অকপট অবস্থানের জন্য আমি সত্যি সত্যি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। সংবিধান যে নিছকই বাংলাদেশের জন্য একটা ছেঁড়া কাগজ মাত্র, যখন-তখন তাকে ছুড়ে ফেলা যায় ও বদলানো যায়, তার নমুনা আমরা এর আগেও দেখেছি। তবুও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছে বিদ্যমান সংবিধান বা আইনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য সাংবিধানিকতা ইস্যু নয় একদমই। এটা মইনুল হোসেন ও কামাল হোসেনদের শ্রেণীরই সমস্যা– কারণ এই শ্রেণীই গণতন্ত্র, সংবিধান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বড়ো বড়ো কথাবার্তা বলে থাকে, কিন্তু নীতিতে বা কাজেকর্মে আদৌ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। কিন্তু অন্যদিকে আবার সংবিধান বা সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা তাদের নিজ শ্রেণীর ধারাবাহিক শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য ব্যবহার করে। এটা শুধু শেখ হাসিনা বা খালেদা জিয়ার সমস্যা নয়– শাসক ও শোষক শ্রেণীর সকল পক্ষেই এই অসুখ বিদ্যমান।

কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের পক্ষে গণতন্ত্র ছাড়া সমাজ গঠন, দেশ পরিচালনা ও বাইরের ও ভেতরের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম চলানো অসম্ভব। কীসে এবং কোথায় সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ এবং কীভাবে তা রক্ষা করা যায় তা একমাত্র সমাজের

সকল স্তরে জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা জানবার, সকলকে জানাবার এবং তা বাস্তবায়নের নীতি ও কৌশল অন্বেষণের মধ্যেই নিহিত। এই অর্থেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও কাঠামো জনগণের খুবই দরকার যাতে জনগণের সামগ্রিক ইচ্ছা সমাজে দানা বাঁধতে পারে। যেন সংখ্যালঘুর স্বার্থকে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ থেকে আলাদা করে চেনা সম্ভব হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ বাস্তবায়নের নীতি ও কৌশলও গণতান্ত্রিকভাবে জনগণ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে। অনেক সময় শাসক ও শোষক শ্রেণীও মানে যে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও শক্তির মধ্যে বিরোধ, প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসনের প্রক্রিয়া, প্রতিষ্ঠান ও কাঠামো না থাকলে বিরোধ তীব্র ও সহিংস হয়ে উঠতে পারে যা প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে ওঠে। এটা পরিষ্কার যে এই শেষের বিপর্যয় সম্পর্কে বর্তমান ক্ষমতাসীনদের মধ্যে আমরা কোনো সচেতনতা দেখছি না বললেই চলে। যার পরিণতি বাংলাদেশের জন্য শুভ হতে পারে না।

সাবেক এটর্নি জেনারেল ও বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল হক এখনো ভাবছেন যে বিদ্যমান সংবিধান বহাল আছে। যদিও এটা কথায় আছে, কিন্তু কাজে নাই। এটা মনে রাখতে হবে বাংলাদেশে সংবিধান সম্পূর্ণভাবে স্থগিত বা বাতিল না করে আন্তর্জাতিকভাবে বিদ্যমান ক্ষমতার 'সাংবিধানিকতা' প্রদর্শন করে রাখবার জন্যই প্রেসিডেন্টের হুকুমে 'জরুরি অবস্থা' জারি করা হয়েছে। এই উপদেশ অবশ্য পরাশক্তিগুলোই দিয়েছে। কারণ সামরিক শাসন জারি করা হলে সামরিক সরকারকে প্রকাশ্যে সমর্থন দেওয়া এই দেশগুলোর জন্য কঠিন। তাছাড়া এতে সেনাবাহিনী শান্তি মিশনের কাজ বা আয়-উপার্জন থেকেও বঞ্চিত হতে পারে। অতএব ইকনমিস্ট পত্রিকার একটি বিশ্লেষণের সূত্র ধরে আমাদের মেনে নিতে হবে যে বাংলাদেশে পরাশক্তির সামরিক শাসন নিয়ে একধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। সংবিধান এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খুবই অপ্রাসঙ্গিক একটি বিষয়। একটা অনাবশ্যক ঝামেলা মাত্র।

সংবিধান এখনো বহাল আছে এই মায়ার ঘোরে আছেন বলে রফিকুল বলছেন, 'সংবিধান অনুযায়ী ১২০ দিনের পর জরুরি অবস্থার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এর মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হলে সুপ্রিম কোর্টের রেফারেন্স ছাড়া কোনো সুযোগই নেই'। আমরা এই বলে তর্ক করছি যে যেখানে বলপ্রয়োগই ক্ষমতার উৎস সেখানে মেয়াদ কতোদিন থাকল কি থাকল না সেই তর্ক আসলেই বেহুদা। সেই দিক থেকে আমরা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকেই সমর্থন করবো। ব্যারিস্টার রফিকুল হককে নয়।

তবে ব্যারিস্টার রফিকুল হক ঠিকই বলেছেন। যদি সংবিধান বহাল আছে বলে আমরা ধরে নিয়ে থাকি এবং বলপ্রয়োগের ক্ষমতাকে উহ্য রাখি তাহলে নিঃসন্দেহে সংবিধান অনুযায়ী সকল সাংবিধানিক বিষয়–প্রশ্ন উঠুক বা না উঠুক– প্রেসিডেন্ট রেফারেন্সে পাঠান বা না পাঠান– সংবিধানের যে কোনো অনুচ্ছেদ

ব্যাখ্যার একমাত্র বৈধতা সুপ্রিম কোর্টের। কে কী ব্যাখ্যা দিলো সেটা তাঁর নিজস্ব মত। মইনুল হোসেন, কামাল হোসেন যাঁর যাঁর একটা মত দিতেই পারেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট যে ব্যাখ্যা দেবে সেটা কোনো ব্যক্তির মত হয়ে থাকবে না– সেটা সংবিধানের নিজেরই নিজের দেওয়া ব্যাখ্যা হয়ে উঠবে। রাষ্ট্র সেই ব্যাখ্যার ওপরই দাঁড়াবে। কারো ব্যক্তিগত মতের ওপর নয়। সেই দিক জরুরি অবস্থার মেয়াদ নিয়ে ওঠা প্রশ্নটিকে সুপ্রিম কোর্টে রেফারেন্সের জন্য পাঠানোর কথা তত্ত্বগতভাবে ঠিকই আছে। কিন্তু বাস্তবতা এখানে ভিন্ন।

আমরা বাস্তববাদী। সেই দিক থেকেই আমরা বলেছি যতোদিন পরাশক্তি ও সেনাবাহিনী এই সরকারকে সমর্থন দিয়ে যাবে ততোদিন– মইনুল হোসেন ঠিকই বলেছেন– জরুরি অবস্থা 'তুলে না নেওয়া পর্যন্ত এর মেয়াদ থাকার জন্য কোনো ঘোষণার দরকার নেই।' আলবৎ বন্দুকের নল সকল ক্ষমতার উৎস– মাও জে দং এই কথাটি বললেও বুর্জোয়া শাসক ও শোষক শ্রেণীর মতো এই কথা কিন্তু বলেননি যে বন্দুকের নল একই সঙ্গে ক্ষমতাকে 'বৈধ' করে। মোটেও না। সেই অসাধারণ তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির জন্য শুধু বিপ্লবী নয়, দার্শনিক হিশাবেও মাও জে দং ইতিহাসে টিকে থাকবেন, তর্কের উপলক্ষ হয়ে উঠবেন। ক্ষমতার বৈধতা, শাসনের বৈধতা বা সরকারের বৈধতা ইত্যাদি ক্ষমতার 'উৎস' হওয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিষয়। ক্ষমতার 'উৎস' হওয়া আর ক্ষমতা 'বৈধ' হওয়া দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। ঠিক এখানেই মাও জে দংয়ের সঙ্গে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, কামাল হোসেন ও অন্যান্য ব্যারিস্টারদের বিশাল পার্থক্য। কাজে কাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠের রাজনীতির সঙ্গে শাসক ও শোষক শ্রেণীর–বিশেষত পরাশক্তি ও বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার রাজনীতির পার্থক্য। কারণ 'বৈধতা'র প্রশ্ন মাত্রই কোনো না কোনো সংবিধানের সূত্র বা রেফারেন্সেই বৈধ। যেমন ব্যারিস্টার রফিকুল হক বলছেন বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী জরুরি অবস্থার ১২০ দিন পেরিয়ে যাবার পর এই সরকার সাংবিধানিকভাবে 'বৈধ' কিনা তার মীমাংসার জন্য এই সংবিধান অনুযায়ী গঠিত সুপ্রিম কোর্টের কাছেই উত্তর চাইতে হবে। ঠিকই। কিন্তু মাও জে দং বৈধতার প্রশ্ন আলাদা রেখেছেন। কারণ হলো, এক : বলপ্রয়োগ যদি নতুন ক্ষমতার শর্ত তৈরি করে বা উৎস হয় তাহলে তা নতুন সংবিধান বা আইনের সম্ভাবনাও তৈরি করে। যেমন, বিপ্লব বা বিপ্লবী সরকার। বলাবাহুল্য, কোনো বিপ্লবী সরকার পুরানো সংবিধান বা আইন নিশ্চয়ই আবার বহাল করে না। তাকে নতুন সংবিধান বা আইন প্রণয়ন করতে হয় এবং নতুন সংবিধানসভা ডেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান বা আইন প্রণয়নের কাজে নামতে হয়। এই ধরনের সরকার কখনোই 'সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার' নামে পুরানো, জীর্ণ ও ব্যবহারের অযোগ্য সংবিধানকে আবার পুনর্বহাল করে না।

বৈধতার প্রশ্ন আলাদা রাখার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই ধরনের ক্ষমতা কোনো শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করবে এবং কীভাবে তা রক্ষা করে তার ওপরই এই সরকারের 'বৈধতা' ঠিক হয়। এই শেষের ক্ষেত্রে 'বৈধতা'-র প্রশ্ন সরকারের লক্ষ্য, কর্মসূচির ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। একই সঙ্গে এই 'বৈধতা' সরকারের স্থায়িত্বকেও নিশ্চিত বা অনিশ্চিত করে তোলে।

বলাবাহুল্য, সংবিধান বা জরুরি অবস্থার মেয়াদ নিয়ে যে তর্ক চলছে তাকে সাংবিধানিকভাবে মীমাংসার আর কোনো সুযোগ নাই। কীভাবে তা সম্ভব বা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আমরা কীভাবে দেখছি সেই সব নিয়ে আরেক দিন।

২ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪। ১৬ মে ২০০৭। শ্যামলী।

আমরা আসলে কী চাইছি

কথা গুছিয়ে পেশ করবার তৌফিক আমার বিশেষ নাই, তবে নাগরিক হিশাবে যদি আমাদের ভবিষ্যৎ রাজনীতির আদত প্রশ্নগুলো দুই-একটি তুলতে পেরে থাকি তো আমি খুশি। আজ একটি সোজা প্রশ্ন নিয়ে আমি কথা তুলবো। আমরা আসলে কী চাইছি? নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার? রাজনীতির সংস্কার? নাকি সাংবিধানিক সংস্কার? এই যে চারদিকে হৈ-হট্টগোল দেখছি, রীতিমতো বাজার বসে গিয়েছে মনে হচ্ছে। সকলেই বুঝি কলা বেচা শুরু করে দিয়েছে। সকলেই নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার কী করে হবে তার মস্তো মস্তো ফর্দ হাজির করছেন। কিন্তু যখনই কাউকে শুধাই বলুন তো কী চাইছেন আপনি? নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার করলেই কি বাংলাদেশের এখনকার দুর্যোগ কেটে যাবে? কী চান আপনি? নাকি, রাজনীতির সংস্কার চান? দেখলেন তো, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে সেই গুজব বা খবর তো আমরা জানুয়ারির ১১ তারিখ থেকে শুনে আসছি ঠিকই। কই? কোথায়? তাঁদের বের করে দিয়েই নাকি রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার পুনর্গঠন বা নতুন দল গড়া হবে? তাই না?

দেখা যাচ্ছে খালেদা এখনো দেশেই আছেন। উল্টা শেখ হাসিনা শক্তিশালী হয়ে উঠছেন। শেখ হাসিনার প্রশংসা না করে পারা যায় না। তিনি এক ঢিলে তিন পাখি মেরেছেন। এক : তাঁকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া বা রাখার পরিকল্পনা মোটামুটি ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছে। দুই : তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর পার্টির অভ্যন্তরে গভীর ষড়যন্ত্র তিনি খানিকটা নস্যাৎ করে দিতে পেরেছেন, তিন : খালেদা জিয়া তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর স্বাভাবিক 'আপোশহীন' চরিত্র প্রদর্শন করে তাঁকে টেক্কা মেরে

কিছু যদি করে ফেলেন তাকে সামাল দেবার জন্য তিনিও দেশে রয়েছেন, এবং কার্যত ছত্রভঙ্গ বিএনপির বিপরীতে গণমাধ্যমে প্রবলভাবে হাজির থেকে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি রাজনৈতিকভাবে সাড়ে ষোলআনা সক্রিয়। চার : ইসলামপন্থী রাজনীতি বা দলগুলোর বিরুদ্ধে তিনিই ভারত ও পরাশক্তির কাছে একমাত্র নির্ভরশীল রাজনৈতিক নেতা, 'সেক্যুলারিজম' যাঁর আদর্শ। নিজের স্থান আবার জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে ক্ষমতাসীনদের জন্য তিনি নতুন রাজনৈতিক সংকট তৈরি করেছেন।

এই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এই সরকারকে চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিয়েছেন শেখ হাসিনা। ভারতীয় টিভি চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, তিনি এই মুহূর্তেই নির্বাচন চান। বলেছেন, 'সেনা শাসন সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছে'। যদি শেখ হাসিনা ভারতীয় টিভি চ্যানেলে এইভাবেই তাঁর রাজনীতি প্রচার করেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে রাজনৈতিক দলের সংস্কার তো দূরের কথা তিনি এই সরকারের পাল্টা শক্তি হিশাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। 'জরুরি অবস্থা' তাঁর জন্য নয়– বা তাঁর দলের জন্যও নয়, এটাও স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জরুরি অবস্থা এসেছে বিএনপিকে ধ্বংস করবার জন্য। (দেখুন 'কালক্ষেপণ করছে সরকার' *নয়া দিগন্ত* মে ২১ ২০০৭)। আর শেখ হাসিনা যেন ঠিক এই দিনটির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন যখন তিনি সেনাসমর্থিত বর্তমান সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে কার্যত সেনাবাহিনীকেই রাজনীতির ময়দানে আহ্বান করে আনছেন। সেনাবাহিনীর বিপরীতে জনগণকে প্রতিস্থাপন করবার এই মহাসুযোগ শেখ হাসিনা কখনোই ছাড়বেন না। ভারতীয় টিভির সাক্ষাৎকারে তিনি ঠিক এই কাজটিই করেছেন। যদি তিনি সফল হন বাংলাদেশের প্রতিরক্ষার শেষ অবশিষ্টটুকু খান খান হয়ে যাওয়া নিছকই সময়ের ব্যাপার মাত্র। তাহলে কি শেখ হাসিনা ও তাঁর আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনার জন্যই এতো উদ্যোগ? এতো লংকাকাণ্ড? তাহলে রাজনৈতিক সংস্কার চাই আমরা এটাও ভুয়া কেচ্ছা। নাকি এগুলো কিছুই নয়। হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনো খানে...

কিছু নতুন সংযোজন করতে হবে, ইত্যাদি। কিন্তু কীভাবে চাই? সংবিধান বলছে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদরাই এই কর্মটি করবেন। তার মানে আবারো সেই চোরডাকাত দুর্বৃত্তদের সংসদ? আবার তাদের দিয়েই– তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে সংবিধান সংশোধন? মাথা খারাপ? এটা হয় না। বিদ্যমান ব্যবস্থা দিয়ে সংস্কার অসম্ভব। অর্থাৎ সাংবিধানিকভাবে সংবিধানের সংস্কারের কথা যাঁরা আজকাল বলছেন তাঁদের সঙ্গে আমরা একমত নই। পচা শামুকে আমাদের পা কাটুক এটা আমরা চাই না। এই এক গেঁড়াকলে পড়েছি আমরা। যদি আমাদের সংগ্রাম গণতন্ত্রের জন্য হয়ে থাকে তাহলে নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার বা সাংবিধানিক সংস্কার মূল ইস্যু নয়।

তাহলে কি রাজনৈতিক সংস্কার করেই অগ্রসর হতে হবে? এর অর্থ কী? রাজনৈতিক দলের সংস্কার? কিন্তু রাজনৈতিক দল কীভাবে আচরণ করবে তা প্রথমত নির্ভর করছে সংবিধানের ওপর। শুধু রাজনৈতিক দল নয়, প্রতিটি নাগরিক রাষ্ট্র ও সরকার প্রশ্নে কী ধরনের আচার আচরণ করবে এবং রাষ্ট্রও নাগরিকদের 'অধিকার' রক্ষা করবার জন্য কী করবে তা সংবিধানে যদি না থাকে তাহলে একটা জগাখিচুড়ি অবস্থা তৈরি হয়। যদি সংবিধান নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্ন এবং একই সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিচ্ছন্ন রাখে কিম্বা যতোটুকু আছে ততোটুকুও কার্যকর করতে ব্যর্থ হয় তাহলে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করতে যা খুশি তাই করবে। এটাই তো স্বাভাবিক। যদি সংবিধানে নিয়ম না থাকে যে রাজনৈতিক দলগুলোকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক হতে হবে, নইলে তারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিজেদের জনগণের প্রতিনিধি বলে দাবি করতে পারবে না, তাহলে তারা গণতন্ত্র চর্চা না করেও এই ধরনের সংবিধানের অধীনে আমাদের দণ্ডমুণ্ডের শরিক হয়ে বসতে পারে। যদি সংবিধানে থাকে যে একটি রাজনৈতিক দলের নেতা সংসদের যদি কোনো বিষয়ে 'হ্যাঁ' বলে সেই দলের সকল সাংসদকেও 'হ্যাঁ' বলতে হবে। যদি 'না' বলে তাহলে সাংসদদেরকেও 'না' বলতে হবে– তাহলে সংবিধানই তো বলে দিচ্ছে যে রাজনৈতিক দলগুলোকে একনায়কতান্ত্রিকই হতে হবে। দলগুলো এতোকাল তাই করে আসছে। যদি সেটা বদলাতে হয় তাহলে রাজনৈতিক দলের সংস্কারের আগে নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান লাগবে আমাদের। সংবিধান যদি একনায়কতন্ত্রকে মহিমান্বিত করে তাহলে রাজনৈতিক দলে একনায়কতন্ত্রেরই চর্চা হবে। এই প্রশ্ন আমরা না হয় আপাতত উহ্যই রাখলাম যে, রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা সমাজের যে কোনো একজন অরাজনৈতিক মানুষ– যেমন, ডক্টর ইউনূস বা ফখরুদ্দীন আহমদ পরাশক্তির বলে হঠাৎ ক্ষমতাশালী ও 'রাজনৈতিক' হয়ে উঠতে পারেন। কোনো দেশের জন্য এটা শুভ লক্ষণ কি? অর্থাৎ রাজনৈতিক সংস্কার করলেই পরাশক্তির হস্তক্ষেপ থেকে গণতন্ত্রকে বাঁচাবার একটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও থাকা চাই আমাদের, যাকে আমি সহজে বোঝার জন্য 'গণপ্রতিরক্ষা' বলে থাকি।

যদি তাই হয় তাহলে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন একজন প্রাজ্ঞ সংবিধানবিদ হবার পরেও যেভাবে ধমক দিয়ে কথা বলেন তাতে মনে হয় তিনি পিটিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে এক্ষুণি ঠান্ডা করে দেবেন। তাদেরকে জোর করে তিনি সংস্কার করাবেন, সাফসুতরো করে তুলবেন। গণতান্ত্রিক বানাবেন। তিনি ধমক দিতে পারছেন, কারণ তাঁর এই শক্তি সংবিধান থেকে আসছে না। আসছে বলপ্রয়োগের ক্ষমতা থেকে। ততোটুকুই তিনি কার্যকর যতোটুকু স্থানীয় দূতাবাসগুলো তাঁকে সমর্থন দেয়। আফসোস, রাজনীতি ডাণ্ডা মেরে ঠান্ডা করার ব্যাপার নয়। রাজনীতির মোকাবিলা রাজনীতি দিয়েই করতে হবে। খালেদা জিয়া

ও শেখ হাসিনার যতো ভয়ংকর অপরাধই থাকুক তাঁরা গণতন্ত্রের একটি প্রাথমিক নিয়ম মানেন, বা সেই নিয়মের প্রতি তাঁদের অঙ্গীকারের কথা জনগণকে জানিয়ে–নিদেনপক্ষে অন্তত কথাবার্তায় মেনে নিয়ে রাজনীতি করছেন। হয়তো তাঁরা কপট, মিথ্যুক, মুখে যা বলেন কাজে তা করেন না। সবই হতে পারে। তাঁরা মুখে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলছেন, কিন্তু একজন সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করেন না কিম্বা অন্যজন কার্যকলাপে সহিংসভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার রাজনীতি করেন। এইসব, তর্কের খাতিরে ধরা যাক সবই সত্যি। কিন্তু বর্তমান সরকারের সঙ্গে তাঁদের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এই যে তাঁরা অন্তত এইটুকু মানেন যে ক্ষমতায় যদি থাকতে হয় তাহলে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। ঠিক এইখানে–ঠিক এইখানেই– এই চিহ্নের ওপর দাঁড়ালে ক্ষমতাসীন সরকারকে আর সমর্থন করা যায় না। কারণ তাঁরা দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করছেন বলে দাবি করছেন সেই কাজের জন্য তাঁদের আমরা নির্বাচিত করে আনিনি। এই কাজই এখন আমাদের প্রধান জাতীয় কর্তব্য কিনা এই প্রশ্নও কেউ করেনি। জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা জানবার জন্য তাঁরা আমাদের সমর্থন চাননি। তাঁরা তাঁদের নিজ দায়িত্বে ও সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে বর্তমান জটিল পরিস্থিতি তৈরি করেছেন। ঠিক এই কারণে আমি বারবার বলে এসেছি, বর্তমান ঘটনাবলির দায়দায়িত্ব যেন কোনোভাবেই সেনাবাহিনীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া না হয়। যে বিপদের আশংকা আমি করেছিলাম শেখ হাসিনার বক্তব্যে সেই বিপদই হাজির হয়েছে। শেখ হাসিনা খুব ভালো করেই জানেন এই সরকারকে চ্যালেঞ্জ করা মানে কার্যত সেনাবাহিনীকেই চ্যালেঞ্জ করা। ভারতীয় গণমাধ্যমে তিনি সুযোগ বুঝে তাই করেছেন।

তার মানে কি আমরা বলছি যে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে আমরা নাই? অবশ্যই আছি। তাহালে কি এটাই বলতে চাইছি যে নির্বাচিত হয়ে এসেই এই ধরনের সংস্কার করতে হবে, নইলে নয়? মোটেও না। তাহলে কী বলতে চাই আমরা? আমরা বলছি রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে জনগণের তীব্র ক্ষোভ আছে এবং বাংলাদেশকে যদি আমরা সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী করতে চাই তাহলে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনগণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধে এবং তাকে বাস্তবায়ন করাবার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠকে সঙ্গে নিয়ে 'গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান' ঘটে। যার নজির আমরা একাত্তর সালে দেখেছি। আমাদের এই ইচ্ছাকেই পুঁজি করে এই সরকার শুরুর দিকে নিজের ক্ষমতা সংহত করেছে, কিন্তু জনগণ এখন বুঝতে পারছে দুর্নীতি দমন বা রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন রোধ এই সরকারের আন্তরিক কোনো ইচ্ছা নয়। যাঁরা সরকারের উপদেষ্টা হয়েছেন তাঁদের দেখেই ব্যাপারটা আঁচ করা গিয়েছিল। বাংলাদেশ ছোটো দেশ– সকলেই সকলের হাঁড়ির খবর জানে। দুর্নীতি দমন বা রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রোধ যে কথার কথা, আসল লক্ষ্য নয়, এটা কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন যে কোনো নাগরিকই টের পেতে শুরু করেছেন।

'গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান'? কথাটা আমি জেনেশুনেই ব্যবহার করছি। কারণ 'গণঅভ্যুত্থান' মাত্রই গণতান্ত্রিক- কিন্তু 'অভ্যুত্থান' মাত্রই গণতান্ত্রিক নয়। যে অভ্যুত্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অংশগ্রহণ ও সমর্থন থাকে তাকেই 'গণঅভ্যুত্থান' বলে। জনগণ যখন দেখে যে বিদ্যমান সংবিধানের অধীনে সংবিধান- অর্থাৎ রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন অসম্ভব তখন তারা নতুন সংবিধানের লক্ষ্যে গণঅভ্যুত্থানে নামতে বাধ্য হয়। বিদ্যমান সংবিধান বা আইন দিয়ে তখন গণঅভ্যুত্থানকে বিচার করা যায় না। যে ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্পকে রূপ দান করবার জন্য গণঅভ্যুত্থান তাকে অভ্যুত্থানের পরে নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধানে জনগণ রূপ দেয়। আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী বিজয়ীদের অধীনে বা জয়ী আন্দোলনের সংস্থার অধীনে ভিন্ন সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। যেমন, গণঅভ্যুত্থানের বিজয়ীরা একটি 'সংবিধানসভা' ডাকে যেখানে জনগণের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে আসেন নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য। সংবিধান প্রণীত হবার পর সংবিধানসভা ভেঙে যায় এবং নতুন সংবিধানের অধীনে নির্বাচন ও নতুন সরকার নির্বাচিত হয়। নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য 'সংবিধানসভা' ও তার নির্বাচন আর বিদ্যমান সংবিধানের অধীনে আইন প্রণয়নের জন্য 'জাতীয় সংসদ' ও তার নির্বাচন- এই দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। দুই ক্ষেত্রেই 'নির্বাচন' রয়েছে। অথচ দুইয়ের ভূমিকা ও গুরুত্বের পার্থক্য আকাশ আর পাতাল।

গণঅভ্যুত্থান নিশ্চয়ই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে হয় না। অন্যদিকে নির্বাচনী কায়দায় না হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প ধারণ করে বলেই গণঅভ্যুত্থান গণতান্ত্রিক। সেই কারণে আগেই বলেছি নির্বাচন মাত্রই গণতান্ত্রিক নয়। অন্যদিকে অগণতান্ত্রিক সংবিধান- যেমন, বাংলাদেশের সংবিধানের অধীনে নির্বাচন হলেই সেটা গণতান্ত্রিক হয়ে যায় না বা যে কোনো সংবিধানের অধীনে গঠিত নির্বাচিত সরকার মাত্রই 'গণতান্ত্রিক' নয়। এই গুরুতর পার্থক্যগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে।

অভ্যুত্থান মাত্রই কি গণতান্ত্রিক? অবশ্যই নয়। ক্ষমতা বদলের জন্য 'অভ্যুত্থান' হতেই পারে। শাসক ও শোষক শ্রেণীর একটি শক্তিশালী পক্ষ আরেক পক্ষকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সদাই উৎখাত করে বা করেছে তার নজির আছে ভূরি ভূরি। আমরা তো হামেশাই দেখছি। একটি দল ক্ষমতায় গেলে নির্বাচিত ও সাংবিধানিক সরকারকে উৎখাত করাবার জন্য হেরে যাওয়া দলটি সংসদে না গিয়ে ক্রমাগত 'গণআন্দোলন' ও 'গণঅভ্যুত্থানের' মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দল বা জোটকে উৎখাত করবার জন্য মরণপণ লড়ে। এটা হচ্ছে নিছকই অভ্যুত্থানের বা অসাংবিধানিক পথে ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা। প্রথমত এই ধরনের অভ্যুত্থান সংবিধানের সংস্কার বা নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের প্রয়োজনে নয়- শুধু বিরোধী পক্ষকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলই এখানে উদ্দেশ্য।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি গণতন্ত্র বলতে আমরা যাই বুঝি, প্রথম কথা হলো সংবিধানকে আগে 'গণতান্ত্রিক' হতে হবে। হতেই হবে। তার কোনো বিকল্প নাই। যে বিধান রাষ্ট্রশক্তি চর্চার বৈধতা, রাষ্ট্র কাঠামোর চরিত্র এবং রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্ব এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্পর্কে সর্বোচ্চ বিধানদাতা- যে কারণে তাকে আমরা 'সংবিধান' বলি- যে বিধানের অধীনে থেকে এবং মেনে জাতীয় সংসদ অন্যান্য আইন প্রণয়ন করে- সেই সংবিধান কেমন হবে তা নিয়ে অবশ্যই কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা তর্কবিতর্ক করতে হবে আমাদের।

এই আলোকে আমাদের একটি নতুন সংবিধান নয়, নতুন 'গণতান্ত্রিক' সংবিধান দরকার এই কথা আমি নব্বই সালের শুরু থেকে বলে আসছি। 'সংবিধান ও গণতন্ত্র' (আগামী প্রকাশনী, ঢাকা) শিরোনামে সম্প্রতি প্রকাশিত আমার একটি বইয়ে এই বিষয়টি নানান দিক থেকে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে আমার বিভিন্ন লেখার সংকলন এটি।

তবে আমি জেনে খুশি হয়েছি যে একজন সাবেক প্রধান বিচারপতিও মনে করেন আমাদের একটি নতুন সংবিধান 'লেখা' দরকার। অন্তত নতুন সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। আশা করি এটাও নিশ্চয়ই মানবেন যে নিছকই নতুন নয়, বরং দরকার নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান। এমনকি আমি দেখে অতিশয় উৎফুল্ল বোধ করেছি যে ডক্টর কামাল হোসেনও মনে করেন, সংবিধান আগাগোড়া পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। তবে 'কোন কোন দিকে সংবিধানকে আরো উন্নত করা যায় অথবা সংবিধানের কোন জিনিসগুলি আমাদের সমস্যা করছে- এগুলো আলাপ আলোচনা করে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংশোধন করা যেতে পারে।' (দেখুন, 'জরুরি অবস্থার মানে হল ইনটেনসিভ কেয়ারে থাকা' *প্রথম আলো* ২০ মে ২০০৭)। বেশ বেশ। কামাল হোসেন যদি এতোটুকু অগ্রসর হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের লেখালিখি কিছুটা সার্থক হয়েছে মনে হয়।

তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের বিরোধ হবে ওখানে যদি একাত্তর সালের সংবিধানকে তিনি নিছকই একটা আইনি ব্যাপার হিশাবে দেখেন। যাকে আমি এর আগে বলেছি 'টুকলিফাই' করা। অর্থাৎ অনেকগুলো সংবিধান দেখে ঘরে বসে নকল করো। এইভাবে সংবিধান লেখা হয়েছে বলেই আজ আমরা সর্বনাশের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। জনগণের ইচ্ছ-আকাঙ্ক্ষা-সংকল্প নানান দাবি-দাওয়া, আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজে যারপরনাই হাজির। অতএব আমরা সংবিধান চাই ঠিকই-কিন্তু জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা-সংকল্প ধারণ করবার সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এটা হতে হবে। তার অর্থ হলো উকিল-ব্যারিস্টারদের মুসাবিদা করা কোনো সংবিধান আমরা চাই না। কারণ তাঁদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনায় বিশ্বাসী লোকজন কম- অধিকাংশই অগণতান্ত্রিক এবং সম্প্রতি লক্ষ করেছি অনেকে আবার সন্ত্রাসীও। খোদ আদালতে ভাংচুরও

করেন। উকিল-ব্যারিস্টারদের হাত থেকে আমরা রক্ষা চাই, আল্লা যেন আমাদের মাফ করেন।

তেমনি সাবেক ও বর্তমান বিচারপতিদের হাত থেকেও আমরা রক্ষা চাই। আমরা মোটামুটি টের পেয়ে গিয়েছি যে ত্রয়োদশ সংশোধনীতে তাঁদের প্রায় ফেরেশতাতুল্য করে তোলা হলেও তাঁরা দোষেগুণে মানুষ এবং তাঁরা নিজেরাই এখন নিজেদের শুদ্ধির দাবি তুলছেন। তাছাড়া সংবিধান প্রণয়ন একটি গণতান্ত্রিক ব্যাপার এবং সেটা একমাত্র নির্বাচিত সংবিধানসভাতেই হতে হবে। আদর্শ পরিস্থিতি হবে তখনই যদি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিজয়ী জনগণ এই ধরনের একটি সংবিধানসভা ডাকতে পারে এবং সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব গণঅভ্যুত্থানের বিজয়ের পর নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের ওপর ন্যস্ত করে। ঐতিহাসিকভাবে গণতান্ত্রিক সংবিধান নিশ্চিত করবার এটাই আজ অবধি আদর্শ পদ্ধতি।

ফলে সাবেক বিচারপতি, যিনি প্রথম আলোর মিজানুর রহমান খানকে বলেছেন, 'আমাদের একটি নতুন সংবিধান লেখা দরকার'– তিনি সম্ভবত একজন লেখক। সাহিত্যিক গোছের কেউ হবেন। সে কারণে একটি দেশের প্রধান বিচারপতি থাকার পরেও তিনি ভেবেছেন সংবিধান বুঝি লেখালিখি করার ব্যাপার। কেউ একজন লিখে দিলেই সেটা দেশের সংবিধান হয়ে যাবে। ফলে তাঁর দৌড়ও শেষাবধি 'সুশীল সমাজ' পর্যন্ত। মিজানুর রহমান খান আমাদের জানিয়েছেন, তিনি মনে করেন 'নতুন সংবিধান লেখার দায়িত্ব বর্তমান সরকারের ওপর না চাপিয়ে বরং সুশীল সমাজের উচিত হবে এ সংক্রান্ত একটি খসড়া সরকারের কাছে উপস্থাপন করা'। খুবই প্রতিভাবান প্রস্তাব। 'সুশীল সমাজ' ও বর্তমান সরকারের মধ্যে ভেদরেখা যে অতি সামান্য তিনি বোধহয় সেটা খেয়াল রাখেননি। পরাশক্তির অনুগ্রহে ও পরজীবী শ্রেণী হিশাবে যে 'সুশীল সমাজ' বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক বিরোধ ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। লড়াই-সংগ্রামের এই বিরোধ মীমাংসাই বাংলাদেশের আগামী দিনের রাজনীতির গতিপথ হিশাবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে। ফলে এই সুশীল সমাজের হাত দিয়ে 'নতুন সংবিধান' লেখা? কী বলছেন আপনি, মাননীয় সাবেক বিচারপতি? নৈব নৈব চ! দূতাবাস বা পরাশক্তির অর্থে পরিচালিত সাহায্যসংস্থা যেভাবে স্থানীয় লোকজন বা তাদের গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠান দিয়ে কনসালটেন্ট নিয়োগ করে বাংলাদেশের নীতিনির্ধারণী দলিলপত্র লেখায় এই ধরনের কিছু কি আপনি ভাবছেন? একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী কি কখনো এই কাজ করে?

না। আমরা ভাবছি ব্যাপক গণজাগরণ। আমরা ভাবছি নিপীড়িত শোষিত গরিব শ্রমিক, কৃষক, পোড় খাওয়া ও ক্রমাগত পড়ে যেতে থাকা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে দাবিদাওয়া উঠে আসছে তাকে একটি

সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বাহিত করবার নীতি ও কৌশল। আসুন সেই নীতি ও কৌশল নিয়ে আমরা আগে পত্রপত্রিকায় আলোচনা করি। সংবিধান প্রণয়ন যেহেতু কবিতা, গল্প বা প্রবন্ধ লেখার ব্যাপার নয়, অতএব লেখালিখির কথা থাকুক। জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সংকল্পকে ধারণ ও তাকে ভাষার রূপ দেবার সাংবিধানিক ও আইনি প্রক্রিয়া কী? যে সংবিধান এখনো লেখা হয়নি, সেই নীতি ও বিধান প্রতিষ্ঠা করা কি লেখালিখির ব্যাপার, নাকি রক্ত দিয়ে অর্জন ও প্রতিষ্ঠা করার বিষয়। ইতিহাস কী শিক্ষা দেয়?

আরেকজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকেও দেখলাম তিনি সংবিধান কীভাবে সংশোধন করতে হবে রীতিমতো তার ফর্মুলা দিয়ে যুগান্তর-এ একটি লেখা লিখেছেন (দেখুন 'বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের সংকট', ১৯ মে ২০০৭)। তিনি ৭০ অনুচ্ছেদ নিয়ে আপত্তি করেছেন বহুদিন পর। এই সব নিয়ে এর আগে বহু কথাবার্তা খরচ হয়েছে আমাদের, বহু কাঠখড় পোড়ানো হয়েছে। তিনি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদীয় বিভাগ এবং প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকারও চান। বেশ।

একটি নতুন সংবিধান বা নিদেনপক্ষে বিদ্যমান সংবিধানের একটি সংস্কার দরকার –শাসক ও শোষক শ্রেণীর মধ্যে উপলব্ধি আসা কম কথা নয়। এটা এই শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ সংকটেরও চিহ্ন বটে। অতএব এই ধরনের আলোচনাকে আমরা স্বাগত জানাই এবং তাঁদের প্রস্তাব নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালিখি তর্কবিতর্ক করতে আমাদের কোনোই আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু উকিল-ব্যারিস্টারদের আমরা সংবিধান মুসাবিদা করতে দেবো না। এটা দিয়েছি বলেই একাত্তর সাল থেকে আমরা ধরা খেয়ে আছি। সুশীল সমাজের তো প্রশ্নই আসে না। কথাটা যখন উঠেছে তখন আমাদের বুঝতে হবে; নতুন সংবিধান নয় আসলে নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান– অর্থাৎ নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম দিতে হবে আমাদের। কী করে তা দিতে হয় জনগণই সময়মতো তা দেখিয়ে দেবে, আপাতত শাসক ও শোষক শ্রেণীর এই সিদ্ধান্তে আমরা খুশি যে আসলেই আমাদের একটি নতুন সংবিধান দরকার।

আমরা তাহলে আগে কথা বলতে চাই গণতন্ত্র ব্যাপারটা আসলে কী? বিভিন্ন শ্রেণীর কাছে তার কী মানে, কী তাৎপর্য? সংবিধান ও গণতন্ত্রের মধ্যে কী সম্পর্ক? সংসদীয় ব্যবস্থা মানেই কি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা? যদি অসাংবিধানিকভাবে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে তাহলে জনগণের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প ধারণ করে বিদ্যমান সংবিধানের নিয়ম না মেনে যদি নতুন কোনো গণনেতৃত্ব ক্ষমতায় আসে তাকে কি আমরা গণতান্ত্রিক বলবো নাকি অন্য কিছু? আসুন, সেইসব নিয়ে আমরা পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া করি। সংবিধান প্রণয়ন সময়মতো।

২১ মে ২০০৭। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪। রিদয়পুর। টাঙ্গাইল।

লেখালিখি ও লেখকের কর্তব্য

আজ আমি লেখালিখি নিয়ে কিছু লিখবো বলে মনস্থির করেছি। প্রথম কারণ হচ্ছে নয়া দিগন্ত একটি দৈনিক পত্রিকা হিশাবে তিন বছর পূর্ণ করেছে। এই পত্রিকাটি আমাদের দেশের গভীর সংকট এবং আমাদের চৌদ্দ কোটি মানুষের বিপদের সময় আমাকে তাঁদের পত্রিকায় লিখতে সুযোগ করে দিয়েছে। বিশেষত যখন অন্য পত্রিকাগুলো পরাশক্তির যোগসাজশে ক্ষমতায় আসা একটি অসাংবিধানিক সরকারকে সমালোচনা দূরে থাকুক তাদের আবির্ভাবে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল এবং আমার লেখাকে বিপজ্জনক মনে করেছে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমার ভয় হয়েছিল আমি বোধহয় আমার পাঠকদের কাছ থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়বো। এই অসময়ে দৈনিক নয়া দিগন্ত আমাকে লেখালিখির যে সুযোগ দিয়েছে, আমার পক্ষে তা কখনই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি আমার পাঠকদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে পেরেছি। শক্তিশালী গণমাধ্যমগুলোর প্রচার ও প্রপাগান্ডার বিপরীতে সত্যিকারের ঘটনা ও বিশ্লেষণ হাজির করতে পেরেছি। শুধু আমি নই, আরো অনেকের মধ্যে অগ্রজ সাদেক খান, বন্ধু মাহমুদুর রহমানসহ আরো অনেকের অত্যন্ত সাহসী ও জরুরি লেখালিখি এই পত্রিকায় স্থান পেয়েছে। তাঁদের লেখালিখি থেকে আমি নিজেও অনেক কিছু বুঝেছি, শিখেছি। দৈনিক নয়া দিগন্তের ঔদার্য, চিন্তাচেতনায় সহনশীলতা ও সাহসের প্রশংসার জন্য আমি কথাগুলো খরচ করছি না। পাঠক মাত্রই তা অনুভব করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা চিন্তার বিভিন্ন ধারা থেকে আসা লেখকদের সন্নিবেশিত করবার ক্ষেত্রে তাঁদের আন্তরিক আগ্রহের দিকটা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য ও পরাধীন করবার যে প্রক্রিয়া চলছে তার বিরুদ্ধে লেখক ও জনমতকে এই পত্রিকা সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে, এটা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে আমাদের টিকে থাকার লড়াই আগামী দিনে আরো তীব্রতর হবে। আশা করি দৈনিক নয়া দিগন্ত তখনও জনগণের পাশেই থাকবে এবং এই লড়াই জারি রাখবে। আমি এই পত্রিকার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

আজ তাহলে লেখালিখি নিয়েই কিছু কথা বলা যাক। কিন্তু তার আগে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের পরিস্থিতির যে দ্রুত অবনতি ঘটছে সে বিষয়ে পাঠকদের সতর্ক করে দেওয়া দরকার। এটা পরিষ্কার জিনিসপত্রের দাম কমবার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। প্রবৃদ্ধির গতি মারাত্মকভাবে পড়তির দিকে

ধাবিত হবার বিপদ দেখা যাচ্ছে। বিডিআর প্রস্তাব দিয়েছে তারা নিজেরাই নিত্যপণ্য আমদানি ও বাজারজাত করবে। এই প্রস্তাবের মধ্যে আন্তরিকতা আছে, কিন্তু তা বাস্তবসম্মত নয়। তাছাড়া যাঁরা আমাদের সীমান্ত রক্ষা করবার কথা– যেখানে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী হামেশা বাংলাদেশের নাগরিকদের গুলি করে মারছে– সেখানে সৈনিকদের আমরা দোকানদার বা ব্যবসায়ী বানাতে পারি না।

ওদিকে সরকারের ওপর দেশে বিদেশে চাপ অব্যাহত রয়েছে। তারা বর্তমান পরিস্থিতির পুরো দোষ সেনাবাহিনীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা নিজেদের দায়িত্ব থেকে খালাস পেতে চাইছে। তারা এখন বলতে চাইছে সেনাবাহিনী মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। অতএব সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেসকল ঘটনা ঘটেছে তার তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি দিতে হবে। জিনিসপত্রের চড়া দাম রোধ করবার অক্ষমতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় পরাশক্তিগুলো এখন খুবই উদ্বিগ্ন। তারা মনে করছে যে কোনো ছোটো ঘটনা দপ করে পুরো দেশকে একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করতে পারে যাকে নিয়ন্ত্রণের কোনো রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক বা আইনি ক্ষমতা এই সরকারের নাই। শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর শক্তি ও সমর্থনের ওপর নির্ভর করে দেশ শাসন রীতিমতো বিপজ্জনক। যতো দ্রুত সম্ভব নির্বাচনই এই পরিস্থিতি থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার একমাত্র পথ– এটাই তাদের সিদ্ধান্ত মনে হচ্ছে।

মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' ১২ জানুয়ারি ২০০৭ থেকে ২২ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখ অবধি ১৩০ দিনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার একটা সারমর্ম করেছে। ১৩০ দিনে ৯৬ জন মানুষ অপরেশনে মারা গিয়েছে এবং ১,৯৩,৩২৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যারা মারা গিয়েছে তাদের মধ্যে ৫৪ জন র‍্যাপিড একশান ফোর্স, ২৫ জন পুলিশ, ৭ জন যৌথ বাহিনী, ৬ জন সেনাবাহিনী, ৩ জন নৌবাহিনী এবং ১ জন মাদক দ্রব্য দমন বিভাগের অফিসারদের কর্মকাণ্ডে মারা গিয়েছেন। বলাবাহুল্য, মানবাধিকারের দিক থেকে এই ছবি খুবই উদ্বেগজনক।

'অধিকার' পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝার জন্য পত্রপত্রিকা থেকেই এই সংখ্যা সংকলন করে তথ্য হিশাবে সকলকে জানাচ্ছে। এমন নয় যে এই সংখ্যা অধিকার নিজের অনুসন্ধানে পেয়েছে। সংখ্যাগুলো সঠিক কিনা সেটা বোঝার জন্য ঘটনার খোঁজখবর নিতে হয়েছে এবং অনেক সময় সরেজমিন প্রতিবেদনও তৈরি করতে হয়েছে। কিন্তু এই অপরাধে অধিকারের কর্মকর্তা নাসিরুদ্দিন এলানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর সঙ্গে খুবই দুর্ব্যবহার করা হয়।

এই ধরনের সংকটময় পরিস্থিতিতে মানবাধিকার কর্মীদের নির্যাতন ও হয়রানি কাম্য তো নয়ই, বরং মনে হয় সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি বিনষ্ট করাই যেন উদ্দেশ্য। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার পরিসংখ্যান এবং সরেজমিন রিপোর্ট বরং এই সময় সেনাবাহিনীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সতর্ক সংকেত। উচিত হচ্ছে এই ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে তার জন্য কঠোর অবস্থান নেওয়া এবং দোষীদের

পেরেছিল, সেই সকল প্রশ্নই আবার বিপুল বেগে ও তেজে ফিরে আসছে। যেমন, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি কোনো ভূখণ্ড, দেশ, ভাষা, সংস্কৃতি, রক্ত, গোত্র, টাকা, পুঁজি, সম্পদ বা কোনো ইহলৌকিক বা প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর মধ্যস্থতায় হবে নাকি হতে হবে সরাসরি? যদি মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো ভেদাভেদ না থাকে তাহলে মানুষ জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিভক্ত থাকবে কেনো? মানুষ কি একই জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়? মানুষকে তাহলে ঐক্যবদ্ধ করবার পথ কী? মানুষ কি দুনিয়ার ওপর নিজের প্রভুত্ব কায়েম করতে এসেছে নাকি সৃষ্টিজগতের বিকাশের পরিণাম অন্যত্র, অন্যদিকে? ইতিহাসের অভিমুখ কি কারিগরিতে? নাকি জ্ঞান ও প্রজ্ঞায়? ইত্যাদি। যে সকল প্রশ্নের মীমাংসা ছাড়া সমাজ বা ইতিহাস সামনে এগিয়ে যেতে পারে না, সেই সকল প্রশ্ন যদি আমরা ধামাপাচা দিয়ে রাখি একদিন ইতিহাস তার প্রতিশোধ নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, সমাজতন্ত্রের পথ পরিহার করে চীনের পুঁজিতান্ত্রিক পথে যাত্রা– ইত্যাদি এই প্রতিশোধের কিছু নমুনা মাত্র।

গাজ্জালির কাছে আমি ধর্ম, দর্শন ও রাজনীতির সীমারেখা যে অতি ক্ষীণ এই শিক্ষাই শুধু পাইনি– ক্রমাগত লিখবার, বিপুলভাবে লিখবার অনুপ্রেরণাও পাই। জর্মন দার্শনিক মার্টিন হেইডেগার কি ফরাসি দার্শনিক জাক দেরিদা পাশ্চাত্যের যে কোনো জাঁদরেল দার্শনিকের কথাই ধরি তো দেখি ধর্ম, দর্শন, আইন, রাজনীতি ইত্যাদির অভেদ বা ভেদরেখার চিহ্ন নিয়ে বিস্তর তর্কবিতর্ক চলছে। জগতের চিন্তাশীলতার মধ্যে আজ গুণগত বদল ঘটছে। কার্ল মার্কস বলেছিলেন ধর্মের পর্যালোচনা ছাড়া কোনো জনগোষ্ঠীর পক্ষেই পরিণত হয়ে ওঠা অসম্ভব। অথচ আমরা ধর্মের প্রশ্নকে সবসময়ই দূরে রেখেছি। ধর্মকে নিছকই ধর্মতত্ত্ব বা হিশাবে নয়, তাকে দর্শন, জ্ঞান, ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করবার ক্ষমতা অর্জন করবার সময় এসে গিয়েছে বাংলাদেশে।

গাজ্জালি পাঠের অন্যান্য নগদ লাভ তো আছেই। যেমন, শরিয়ত (বিধান বা আইন) এবং মারেফাতের সম্পর্ক যে পরস্পরবিরোধী বিষয় নয়, কিম্বা যতো সহজ ও সরলীকরণই আমরা করি না কেনো আইন ও প্রজ্ঞার সম্পর্ক যে অনেক জটিল সেই বিষয়ে গাজ্জালি পড়ে খুব কম বয়সেই সতর্ক হতে পেরেছি। এই সেই অমীমাংসিত সম্পর্ক যার সুরাহা একালের দর্শন আজো করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। জ্ঞানচর্চা বা প্রজ্ঞার সেই সীমান্তচিহ্নগুলো চিনবো কী করে? যেখানে বিদ্যমান আইন, বিধিবিধান, রাষ্ট্র ইত্যাদির সঙ্গে সপ্রাণ জ্ঞান বা প্রজ্ঞার বিরোধ বা সংঘাত— মারেফাত বা জ্ঞানের অন্বেষণেই তো তা সম্ভব। সেই দিকগুলো সঠিকভাবে শনাক্ত ও অন্বেষণ করা জরুরি। গাজ্জালির কাছে এই শিক্ষাটা পাই। ফলে তাঁর কাছে একদিকে শরিয়তের বিধিবিধান আর অন্যদিকে সুফিদের একাকী ও নিঃসঙ্গ অন্বেষণ, পরিভ্রমণ ও জ্ঞানবাক্য উচ্চারণের সাহস ইত্যাদি দেখি। কখনও কখনও তারা আলাদা আবার কখনও কখনও একদমই একাকার।

লেনিন অসাধারণ মানুষ। লিখে ও লেখা প্রচার করেই তিনি তাঁর দেশে যে মহাকাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পেরেছেন সেটা অবিশ্বাস্যই বলতে হবে। তাঁর পত্রিকার প্রচারের জন্য যে সংগঠন গড়ে উঠেছে সেটাই তাঁর পার্টি হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ বিদ্যমান ব্যবস্থার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং বর্তমান অবস্থা থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মুক্তির পথ প্রচার করেই তিনি তাঁর পার্টি দাঁড় করিয়েছেন। একদিক থেকে জনগণ দৈনন্দিন যে লড়াই-সংগ্রাম করছে এবং তাদের সংগ্রাম পরিচালনার জন্য যে সকল আন্দোলনের সংস্থা বা সোভিয়েত গড়ে তুলছে তার বাইরে তিনি আলাদা সংগঠন করেননি, বরং তিনি সেই সকল আন্দোলনের সংস্থাগুলোকে আরো বিকশিত করা এবং আন্দোলন-সংগ্রামকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার অনন্যপ্রকাশ্য তৎপরতাকেই সংগঠিত করেছেন। এই তৎপরতাই বিপ্লবে সফলতার মধ্য দিয়ে পার্টি হিশাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। লেনিনের নীতি ও কৌশল থেকে শেখার আছে অনেক কিছুই, কিন্তু সবার আগে শিখতে হবে কীভাবে জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করবার জন্য লিখতে হয় এবং এখন কোন বিষয় জরুরি, কোন বিষয় গৌণ। পার্টি করা বলতে বুঝিয়েছেন বিদ্যমান আন্দোলন-সংগ্রামকে কোন দিকে নিয়ে যেতে হবে তার দিকনির্দেশনা দেওয়া। মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁদের কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার পুস্তিকায় লিখেছেন, কমিউনিস্টরা জনগণের লড়াই-সংগ্রাম চলাবার বিদ্যমান সংগঠনগুলোর বাইরে নিজেদের কোনো দল করে না। লেনিন কীভাবে জারের আমলে এই নীতির চর্চা করেছেন তা থেকে আমাদের এখনও বহু কিছু শেখার আছে।

পত্রিকা ছাড়া ভ্লাদিমিরের পার্টি সংক্রান্ত ধারণা কিছুই বোঝা যাবে না। এমন এক পত্রিকা যা জনগণের আশু প্রশ্ন তোলা ও তার মীমাংসার মধ্য দিয়েই জনগণকে ভবিষ্যতের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। রাজনৈতিক দল মাত্রই যে দলবাজি নয়– বরং সচেতনতা ও সজ্ঞানতা চর্চার পথ– তাঁর কাছে এই শিক্ষা পাওয়া যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আরেক অসাধারণ মানুষ, যিনি শুধু বিদ্যার সাগর বলে আমার কাছে অমূল্য নন। আমি ভাবি, একটি মানুষ এতো কিছু জানার পরেও, জ্ঞানের ভাণ্ডার হয়েও কেনো শিশুদের জন্য বর্ণশিক্ষা লিখলেন? শিশুদের জন্য পাঠ্যবই নিয়ে ব্যস্ত রইলেন? কীভাবে একটি জাতিকে জন্ম দিতে হয়– ভাষায়, শিক্ষায়, গল্পে আদর্শে– তিনি তার জ্বলজ্বলে নজির। তাঁর তুলনা মেলা ভার।

সংবিধান প্রণয়ন কবিতা, গল্প বা প্রবন্ধ লেখার ব্যাপার নয়। জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সংকল্পকে ধারণ ও তাকে ভাষায় রূপ দেবার সাংবিধানিক ও আইনি প্রক্রিয়া। যে সংবিধান এখনো প্রণীত হয়নি, সেই নীতি ও বিধান প্রতিষ্ঠা করা কি লেখালিখির ব্যাপারে, নাকি রক্ত দিয়ে অর্জন ও প্রতিষ্ঠা করার বিষয়। ইতিহাস কী শিক্ষা দেয়?

আমি পত্রিকায় লেখালিখি করে জীবিকা নির্বাহ করি না। এর অর্থ এই নয় যে লেখাই যাঁদের পেশা তাঁরা তাঁদের পরিশ্রমের অর্থ চাইবেন না। অবশ্যই চাইবেন

এবং নেবেন। নইলে তাঁদের চলবে কী করে? আমার যতোক্ষণ অন্য পেশা থেকে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ আছে আমি কথা বিক্রি করে জীবন চালাতে চাই না। তাছাড়া পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে সবকিছুই পণ্যে রূপান্তরিত হয়-প্রতিটি গ্রন্থ, পুস্তিকা বা পত্রিকার তো নিয়তি এটাই। ছাপা, বাঁধা ও বিতরণের একটা খরচ আছে। নিদেনপক্ষে সেই খরচ তো তুলতে হবে। কিন্তু বই পত্রপত্রিকাকে কেউ যেন পণ্যজ্ঞান না করে সেই জন্য সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। এর উচ্চারণ, বাক্য বা খবরে আমাদের আগ্রহ পণ্যের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একে আমরা যেন তালগোল না পাকাই। পণ্যের বাজারে পণ্য হিশাবে সংগ্রহ করতে গেলেও ভুল করে তাকে যেন আবার শুধু পণ্যজ্ঞান না করি।

পত্রিকার দিক থেকে দেখলে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে এই ভূমিকা পালন করতে পারা অত্যন্ত কঠিন কাজ। টিকে থাকতে হবে কিন্তু পাঠককে তার আত্মার, জ্ঞানের প্রজ্ঞার, বিচার-বিবেচনার খোরাক দিতে হবে। সহজ কাজ নয়। আশা করি দৈনিক নয়া দিগন্ত এই ভূমিকা পালন করতে থাকবে। সবসময় আমার সঙ্গে তাঁরা একমত হবেন আমি এই আশা করি না। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের প্রতি লেখক হিশাবে একটা কর্তব্য আছে আমার- সেই কর্তব্য পালনে তাঁরা যদি সহায়ক হন আমি খুশি হবো।

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪। ২৭ মে ২০০৭। শ্যামলী।

গণমাধ্যম, রাষ্ট্র ও মানবাধিকার জনগণের আস্থা অর্জন জরুরি

প্রথমেই একটি নীতিগত প্রশ্ন তুলবো, তারপর এখনকার জরুরি প্রসঙ্গে দুই-একটি কথা...

গত কয়েকদিনে আমরা দেখেছি সামনের সারির বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও ব্যবসায়ী গ্রেফতার হয়েছেন এবং যৌথ বাহিনীর কাছে তাঁরা বন্দী অবস্থায় যেসব জবানবন্দী দিয়েছেন সেইসব পত্রপত্রিকায় রসালোভাবে পরিবেশিত হচ্ছে। বলাবাহুল্য, পত্রিকাগুলো যার যার দলীয় অবস্থান থেকে খবরগুলো পেশ করেছে- অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে যেসকল খবরে ঘায়েল করা যায় সেই তথ্যকে প্রাধান্য দিয়ে প্রকাশ করেছে। কিছু দিন আগে দেখেছি গণমাধ্যমের একটি পক্ষ গ্রেফতার হওয়া নেতানেত্রীদের বিরুদ্ধে হেন কোনো গর্হিত খবর নাই ছাপেনি, তারা এখন আবার যেন থমকে গিয়েছে। এখন যেন আবার হাওয়া বদল হয়ে যাবার আভাস

পেয়ে আরেক কাতারের পত্রপত্রিকা সরব হয়ে উঠেছে। ব্যতিক্রম আছে নিশ্চয়ই, রাষ্ট্রীয় এজেন্সির সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য নির্বিচারে ছাপানো গণমাধ্যমের কাজ কি?

গোয়েন্দা সংস্থার সরবরাহ করা তথ্য পত্রিকা আদৌ ছাপবে কি ছাপবে না কিম্বা ছাপলে কীভাবে ছাপবে সেটা সামগ্রিকভাবে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি নানা প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। সম্ভবত এই তর্কগুলো আমাদের শুরু করে দেয়া উচিত। কিন্তু নিদেনপক্ষে এই ন্যূনতম নীতি মেনে চলতে হবে যে গণমানুষের পত্রিকাকে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রচার দফতরে পরিণত করা যাবে না। কিন্তু বাংলাদেশের গণমাধ্যম যখন এই দিকটি ভুলে যায় তখন সেটা গণমাধ্যম ও রাষ্ট্রে উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রের তরফে যাঁরা জরুরি তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের দায়িত্বে আছেন তাঁদের কাজ ও কর্তব্য এবং গণমাধ্যমের কাজ ও কর্তব্য এক নয়। অন্যদিকে এটাও ভাবার কোনো কারণ নাই যে সীমাহীন দুর্নীতি ও রাজনীতির ভয়াবহ দুর্বৃত্তায়নের প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় সংস্থার সঙ্গে গণমাধ্যমের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। অবশ্যই থাকবে। সেই সম্পর্ক সহযোগিতা না বিরোধিতার তা নির্ভর করবে জাতীয় সংস্থা সংবিধান, আইন, মানবাধিকার ইত্যাদি আদৌ মান্য করে চলে কিনা। দুর্নীতিবাজ ও দুর্বৃত্তদের পাকড়াও করা, তাদের দুর্নীতির সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ ও অভিযুক্তদের আদালতে সোপর্দ করা জাতীয় সংস্থা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাজ। সেটা তাঁরা যতো বেশি পেশাগত গোপনীয়তা, দক্ষতা এবং অভিযুক্তের নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা রক্ষা করে করতে পারবেন ততো বেশি তাঁরা প্রশংসিত হবেন। হয়তো প্রশংসা এখন বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধ অভিযানে জনগণের সমর্থনের ভিত্তিকে শক্তিশালী রাখা। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যদি কোনো কারণে ঘটনাঘটনের ভুল ব্যাখ্যা করে যে আদালতে হাজির করবার আগে বা বিচার প্রক্রিয়া শুরুরও আগে জয়েন্ট ইন্টেরোগেশন সেলের তথ্যাদি গণমাধ্যমে ফাঁস করে দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দান নয়, বরং খোদ রাজনীতির প্রতি মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলা– তাহলে তা হিতে বিপরীত হবে। বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করার যদি উদ্দেশ্য না হয়, যদি দুর্বৃত্ত ও দুর্নীতিপরায়ণ দলবাজি ধ্বংস করে বরং রাজনৈতিক পরিবেশের বিকাশই এখনকার লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে জনগণকে সেভাবেই বুঝতে দিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে জেরা বা জবানবন্দীর ক্যাসেট গণমাধ্যমগুলোতে শুধু নয় রীতিমতো খোলাবাজারে ছড়িয়ে যাওয়াটা বিপজ্জনক সংকেত। আমরা যেন নিজের পায়ে নিজেরা কুঠার না মারি। জাতীয় সংস্থা ও গণমাধ্যম উভয়কে লক্ষ করেই আমি এই কথাটি বিনয়ের সঙ্গে পেশ করছি। পুরো ব্যাপারটা যেন কাদা ছোড়াছুড়ি ও খেলো ব্যাপারে পরিণত না হয়।

জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রশ্নে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় সংস্থার ভূমিকা জনগণের কাছে কতোটা পরিচ্ছন্ন তার ওপর নির্ভর করে জনগণের সঙ্গে

তাদের সহযোগিতার মাত্রা ও গভীরতা। কিন্তু তার আগে জনগণ ও জাতীয় সংস্থা উভয়কেই ঔপনিবেশিক মনমানসিকতা পরিহার করতে হবে। রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে নিজেদের যদি আমরা সত্যিই স্বাধীন ও সার্বভৌম গণ্য করি এবং আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে টিকে থাকাকে আমল দেই তাহলে বুঝতে হবে জাতীয় সংস্থা মাত্রই গণবিরোধী সংস্থা নয়। এই অর্থে যে এটা ইংরেজের আমল নয়, কিম্বা পাকিস্তানি শাসনাধীনও নই আমরা। এই রাষ্ট্রের যাঁরা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে আছেন তাঁরা জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এই দায়িত্ব নিয়েছেন। ঠিক তেমনি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের মনে রাখতে হবে, জনগণ মানেই 'নেটিভ' নয়। বাংলাদেশ কারো কলোনি নয়। অতএব ঔপনিবেশিক কায়দায় নাগরিকদের যখন-তখন ধরে নিয়ে যাওয়া এবং অত্যাচার-নির্যাতন হুমকি-ধামকি দিয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী আদায় করে বিচারের আগেই অভিযুক্তকে দোষী প্রমাণের এই চর্চা আমাদের বড়ো ধরনের ক্ষতি করবে। অতি নিন্দনীয় ও মানবাধিকার বিরোধী তথাকথিত 'ক্রসফায়ারে' অভিযুক্তদের হত্যা আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের মানমর্যাদা ইতোমধ্যেই মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করছে। মানবাধিকারকে আমাদের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার অস্ত্র হিশাবে ব্যবহার করতে হবে- উল্টাটা নয়। ব্যক্তির অধিকারের সঙ্গে সমষ্টির স্বার্থের বিরোধ থাকতেই পারে। মানবাধিকার রক্ষার নামে শক্তিশালী দেশ দুর্বল দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে- আমরা তা জানি। অতএব আমাদের আরো বেশি সতর্ক হতে হবে। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ আজ অত্যন্ত বিপন্ন একটি দেশে পরিণত হয়েছে। আজ সকলেরই সতর্ক হবার- সকলেরই গণসৈনিক হবার সময় হয়েছে। দুর্নীতিবাজ ও দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে। আলবৎ সেখানে সহযোগিতা থাকবে- কিন্তু সেটা হতে হবে নীতিনৈতিকতা, মানবাধিকার, আইন-আদালতের পরিসীমার মধ্যে। জাতীয় সংস্থাগুলো যদি জনগণকে তাদের দুশমন বলে গণ্য না করে, মানবাধিকারের মর্যাদা যে কোনো মূল্যে অক্ষুণ্ন রাখে এবং সর্বোপরি দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার ক্ষেত্রে সাহসী ও অকুতোভয় হয়ে থাকে তাহলে গণমানুষের সমর্থন তাঁরা অবশ্যই পাবেন। কাজে কাজেই গণমানুষের স্বার্থ যে সকল পত্রিকা সংরক্ষণ করে তাদের সঙ্গে নীতিগত অভিন্নতার কারণেই ইতিবাচক সহযোগিতা গড়ে উঠবে বা উঠতে বাধ্য। পৃথিবীর সব দেশেই সংবাদপত্র জাতীয় সংস্থাগুলোর সংবাদ সংগ্রহ ও জাতীয় স্বার্থ বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ অতি আবশ্যিক উৎস। কিন্তু জাতীয় সংস্থা তাঁদের পেশাগত কর্তব্য পালনের প্রক্রিয়ায় যেসব তথ্য ও বিশ্লেষণ খাড়া করেন যদি তা খোলাবাজারের পণ্যে পরিণত হয় তাহলে তা খুবই বিপদের কথা। গণমাধ্যমের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর সম্পর্কের যে সকল নমুনা ও নজির আমরা বহুদিন ধরে দেখতে পাচ্ছি তা রাষ্ট্রের ভয়াবহ দুর্বলতার লক্ষণ শুধু নয়, আমাদের গণমাধ্যমেরও ভয়াবহ দুর্বলতা।

গোয়েন্দাদের জেরার মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি বন্দী অবস্থায় যেসকল কথাবার্তা বা তথাকথিত 'জবানবন্দী' দিয়ে থাকেন সেইসব হুবহু কিছু কিছু পত্রপত্রিকায় ছাপা হয় । কিছু কিছু পত্রিকা এমনভাবে ছাপে যে মনে হয় তারা নিজেরাই তদন্ত করে এইসকল সত্য উদঘাটন করেছে এবং এখন জনসমক্ষে তা প্রকাশ করছে। অর্থাৎ আদালত অভিযোগ পরীক্ষা করে আদৌ অভিযুক্ত দোষী কি নির্দোষ সেই রায় দেবার আগে পত্রিকাগুলো নিজেরাই আদালতের ভূমিকা পালন করে। আইনের দিক থেকে যার অর্থ হচ্ছে বিচার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যমের এই ধরনের কার্যকলাপ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। গণমাধ্যমের এই ধরনের ভূমিকা দেখে আমরা বুঝতে পারি সামগ্রিকভাবে নাগরিক অধিকারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। একজন ব্যক্তি যতো বড়ো অপরাধীই হোক না কেনো তার নাগরিক অধিকার যদি আমরা রাষ্ট্রকে ক্ষুণ্ন করাতে সানন্দে রাজি হই, সকল নাগরিকের অধিকার অতি অনায়াসে এটাও বুঝবো 'জরুরি অবস্থা' এতো সহজে এই সমাজে কী করে জারি হতে পারলো? কী করে গণমাধ্যমেরই সামনের সারির সর্দাররা গর্ব করে দাবি করলেন আমরাই লেখালিখি করে 'জরুরি অবস্থা' এনেছি। এই কারণে আমি সবসময়ই বলে থাকি, লিখেছিও অনেকবার : যেমন প্রজা তেমনি রাজা। অর্থাৎ আমরা নিজেরা যেমন আমাদের শাসনকর্তারাও ঠিক তেমনিই হবে। নির্বাচিত হোক বা না হোক। আমরা যেহেতু অন্যের নাগরিক অধিকারের মর্যাদা দিতে শিখিনি, অতএব নিজের অধিকার রাষ্ট্র হরণ করলেও পুলকিত বোধ করি। এই এক অদ্ভুত সমাজ যেখানে নাগরিক অধিকার রাষ্ট্র হরণ করলেও পুলকিত বোধ করি। এই এক অদ্ভুত সমাজ যেখানে নাগরিক অধিকার রাষ্ট্র হরণ করে নেবার পরেও সমাজের বাঘা বাঘা মানুষগুলো দাবি করে যে 'জনগণ উৎফুল্ল'। এদের নিয়েই নাকি আবার 'জাতীয় সরকার', 'জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল' বানাবার পরিকল্পনা চলছে। গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দূরের কথা আমরা বাস করছি বিপজ্জনকভাবে বিভক্ত ও নীতিনৈতিকতা-বিবর্জিত একটি সমাজে। ভাবতে লজ্জা হয়।

কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোনো পক্ষ থেকে ওঠা অভিযোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে তাকে আগেই জনগণের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত করবার চর্চা মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে অন্যায়। একজন ব্যক্তি যতো বড়ো অপরাধই করে থাকুক না কেনো যদি আমরা তার নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে তাকে আগেই অপরাধী বলে গণরায় দেবার চর্চা করি তাহলে আমাদের আর আইন-আদালতের কী দরকার? কী দরকার সংবিধানের? যদি লাঠি মেরে ঠেঙিয়ে ভেড়ার দল চরানো সম্ভব হয় তাহলে রাষ্ট্রেরই বা কী দরকার?

আমার মিনতি হচ্ছে এই যে আমরা অত্যন্ত খারাপ সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। এই সময়টা সফলভাবে পেরিয়ে যেতে হবে। উপায় কি? প্রথম কাজ

হচ্ছে, যদি উদ্দেশ্য মহৎ হয় তাহলে উদ্দেশ্য হাসিলের প্রক্রিয়ার মধ্যে সেই মহত্ত্বের নমুনা থাকতে হবে। থাকতেই হবে। যেমন, সেই নমুনা বা নজির দেখাবার একটা প্রশস্ত পথ হচ্ছে মানবাধিকার রক্ষা বা ব্যক্তির মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবার নীতি সমুন্নত রাখা। দ্বিতীয়ত পেশাগত দায়িত্ব বা লক্ষ্য সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন থাকা। যাঁরাই গ্রেফতার হয়েছেন তাঁরা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হতে পারেন, হয়তো অনেকে ভয়ানক অপরাধীও– কিন্তু জাতীয় সংস্থাকে প্রতিপদে প্রমাণ রাখতে হবে যে তাঁদের কাজ হচ্ছে আদালতের জন্য প্রমাণাদি ও সাক্ষীসাবুদ সংগ্রহ করা– গণমাধ্যমকে রসালো সংবাদ সরবরাহ নয়। তাঁরা যদি কোনো ব্যক্তির মানবিক বা নাগরিক মার্যাদা ক্ষুণ্ন করেন তাহলে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠের চোখে নৈতিক বৈধতা হারাবেন। অন্যদিকে আদালতে হাজির করবার আগে যদি গণমাধ্যমে তথ্য আগেই ফাঁস হয়ে যায় তাহলে তথ্যের গুরুত্ব যেমন নষ্ট হবে, ঠিক তেমনি গুরুতর আইনি প্রশ্নও তৈরি করবে। এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর, সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে।

এবার আসি অন্য প্রসঙ্গে। জাতীয় সরকার, জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল ইত্যাদি গঠনের খবর দেখছি পত্রপত্রিকায়। পাশাপাশি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। বলাবাহুল্য এই চেষ্টাগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান অসাংবিধানিক পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ বের করা। জাতীয় সরকার গঠনের কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না। এই সরকার যেমন অসাংবিধানিক, জাতীয় সরকারও ঠিক তেমনি অসাংবিধানিক হবে। অসাংবিধানিকভাবে হাতে গোনা নতুন কিছু লোক নিয়ে একটি নতুন সরকার গঠন করলেই সেখানে কোনো গুণগত পরিবর্তন হবে না। সরকার কথাটির সামনে বিশেষণ হিশাবে 'জাতীয়' কথাটি বসিয়ে দিলেই সেই সরকার জাতীয় হয় না। এটা সত্যি যে এই সরকারের সামনে আমরা যাদের দেখছি তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ রক্ষা করেন এমন কোনো ব্যক্তিত্ব নন। কিন্তু এই সরকারের বিরুদ্ধে জনগণ কোনো বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ করেনি। এর প্রধান কারণ বাইরে যে সরকারকে জনগণ দেখছে আর যাঁরা সরকার পরিচালনা করেছেন তাঁরা এক ব্যক্তি নন, এটা বোঝার ক্ষমতা এই দেশের জনগণের আছে। রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য অবশ্যই কিছু ব্যক্তিকে দরকার যাদের আমরা সামনে দেখছি। এই সরকার ততক্ষণ গ্রহণযোগ্য থাকবে যতোক্ষণ তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাকবে। বিশেষত যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একমাত্র রাজনৈতিকভাবে নির্বাচিত সরকারেরই করা উচিত। এই অবস্থা জনগণ মেনে নিয়েছে। একে অযথা ঘাঁটিয়ে পরিস্থিতি জটিল করা ঠিক নয়।

জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠনের যে তত্ত্ব শুনছি তাতে মনে হয় একটা মহল চাইছে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংস্থা ও সামরিক বাহিনীর ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করবার

একটা সামরিক-বেসামরিক মিশ্রিত কাঠামো তৈরি হোক। এই কাঠামোতে বেসামরিক যেসকল ব্যক্তিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করবার কথা বলা হচ্ছে মূলত তাঁরাই সেনাবাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েমের খায়েশ করছেন হয়তো। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠনের পরিণতি সেনাবাহিনীর ওপর একটি বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ। সমাজে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা নিয়ে সামরিক ও বেসামরিক বিভিন্ন দিক নিয়ে খোলামেলা আলাপ আলোচনা দরকার। যদি গঠনমূলক আলোচনা করবার ক্ষেত্রে কোনো বাধা না থাকে এই মুহূর্তে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ নামক জগাখিচুড়ির কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ আসলে এখন কী দেখতে চাইছে? তারা দেখতে চাইছে এই সরকার আসলে কার সরকার? যাঁরা সামনে আছেন তাদের তারা চেনে। তাদের নিয়ে জনগণের মাথাব্যথা নাই। বরং যাঁরা সরকার চালাচ্ছেন তাঁরা দেশ ও জনগণ সম্পর্কে কী ভাবেন, কী তাঁরা করতে চান এই দিকটা জানতে তাঁরা আগ্রহী। বলাবাহুল্য, দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের বিরুদ্ধে জনগণ দাঁড়ালেও এই সরকার শেষাবধি কী করতে চায় সেই বিষয় জনগণের কাছে পরিষ্কার নয়। জিনিসপত্রের আকাশচুম্বি দাম এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলার অবনতি এই সরকারের জন্য একটি হুমকি তৈরি করেছে। এই হুমকির প্রধান কারণ এই সরকারের ক্ষমতারোহণের প্রক্রিয়া এবং পরাশক্তির ছায়া থেকে নিজেকে এখনো আলাদা করতে না পারা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সরকারের বিরোধিতা করবার জন্য জনগণ রাস্তায় নেমে আসেনি। হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ভাবছে যে পরাশক্তির প্রভাব বলয়ের বাইরে এই সরকারের নিজের একটি জাতীয় লক্ষ্য আছে যা জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যাঁরা সরকার পরিচালনা করছেন তাঁরা এমন একটি অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবেন যাতে তারা কারো মুখাপেক্ষী থাকবেন না। জনগণ হয়তো অপেক্ষা করতে রাজি।

খেয়াল করতে হবে জিনিসপত্রের দাম কমানো বা বিদ্যুতের সমস্যা এই মুহূর্তেই সমাধান করা যাচ্ছে না বা যাবে না এই সত্য জেনেও জনগণ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে নেমে পড়েনি। তারা নামেনি এই কারণে নয় যে জরুরি অবস্থাকে জনগণ ভয় পায়। জনগণ হয়তো এখনো ভাবছে দলবাজি ও দুর্নীতিবাজির বাইরে একটা গণরাজনৈতিক প্রক্রিয়া তৈরি করার কাজটা আসলেই জরুরি। এবং যাঁরা এই কঠিন দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছেন তাদের সময় দেওয়া দরকার।

আমার এই অনুমান সত্য কিনা সেটা ভবিষ্যতে দেখবো। রাজনীতি কোনো স্থির বিষয় নয়, তার উত্থানপতন আছে। যদি এই সরকারের সত্যিই কোনো ইতিবাচক লক্ষ্য থাকে তাহলে তার কাজ হচ্ছে ধনী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে খুশি রাখার চেষ্টা না করে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করা। সেই দিক

থেকে কয়েকটি বিষয়ে এই সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারলে সাধারণ মানুষ ইতিবাচকভাবেই দেখবে বলে আমার ধারণা। এর মধ্যে মানবাধিকার বিষয়ে আগেই বলেছি। অন্যান্য অনেক প্রসঙ্গই হতে পারে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে :

এক : যেসকল শ্রমিক তাদের প্রাপ্য মজুরি পাবার দাবিতে খালিশপুর আন্দোলন করেছে এবং যাদের অনেকে এখনও কারাগারে–অবিলম্বে তাদের সকলের মুক্তি দান এবং তাদের প্রাপ্য মজুরি পরিশোধের ব্যবস্থা করা। খালিশপুরের ঘটনা সাধারণভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে চাপা ক্ষোভ তৈরি করেছে। এর আশু মীমাংসা দরকার।

দুই : গার্মেন্ট শ্রমিকদের সঙ্গে যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি করা হয়েছে মালিক পক্ষকে তা মানতে বাধ্য করার ক্ষেত্রে সরকারের কঠোর ভূমিকা গ্রহণ। এই দিক থেকে মালিকপক্ষের পিঠ চাপড়ানো নীতি সরকারকে বাদ দিতে হবে এবং পরিষ্কার বলতে হবে মালিকপক্ষ যে চুক্তি করেছে তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার টালবাহানা সরকার সহ্য করবে না।

তিন : যেসকল কোম্পানি বা সাহায্য সংস্থা রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে নতুন টেকনলজি ও বাণিজ্যিক বীজ প্রবর্তনের নামে কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থা ধ্বংস ও পরিবেশ বিপর্যয় ঘটাচ্ছে তাদের ব্যাপারে অবিলম্বে সতর্ক হওয়া এবং অবিলম্বে পরিবেশ ও প্রাণসম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ় অবস্থান পরিষ্কার করা।

দীর্ঘ তালিকা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে আস্থার মধ্যে কীভাবে নেওয়া যায় সেই বিষয়ে ভাবা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আস্থা অর্জনের মধ্য দিয়ে পরাশক্তির ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ আমরা পেয়েও যেতে পারি। প্রশ্ন হচ্ছে জনগণের স্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়ে কিছু ঐতিহাসিক কাজ কি আমরা করতে পারবো না? আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অক্ষশক্তি ও আঁতাতের বাইরে স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ দরকার বাংলাদেশের। কিন্তু সেই সুযোগ আপসে আপ ঘটবে না। ছোটো দেশ হিশাবে বাংলাদেশের শক্তি সীমিত, এটা মানতে হবে। জনগণও তা জানে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আস্থা অর্জন করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে জাতীয় লক্ষ্যের নিশানাগুলো পরিষ্কার করা এখনো হয়তো সম্ভব।

এই আশা ব্যক্ত করে শেষ করি।

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪। ৪ জুন ২০০৭। শ্যামলী।

অনাহারি পাটকল শ্রমিকের মৃত্যু এবং বাজেট প্রসঙ্গ

সিরাজুল ইসলাম ছিলেন পিপলস জুট মিলসের ব্যাচিং বিভাগের ব্রেকার ফিডার পদে স্থায়ী শ্রমিক। নয়া দিগন্ত (১১ জুন ২০০৭) খবর দিচ্ছে, 'পরিবারের দাবি, অভাব-অনটন, অনাহার-অর্ধাহার আর দুশ্চিন্তায় স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গেছেন। অভাব, অনটন, অনাহার, অর্ধাহার, কথাগুলো খুবই সহজে লিখলাম। যদি নিজে অনাহারে অর্ধাহারে থাকতাম তাহলে এতো মসৃণ ভাষায় নির্ভুল বানানে লেখা যেতো না। কথাটি বলছি পাঠকদের বোঝাবার জন্য। অনাহরে অর্ধাহারে অনটনে অভাবে মানুষ মারা যাবার মতো নির্মানবিক, যন্ত্রণাদায়ক ও নিষ্ঠুর মৃত্যু আর হতে পারে না। যাঁরা অনাহারে বা অর্ধাহারে কখনো থাকেননি তাঁদের পক্ষে এই নিদারুণ ক্ষয়ের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করা মুশকিল।

সিরাজুল ইসলামের বড়ো ছেলে জুলহাস জানিয়েছেন, তিন দিন ধরে তাদের ঘরে চুলা জ্বলেনি। দোকানে বাকি পড়েছে ১৩ হাজার টাকা, দোকানদাররা আর বাকি দিতে চায় না। ঘরভাড়া দেওয়া হয়নি পাঁচ মাসের। দুই বোন ফাতেমা ও হালিমার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে টাকাপয়সার অভাবে। জুলহাস একটি আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, সে যে টাকা পায় তাতে সংসার চলে না। কোনো শ্রমিক মারা গেলে মিল কর্তৃপক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা। কিন্তু সিরাজুল ইসলামের পরিবারকে দেওয়া হয়েছে মাত্র দুই হাজার টাকা।

মৃত শ্রমিকের পাওনাও মিটিয়ে দেওয়া হয়নি। দায় এই সরকারের। যদি মৃত শ্রমিকের ২০ হাজার টাকা পাওনা থাকে তা মিটিয়ে দেওয়া হয়নি কেনো? শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতন তো আছেই। খুলনার শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতন না দেওয়া, তারা তাদের বেতন চাইতে গেলে তাদের ওপর গুলি চালানো, অকথ্য নির্যাতন ও ধরপাকড় ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের সচেতন জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। এখন অভাব অনাহারে শ্রমিক মৃত্যুর খবর যতো জানা যাচ্ছে ততোই ক্ষোভ বাড়ছে। যেসব শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়েছে তারা এখনও কারাগারে। অনাহারে অর্ধাহারে সিরাজুল ইসলামই প্রথম মারা যাননি, এর আগে গত ৬ জুনে মারা গিয়েছে প্লাটিনাম জুট মিলের অনাহারি শ্রমিক আবুল কালাম। তার মানে খুলনায় প্রাপ্য মজুরি না দেবার কারণে এবং সরকারি দমন-নির্যাতন নীতির কারণে দুই জন শ্রমিক অভাবে অনাহারে মরলেন। দুর্ভাগ্য আমাদের। মনে রাখা দরকার প্রায় ছয় মাসের প্রাপ্য বকেয়া থাকলেও সরকার গত ২৭ এপ্রিল শ্রমিকের পাওনার

এক-তৃতীয়াংশ মজুরি শুধু পরিশোধ করেছে। এরপর শ্রমিকদের প্রাপ্য পরিশোধ করা হয়নি। শ্রমিকদের এই প্রাপ্য কোনো দাবিদাওয়ার ব্যাপার নয়। কাজ করেছে শ্রমিক, তার মজুরি দিতে হবে। কিন্তু দেওয়া হয়নি। প্রাপ্য চেয়েছে বলে শ্রমিকের ওপর দমনপীড়ন চলেছে।

শ্রমিক কৃষকসহ খেটে খাওয়া জনগণ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ক্ষমতাসীন এই সরকার তাদের শত্রু নাকি মিত্র চিনবে কী করে? চিনবে এই সকল ঘটনার মধ্য দিয়েই। দুইজন শ্রমিক না খেয়ে মারা গিয়েছেন এটা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় খবর। খালিশপুরের পাটকলগুলোতে এখনো লে অফ প্রত্যাহার করা হয়নি। বরং ৯৫০ জন শ্রমিকের বিরুদ্ধে নতুন করে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দেওয়া হয়েছে, যাদের অধিকাংশই বদলি শ্রমিক। শ্রমিকদের স্থায়ীভাবে কাজ করবার নিশ্চয়তা নাই, অন্যদিকে পিসমিল বা খণ্ডকাজ হিশাবে শ্রমিকদের খাটিয়ে নিয়ে জরুরি কিছু অর্ডার সরবরাহ করছে কর্তৃপক্ষ।

খুলনার খালিশপুরে বকেয়া মজুরি-বেতনের দাবিতে ৪টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পাটকলের শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করেছিলেন। শ্রমিকরা ১৫ এপ্রিল থেকে একে একে কারখানার উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। এক পর্যায়ে ১৭ এপ্রিল তারিখ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে শ্রমিকদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশ ২১ এপ্রিল তারিখে গুলি চালায়। একদিকে প্রাপ্য মজুরি ও বেতন না দেওয়া, অন্যদিকে কপর্দকশূন্য অভাবী ও অনাহারী শ্রমিকদের ওপর নির্বিচার ও বেপরোয়া গুলি চালানো– জরুরি অবস্থা জারি করে শ্রমিকদের ওপর যে অন্যায় সরকার করেছে তা গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন। পুলিশ ৭০ জন শ্রমিককে গ্রেফতার করে রেখেছে ও বিভিন্ন অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে। এফ আই আর তথ্য থেকে জানা যায় যে চারটি মামলায় আট থেকে নয় হাজার শ্রমিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা ঝুলছে। বহু শ্রমিক গ্রেফতারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

শ্রমিকদের এই দিকটির পাশাপাশি হাজার হাজার একর বোরো ধানের জমিতে চিটা ও বার্ড ফ্লুর কারণে বাংলাদেশে পোল্ট্রি ফার্মের উপযোগিতার কথা না তুলে গ্রামের গরিব কৃষক বাড়ির মোরগা-মুরগি নিধনের উৎসবের ছবি যদি আমরা মনে রাখি তাহলে এই সরকারের চেহারা আমাদের আগেই খানিক পরিষ্কার হয়েই আছে। তার উপর সরকার যখন বাজেট ঘোষণা করলো তখন তাঁকে আমরা পুরাপুরি চিনতে পারলাম। ঢাকা শহরের পরজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী, লুটেরা ধ্বনি ও ইম্পোর্টার– এক্সপোর্টার টেন্ডারবাজ ও কন্ট্রাকরদের সরকার থেকে এই সরকারের পার্থক্য কি? একই শ্রেণী নয় কি? আগের সরকারের তুলনায় এই সরকারের পার্থক্য ওখানে যে আগের সরকার আর যাই হোক গণতন্ত্র ও নির্বাচনের কথা বলে আমাদের শোষণ করতো, লুটপাট করতো। দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের পরেও তারা অন্তত জনগণের ভোটের কথা বলতো। বাজেট ঘোষণা করত জাতীয় সংসদে।

বাজেট আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত হিশাব এই জন্যই খালিশপুরের অনাহারে দুই শ্রমিকের মৃত্যু দিয়ে শুরু করেছি।

বলাবাহুল্য যারা আমাদের আগামী দিনে শোষণ লুণ্ঠন করবে তাদেরই একপক্ষ আরেক পক্ষকে 'দুর্নীতিবাজ' আর 'দুর্বৃত্ত' বলে ধরপাকড় করে চলেছে। এর আগে অন্তত কে পাঁচ বছরের জন্য এই কুকর্মটি করবে তার জন্য ভোট চাইতে আসতো। এই সরকারের সেই দায় নাই। ঢাকার কূটনৈতিক মহল সরকারকে সমর্থন দিলেই তাদের কারো মুখাপেক্ষী থাকতে হচ্ছে না। জরুরি অবস্থা জারি এবং আইন-আদালতের তোয়াক্কা না করার কারণে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভেঙে পড়ছে। এই পরিস্থিতি বিপজ্জনক। যেসকল পরাশক্তি এই সরকারকে সমর্থন দিচ্ছে তারা নিশ্চয়ই প্রতিদানে বড়ো কিছুর মতলবে আছে। কী সেই প্রতিদান?

ফলে বাজেট নিয়ে আমাদের পক্ষে বিমূর্তভাবে সুশীল সুশীল ভাব বজায় রেখে কথাবার্তা বলা অসম্ভব। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ হিশাবে আমরা নির্যাতিত ও শোষিত। আমাদেরই বিরুদ্ধে এই বাজেট প্রণীত হয়েছে। ঠিক। বাজেট গরিবের বিরুদ্ধে ধনীর বাজেট। তাও সত্য। কিন্তু এ আর নতুন কথা কি? না, অতএব এই সস্তা ফর্মুলা দিয়ে আমরা বাজেটের সমালোচনা করবো না। এই সকল ভাষা শাসক শ্রেণীরই এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের পিঠ চাপড়াবার জন্য ব্যবহার করে। যে কোনো আহাম্মকই বুঝতে পারে যে যদি শাসক শ্রেণীর খোদ উদ্দেশ্যই হয় পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধি তাহলে তার মানে অবশ্যই কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থের বিপরীতে পুঁজিপতি ও সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে বাজেটই প্রণয়ন করা। এর আগেও তাই হয়েছে, এখনও তাই হয়েছে। মুনাফাকেন্দ্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ভিন্ন কিছু করবে কেনো? কাঁঠালগাছ থেকে গরুর দুধ দোহানোর কথা বলে চলেছে সুশীল সমাজ। হাসবো নাকি কাঁদবো? ওখান থেকে কাঁঠালের আঠাই সাদা হয়ে বের হয়। উহা দুগ্ধ নহে!!

অতএব আমরা এইসব সস্তা সমালোচনার ময়লায় পা দেবো না। বাজেট সম্পর্কে আমাদের বিস্তর কথা বলার আছে। কিন্তু সরকার যতোই বলুক যে এই বাজেট এখনো প্রস্তাব– এখানে সংস্কারের সুযোগ আছে। আমরা হাসা ছাড়া আর কীই বা করতে পারি? ভেবে দেখুন কৃষক আর শ্রমিক কী করে বাজেটের সমালোচনা করবে? কিম্বা দিন আনে দিন খায় এই ধরনের একটি চাকরিজীবী পরিবার? ওদের কথা শুনবেটা কে? তারা কী করে ইন্টারনেটে গিয়ে বাজেটের পাতা খুলে তা বুঝে আবার সমালোচনা করবে? দ্বিতীয়ত যারা সালোচনা করবেন বা করছেন তাদের চাতুরিকেও আমরা চাতুরি বলে লজ্জা দেবো না। কারণ শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন অংশ, যাদের মধ্যে সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সারাক্ষণই সরব– তাদের অনুমানই হচ্ছে এই যে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাই আদর্শ ব্যবস্থা। উন্নত,

সুখী বা ভালো জীবন কেমন? কী ধরনের সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশে?- এইসব তাদের বিচার্য নয়। তারা চায় কোম্পানির জন্য মুনাফা। শাসক শ্রেণীর লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফাবাজদের সহজে মুনাফা কামানোর ব্যবস্থা করে দেওয়া। তাদের নিয়মে টাকা না কামালে বা সম্পদ কুক্ষিগত না করলে শাসক শ্রেণীর ভাষায় সেটা 'দুনীতি', কিন্তু তাদের নিয়মে বা ব্যবস্থায় এবং পরাশক্তি ও দাতা সংস্থাগুলোর পরামর্শে করলে সেটা 'অর্থনীতি'। 'দুর্নীতি' আর 'অর্থনীতি'-র এই ক্ষীণ সীমারেখা সম্পর্কে সতর্ক না থাকলে শাসক শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে বিভ্রান্ত করে যাবে। শাসক শ্রেণী এই কারণে দুর্নীতিবাজ বা দুর্বৃত্তের ধরপাকড় করে, কারণ তারা তাদের শ্রেণীর নিয়ম মানেনি, কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থনীতি ও সমাজকে ব্যক্তির দুর্নীতি থেকে আলাদা করে রাখে। কারণ তাকে শেষাবধি প্রমাণ করতে হয় তার ব্যবস্থার মধ্যেই দুর্নীতিবাজ ও দুর্বৃত্ত তৈরির প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। পুঁজিবাদ চাই কিন্তু দুর্নীতিবাজ ও আর দুর্বৃত্ত চাই না- এটা হয় না। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে এই সকল বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

বাজেটীয় ভাষায় মুনাফাবাজির নাম হচ্ছে 'প্রবৃদ্ধি'। এর গলাভরা নামও আছে, 'জাতীয় প্রবৃদ্ধি'। সুশীলসমাজ তর্ক করছে বাজেটে প্রবৃদ্ধি বাড়বে নাকি কমবে? মুনাফাকেন্দ্রিক এই তর্ক, মুনাফাবাজদেরই এই সকল ভাষা। পাঠক, লক্ষ করবেন কারো ভাষায় এমনকি 'জীবন' ও 'জীবিকা' নামক অতি সাধারণ অথচ অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কোনো উল্লেখ আমরা দেখিনা বললেই চলে। ধরুন, এই বাজেটে আমাদের জীবনের কি হবে? আমরা কি ভালোভাবে বাঁচতে পারবো? আমাদের প্রাণ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কি উপকার বা অগ্রগতি হবে? আমাদের জীবিকার কি সংস্থান হবে? আমাদের শ্রমিক, কৃষক বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কি খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারবে? উত্তর, না এই সরকারের আগেও এর উত্তর ছিল নেতিবাচক, এই সরকারের আমলেও সেটা আরো গভীর নেতি বা আরো উচ্চস্বরে 'না'-এ পর্যবসিত হয়েছে। প্রবৃদ্ধি বাড়া মানে অল্প কিছু কোম্পানি, ব্যবসায়ী বা ব্যক্তির সম্পদ জমা হওয়া, অন্যদের সম্পদ হরণও হতে পারে। প্রবৃদ্ধিরও আগে আছে সম্পদ বিতরণ ও বণ্টনের প্রশ্ন এবং সঙ্গেই জড়িত রয়েছে জীবন ও জীবিকার প্রশ্ন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা 'প্রবৃদ্ধি' মার্কা তর্ক থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলছি। বেরিয়ে আসতে হবে 'সুশীল' সমাজের ভাষা ও চাতুরি থেকেও। সহজ, সরল, সাধারণভাবে বাজেট নিয়ে তর্কাতর্কির পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে আমাদের। জীবন ও জীবিকার জায়গায় দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রের নীতি ও কৌশলের সমালোচনা করতে শিখতে হবে। সেখানে তত্ত্ব থাকবে, অবশ্যই। কিন্তু ফাঁকা তত্ত্ববাগিশতা থাকবে না। আর সেটা করতে হবে শাসিতের দয়াভিক্ষার ভাষাতেও নয়। বরং আগামী দিনে শাসক হয়ে ওঠার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

এই শেষে যে বললাম সেই দিকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিপীড়িত ও শোষিত যদি ইতিহাসে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে চায় তাহলে তাকে দুটো পথ পরিহার করতে হবে। এক : দয়াভিক্ষার ভাষা, কাকুতি মিনতি। দুই মারো, ধরো, জ্বালাও পোড়াওর ভাষা। লক্ষ করলে আমরা দেখবো শাসক শ্রেণীর মধ্যেই এই ধরনের ভাষার জন্য ব্যাকুলতা প্রবল, বাজেটের ক্ষেত্রে যেমন- যারা সংখ্যাগরিষ্ঠকে শোষণ শাসন করে ধনী হয়, গরিবের জন্য তাদের ব্যাকুলতা যেন একটু দৃষ্টকটুভাবেই অধিক হয়। অন্যদিকে শাসক শ্রেণীর এক পক্ষই অন্য পক্ষকে জ্বালাও পোড়াও মারো ধরো এই নীতিতে চলে। বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের গোড়াও এই নীতির মধ্যেই।

খেটে খাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যখন আগামী দিনে শাসক হয়ে ওঠার প্রতি নজর দিয়ে ইতিহাস নিরীক্ষণ করে তখন সেটা বিদ্যমান শাসকের নজর হয় না- হয় সকল শ্রেণীর মুক্তির দৃষ্টি। সে এক অন্য আলো, অন্য প্রকার আবির্ভাবের প্রজ্ঞা। কারণ শোষিত ও নির্যাতিত নিশ্চয়ই অন্য একটি শ্রেণীকে শাসন ও শোষণ করবার জন্য 'শাসক' চায় না। বরং শোষণ ও নির্যাতনের খোদ ব্যবস্থাটাই উপড়ে ফেলবার জন্য তার সংগ্রাম। সমাজে বিভাজন বহাল রাখা তার উদ্দেশ্য নয়, সকল বিভাজন ও বিভক্তি উৎখাত করে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্য প্রতিষ্ঠাই তার কর্তব্য হয়ে ওঠে। সেই উদ্দেশ্যেই তার 'শাসন'। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই ধারণার উপযোগিতা বা তার বাস্তবিক প্রয়োগ কেমন হবে? সেই দিকে দুই-একটি ইঙ্গিত দিয়ে আজ বাজেট সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত নোক্তাটুকু শেষ করবো।

সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী যদি নিজেকে প্রথাগত অর্থে শাসক শ্রেণী হিশাবে ভাবতে শেখে তাহলে তাকে কয়েকটি বিষয়ে পরিষ্কার থাকতে হবে। রাষ্ট্র পরিচালনার অনেক কিছুর মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। সরকারি কর্মচারীদের বেতন দিতে হবে। ওদেরও পেট আছে, বালবাচ্চা আছে। আমরা মুখে পরাশক্তির বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো কথা বললাম, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র আমাদেরই নিজের খরচে চালাবার হিম্মত নাই। যদি বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার অর্থ বিদেশ থেকে আসে তাহলে সামরিক-বেসামরিক আমলার উভয়েই- আমরা যতোই বড়ো বড়ো কথা বলি- পরাশক্তির অধীনেই চলবে, বিদেশি শক্তিরই গোলামি করে যাবে। যদি তাই হয়, তাহলে বাজেটের ক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সরকার কার ওপর খাজনা ধরছে, খরচের টাকা (বা রাজস্ব) তুলছে কীভাবে? দাতা সংস্থাগুলো কোথায় কীভাবে টাকা দিচ্ছে? কেনো দিচ্ছে? যদি গরিব শ্রমিক ও কৃষক মনে করে যে যেহেতু আমরা ট্যাক্স দেই না, অতএব এইসব জেনে আমাদের কী লাভ? আদার ব্যাপারির জাহাজের খবরে কী ফায়দা? যদি এই মানসিকতা আমাদের থাকে তাহলে এই দেশ গোলামির জিঞ্জির কখনই ভাঙতে পারবে না।

এই দিকটা যদি ভাবি তাহলে এটাও বুঝবো যে শাসক শ্রেণী আমদানিনির্ভর হয়ে যায় কেনো? শুধু কি অবাধ বাণিজ্যের এই দেশীয় তরফদার হবার কারণে? আমদানি শুল্ক থেকেই সরকার চালাবার জন্য বড়ো একটা রাজস্ব আসে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যদি সরকার চালাবার জন্য সরকারকে ট্যাক্স না দেয় বা দেবার সামর্থ্য হারায় তখন আমদানি-রপ্তানি নীতিতে তার সুফল পড়তে বাধ্য।

প্রবৃদ্ধি টাকার হিশাবে হলো কি হলো না সেই সকল ভুয়া তর্ক বাদ দেবার আরো হাজার কারণের মধ্যে আরেকটি কারণ হচ্ছে রাষ্ট্র চলাবার জন্য যেভাবে আমরা হিশাবকিতাব রাখি (National Accounting) তার পর্যালোচনা। জাতীয় আয় ব্যয়ের এই হিশাবকিতাবের মধ্যে এক মহা শুভংকরের ফাঁক থাকে। উৎপাদন না করে ধ্বংসাত্মক কর্মে নিযুক্ত হলেও সেটা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বা জাতীয় আয় বলে হিশাবের খাতায় ঢুকে যায়। তাহলে প্রথমে জানতে হবে আমরা কী ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে উৎপাদনমূলক বলবো, আর কোন ধরনের কর্মকাণ্ডকে অনুৎপাদক বলবো। স্বভাবতই সমাজের উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা ও অনুৎপাদক কর্মকাণ্ডকে নিরুৎসাহিত করবার জন্য বাজেটকে হাতিয়ার হিশাবে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু কোন কাজ বা কোন ব্যবসা উৎপাদনমূলক আর কি কাজ বেহুদা, অনুৎপাদক বা ক্ষতিকর এই হিশাব আমাদের অবশ্যই করতে হবে। বাজেটে দেখা যায় অনুৎপাদক খাতকে অনেক সময় উৎসাহিত করে বা করতে বাধ্য হয়। কারণ এই খাতে যারা ব্যবসা করে তারা শক্তিশালী।

দেশীয় ও বিদেশি মালিকানার শিল্প-কলকারখানা সম্পর্কে আমাদের ধারণা এই রকম যে বাংলাদেশী মালিক হলে সেটা 'ভাল', আর বিদেশি মালিক হলে সেটা 'খারাপ'। আমাদের দেশীয় শিল্পের পক্ষে দাঁড়াতে হবে। আসলে, পুঁজির কোনো দেশ নাই। বাংলাদেশী বিদেশি ভেদটা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নয়। শ্রমিকের দিক থেকে ব্যাপারটা তার মজুরি, কাজের পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। দেশীবিদেশি ভেদ শ্রমিকরা করে না। করার দরকারও নাই। সেটা করবার প্রয়োজন রয়েছে রাজনৈতিক দিক থেকে। যাঁরা এই দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলবার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করছেন এবং রাজনৈতিকভাবে যাঁরা এই দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নকে নিজেদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিক থেকেও বিচার করেন —দেখা যায় এঁরা দেশগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। শ্রমিক-কৃষক ও খেটে খাওয়া জনগণের সঙ্গে মৈত্রী রচনার রাজনৈতিক গুরুত্বও তারা বোঝে। বাংলাদেশী ব্যবসা মানেই 'ভাল'– এই ধারণা ত্যাগ করতে হবে।

সত্যি যে এবারের বাজেটে স্থানীয় শিল্পের ক্ষতি হবে। কিন্তু স্থানীয় শিল্প হলেই সেটা ভালো হবে এমন কোনো কথা নাই। আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে আগামী দিনের 'শাসক' ভেবে যেভাবে আলোচনা করছি সেই দিক থেকে মূল প্রশ্ন হচ্ছে শ্রমবিভাগ। অর্থাৎ বাজেট আমাদের বিভিন্ন উৎপাদনমূলক খাতের মধ্যে কী

ধরনের সম্পর্ক রচনা করছে, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগে আমরা আমাদের স্থান কীভাবে চাইছি– এইসবই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো বিবেচনা।

খালিশপুরের পাট দিয়ে কথা শুরু করেছি পাট দিয়েই শেষ করি। আমরা আমাদের পাটকলগুলো ধ্বংস করে দিয়েছি। কিন্তু পাটকল গড়ে উঠছে ভারতে। একই সঙ্গে কৃষিতে আমরা পাটচাষকেও ধ্বংস করেছি। পাটের মধ্য দিয়ে কৃষি ও কারখানার মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ সংযোগ ছিল আমাদের তা ধ্বংস করেছি। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গেও আমরা সম্পর্ক হারিয়েছি। এটাই কি আমরা চাই? আমরা কি চাই আমরা অন্য দেশকে শুধু কাঁচা মালের রসদ যোগাবো? কৃষিজমি ধ্বংস করে পোল্ট্রি ফিডের জন্য ভুট্টা চাষ করে তা রপ্তানি করবো অস্ট্রেলিয়ায়? ইতিমধ্যে আমাদের জমি ধ্বংস হোক, পানি বিষাক্ত হয়ে যাক– কিছুই আসে যায় না। আমরা কি অন্য দেশে উৎপাদিত পণ্যের ভোক্তা হবো শুধু? কী আমাদের নিয়তি?

এই প্রশ্নের উত্তর স্থানীয় বনাম বিদেশি শিল্প– এই বিভাজন দিয়ে আমরা বুঝবো না। বুঝবো আমাদের আভ্যন্তরীণ শ্রমবিভাগের চরিত্র কী তা দিয়ে। বিভিন্ন উৎপাদনমূলক খাতের মধ্যে সম্পর্ক ও সংযোগের চরিত্র বিচারই হচ্ছে আসল কথা।

২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪। ১২ জুন ২০০৭। শ্যামলী।

বাজেট ও নয়া উপনিবেশবাদী নীতি

বাজেট প্রস্তাব এবং তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর তর্ক আমরা পত্রপত্রিকায় পড়ছি। টেলিভিশনে যাদের কথাবার্তা শুনছি, পত্রিকায় যাদের লেখা পড়ছি তাদের মধ্যে এমন কাউকেই দেখিনি যারা শ্রমিকদের প্রতিনিধি, কিম্বা শ্রমিকদের নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ভালমন্দ যাই হোক কাজ করে। কিম্বা এমন কারো ছায়াও দেখিনি যারা কৃষকদের সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে জানেন, বোঝেন বা কৃষকদের নিয়ে কাজ করেন। খোদ কৃষক বা কৃষক প্রতিনিধির কথা তো অনেক দূরের ব্যাপার। ব্যবসায়ী, কোম্পানি বা এনজিওদের কথাবার্তা শুনবো নিশ্চয়ই– কিন্তু তরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কেউ নয়, তারা জনগণের প্রতিনিধিও নয়। ফলে প্রস্তাবিত বাজেটে যদি এইসব লেখালিখি প্রেসকনফারেন্স কথাবার্তায় আদৌ কোনো পরিবর্তন বা কোনো সংস্কারও হয় সেই সংস্কার গণমানুষের কথা

ভেবে হবে না। এই ব্যাপারে আগেভাগেই নিশ্চিত হওয়া যায়। সেই সংস্কার বা অদলবদল সংখ্যার এদিক-ওদিক হতে পারে কিন্তু বাজেটের গুণগত চরিত্রে কোনো হেরফের ঘটবে না।

বাজেটে কী প্রস্তাব করা হয়েছে, কোথায় কর বসবে কি বসবে না সেটা বাহ্য অর্থাৎ বাইরের বিষয়। এই বক্তব্যে নিশ্চয়ই অনেকে অবাক হবে । মূল প্রশ্ন হচ্ছে বাজেট যে অনুমান ও নীতির ওপর দাঁড়িয়ে প্রণীত হয়েছে সেই অনুমান ও নীতি জনগণের ঘোরতর বিপক্ষেই শুধু নয়, বরং বাংলাদেশকে একটি অধস্তন, পরদেশ মুখাপেক্ষী, বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ নির্ভর দেশে পরিণত করবার নীতি।

কিন্তু আমরা আগের লেখায় বলেছি এই নির্বিশেষ বা সাধারণ সমালোচনা আমরা করবো না। কারণ সেটা সস্তা গড়ে হরিবোল দেবার মতো সমালোচনায় পর্যবসিত হবে। এতে না-লেজ, না-মাথা কিছুই বোঝা যায় না। আমরা নজির ধরে অগ্রসর হবার চেষ্টা করি। আমি কৃষি নিয়েই আজ কিছু কথা বলবো, কারণ কৃষকের সঙ্গে থাকি বলে কিছু কথা সকলকে জানাতে পারবো মনে হয়।

বাজেটে 'কৃষি পল্লী উন্নয়ন' অংশের কেচ্ছা কীভাবে শুরু করা হয়েছে, দেখুন। বাংলাদেশে খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে এই নিয়ে তর্ক করার কিছুই নাই। এখন খাদ্য মানে কিন্তু ধানের উৎপাদন বাড়ানো নয়। গো-খাদ্য বা খড়, মাছ হাঁসমুরগি ইত্যাদি সবকিছুই খাদ্য। শাক, লতাপাতা, মাটির তলার আলু, কাঁচা কাঁঠাল, পাকা কাঁঠাল, আম, লিচু- এই সবই খাদ্য আর খাদ্য শুধু মানুষের জন্য নয়- গরু ছাগল হাঁসমুরগির খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপার আছে। অতএব খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানো মানে শুধু ধানের উৎপাদন বাড়ানো- এই ভুয়া বা বিভ্রান্তিকর চিন্তা তো আছেই। এটাও মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশ প্রাণসম্পদ বা প্রাণবৈচিত্র্যের দিক থেকে অত্যন্ত সম্পদশালী দেশ। তাহলে খাদ্য উৎপাদন শুধু নয়, খাদ্য সংরক্ষণও করতে হবে। গবেষণায় দেখা যায় পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ রাখা হলে বা যেসব এলাকায় তা সংরক্ষিত হয়েছে সেখানে কমপক্ষে ৪০ ভাগ খাদ্য গ্রামের মানুষ কুড়িয়ে খেতে পারে। অর্থাৎ শাক লতাপাতা কুড়িয়ে নদীনালায় ছোটো মাছ ধরে গ্রামের মানুষ তাদের খাদ্যের চল্লিশ ভাগের যোগান অনায়াসেই নিজে করতে পারে। এর জন্য কোনো সরকার লাগে না, কারো সাহায্য লাগে না। কোনো এনজিও দারিদ্র্য বিমোচন এই সব কাণ্ডকারখানার দরকার হয় না। কিন্তু বাজেটে যে খাদ্য প্রকৃতি নিজেই নিজের আনন্দে উৎপাদন করে, যে অনাবাদী শাক, লতাপাতা, মাছ খেয়ে মানুষ বাঁচে তাকে সংরক্ষণের কোনো চিন্তা নাই। অন্যদিকে গবেষণায় দেখা গেছে সারা বছর কুড়িয়ে খেয়ে বাঁচে এই ধরনের পরিবারের সংখ্যা কম নয়।

কৃষি বলতে আসলে কী বোঝায় সেই ধারণা তো বাজেটে নাই-ই, বরং বলা হচ্ছে কৃষিজমি ১ শতাংশ হারে কমছে। কেন রে বাবা? কেন কমছে? তাহলে সেটা আগে ঠেকাও। অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতির কথা বলা হচ্ছে। কৃষি উৎপাদন নাকি

বাড়াতে হবে মুদ্রাস্ফীতি ঠেকাবার জন্য। প্রশ্ন, মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে কৃষি উৎপাদনের সম্পর্ক কি এতোই ডাইরেক্ট?

'কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর' যে কৌশল গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে উচ্চ ফলনশীল ধান ও গম প্রবর্তনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল তার একটা সৎ মূল্যায়ন থাকা দরকার। যদি না থাকে তাহলে আগের মতোই কি প্রাণ ও পরিবেশ বিপন্ন করে আমরা উৎপাদন করবো? তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের শুরুতে মাটিতে কোন মৌলিক উপাদানের ঘাটতি ছিলো না। কিন্তু বর্তমানে কম করে হলেও পাঁচটি মৌলিক উপাদান নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, সালফার ও জিঙ্ক না দিলে আর ফসল হয় না। মাটিতে জৈবপদার্থের পরিমাণ অস্বাভাবিক রকম কম। কমপক্ষে শতকরা দুই ভাগ থাকা উচিত। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগেই বলা হয়েছে যে তথাকথিত 'আধুনিক' জাত এখন স্থবির (stagnant) হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ অধিক উৎপাদনের ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলেছে। তাহলে মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা, আপনি উৎপাদন বাড়াবেন কী করে? কৃষিতে কৃষকের ভূমিকা এবং বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার দরকার আছে আগে। তাহলে কি অনুমানের উপর ভিত্তি করে কৃষি বাজেট প্রণীত হলো? কাদের জন্য এই বাজেট?

আমরা দেখছি যে কৃষিতে ভর্তুকি মানে কোম্পানি- বিশেষত বহুজাতিক কোম্পানি ও ব্যবসায়ীদের ভর্তুকি। কৃষকের জন্য ভর্তুকি চাই অবশ্যই- কিন্তু কৃষকের নামে কোম্পানিকে ভর্তুকি দেওয়া চাই না আমরা। সার বিষ পাম্পের ভর্তুকি কোথায় যাচ্ছে বাজেট দেখলেই পরিষ্কার হবে। তাছাড়া এখনো আমাদের কেনো হুঁশ হয়নি যে মাটির তলা থেকে পানি তোলা মানে আর্সেনিকে পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলা। এই সত্যি জানা থাকার পরেও ডিজেলে ভর্তুকি দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে? এতে কি উৎপাদন বাড়বে? নাকি গ্রামে একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী জন্ম দেবার বা টিকিয়ে রাখবার জন্যই ব্যবস্থা? অর্থ উপদেষ্টাকে তাহলে প্রমাণ করতে হবে যে ভর্তুকিতে বাংলাদেশের উৎপাদন বাড়ছে। আমি তাঁকে মোটেও দোষারোপ করবো না। তাঁকে বোঝানো হয়েছে যে মাটির তলা থেকে পানি তুলতে না পারলে বুঝি আমাদের উৎপাদন কমে যাবে। সার, বিষ ও পাম্প ছাড়া বুঝি চাষ করবার আর কোনো পথই নাই। ভুয়া আর রাবিশ এই সব প্রপাগান্ডা।

আমাদের শক্তির ঘাটতি আছে। ডিজেল তেল আমাদের বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। তাছাড়া আমাদের ইলেকট্রিসিটির অভাব আছে। কৃষিতে যদি আমরা ইলেকট্রিসিটির ব্যবহার কমিয়েও উৎপাদন বাড়াতে পারি তাহলে সেটাই তো আমাদের পথ হবে। তাহলে সেই ধরনের কৃৎকৌশল ও কৃষি ব্যবস্থাপনা উৎসাহিত করাই ছিল অর্থ উপদেষ্টার কাজ। আমাদের অবশ্যই উৎপাদনের ভিন্ন পথ অনুসরণ করতে হবে। বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ কৃষক আছে

যারা সার বিষ পানির পাম্প ব্যবহার করে না। কারণ তারা তথাকথিত আধুনিক চাষাবাদ করে না। তাদের জন্য অর্থ উপদেষ্টাকে অবশ্যই পুরুস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। যারা পরিবেশ ক্ষতি করছে অথচ উৎপাদন বাড়াচ্ছে না তাদের ভর্তুকি নয়, যারা পরিবেশ রক্ষা করছে অথচ উৎপাদনও বাড়াচ্ছে তাদেরকেই ভর্তুকি দিতে হবে। উৎপাদন বাড়াবার ক্ষতিকর ও পুরানা পথ আমাদের জন্য আত্মহত্যার শামিল আর বিষ কীটনাশক ছাড়া যারা চাষাবাদ করেও অধিক উৎপাদন করে তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তারাই বরং অত্যাধুনিক চাষাবাদ করে–যাকে জাতিসংঘের প্রাণবৈচিত্র্য সংক্রান্ত এক্সপার্ট কমিটি নাম দিয়েছে ecosystem approach to agriculture । কৃষিকে পশ্চিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কৃষি মডেল– যা প্রাণবৈচিত্র্যসমৃদ্ধ দেশের জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত– সেই দেশের জন্য এই আধুনিক পথই উৎপাদন বাড়াবার পথ। এই নিয়ে বাংলাদেশে প্রচুর গবেষণা হয়েছে।

একটা ছোটো উদাহরণ দেওয়া যাক। বাংলাদেশের প্রাণবৈচিত্র্যনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় কী পরিমাণ শক্তি খরচ করে আর কী পরিমাণ উৎপাদন করে তার একটা হিশাব আছে। বাংলাদেশের কৃষক উৎপাদনে এক ক্যালোরি খরচ করে তিন ক্যালোরি খাদ্য উৎপাদন করে। অথচ ইউরোপে কমপক্ষে নয় ক্যালোরি খরচ করে উৎপাদন করে মাত্র এক ক্যালোরি। এই ক্যালোরি খরচ হয় জীবাশ্মভিত্তিক শক্তি– যেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কৃষি মডেল উৎপাদন না করে এনার্জি ধ্বংস করছে, আর আমাদের কৃষক উল্টা এনার্জি উৎপাদন করছে– এই কৃষকের সর্বনাশসাধনের জন্যই আমাদের দেশে বহুজাতিক কোম্পানি ও তাদের এক শ্রেণীর দালালেরা কৃষিকে ধ্বংস করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। অর্থ উপদেষ্টার বাজেট দেখে মনে হয় যেন তাদেরই হাতে এই বাজেট প্রণীত হয়েছে কোনো বিশেষ পক্ষকে খুশি করবার জন্য এবং গ্রামের মধ্যস্বত্বভোগী একটি নতুন শ্রেণী গড়বার জন্যই যেন এই বাজেট। এই বিষয়ে আরো আন্তরিকতার সঙ্গে পর্যালোচনার দরকার আছে। আমরা ধরে নেবো অর্থ উপদেষ্টাকে কেউ বুঝিয়েছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কৃষি ব্যবস্থাই একমাত্র ব্যবস্থা। তাঁর বাজেটে এই অনুমান প্রত্যক্ষভাবেই রয়েছে। তাঁকে এই অনুমান থেকে অবিলম্বে সরে আসতে হবে।

আমাদের বিজ্ঞানীরাই বলছেন যে বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের কিছু কিছু নিচু জমিতে বর্ষার পানি সরে যাবার পরপরই বোরো ধানের আবাদ করা হতো। বিশেষ করে বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং অন্যান্য জেলার নিচু জমিতে প্রকৃতিনির্ভর পরিবেশে বোরো ধানের আবাদ ছিল। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে রবি মৌসুমে ডাল, তৈলবীজ, গোল আলু, মিষ্টি আলু, মসলা, শাকসবজি এবং অন্যান্য ফসলের আবাদ ছিল। কিন্তু সেচনির্ভর উচ্চ ফলনশীল ইরি, ব্রি, বোরো ধান এবং গম প্রবর্তনের ফলে রবি মৌসুমে আগে যেসব ফসল প্রচলিত ছিল সেইসব ফসলের আবাদ আশংকাজনকভাবে কমে

গেছে। সেচের জন্য মাটির নিচের পানি তোলার ফলে পানি ও মাটিতে আর্সেনিকের পরিমাণ বেড়ে গেছে। দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে বর্তমানে ৬১ জেলায় আর্সেনিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। শুধু পানিতে নয়, খাদ্যশস্যের মধ্যেও এখন আর্সেনিকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এ অবস্থা ক্রমাগতভাবে চলতে থাকলে খাদ্যশস্যের মধ্যে আর্সেনিকের মাত্রা বাড়তেই থাকবে। এর ফল হবে মারাত্মক।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে উৎপাদন বাড়াবার নতুন পথ অন্বেষণ জরুরি। কৃষি পরিবেশের তথ্য সমৃদ্ধ আমাদের খাদ্যদ্রব্য আর্সেনিক বিষমুক্ত রাখার জন্য শস্যপঞ্জিকা প্রবর্তন ছাড়া উপায় নাই। কৃষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যাঁরা কাজ করেন সেইসব বিজ্ঞানীরাই পরামর্শ দিচ্ছেন যে প্রকৃতি ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কেবল নিচু জমিতে বোরো ধানের আবাদ হোক। সেখানে কীভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায় গবেষণা চলুক। অন্যদিকে এখন যে সমস্ত উঁচু জমিতে সেচনির্ভর বোরো ধানের আবাদ হচ্ছে তা বন্ধ করে আগে যেভাবে ব্যাপক প্রচলিত রবি ফসল যেমন খেসারী, মসুরী, ছোলা, গোল আলু, মিষ্টি আলু, সরিষা, পেঁয়াজ, রসুন, শাকসবজি ইত্যাদি উভয় থেকে ফসল তুলতে পারে। ফসল পেতে পারে। জমিকে অনাবাদি ফেলে রাখা নয়। বরং এমন এক কৃষি ব্যবস্থাপনা যাতে প্রাকৃতিকভাবেই যে সকল খাদ্য উৎপাদিত হয়ে তারা আবার ফসল চক্রে ফিরে আসতে পারে। এটাই eco-system approach to agriculture– বা প্রাণের সংস্থান ও প্রাণবৈচিত্র্য রেখে অত্যাধুনিক চাষাবাদ ব্যবস্থাপনা।

রবিশস্য করার সুবিধা হচ্ছে শস্য তোলার সঙ্গে সঙ্গে ঐসব জমিতে আউশ ধানের আবাদ করা যাবে। শস্য পঞ্জিকায় বর্তমানে বোরো ধান আবাদের উপর যে গুরুত্ব আছে তা কমিয়ে আউশ ধান আবাদের উপর জোর দিতে পারি আমরা।

পাটের কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ, মৌসুমে আউশ ধানের পাশাপাশি পাটের আবাদ চালু রাখার সম্ভাবনার কথাও বিজ্ঞানীরা বলেন। পাট শুধু বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলই নয়, কৃষি পরিবেশের ভারসাম্য ও ফসল চক্রের বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য পাটের কোনো বিকল্প নাই। ধান, গম এবং এ জাতীয় অন্যান্য ফসলের শিকড়ের পরিধি মাটির উপরের স্তরে সীমিত থাকে। বছরের পর বছর এসব ফসল আবাদের ফলে মাটির তলায় একটি শক্ত স্তর পড়ে। এ স্তরের নিচু জমে থাকা মাটির খাদ্য উপাদান ক্ষুদ্র শিকড় যুক্ত ফসলের কাজে আসে না। এ অবস্থায় ফসল চক্রে পাট চাষ করলে মাটির উর্বরতা বাড়ে। কারণ পাটের শক্ত এবং দীর্ঘ শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে। তলায় জমে থাকা খাদ্য উপাদান পাটগাছ সহজেই গ্রহণ করতে পারে। ফলে পাট ফসলে আলাদা কোনো সার দিতে হয় না। মাটির নিচের স্তরে জমে থাকা খাদ্য উপাদানেই পাটগাছ বেড়ে ওঠে। পাটগাছ মাটি থেকে যে খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে মাঠে দাঁড়ানো অবস্থায়ই তার শতকরা প্রায় ষাট ভাগ ঝরা পাতার সাথে মাটিতে ফিরিয়ে দেয়। কৃষি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে পাট ফসলের অবদান অপরিসীম। তাছাড়া

পাটের আঁশ অর্থকরী ফসল, পাটখড়ি জ্বালানির গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং পাট পাতা ভিটামিন ও প্রটিনসমৃদ্ধ শাক। সময় উপযোগী পাট নীতির মাধ্যমে চাষী পর্যায় পাটের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে। পাটের এই দিকগুলো সম্পর্কে যাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমি এখানে ধার নিয়েছি তিনি বিশিষ্ট পাট বিজ্ঞানী ডক্টর এম এ সোবহান। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পাটের কথাটা গুরুত্বপূর্ণ। এর আগের লেখায় আমি পাটকল শ্রমিকের অনাহারে মৃত্যুর কথা বলেছিলাম। পাট আমাদের জমি ও কারখানা থেকে চলে যাওয়া একটি ভয়াবহ ঘটনা। এর আগের যেসব সরকার বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে আমাদের সমূহ ক্ষতি করেছে আজ তারা কোথায়?

কৃষি গবেষণাকে অগ্রাধিকার খাত হিসাবে বিবেচনা করে ৩৫০ কোটি টাকার একটি 'এনডাউমেন্ট ফান্ড গঠনের প্রস্তাব' করা হয়েছে। এতে আমরা আনন্দিত নই। বরং আশংকিত। কারণ কোথায় কাকে কীভাবে অর্থ উপদেষ্টা এই টাকা দেবেন তা জানানো হয়নি। কারা এই ফান্ডের সিদ্ধান্ত নেবে? বলা হচ্ছে, একটি কোম্পানি গঠন করা হবে। কে থাকবে সেই কোম্পানিতে? তাছাড়া কোম্পানি কেনো গঠন হবে? কী হবে সেই কোম্পানির উদ্দেশ্য?

বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের বিকৃত (জিমও) বীজ ও বাণিজ্যক বীজ বাংলাদেশে প্রবর্তনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এটা তাদেরই পরিকল্পনা বলে মনে হয়। যদি না-হয় তাহলে কৃষি গবেষণার জন্য আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে। এই ফান্ড তো তাদেরই পাবার কথা। আলাদা কোম্পানি কেনো? কার গরু কার গোয়ালে যাচ্ছে? এই ফান্ড যদি কোম্পানির খাতে বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কায়কারবারে ব্যয় হয় তাহল সেটা মারাত্মক ক্ষোভের কারণ হবে।

কৃষির নজির দিয়ে আমরা দেখাতে চেয়েছি যে বাজেটের আলোচনা নিছকই সংখ্যা দিয়ে বা কোন খাতে কী ব্যয় হচ্ছে সেই হিশাবকেতাব দিয়ে আমরা বুঝবো না। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা তো বটেই এমনকি বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশল সংক্রান্ত যে সকল অনুমান ও নীতির ওপর এই ধারণা বাজেট প্রণয়ন করা হয় সেই অনুমান ও নীতির দিকে আমাদের নজর ফেরাতে হবে। আগের সরকারের বাজেটের তুলনায় এই সরকারের বাজেটে বিশেষ জেরজবর ভেদ নাই। তাহলে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার আর দুর্নীতিবিরোধী সরকারের মধ্যে কী পার্থক্য? যাকে বলি ডিম্ব তাকেই কয় আন্ডা!!

কৃষির প্রসঙ্গ ছাড়া ও সামগ্রিকভাবে এই বাজেটে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার যে অনুমান ও নীতি তার একটা নাম অর্থশাস্ত্রবিদরা দিয়েছেন। একে বলা হয় নিউ-লিবারেল ইকনমিক পলিসি। এর আক্ষরিক অনুবাদ দাঁড়ায় নব্য উদারনীতি। কিন্তু এই ধরনের মোলায়েম একাডেমিক ভাষায় এইসকল অনুমান ও নীতির মর্ম বোঝা যায় না। এটা আবার অর্থশাস্ত্রবিদরা বোঝেন। তাই তারা বোঝার সুবিধার জন্য একে বলেন নিউ কলোনিয়াল পলিসি বা নব্য উপনিবেশবাদী নীতি। এই অর্থে যে

এই নীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে ছোটো ও দুর্বল দেশের অর্থনীতি ধনী ও শক্তিশালী দেশের অধীন করে ফেলাই শুধু নয়, এই দেশগুলোতে আবার পুরানা ঔপনিবেশিক আমলের মতো কাঁচামাল ও সস্তায় শ্রমশক্তি জোগানদারের ভূমিকায় নামিয়ে আনা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর দৃশ্যমান পরিণতি হবে এইরকম যে একদিকে আমরা বিদেশি কোম্পানী বা বিদেশ থেকে আমদানি হয়ে আসা পণ্য কিনব এবং অন্য দেশের উৎপাদিত পণ্যের ভোক্তা হবো, অন্যদের পণ্যের বাজার হয়ে থাকবো আমরা। আর অন্যদিকে আমরা যদি জীবন ও জীবিকা অর্জন করতে চাই তাহলে সামনে একটি মাত্র পথই খোলা থাকবে : সস্তা দরে মজুর হওয়া–সস্তা-মজুরির দাসত্ব করা। অর্থনীতিবিদরা দাবি করেন যে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন বা তথাকথিত 'রপ্তানি খাত' এই নীতিতে যেভাবে অর্থনীতির ভারকেন্দ্র হয়ে ওঠে তার মধ্য দিয়ে নয়া ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার চরিত্র পরিষ্কার। একটি স্বাধীন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক উপনিবেশ কী করে গড়ে ওঠে তার উদাহরণ হচ্ছে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাত অঞ্চল। স্বাধীন দেশের স্বাধীন ভৌগোলিকতার মধ্যে আরেক ভূগোল— একটা দেয়াল ঘেরা উপনিবেশ।

১ আষাঢ় ১৪১৪। ১৫ জুন ২০০৭। শ্যামলী।

ভাবতে হবে, কিন্তু কীভাবে

কার্ল মার্কসের বন্ধু ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস মানুষ ও ইতিহাসের সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে বলেছিলেন, মানুষই ইতিহাস তৈরি করে– কিন্তু সেটা সে করে ইতিহাসের মধ্যে থেকে। এঙ্গেলস মানুষকে ইতিহাসের অধীন জ্ঞান করেই মানুষের সীমা ও সম্ভাবনার প্রস্তাব করছেন। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা হাজির করবার জন্য ইতিহাস মানুষের বাইরে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি হয়ে বিরাজ করছে এই প্রতিজ্ঞা না মেনে তাঁর উপায় ছিল না। যদি তাই হয় তাহলে ইতিহাসই কেবল ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে। সেই ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা কী? মানুষ কি ইতিহাসের কর্তা নাকি উপায় মাত্র? আর 'ইতিহাস' নামক এই রহস্যময় ব্যাপারটাই বা কী? এই তর্ক বহুদিনের। দার্শনিকরা এর মীমাংসা করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নাই। এঙ্গেলস প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর কথা অনেকটা এই রকম, মানুষ ইতিহাসের উপায় হবে, নাকি কর্তা হবে তা আগাম বলা মুশকিল। কারণ শেষাবধি তার সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষ বা বিশেষ শ্রেণী বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিকতার

বিকাশ এবং বিপ্লবী ইচ্ছাশক্তির প্রশ্ন জড়িত। এতে আমাদের সাময়িক সুরাহা হয়, কিন্তু দর্শনের আদালতে শেষ রায় দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। জ্ঞানের আপিল বিভাগে এই মামলা পেশ করলে বিচারকরা দেখি প্রায়ই 'বিব্রত' বোধ করতে থাকেন।

এঙ্গেলসের মুশকিলটা বুঝি। মানুষ যদি 'ইতিহাস' নামক অপ্রতিরোধ্য নিয়তির অধীনই হয় তাহলে 'বিপ্লব' কথাটার মানে কী? ইতিহাসকে মানুষের বাইরে ক্রিয়াশীল রহস্যময় নৈর্ব্যক্তিক শক্তি আকারেই যদি কেউ ভাবে তাহলে 'আল্লা', 'গড', 'ভগবান' বা 'ঈশ্বর' এই ধরনের শব্দচিহ্নের জায়গায় শুধু 'ইতিহাস' কথাটা বসিয়ে দিয়েই কি খালাস পাওয়া যায়? আল্লাই সবকিছুর নিয়ন্তা, সবকিছুর কর্তা ও কারণ একমাত্র তিনিই– সেইখানে যদি কেউ বলে বস্তুবাদী ইতিহাসই সব কিছুর নিয়ন্তা, ইতিহাসই সবকিছুর কারণ– তখন ধর্মতত্ত্ব আর এই ধরনের বস্তুবাদী বিপ্লবীতত্ত্বের মধ্যে বিশেষ জেরজবরের ফারাক হয় না। এই ধরনের রাজনীতি প্রসঙ্গে রসিকতা করে বলা হয় গির্জার পুরোহিত আর বামপন্থী দলের নেতার মধ্যে ফারাক কিছুই নাই–একজন খালি গলায় যীশুর ক্রস ঝুলিয়ে রাখেন, অন্যজন লাল বইয়ের মাদুলি।

এগুলো ঠাট্টা মশকরার কথা। কিন্তু ছোটখাট ঠাট্টা মশকরা নয়। এই ধরনের রসিকতার মধ্যে এঙ্গেলসকে যেন পড়তে না হয় তার জন্যই তিনি ইতিহাসের মধ্যে থেকেই মানুষ ইতিহাস তৈরি করে কথাটা বলেছেন, বলতে হয়েছে। ঐতিহাসিকতার মধ্যেই মানুষকে 'কর্তা' হিশাবে টেনে এনেছেন : মানুষ নিজেই ইতিহাস তৈরি করে কথাটা ঠিক– কিন্তু মানুষ যেহেতু ইতিহাসের বাইরে বাস করে না, অতএব ইতিহাসের মধ্যে থেকেই তাকে ইতিহাস সৃষ্টি করতে হয়।

আমার লেখালেখি সম্পর্কে কেউ কেউ মন্তব্য করছেন যে বাংলাদেশ খুবই খারাপ একটি সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে এটা তাঁরা বুঝতে পারেন, বোঝেন। কিন্তু এতো মন্দ ও হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যে আমি আবার এতো আশাবাদ কোথায় পাই? তাঁদের খানিক খামোশ রাখার জন্যই এঙ্গেলসের কথাটি মনে পড়লো। হ্যাঁ। বাংলাদেশকে যদি নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসের জায়গা থেকে দেখি তাহলে আমরা ভয়াবহ বিন্দুতে এসে ঠেকেছি। কিন্তু এখনকার বাস্তবতার মধ্যেই বাংলাদেশকে ইতিহাস তৈরি করতে হবে। এই মিনতিটুকুই আমি বারবার করে যাচ্ছি।

পলাশির যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যে দুইটি লেখা লিখেছি তার মূল সুর এটাই। বর্তমানকে অর্থপূর্ণ করবার ক্ষেত্রে অতীত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানান ইশারা ইঙ্গিত করতে সক্ষম। সেই ইশারা-ইঙ্গিতগুলো বুঝলে আমরা আমাদের কর্তব্যটুকুও বুঝবো। সেইভাবে এই যুদ্ধকে পাঠ করবার চেষ্টা করেছি। ইশারা ও ইঙ্গিত কেন্দ্র করে সমাজে যে চিন্তা, প্রতিক্রিয়া ও নতুন ভাবনার উন্মেষ ঘটছে তা খানিক দানা বাঁধুক। সময়মতো আবার এই সকল প্রসঙ্গে পাঠকের কাছে ফিরে আসবো।

বর্তমান অবস্থা থেকে 'প্রস্থান' করবার যে পথ নিয়ে কথা তুলেছি— যেমন, গাঠনিক শক্তির সন্নিবেশ ঘটাবার অনিবার্য দরকারে 'অন্তর্বর্তীকালীন' সরকার (জাতীয় সরকার নয়) সংক্রান্ত ধারণা— ইত্যাদি নানান বিষয় নিয়ে অনেক কিছুই বলার আছে। তদুপরি বাজার গরম, সকলেই সংস্কার প্রস্তাবের প্রেসক্রিপশান বগলে বগলে নিয়ে ফেরি করছে। আমি সংস্কারবাদী নই। বরং নানা কিসিমের সংস্কারবাদীদের ঘোরতর বিপক্ষেই আমার অবস্থান। অতএব ঝুটঝামেলাগুলো কমুক। টাউট-টন্নিদের কোলাহল থামুক। এইসব বাজে জিনিস ও আবর্জনা সাফ হয়ে যাবার কথা ছিল। হয়নি। এখানেই এই সরকারের সদিচ্ছার ব্যাপারে আমার ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। এরা জোড়াতালি দিয়ে এখন নিজেদের গা বাঁচানোর চেষ্টা করছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য আজ তারা বাংলাদেশের নিরাপত্তাকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিতে পারে– এটাই আমার প্রধান উদ্বেগ।

ইতোমধ্যে আমরা ভাবনা শুরু করতে পারি, বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো কী? কোন্ কোন্ প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠ চিন্তা শনাক্ত করা জরুরি? কীভাবে দলবাজি ও দলীয় আনুগত্যের ঊর্ধ্বে উঠে সামষ্টিক স্বার্থের জায়গায় দাঁড়িয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে আলাপ-আলোচনা তকবিতর্ক করবার সুযোগ করে দেবো আমরা? কীভাবে আমরা বোঝাবো যে তর্ক, মতপার্থক্য, চিন্তার বিরোধ একটি দেশের জন্য মোটেও খারাপ বা মন্দ তো নয়ই, বরং একটি জনগোষ্ঠীর এটাই প্রধান প্রাণশক্তি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে চিন্তা ও মতের পার্থক্যের পরেও এমনকি সাময়িক স্বার্থের বিরোধ থাকলেও সমষ্টিকে ধারণ করবার রাষ্ট্রীয়, প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলবো আমরা? জাতীয় ঐক্যের স্থানগুলো শনাক্ত করবো? আভ্যন্তরীণভাবে চিন্তার পার্থক্য আমরা চাই, কিন্তু পরাশক্তির উসকানি বা পরামর্শে বিভেদ, বিভক্তি ও দলবাজির রাজনীতি আমরা চাই না। সংখ্যাগরিষ্ঠের বুদ্ধি, বিচার ও প্রজ্ঞার শক্তির ওপরই রাষ্ট্র ও নাগরিক উভয়কেই দাঁড়াতে হবে।

কথাগুলোর মানে কী? 'ধর্ম নিরপেক্ষতা'-র প্রশ্নটি নিয়েই ব্যাপারটা খানিক খোলাসা করা যাক আজ। প্রণব মুখার্জি ও শিবশংকর মেননের ছুটাছুটিতে যেটা আমরা বুঝছি ভারত বাংলাদেশে তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনীতির জয় হোক চাইছেন। তাঁদের পছন্দের দলকে ক্ষমতায় বসানোর কোশেসও তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতের আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ ও ইচ্ছা অনুযায়ী বাংলাদেশকে সাজিয়ে নেয়ার উদ্যোগ ও তৎপরতাও আমরা লক্ষ করছি। একে আমরা মোকাবিলা করবো কী করে?

ভারত বাংলাদেশে যদি একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাইত তাহলে ভারতের সঙ্গে এই বিষয়ে বন্ধুত্বমূলক আলাপ-আলোচনা হতে পারতো। তখন ভারতেরই বহু চিন্তাশীল মানুষ আমাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েই বলতেন যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের

ধারণা একটি ইউরোপীয় ধারণা এবং খ্রিস্টীয় ধর্ম ও চার্চের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসের সঙ্গে 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গী জড়িত। অর্থাৎ ইতিহাসের প্রহসনই বলতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার ইতিহাসে ধর্ম কখনই নিরপেক্ষ ছিল না। এখনও নাই। চার্চ ছিল বিপুল ধনসম্পত্তি ও জমির মালিক। কাজে কাজেই চার্চ একই সঙ্গে ছিল সামন্ত ব্যবস্থার প্রতিভূ। অতএব ইউরোপে যখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটলো তার অন্তর্গত দাবি হিশাবে গির্জা ও পুরোহিতদের ক্ষমতাকে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে আলাদা করবার দাবিও উঠল। ন্যায্যতই। ঠিক আছে, কাজটি হয়েছে এবং খারাপ হয়নি। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে সব দেশকে ইউরোপের মতো হতে হবে। মসজিদ আর চার্চের ইতিহাসও আলাদা। তাছাড়া এমন তো নয় যে ইউরোপ বা পাশ্চাত্য দেশগুলো থেকে সব চার্চ উঠে গিয়েছে এবং রাষ্ট্রে ও সমাজে তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হ্রাস পেয়েছে। বরং উল্টাটা হয়েছে। তার মানে সমাজে, সংস্কৃতিতে ধর্মের ভূমিকার একটা ঐতিহাসিক রূপ ইউরোপে আমরা দেখেছি—কিন্তু একেই আদর্শ গণ্য করবার কোনো যুক্তি নাই। এই বিষয়ে আরো তর্ক বিতর্ক, আরো অন্বেষণ এবং আরো বিকশিত পথের সন্ধান নেওয়াই বরং এখন কাজ।

ধর্মনিরপেক্ষতা কোন্ রাষ্ট্র কীভাবে পালন করছে সেইসব বিষয়ে বিস্তর সাংবিধানিক ও আইনি তর্কবিতর্ক আছে। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হবে কি হবে না সেটা একান্তই বাইরের তর্ক। বহিরঙ্গের খবর— রাষ্ট্রের রূপবিচার- মর্মের বিচার নয়। ইউরোপ ধর্মনিরপেক্ষ হলেও ইউরোপের আপাদমস্তকে খ্রিস্টীয় চিন্তা, সংস্কৃতি ও জীবন যাপন বিদ্যমান। এটাই ন্যায্য— কারণ ইউরোপের জনগণ যেভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে চায় তারা সেভাবেই পালন করছে, ধর্মের ব্যবহার (অপব্যবহারও) হচ্ছে সেই ভাবেই। খ্রিস্ট ধর্মকে তারা শুধু ধর্মতত্ত্ব হিশাবে নয়, চিন্তা ও দর্শনের ভিত্তি, খোরাক বা উপাদান হিশাবে ব্যবহার করেছে এবং করছে। তার বহু ভালো দিক আছে- আমরা গ্রহণ করলে আমাদেরই নগদ লাভ। তেমনি বহু মন্দ দিকও আছে। তাহলে আমাদের দরকার বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করবার ক্ষমতা অর্জন। তোতাপাখির মতো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রই রাষ্ট্রের জন্য শেষ কথা- এই ধরনের তর্ক বাজে, বিভেদমূলক চিন্তা অতিশয় নিম্নস্তরের চিন্তা।

ভারত কাগজে কলমে ধর্মনিরপেক্ষ হলেও এই রাষ্ট্রে মূলত উচ্চ বর্ণেরই আধিপত্য ও দাপট। যেখানে দলিত, আদিবাসী, অহিন্দুরা নিপীড়িত ও নির্যাতিত। সেই কারণেই বলা হয় ভারত ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্র। একথা সত্যি কিন্তু এর অসম্পূর্ণ দিকটা হলো এই যে সংবিধানে, আদালতে, আইনে বা বিধানে ভারতে দলিত ও অহিন্দুদের পক্ষে যে চেষ্টা আছে আমরা তাকে উপেক্ষা করতে পারি না। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমাদেরই শেখার আছে। গুজরাটের মতো ভয়াবহ দাঙ্গার ঘটনার পরেও। হিন্দুত্ববাদের যে রাজনীতি আমরা ভারতে দেখছি তা মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদ। ভারত যদি সত্যি সত্যিই 'হিন্দু' রাষ্ট্র হতো তাহলে বাংলাদেশের

জনগণের বিশেষ অসুবিধাও ছিল না। কারণ সিন্ধু নদী ও তার অববাহিকার সভ্যতার উত্তরাধিকার হিশাবে হিন্দুস্তানের আমরাও শরিক। মুঘলদের দেওয়া নাম। গণতান্ত্রিক হিন্দুস্তান যদি উপমহাদেশে সত্যি সত্যিই গড়ে উঠত তাহলে আলাদা রাষ্ট্র হিশাবে পাকিস্তান, বাংলাদেশ গড়ে উঠত কিনা সন্দেহ। বাংলাদেশ হিন্দুস্তানেরই অংশ হয়ে থাকতো। কিন্তু হিন্দুস্তান মুঘল বা মুসলমানদের দেওয়া নাম হওয়ায় তার ঐতিহাসিকতা সত্ত্বেও এই নাম ভারত গ্রহণ করেনি। ভারতের শাসক শ্রেণীর মনের গঠনটা আমাদের অতএব বুঝতে হবে, ভুলে গেলে চলবে না। নাম ও ধারণা হিশাবে 'ভারত' আর 'হিন্দুস্তান' অনেক আলাদা। ফারাক আসমান আর জমিন। এই যে যা— কিছু ইসলাম বা মুসলমানদের সঙ্গে যুক্ত তাকে ভারতের গ্রহণ করতে অসম্মতি ও আপত্তি— ইসলাম যে এই উপমহাদেশেরই ইতিহাস সেই ইতিহাসকে যোগ্য স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের অনীহা— ঠিক এখানেই ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিরোধ মৌলিক। ঠিক এই কারণেই বাংলাদেশকে শুধু নিজের কারণে নয়, ভারতকে ইতিহাসের শিক্ষা দেবার জন্যই অবশ্যই টিকে থাকতে হবে— টিকিয়ে রাখতে হবে। এই বিরোধকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে না।

এই দিকগুলো যদি আমরা বুঝি তাহলে সস্তা ভারতবিরোধী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে আমাদের সরে আসতে হবে। কিন্তু এটা সম্ভব না হবার প্রধান কারণ হচ্ছে ভারত ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে প্রধানত বাংলাদেশকে ইসলামশূন্য বা ইসলাম থেকে বাংলাদেশের জনগণকে মুক্ত করাই বোঝে। যে কারণে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের গণমাধ্যমের ক্রমাগত বিষাক্ত অপপ্রচার আমরা দেখি। এই দেশে তাদেরই তল্পিবাহক 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী'দের ধৃষ্টতা দিনের পর দিন একটি দুর্বল দেশ হিশাবে আমাদের সহ্য করতে হয়। বাংলাদেশ মৌলবাদী হয়ে গিয়েছে, বাংলাদেশে জঙ্গী ইসলামীদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে– এই তীব্র প্রচার চালিয়ে ভারত বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ (failed state) বা অকার্যকর রাষ্ট্র (dysfunctional state) পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশের ভেতরে যারা এই প্রচারগুলো চালায় তাদের সঙ্গে ভারতীয় সংযোগগুলো পরখ করলেই আমরা বাংলাদেশে ভারতের ইচ্ছাটা ধরতে পারব। এগারো জানুয়ারির ঘটনা ঘটে যাবার পর দেখেছি ভারত-মার্কিন-ইসরায়েলি অক্ষশক্তি বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দলকেই ক্ষমতায় আনবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবে তারা প্রবল প্রচার চালাচ্ছে যে বাংলাদেশে 'মৌলবাদী' ইসলামী গোষ্ঠী ক্ষমতায় এসে যাচ্ছে। এটা ঠেকাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের অবিলম্বে ক্ষমতায় আনা। সেটা সম্ভব যদি অবিলম্বে নির্বাচন দেওয়া যায়।

এই সরকারকে দিয়ে যদি বাংলাদেশে ভারতীয়, ইসরায়েলি ও মার্কিন কক্ষপুটে লালিত পালিত ধর্মনিরপেক্ষতাবদী গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসানো যায়

তাহলে ভারতের লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। যদি এই শক্তি টিকে যায় তাহলে বাংলাদেশের জনগণের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে বিজয় নিশ্চিত করা সহজ। যদি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ বা লড়াই-সংগ্রাম হয় তাহলে অতি অনায়াসে তাকে ইসলামী জঙ্গী বা মৌলবাদীদের কাণ্ড বলে নাকচ করা শুধু নয়— একই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের অংশ হিশাবে ব্লু হেলমেট বা শান্তি মিশন বসানোর দিকে নিয়ে যাওয়াও কঠিন কোনো কাজ হবে না। পরিণতি যাই দাঁড়াক ভারত ও ইসরায়েলি স্বার্থের জন্য এই পথটিই অনুকূল। এই পথে জিতের সম্ভাবনা, হার নাই।

আমি ভারতের পররাষ্ট্র নীতি আলোচনা করতে বসি নি। সেটা অন্য বিষয়। আরো তথ্য ও পর্যালোচনার দাবি রাখে। বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ভাবা বলতে আমি কী বোঝাচ্ছি তারই একটা নজির হিশাবে ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ে দুই এক কথা বলেছি। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন তাহলে নিছকই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাই কি চাই না, কিম্বা ধর্মীয় সহনশীলতার প্রশ্নও নয়। মূলত বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তারও প্রশ্ন। বাংলাদেশ আদৌ টিকে থাকবে কি থাকবে না তার সঙ্গে সরাসরি এই ধরনের তর্ক জড়িত।

পাঠককে নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার নাই যে একই কারণে এই তর্ক ইসলামপন্থী বনাম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের তর্কে পর্যবসিত করাও আমাদের ইচ্ছা নয়। ইসলামপন্থীদের ক্ষমতায় বসানোর তর্ক নয়, বা তাদের মোকাবিলার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার চিৎকার জুড়ে দেওয়া নয়– বরং ইসলাম প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসা। ইসলাম এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনে কী ভূমিকা রাখছে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে আগামী দিনে তার ভূমিকা কী হবে সেই প্রশ্নের বিচারও আমাদের প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু।

১৮ আষাঢ় ১৪১৪। ২ জুলাই ২০০৭। আরশিনগর। ঈশ্বরদী

মানবাধিকার ও আইনী প্রক্রিয়ায় বিচার

পত্রপত্রিকায় সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আমি লিখি। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লেখালিকে দৈনিক পত্রিকার ভাষায় 'কলাম' বলা হয়। তথ্য, বিশ্লেষণ ও তত্ত্ববিচার এই ধরনের লেখায় গৌণ ভূমিকা পারন করে। কিন্তু শক্তিশালী 'কলাম' লেখকদের গুণ হচ্ছে তাঁরা এই তিনের মিলন ঘটাতে পারেন এবং সহজভাবে সমসাময়িক ঘটনাঘটনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কর্তব্যের দিকটা এমনভাবে

তুলে ধরেন যাতে সমাজে নতুন রাজনীতির সম্ভাবনা তৈরি হয়। বলাবাহুল্য যাঁরা লেখালিখি করেন তাঁরা কোনো না কোনো শ্রেণী বা স্বার্থের পক্ষেই লেখালিখি করেন। যদি শ্রেণীবিচার আমাদের পঠনপাঠন পদ্ধতির অন্তর্গত বিষয় হয় তাহলে বিশেষ সমাজে ও বিশেষ বিশেষকালে বিভিন্ন শ্রেণী কিভাবে মতাদর্শিক লড়াই-সংগ্রাম চালায় তার একটা ছবি আমরা পত্রপত্রিকায়— বিশেষত কলাম লেখকদের লেখালিখির মধ্যেও ধরতে পারি। তথাকথিত 'বুদ্ধিজীবী'-রা ঘটনাঘটন কেন্দ্র করে যে ধরনের রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেন সেখানেও তাঁদের চেহারাটা আমরা ধরতে পারি। এতে লাভ বৈ ক্ষতি নাই।

লেখালিখি ইতিহাসের মধ্যে নতুন চিন্তা বা নতুন সম্ভাবনা শনাক্ত করবার জন্য। পাঠকদের কাছে তারই একটি পরীক্ষা দেবার জন্য খাঁটি লেখকরা উদগ্রীব থাকেন। কারো পক্ষে বা বিপক্ষে লিখবার জন্য নয়। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লেখালিখির সীমাবদ্ধতা আছে, মানতেই হবে। তাছাড়া সমসাময়িক ঘটনার মধ্যে আসলে নতুন কি উপাদান তৈরি হচ্ছে তা ধরতে পারা সহজ কাজ নয়। 'জরুরি অবস্থা'–র মধ্যে যতোটা পেরেছি লিখেছি। অনেক সময় সহজ কথা সহজভাবে বলতে পানি নি 'জরুরি অবস্থা'-র জন্যই। এখন, ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের সঙ্গে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ পরিস্থিতি অস্তিতিশীল করে তুলেছে। প্রাণ খুলে বলা এখন আরও বিপজ্জনক।

অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের বলে যে দমনপীড়ন কখনই রাজনৈতিক বিষয়ের রাজনৈতিক মীমাংসার দিকে নিয়ে যায় নি— আরো সংঘাত ও সংঘর্ষের দিকেই দেশকে ঠেলে দিয়েছে। এটা সত্যি যে বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগ নেবার জন্য রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক উভয় প্রকার শক্তিই সচল হয়ে উঠেছে, কিন্তু এটাই তো হবার কথা। ভাংচুরের ঘটনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্র বা বিক্ষুব্ধ জনতার দ্বারা হয়েছে মনে করার কারণ নাই, কিন্তু এতে রাজনৈতিক বাস্তবতার কিছুই হেরফের হয় না। বরং এই পরিস্থিতিতে জনগণের রাজনৈতিক বিবেচনার ওপর আস্থা রাখা ছাড়া সহজ কোনো পথ নাই।

সরকার বিপুল সংখ্যক ছাত্র এবং কয়েকজন শিক্ষককেও গেফতার করেছেন। গ্রেফতারের মধ্যে ছাত্রনেতাও আছেন। যদি আশি হাজার বা মতান্তরে পঞ্চাশ হাজার ছাত্রজনতাকে গ্রেফতার করা হয় তাহলে সরকার নিজেই প্রমাণ করছেন বিপুল সংখ্যক মানুষ বিক্ষুব্ধ এবং প্রতিবাদী। 'অপশক্তি' এতো বিপুলসংখ্যক মানুষকে এতো তাড়াতাড়ি বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে প্রমাণ করা মুশকিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে মানবাধিকার ও যথাযথ আইনী প্রক্রিয়ায় অভিযুক্তদের সুবিচার পাওয়ার অধিকার সমুন্নত রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর আজ আমরা বিশেষভাবে জোর দেব।

সরকার পাঁচজন শিক্ষককে গ্রেফতার করেছেন এবং আইন-বহির্ভূতভাবে তাঁদের আদালতে হাজির না করে অজ্ঞাত স্থানে রেখেছিলেন। শিক্ষকরা হলেন ড.

আনোয়ারা হোসেন, ড. হারুন-আর-রশীদ, অধ্যাপক সাইদুর রহমান, অধ্যাপক আব্দুস সোবহান এবং অধ্যাপক মলয় ভৌমিক। এই ধরনের ঘটনায় মানবাধিকার লংঘন ও আইনী প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করার দিক তো আছেই, কিন্তু সরকারের এই প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিকভাবে সরকারের মর্যাদা বাড়িয়েছে কি? ইতোমধ্যেই যাঁরা গ্রেফতার হয়েছেন তাঁদের মানবাধিকার রক্ষিত না হওয়ার কারণে আন্তর্জাতিকভাবে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ শুরু হয়েছে। যাঁরা গ্রেফতার হয়েছেন, তাঁরা সম্মানিত শিক্ষক— শিক্ষকের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে কিনা সেই ব্যাপারেও কথা উঠছে।

শিক্ষকদের গ্রেফতার প্রশ্নে অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের বক্তব্যের সঙ্গে মানবাধিকার কর্মী হিশাবে একদমই একমত হওয়া যায় না। সত্যি কথা বলতে কি তাঁর বক্তব্য অনেককেই বিস্মিত করবে। মানবাধিকার ও সুনির্দিষ্ট আইনী প্রক্রিয়ার অধীনে সুবিচার পাওয়ার আন্তর্জাতিক নীতির সঙ্গে তিনি জাতীয় রাজনীতির গোলমাল পাকিয়ে ফেলেছেন। দেশের আভ্যন্তরীণ সংকটে তাঁর অবস্থানের সঙ্গে নীতিগত অবস্থানের পার্থক্য একসূত্রে গেঁথে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন, ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ কেন্দ্র করে উদ্ভূত ঘটনাবলিতে "শিক্ষক সমিতির প্রতিবাদ সংগত হয়েছে। তবে সমিতির বক্তব্য ঘটনার প্রতিবাদ অতিক্রম করে রাজনৈতিক অবস্থান সূচিত করেছে"। (দেখুন, 'প্রথম আলো' ২৫ অগাস্ট ২০০৭) অথচ তিনি আবার স্বীকার করেছেন যে "শিক্ষক সমিতির পক্ষে এই ধরনের রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ নতুন নয়, অতীতেও এমন হয়েছে"।

শিক্ষকদের গ্রেফতারকে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান মানবাধিকার বা আইনী প্রক্রিয়ার সুবিচার পাওয়ার মধ্যে নির্দিষ্ট না করে তিনি নিজেই তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়া শুরু করেছেন। আশ্চর্য যে তাঁর আপত্তি যে শিক্ষকরা 'রাজনৈতিক অবস্থান সূচিত করেছেন'। শিক্ষকরা কী বলবেন না বলবেন সেটা তাঁদের রাজনৈতিক অধিকার। এর দায়দায়িত্বও তাঁদের। শিক্ষকরা যদি 'তাঁদের বক্তব্যে 'রাজনৈতিক অবস্থান' সূচনা করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে ড. আনিসুজ্জামানের এখন আপত্তিটা কীসের? তাঁর আপত্তিটাও রাজনৈতিক নয় কি? তিনি কি বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করার পক্ষের লোক? 'জরুরি অবস্থা'-র বিধিনিষেধ শিক্ষকরা মানতে পারেন, কিম্বা নাও মানতে পারেন। সেই সিদ্ধান্ত নেবার রাজনৈতিক অধিকার শিক্ষকদের আছে, এটা মানতেই হবে। সরকারেরও অধিকার আছে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার। রাজনীতির জন্য রাষ্ট্রের রোষানলে কেউ পড়বেন কি পড়বেন না সেটা নাগরিকদের যার যার নিজেরই সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্তের অধিকারের প্রতি আমরা নিঃশর্তভাবে সমর্থন করি। তাঁদের রাজনীতির ঘোর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষকদের এই অধিকার সমুন্নত রাখার পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোই এখনকার কাজ।

মনে রাখা দরকার, অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের রাজনীতি গ্রেফতার হয়ে যাওয়া শিক্ষকদের দলবাজিতা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। অবশ্য আজকাল তিনি তাঁর

অবস্থান বদলিয়েছেন কিনা বলতে পারব না। রাজনীতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মোকাবিলার ক্ষেত্র, পথ ও পদ্ধতি আলাদা। সরকারের চরিত্র যাই হোক এই ক্ষেত্রে এবং এই সময়ে তার বিচারও অপ্রাসঙ্গিক। মূল প্রশ্ন হচ্ছে সরকার বা রাষ্ট্র যখন কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে ইচ্ছা করে তখন সরকার বা রাষ্ট্র মানবাধিকার ও আইনী প্রক্রিয়া মেনে চলছে কিনা সেটাই এখন আমাদের দেখার বিষয়। পাঁচজন শিক্ষক কী বলেছেন বা বলেন নি, সেই রাজনৈতিক বিচার হবে সময়মতো। কিন্তু তাঁদের রাজনীতির পক্ষে দাঁড়ানো বা বিপক্ষে কথা বলার সময় এটা নয়। কারণ মানবাধিকার আর আইনী প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নাগরিকের সুবিচার পাওয়া এবং সংবিধানে প্রদত্ত ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে প্রাপ্য অধিকারের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে। এই 'অধিকার' প্রতিষ্ঠা করাই এখন আমাদের প্রধান কাজ। এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা গণমানুষের স্বার্থবিরোধী ধারার বিরুদ্ধে আরো শক্তি নিয়ে লড়তে পারব। শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীসহ প্রতিটি নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষার পক্ষে থাকাই এখনকার প্রধান কাজ। দল মত ধর্ম বিশ্বাস নির্বিশেষে নিঃশর্তে কারা মানবাধিকার ও আইনী প্রক্রিয়ায় বিচারের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে সেই অবস্থান দিয়ে আমরা এখন গণতন্ত্রের শত্রুমিত্রকেও চিনতে পারব।

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান বলেছেন যে অতীতেও শিক্ষক সমিতি এই ধরনের রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেছে। অন্ধ দলবাজি আর রাজনীতির মধ্যে ড. আনিসুজ্জামান কোনো পার্থক্য করছেন না, বোঝা যাচ্ছে। শিক্ষক সমিতির অন্ধ দলবাজি এবং জাতীয় বিভাজন ও বিভক্তির বিষবাষ্প চর্চা আদৌ রাজনীতি ছিল কিনা প্রশ্নসাপেক্ষ। শিক্ষক হয়েও নিজ দলের পক্ষে অনেকে সংঘবদ্ধ মাস্তানি করেছেন। গণতান্ত্রিক রাজনীতি বা আচার-আচরণের মধ্যে থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শিক্ষক সমিতির সংকীর্ণ পরিমণ্ডলে ব্যস্ত শিক্ষকরা আদৌ নজর রেখেছেন কিনা কিম্বা তাঁদের অন্ধ দলবাজির জন্য আদৌ নজর রাখতে তাঁরা সক্ষম কিনা সেটা তর্কের বিষয়। আমরা শিক্ষকদের রাজনীতির পক্ষে, কারণ রাজনীতিই আমাদের মুক্তির পথ দেখাতে পারে। রাজনীতিহীনতার এই সময়ে কথাটা সরবে প্রচার দরকার। কিন্তু রাজনীতি আর দলবাজিকে আমরা সমার্থক গণ্য করি না। শিক্ষকরা দলবাজি করেছেন তাঁদের চাকুরির সুবিধা আদায়ের জন্য। ব্যক্তিগত সংকীর্ণ স্বার্থকে তাঁরা রাজনীতির পোশাক পরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও মুক্তচিন্তা চর্চার ক্ষতি করেছেন। নিজেদের 'সাদা' দল, 'নীল' দল ইত্যাদি ভাগে ভাগ করেছেন। সেই সকল তর্ক আমরা মানবাধিকারবঞ্চিত শিক্ষকদের বন্দী রেখে এখন করা অন্যায় মনে করি। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সেই বিভাজন ও বিভক্তির রাজনীতির একজন প্রধান পুরুষ। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক দুর্দশার বিচার যখন আমরা করি তখন

অধ্যাপকদের ভূমিকার বিচারও আমাদের করতে হয়। তার নাম সেখানে উজ্জ্বলভাবেই হাজির আছে।

যেসব দুর্নীতবাজ ও লুটেরাদের এই সরকার বন্দী করেছে তাদের অনেকের সঙ্গে শিক্ষকদের আর্থিক দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক খুবই লজ্জার এবং ন্যক্কারজনক। অর্থলোভে লোভী শিক্ষকরা শুদু দলের তোষণ করে নি, সরকারে তোষামদি করে নিজেদের স্বার্থ জারি রেখেছে। কনসালটেন্স বা অন্যান্য ব্যবসাবাণিজ্যের কথা কীইবা আর বলব। শিক্ষকরা তরুণদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা হারিয়েছে অনেক আগেই। ফলে, ছাত্রছাত্রীদের সত্যিকারের আন্দোলন-বিক্ষোভ শিক্ষকদের দ্বারা প্রণোদিত হবার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে। ছাত্রদের দলবাজি ও মাস্তানিতে ব্যবহার করবার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের প্রতিভা আমরা দেখেছি, কিন্তু গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিকাশের ক্ষেত্র শিক্ষকদের ভূমিকায় প্রচণ্ড ধস নেমেছে বহুদিন থেকেই।

স্পষ্ট যে অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান শিক্ষকদের রাজনৈতিক অবস্থানের বিরুদ্ধে সরকারি অবস্থানের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। এই অধিকার তাঁর আছে বলে মানি। সেই অবস্থান সমর্থন করতে গিয়ে তিনি শিক্ষকদের যে দোষে অভিযুক্ত করেছেন সেখানে তিনি অর্ধেক সত্য বলেছেন। তাঁর মন্তব্যে মনে হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন শিক্ষক সমিতির মধ্য দিয়ে সক্রিয় একটি বিশেষ ধারার রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। অথচ কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এর দুটো মারাত্মক বিপদের দিক আছে। একটি দিক হচ্ছে এই মন্তব্য ছাত্রছাত্রীদের ন্যায় সঙ্গত অবস্থানকে যেমন হেয় করবে তেমনি গ্রেফতার হওয়া শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যাবে এমন একটা সময় যখন আমরা নাগরিকদের মানবাধিকার ও আইনী প্রক্রিয়ায় বিচার নিশ্চিত করতে পারছি না। দ্বিতীয় বিপদ হচ্ছে সরকারকে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত করা হবে। ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের মধ্যে যে দিকটা গণতান্ত্রিক ও ইতিবাচক সেই দিকটা সরকার যেন গ্রহণ করে এবং আগামী দিনে সরকারি নীতি ও পদক্ষেপ যেন ইতিবাচকভাবে অগ্রসর হতে পারে সেটাই আমাদের কাম্য। যদি আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করি যে পুরো ঘটনাই ঘটিয়েছে এক অদৃশ্য অপশক্তি– তাহলে আমাদের সকলের কপালেই দুঃখ আছে।

সত্যি কথা হল, শিক্ষক সমিতির কথায় ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ-আন্দোলন শুরু হয় নি। ঠিক সেই এই কারণেই শিক্ষক সমিতি তাদের হল ছেড়ে যেতে বললেও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের কথায় হলে থেকে যায় নি। এটা ড. আনিসুজ্জামান স্বীকার করেছেন। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা জিমনাশিয়াম থেকে ক্যাম্প প্রত্যাহারের ঘোষণা ও বিচারবিভাগীয় তদন্তের কথা শুনবার পর সরকারি নির্দেশ মেনেছে। কিম্বা তাদের আন্দোলনের ওপর অন্য শক্তি ভর করবার আঁচ করতে পারে টের পেয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করা সঙ্গত মনে করেছে। অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান বলেছেন, "সান্ধ্য আইন জারির পর ছাত্রছাত্রীদের হলত্যাগের

নির্দেশ অমান্য করতে যদি শিক্ষক সমিতি আহ্বান জানিয়ে থাকে তা যথার্থ হয় নি"।

কেন? রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এখানে কূটতর্কের সুযোগ নাই। যেমন সরকার হলত্যাগের নির্দেশ দিলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার কি একদমই নাই? ছাত্রদের নিরাপত্তার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের একটা রাত থাকবার কথা বলতেও পারেন। দোষ কি? শিক্ষকরা যদি মনে করেন যে ছাত্রছাত্রীরা অল্প সময়ে নিরাপদে অন্যত্র হল থেকে সরে যেতে পারবে না, তাহলে তো তাঁরা হল ছেড়ে যেতে ছাত্রদের নিষেধ করতেই পারেন। প্রশ্ন হল শিক্ষকরা কি সরকারি নির্দেশ অমান্য করবার জন্য ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন, নাকি ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি আইনী প্রক্রিয়ায় সুবিচারের কথা ওঠে তাহলে এই প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। আমাদের আপত্তি একজন শিক্ষক হয়েও ড. আনিসুজ্জামান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এমন একটা অবস্থান নিয়েছেন যাতে মনে হয় শিক্ষকরা শুধু উস্কানি দেবার জন্যই ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন।

সবচেয়ে আপত্তির যে তিনি কথাটা বলেছেন 'যদি' কথাটার অধীনে। 'যদি' আবার কি? হয় শিক্ষকরা ছাত্রদের হল ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন, অথবা করেননি। ড. আনিসুজ্জামান যদি এই বিষয়ে নিশ্চিত না হন তাহলে তাঁর উচিত ছিল শিক্ষকদের নিরাপত্তার স্বার্থে এই ধরনের অভিযোগ না তোলা। যার পরিণতি শিক্ষকদের মানবাধিকার রক্ষা ও আইনী প্রক্রিয়ার সুবিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা ও বিপদের কারণ হতে পারে। এখন ড. আনিসুজ্জামানের 'যদি' কথাটির তদন্ত ও মীমাংসা কি করে আমরা করবো? কারা করবে? কার তদন্তের ওপর তিনি এখন আস্থা রাখবেন?

হল ছাড়া না ছাড়ার প্রশ্নটি যে নিছকই সরকারি নির্দেশ মানা না মানার ব্যাপার নয়, বরং ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত— এই সত্য ড. আনিসুজ্জামান অস্বীকার করবেন কীভাবে? ছেলেরা অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ি পৌঁছাতে পারেনি। তাদের অনেককে আজিজ মার্কেটসহ অন্যান্য স্থান থেকে গ্রেফতার করে চালান দেওয়া হয়েছে। তাদের মারধোর ও নির্যাতন করা হয়েছে। যার খবর বিবিসি ফলাও করে দেশে বিদেশে প্রচার করেছে। এই ছাত্রদের দায়দায়িত্ব এখন কে নেবে? ড. আনিসুজ্জামান বলেছেন, "ছাত্রছাত্রীরা যদি নির্দেশ অমান্য করে হলে থেকে যেতো এবং পরিণামে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হয়রানির শিকার হতো, তার দায়িত্ব কে বহন করতো? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার আশপাশে এই রকম হয়রানির ঘটনা যে ঘটেছে, তা তো আমরা জানতেই পারছি"।

ড. আনিসুজ্জামান যদি আশপাশে ছাত্রদের নির্যাতন-হয়রানির কথা জেনেই থাকেন তাহলে ছাত্রদের হল থেকে বের করে দেবার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পক্ষে

এতো ওকালতি করছেন কেনো? যদি ছাত্রদের আবাসিক হলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী হয়রানি করতো তার দায়দায়িত্ব তাঁর মতো শিক্ষককেই তো নিতে হবে। আর কে নেবে? তাছাড়া আবাসিক হলে ঢুকে ছাত্রদের হয়রানি করা গুরুতর মানবাধিকার লংঘন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে এটা বোঝানো তো তাঁর মতো শিক্ষকের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। ছাত্রদের শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে রেখে ও বিক্ষোভ-প্রতিবাদ থেকে সরিয়ে এনে সরকারের সিদ্ধান্ত মান্য করানো গেলে অসুবিধা কি? মিটমাট তো হয়েই গিয়েছিল। ছাত্র ও সরকার উভয়কেই বোঝানোর দায়িত্ব তো কাউকে না কাউকে নিতে হবে। এখন ছাত্রদের কোথায় কোন অবস্থায় কীভাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গ্রেফতার করেছে তার সাক্ষ্য প্রমাণ দেবে কে? অল্প সময়ের মধ্যে হলত্যাগ করবার কারণে যে বিপদে ছাত্ররা এখন পড়েছে তার দায়দায়িত্ব কি ড. আনিসুজ্জামান নেবেন?

শিক্ষকরা যদি অন্যায় করে থাকেন আইনী প্রক্রিয়ায় তাঁদের বিচার হোক। শুধু শিক্ষকদের নয়, যে কোনো নাগরিককেই মানবাধিকার লংঘন করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া “অসঙ্গত, উদ্বেগজনক এবং প্রতিবাদযোগ্য”। আমরা অবাক হয়েছি যে ড. আনিসুজ্জামানের অসঙ্গতিবোধ, উদ্বেগ ও প্রতিবাদ শুধু শিক্ষকদের জন্য–আমরা দৃঢ়ভাবে সকল নাগরিকেরই মানবাধিকার রক্ষার পক্ষে। হকার, রিকশাওয়ালা, রাস্তার টোকাই— সকলের জন্যই। সকলের অধিকার নিয়েই আমরা উদ্বিগ্ন।

বিপুল সংখ্যক ছাত্র, সাধারণ মানুষ এবং পাঁচজন শিক্ষককে গ্রেফতার করবার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আরেকটি জটিল রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করলো। অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের বক্তব্যের বিরোধিতা আমরা প্রয়োজনীয় মনে করেছি এই কারণে যে মানবাধিকার ও আইনী প্রক্রিয়ায় বিচারের প্রশ্নকে আমরা আজ সবার আগে স্থান দিতে চাই। এই কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক পক্ষপাত বা রাজনৈতিক অভিলাষ যেন আমাদের বিচারবুদ্ধিকে অন্ধ না করে ফেলে।

যে পাঁচজন শিক্ষক গ্রেফতার হয়েছেন তাঁদের রাজনীতি আমরা সমর্থন করি কি করি না সেই প্রশ্ন এখন অবান্তর। তাঁরা ‘রাজনীতির সূচনা’ করেছেন নাকি করেননি– এই তর্ক এখন কীসের জন্য? যতক্ষণ তাঁদের মানবাধিকার এবং আইনী প্রক্রিয়ায় সুবিচার পাওয়া আমরা নিশ্চিত করতে না পারছি ততক্ষণ তার জন্য দাবি তোলাই হচ্ছে ঠিক অবস্থান।

কিন্তু এই সেই সময় যখন নিজ নিজ গর্ত থেকে কে কীভাবে বেরিয়ে আসছে সেটা চিনে রাখাও ভালো। ঘোর দুর্দিনে পরস্পরের চেহারা আরও পরিচ্ছন্নভাবে ধরা পড়ে।

১২ ভাদ্র ১৪১৪ । ২৭ আগস্ট ২০০৭ । রিদয়পুর বিদ্যাঘর । টাঙ্গাইল ।

বাজেয়াপ্ত রাজনীতি

বাজেয়াপ্ত রাজনীতি। 'জরুরি অবস্থা'-র অধীনে আছি। ভাবছি আজ একটি রাজনৈতিক সিনেমা নিয়ে লিখে পাঠকদের একটা বুঝ দেবার চেষ্টা করবো। কিন্তু খালেদা জিয়ার গ্রেফতার হবার কারণে আমাকে মাঝপথে প্রসঙ্গ বদলাতে হয়েছে। ছবি সংক্রান্ত লেখাটি তবুও যতোটুকু লিখেছি— জুড়ে দিয়েছি। পরিচালক কস্টা গাভরাসের ছবিটির নাম State of Seize। পরাশক্তি যখন কোনো দেশ দখল করে বা দখল করার প্রক্রিয়ায় জনগণের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে তখন রাষ্ট্রের যে দুর্দশা হয় তাকে বলা হয় State of Seize। একে রাজনীতি বাজেয়াপ্ত করাও বলতে পারি। দুটো প্রসঙ্গের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক নাই। শিরোনামে 'বাজেয়াপ্ত রাজনীতি' এই কারণে যে 'জরুরি অবস্থা'-র অধীনে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে State of Seize কথাটা বারবার মনে আসছিল। পরাশক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে জনগণের লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও কিছু অভিন্ন দিক তো থাকবেই। সরাসরি সম্পর্কহীন দুটো লেখার মধ্যে অভিন্নতা ধরতে পারাও কম কি?

সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে বিএনপির ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে বিএনপির চেয়ারপারসন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে দলীয় কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। তখন থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করা হবে এই রটনা ছড়াতে থাকে। আজ, এই লেখা যখন লিখছি, তখন তাঁকে গ্রেফতার করা হলো। যাঁরা বলে আসছিলেন, শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিন্তু খালেদা জিয়াকে কেনো গ্রেফতার করা হচ্ছে না, তাঁরা এখন বগল বাজাতে পারেন।

খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে এটা মোটেও আমার কাছে খবর নয়। তিনি আমার কাছে প্রথমে খবর হয়ে আছেন এই কারণে যে তাঁর তো বহু আগে মালয়েশিয়া, সৌদি আরব বা অন্য কোনো দেশে নাকি দেশান্তরী হবার কথা। তাঁকে বাইরে পাঠিয়ে দেবার প্রকল্পটা ব্যর্থ হওয়ার রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। এই তাৎপর্য যাঁরা ক্ষমতায় আছেন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যর্থতার মধ্যে নাই, বরং দেশেই থাকবেন খালেদা জিয়া ইচ্ছাশক্তিই এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। পরিষ্কার যে খালেদা জিয়া দেশেই থাকবেন, এই সিদ্ধান্ত তিনি শুরু থেকেই নিয়েছিলেন এবং সেই সিদ্ধান্তে তাঁকে এখন অবধি আমরা অটল দেখছি।

হতে পারে যে শেখ হাসিনা এই ক্ষেত্রে তাঁকে বাড়তি প্রেরণা জুগিয়েছেন। কারণ তিনিও দেশে ফিরে এসে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আদালতে মোকাবিলা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দেশ ত্যাগ না করে দুইজন জননেত্রী দেশেই থাকছেন, এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ খবর। কাজে কাজেই রাজনীতির দাবার ছক যেভাবে সাজানো হয়েছে সেই চাল অনুযায়ী গ্রেফতারও হয়েছেন। শেখ হাসিনা আগে গ্রেফতার হয়ে খালেদা জিয়ার গারদের বাইরে থাকাটা একটু দৃষ্টিকটু হয়ে যাচ্ছিল। পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে বলে আওয়ামী লীগ যে অভিযোগ করছিল তাকেও পুরাপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না। তো যাক যা হয়েছে ভালই হয়েছে!! যাঁরা দুইজনকেই ধরে বেঁধে জেলে ঢোকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁদের এখন রাতে ভালো ঘুম হবে। শুধু একটু আগ-পিছ হয়েছে এই যা!

দ্বিতীয় খবর হচ্ছে তাঁদের বিরুদ্ধে আনা যে কোনো অভিযোগ মীমাংসার জন্য তাঁরা আদালতকেই এখন মানবেন। এই মানা স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায় আমরা জানি না। কিন্তু কী এসে যায়! আদালতকে মানছেন তাঁরা— শুধু এই রাজনৈতিক বিনয়ই রাজনীতির নতুন উপাদান। কারণ বিচার বিভাগ এখন রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিণত হলো। যদি তাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য দেশ ত্যাগ করতে রাজি হয়ে যেতেন, তাহলে তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আমলনামার খাতা থেকে খারিজ হয়ে যেত। যদি ভবিষ্যতে তাঁরা প্রত্যাবর্তনও করতেন তবে করতে হতো বেনজির ভুট্টোর মতো জর্জ বুশের সার্টিফিকেট বগলে নিয়ে। এই দুই নেত্রী এখন শুধু আদালত নয়, এর মধ্য দিয়ে অদৃশ্য গণআদালতের সামনেও হাজির হয়ে গিয়েছেন। এখন তাঁদের সম্পর্কে মূল্যায়ন করবার সুযোগ জনগণ পাবেন। তাঁরা অভিযোগ খালাস পান তো ভালো কথা। যদি খালাস না পান এবং তাঁদের শাস্তি হয় তাতে জনগণ তাঁদের ভোট দেবে না এটা এখন আর সুনিশ্চিত করে বলার উপায় নাই। রাজনীতি অন্য জিনিস। সাধারণ মানুষ বুঝে ফেলেছে দেশান্তরী হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ এড়িয়ে আগামী সুদিনে পরাশক্তির দয়ার ওপর নির্ভর করে রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করবার কাপুরুষ পথ তাঁরা নেননি। তাঁদের কৃত অপরাধ ও অন্যায়ের অভিযোগ মাথায় নিয়ে আজ আদালতে দাঁড়িয়েছেন। পরিষ্কার জেনেও যে বর্তমান বিচার ব্যবস্থা ও ক্ষমতার যে-চরিত্র তার অধীনে সুবিচার না পাওয়ার আশংকা আছে। কিন্তু আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে খোদ বিচার ব্যবস্থাকেও এখন তাঁরা অদৃশ্য গণআদালতে মূল্যায়নের মুখোমুখি করে দিয়েছেন। এ এক দুর্দান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি। নৃত্যে গানে ভরপুর রঙিন ফাইটিং চিত্র না হলেও কম রোমাঞ্চকর নয়।

এতোকাল যে রাজনীতির শক্তি আইন ও আদালতকে পদদলিত করেছে, সেই আদালতের সামনে আজ ব্যক্তি শুধু নয়, তাঁদের রাজনীতিও বিচারের জন্য হাজির। আদালত এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করবার মধ্য দিয়ে কীভাবে বিচার

ব্যবস্থার— অর্থাৎ সংবিধান, আইন ও বিচার প্রক্রিয়ার ন্যায্যতা কায়েম করে, কীভাবে করে বা আদৌ করতে শেষমেশ ব্যর্থ হয় কিনা তা আমরা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গেই পর্যবেক্ষণ করবো। কারণ এর সঙ্গে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে।

আমি সাধারণ মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করতে ভালবাসি। তাঁদের মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করি। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের কাছে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত দেশান্তরী খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনা, আর যতোই অভিযোগ দায়ের করা হোক আর আদালত যে শাস্তিই দিক, দেশের ভেতরে দেশেরই আদালতে দেশেরই জনগণের সামনে দাঁড়ানো খালেদা জিয়া আর শেখ হাসিনা এক কথা নয়। প্রথম ক্ষেত্রে তাঁদের দেশান্তরী হওয়ার অর্থ হতো দুর্নীতিবাজ দুই ব্যক্তির অপকর্মের কারণে গণরোষের ভয়ে দেশ থেকে পলায়ন। আর শেষের ক্ষেত্রে অর্থ হচ্ছে ভুলক্রুটি সীমাবদ্ধতা দোষক্রুটি সব কিছুর পরেও বাংলাদেশের দুই নেত্রীর এই দেশের জনগণের কাছে এই দেশেরই আদালতে কোনো অন্যায় করে থাকলে তার শাস্তি মেনে নেওয়া, কিম্বা না করে থাকলে মুক্তি পাওয়া। যেহেতু নিজ দেশে জনগণের কাছেই তাঁরা আছেন, জনগণকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাননি— তাঁদের অভিযোগ প্রমাণিত হোক বা না হোক, তাঁরা শাস্তি ভোগ করেন বা না করেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি তাঁরা তাঁদের এই অবস্থানকে ইতিবাচকভাবেই দেখছেন। দুই নেত্রীকে এই পরিস্থিতিতে এতো সহজে কেউ ছেড়ে যাচ্ছে মনে হয় না। এটা হলো তৃতীয় খবর।

চতুর্থ খবর হলো আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, আমীর হোসেন আমু ও তাঁদের ছোটবড় সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে যে গোষ্ঠীটা গড়ে উঠবার চেষ্টা চলছিল, সেই কাঁঠাল বোধহয় পাকতে শুরু করেছে। অন্তত আমীর হোসেন আমুর কথাবার্তাতেই আমরা সেটা বুঝতে পারছি। তিনি বলেছেন, এই সরকারকে সমর্থন দেওয়াই আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত এবং শেখ হাসিনাকে কারাগারে রেখেই আমু নির্বাচনে যেতে চান। খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করার মধ্য দিয়ে আমু-মান্নান-কোরেশিদের নিয়ে ক্ষমতাসীনরা তাদের নিজেদের জন্য যে প্রস্থান পথটা তৈরি করতে চাইছেন তা এখন ত্বরান্বিত হবে। কাজটি অবশ্য খারাপ হবে না। কারণ এখনকার রাজনীতির মূল বিভাজনটা এখন দলীয় রাজনীতি নয়— বরং পরাশক্তি ও তাদের এদেশীয় এজেন্ট বনাম বাংলাদেশের জনগণ। ফলে কারা পরাশক্তির পক্ষে আর কারা নয় রাজনীতির এই মেরুকরণ যতো দ্রুত হয় ততোই তা রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন করবে এবং দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া যে যার ভূমিকা পালন করবার শর্ত তৈরি হবে। এটা সত্যি যে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে পরাশক্তির মোকাবিলা কিম্বা দেশের সার্বভৌমত্বের ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য গণমানুষের ইচ্ছা ও সংকল্প জানা, বোঝা ও তা বাস্তবায়ন করবার রাজনীতি শেখ হাসিনা বা খালেদা জিয়া করেন না। গণমানুষের রাজনীতিটা তাঁদের জন্য নতুন, কাজে কাজেই শিখতে হবে। তাঁরা দলের

রাজনীতি করেছেন– কিন্তু গণমানুষের বা সমষ্টির রাজনীতি করেননি। বিপ্লবী অর্থে কথাটা বলিনি। খুবই সাধারণ অর্থেই বলেছি। দেশে যখন বিপদ উপস্থিত হয় তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য রাজনৈতিক মত ও পথে ভিন্নতা থাকলেও অনেক কিছুতে ছাড় দিতে হয়, অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়। কিন্তু এই বিচক্ষণতা তাঁদের মধ্যে সাম্প্রতিক অতীতে আমরা দেখিনি। আগামী দিনে দেখবো কিনা জানি না। অতীতে তাঁরা যাই করে থাকেন যদি জনগণের বর্তমান বিপর্যয়ে জনগণের সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত তাঁরা নিয়ে থাকেন তাহলে জনগণের রাজনীতিই তাঁদের করতে হবে। এটাই পথ। পুরানা ধারায় এখন বিশেষ কাজ হবে বলে মনে হয় না। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

এর মানে হলো খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে বুঝতে হবে বাংলাদেশ একটা ভয়াবহ বিপদের মধ্যে পড়েছে। তাঁদের অতীতের ভুল রাজনীতি এর কারণ। এই বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ সহজ নয়। তাঁদেরকে অল্প কয় দিনের মধ্যেই কারাগার থেকে মুক্ত করে বিজয়ের মালা দিয়ে অভিনন্দন করার আশা করা ঠিক নয়। কারণ দুর্নীতির দায় ছাড়াও বিভাজন ও বিভক্তির রাজনীতির কারণে শত্রুপক্ষ জনগণকে এখনো বিভক্ত রাখতে সক্ষম। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দুর্দশার আন্তরিক উপলব্ধি বিভাজনের রাজনীতির অভ্যাসের কারণে অতিক্রম করে যাওয়া কঠিন। তাছাড়া দুর্নীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যক্তিগত দায় কতোটুকু সেই বিচার বা মূল্যায়নটুকু করবার অবসরও জনগণকে দিতে হবে। ইত্যাদি কারণে নতুন পরিস্থিতিতে নতুন রাজনীতি দানা বাঁধতে সময় নেবে। কিন্তু যদি কেউ ইতিহাস ঠিকভাবে পাঠ করে থাকে তাহলে দেয়ালের লক্ষণ পরিষ্কার— এই রাজনীতি দানা বাঁধবেই। যদি কারাগার থেকে পাঠানো ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার প্রস্তাব অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট পদের রদবদল ঘটে যায় তাহলে দানা বাঁধতে বেশি সময় লাগবার কথা নয়।

একটা লক্ষণ আমরা দেখছি যে দলীয় রাজনীতির আধিপত্যের বাইরে জনগণের ক্ষোভ ও বিক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত অভিপ্রকাশ ঘটছে। এরশাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গ সংগঠন হিশাবে সক্রিয় ছাত্র সংগঠনগুলোর কারণে ছাত্র আন্দোলন দানা বেঁধেছে। ছাত্র অঙ্গ সংগঠনগুলো ছিল সক্রিয়। কিন্তু এবার ছাত্র অঙ্গ সংগঠনগুলোর কারণে নয়, ছাত্রদের বিক্ষোভ ঘটেছে ছাত্রদেরই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে। প্রতিবাদের পক্ষে জনমতের স্ফুরণ আমরা যেমন দেখেছি তেমনি অন্যান্য শক্তি বা সরকারের ভাষায় 'অপশক্তি' নিজেদের ফায়দা হাসিল করবার জন্য নেমে পড়েছে, সেই দিকটাও অস্বীকার করার কারণ নাই। অন্যের পুকুরে মাছ ধরা অস্বাভাবিক কিছু নয়, খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার–অসম্ভব তো নয়ই। কিন্তু অন্যান্য গৌণ প্রবণতার মধ্যেও প্রতিবাদের রাজনৈতিক অথচ নির্দলীয় দিক অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল। নতুন গণরাজনীতির লক্ষণ দেখছি আমরা, হয়তো যা দানা বাঁধবার সময় হয়েছে। অগাস্টের ২০ তারিখের

পর বাংলাদেশের রাজনীতির যে গুণগত রূপান্তর ঘটেছে তার হিশাব খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনা করতে সক্ষম কিনা আমরা তা এখনো জানি না। কিন্তু একে বুঝতে পারা এবং জনগণের ইচ্ছা ও সংকল্প অনুধাবন করে জনগণের আন্দোলন-সংগ্রামের অধীন থাকার চর্চা আদৌ শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার সমর্থকরা করবে কি?

কিন্তু কিছু বিষয় মনে হয় পরিষ্কার। এক : গণরাজনীতি উন্মেষের এই নতুন উপাদানকে মর্যাদা না দিয়ে কোনো দলীয় বা খণ্ডিত রাজনীতি দিয়ে রাজনীতির পটপরিবর্তন সম্ভব নয়। খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার অনুসারী ও সমর্থকদের কাছাকাছি আসতেই হবে। দুই : সরকার তাঁদের বিচার ও শাস্তি দিতেই পারেন, কিন্তু এই সরকার সম্পর্কে জনগণের যে মনোভাব ইতোমধ্যেই গড়ে উঠেছে তাতে এর কোনো দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক প্রভাব গণমনে পড়ার সম্ভাবনা কম। তিন : এই সরকারের সঙ্গে যাঁরা যোগসাজশ করছেন বলে জনগণের কাছে মনে হবে তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ প্রশ্নসংকুল হয়ে উঠতে পারে। ইত্যাদি।

পরাশক্তি এবং তাদের এদেশীয় এজেন্ট বনাম বাংলাদেশের জনগণ–এই হচ্ছে রাজনীতির বর্তমান মেরুকরণ। এই লড়াইয়ের নেতৃত্ব কে দেবে এটা নির্ধারিত হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। এই অবসরে State of Sieze সম্পর্কে কিছু তথ্য পাঠকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। কাজে লাগতে পারে।

বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক কস্টা গাভরাজের অসাধারণ ছবি State of Sieze সম্ভবত ১৯৭২ সালে মুক্তি পেয়েছিল। আমি ছবিটি ঠিক কবে দেখেছি মনে নাই। ষাটের দশকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লক্ষ্যবস্তু ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। যাঁরা বিশ্বাস করতেন সাম্রাজ্যবাদ এবং এই দেশীয় এজেন্টদের বিরুদ্ধে একমাত্র সামরিকভাবে লড়াই-সংগ্রাম করেই দেশের সার্বভৌমত্ব এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব, অন্য কোনো ভাবে নয়, তাঁদের কাছে ছবিটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। ছবিটিতে উরুগুয়ের বিপ্লবী দল টুপামারোর ভূমিকা এবং আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকেও গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পদ্ধতি সংক্রান্ত বাস্তব দিক যেমন ছিল একই সঙ্গে বিপ্লবী গণআদালত যে আসলেই একটি আদালত এবং সেই আদালতেই ন্যায়বিচার সম্ভব– সেই সকল দিকও তুলে ধরা হয়েছিল। সেই সময় বিপ্লবী মন্ত্রে যাঁরা উজ্জীবিত ছিলেন শুধু তাঁদের কাছেই এই ছবিটির আদর ছিল না, অসামান্য রাজনৈতিক মর্মের জন্য চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ছবিটি অমর হয়ে আছে বলা যায়। সত্তর দশকের শুরুতে উরুগুয়ের রাজনৈতিক উত্থানপতনের পরিপ্রেক্ষিতে ছবিটি তৈরি হয়েছে। মনে রাখা দরকার সেই সময় আমাদের দেশেও মুক্তিযুদ্ধের কাল চলছে। আমাদের দেশের তরুণদের বড়ো একটি অংশ মনে করেছিল শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের সঙ্গে থেকে একমাত্র সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়েই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে বিজয়ী হয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব– অন্য কোনোভাবে নয়।

সত্তরের শুরুতে সামরিক একনায়কতন্ত্র কায়েম হবার আগে মার্কিন সাহায্য সংস্থা ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের (ইউএসএইড) একজন কর্মকর্তাকে টুপামারো গেরিলারা অপহরণ করে। টুপামারো গেরিলাদের কর্মকাণ্ড শহরকেন্দ্রিক। ইউএসএইডের তখন মুখ্য কাজ ছিল মার্কিন তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলোর পুলিশ বিভাগকে কাউন্টার ইনসার্জেন্সি অপারেশানে প্রশিক্ষণ দেওয়া। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ যদি সশস্ত্র বা সহিংস রূপ গ্রহণ করে তাহলে তাকে কীভাবে দমন করতে হবে তার প্রশিক্ষণ। ছবিতে ইভস মনতাঁ ইউএসএইডের অপহৃত কর্মকর্তার ভূমিকায় অভিনয় করেন।

ছবিতে দেখা যায় যে টুপামারো গেরিলারা তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে উরুগুয়ের জনগণের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং এই অপকর্ম সাধনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার জন্য অভিযোগ এনে বিচার করছে। সেই জিজ্ঞাসাবাদকে পটভূমি হিশাবে ধরে নিয়ে ছবিটি দেখাচ্ছে উরুগুয়ের সরকারের সঙ্গে টুপামারো গেরিলাদের সংঘর্ষ। অনেক সময় যা ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহণ করেছে। এর মধ্য দিয়ে দর্শককে দেখানো হয়েছে যে ল্যাটিন আমেরিকায় জনগণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে মার্কিন হস্তক্ষেপ কীভাবে সামরিক একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছে।

যে মার্কিন কাউন্টার ইনসার্জেন্সি নায়ককে নিয়ে ছবি তার আসল নাম ডেন মিট্রিঅন (Dan Mitrione)। ইনি সত্যিকারের ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কাল্পনিক কেউ নন। মিট্রিঅন রিচমন্ড ইন্ডিয়ানাতে ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সাল অবধি পুলিশ অফিসার ছিলেন এবং ১৯৫৯ সালে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই-তে যোগদান করেন। উনিশ শ ষাট সালে মিট্রিয়ন মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশান এডমিনিস্ট্রেশানের কাজে নিয়োজিত হন। তাঁর কাজ ছিল দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে গিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে দমন করবার জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে 'এডভান্সড কাউন্টার ইনসার্জেন্সি টেকনিক' শেখানো। সায়গনে নিউ ইয়র্ক টাইমসের ব্যুরো এ জে লাগুথ সেই সময় জানিয়েছিলেন, মার্কিন উপদেষ্টাদের মধ্যে মিট্রিঅন ব্রাজিলের পুলিশ বাহিনীকে শিখিয়েছেন কীভাবে বন্দীকে না মেরেও ইলেকট্রিক শক দিয়ে যন্ত্রণা দেওয়া যায়। তিনি আরও বলেছেন যখন এই ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে নতুন পীড়ক তৈরি করা যায় এবং সিআইএ ও পুলিশ যখন আরো নিষ্ঠুর নির্যাতনের উপায় প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় তখন পুরানা পুলিশ অফিসারদের বাদ দেওয়া হয়। সামগ্রিকভাবে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে মার্কিন স্বার্থে ব্যবহারের জন্য নিপীড়কের যন্ত্রে পরিণত করার প্রক্রিয়া এইসব। লাগুথ আরো জানিয়েছেন যে ডেন মিট্রিয়ন ইউএস পাবলিক সেফটি প্রোগ্রামের অধীনে উরুগুয়েতে ব্রাজিলের মতোই পুরো দেশে পরিচয়পত্র প্রবর্তন করবার ব্যবস্থা করেন, এখন যেমন আমাদের দেশে আইডেনটিটি কার্ড চালুর কথা চলছে

এবং তার প্রশিক্ষণেই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে নিষ্ঠুর অত্যাচার–নির্যাতন স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে ওঠে।

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন নতুন কিছু না, কিন্তু মিট্রিঅনের অধীনে ইউএসএইডের অফিস অব পাবলিক সেফটি নিষ্ঠুর নির্যাতন রুটিনে পরিণত করে ফেলেছিল। মিট্রিঅন নিষ্ঠুরতাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল তার নজির হিশাবে তাঁর একটি বাক্য কাউন্টার ইনসার্জেন্সি বা কাউন্টার টেররিজমের ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছে : "The precise pain, in the precise place, in the precise amount for the desired effect.". অর্থাৎ "যে ফল চাওয়া হচ্ছে সেই কাঙ্ক্ষিত ফলের জন্য ঠিক যেখানে যন্ত্রণা দেবার সেখানে আর ঠিক যে পরিমাণে দেবার ঠিক সেই পরিমাণে যন্ত্রণা দিতে হবে"।

১৯ ভদ্র ১৪১৪। ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭। শ্যামলী।

ঘটনা দ্রুত ঘটছে

আগামী বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বাংলাদেশের সেনাপতি– যাঁর সমর্থন এই সরকারের প্রতি আছে বলেই এই সরকার টিকে আছে– তিনি যদি কিছু বলে থাকেন আমি অন্তত একটি কারণে খুশি যে তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন সরকার আসলে কে চালাচ্ছে। জনগণের দিক থেকে এতে কোনোই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যাহা বাহান্ন, তাহাই তেপ্পান্ন নয় কি?

ঘটনা দ্রুত ঘটছে। অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলার আছে। কিন্তু আজ ব্যস্ততার কারণে আমি লিখবো সংক্ষিপ্ত। শুধু ধারণা দেবো আগামী কিস্তিগুলো কী বিষয় নিয়ে লেখা দরকার। আশা করি, সেই বিষয়ে অন্যরাও লিখবেন আর আমি আমার হিম্মতে যতোটা কুলায় লেখার চেষ্টা করবো।

সেনাপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল মইন উ আহমেদ প্রকাশ্যে রাজনীতিতে নেমেছেন দেখে মাহফুজ আনামের ৬ এপ্রিল ২০০৭ তারিখে ডেইলি স্টারে How can national interest be served best লেখাটি পড়ে হাসি সামলাতে পারিনি। মাহফুজ আনাম আবুল মনসুর আহমদের সন্তান, ফলে তাঁর প্রতি আমার দুর্বলতা থাকা খুবই স্বাভাবিক, আছেও। সামাজিকভাবে আমি মাহফুজ আনামকে বন্ধু গণ্য করি। কিন্তু বন্ধু বলেই তাঁর সম্পর্কে আমাকে প্রকাশ্যে বলতে হচ্ছে। তাঁর পত্রিকা ও সম্পাদক হিশাবে তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে ক্ষতি

করেছেন তা আমাকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। গণমানুষের স্বার্থে তার একটি মূল্যায়ন প্রয়োজন হবে আমাদের। তাঁর নীতি বা রাজনীতির সঙ্গে আমার পার্থক্য থাকার কারণে নয়। সেই পার্থক্য থাকা ও নিজ নিজ নীতিগত অবস্থান নিয়ে তর্কবিতর্ক একটি দেশের রাজনৈতিক সপ্রাণতার লক্ষণ। অবশ্যই তাঁর মত, চিন্তা বা নীতিগত অবস্থান থাকবে, যার প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তিনি যদি নীতিশূন্য হন তাহলে তা অত্যন্ত বিপদের কথা। যেমন একটি সাংবিধানিক সরকারকে হটিয়ে দিয়ে সেনাবাহিনীকে শাঁখের করাতে চেপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বে পরাশক্তিগুলো বাংলাদেশে যে সরকারকে অগণতান্ত্রিক কায়দায় বসিয়ে দিলো, মাহফুজ ছিলেন তার ঘোর সমর্থক। তিনি খুশি হয়েছিলেন। তিনি দাবিও করেছিলেন যে তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের লেখালেখির কারণেই এই ধরনের সরকার ক্ষমতায় এসেছে। তিনি একবারও ভাবেননি যে অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একটি সাংবিধানিক সরকারকে উৎখাত করবার রাজনৈতিক পরিণতি একটি দেশের জন্য কী হতে পারে। দ্বিতীয়ত, কারো যদি গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ন্যূনতম কোনো আস্থা থাকে, তাদের পক্ষে এই ধরনের অসাংবিধানিক ও অনিয়মতান্ত্রিক পথে ক্ষমতার বদল সমর্থন করা অসম্ভব। কিন্তু মাহফুজ আনাম তা করেছেন এবং বুক ফুলিয়ে নিজের কৃতিত্বের কথা জাহির করেছেন। তাঁর পত্রিকার একজন সহকর্মীও এই সরকারের নিয়োগ পেয়েছেন। ফলে তিনি এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা নীতিগর্হিত বা নীতিশূন্যতার অপরাধে অপরাধী বলে আমি মনে করি। যারা পত্রপত্রিকা চালান, কিম্বা জনগণের বিবেক হয়ে কাজ করেন তাঁদের এই নৈতিক বিচ্যুতি ক্ষমার যোগ্য কি? বিবেকচ্যুতি বা নীতিভ্রষ্টতা টাকা পয়সার দুর্নীতির চেয়েও ভয়াবহ। একটি জাতির ধ্বংসের নজির এই সব।

তাঁর লেখা পড়ে হেসেছি ঠিকই, কিন্তু আতংকিত হয়েছি। তিনি কিছু দিন আগেও এই সরকারের ঘোর সমর্থক হিসাবে নিজেকে জাহির করেছিলেন। তিনি এখন চোখ উল্টিয়ে অন্য কথা বলছেন। তাঁকে নিয়ে তাঁর বন্ধুদের উচিত অবিলম্বে ডাক্তারের কাছে যাওয়া। কিন্তু মাহফুজ মানসিকভাবে অসুস্থ নন– জেনেশুনেই তিনি এখন একটা বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করছেন। তাঁর এই লেখাটি দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে।

এখন শুধু একটি দিক উল্লেখ করে রাখছি। তিনি পরাশক্তিগুলোর অবস্থানই পরিষ্কার করছেন। মাহফুজ আনাম World Economic Forum নামক পরাশক্তিগুলোর একটি নেটওয়ার্কের সদস্য। তাঁকে পরাশক্তির স্বার্থ দেখতেই হবে। তিনি দেখভাল করতে থাকুন, আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু তিনি বলছেন, “As to the timing, we feel that such a policy speech on the future direction of the country, its politics, its government, its political parties and several vital related issues should have come, as part of the reform agenda, from the head of the caretaker government which is being ably backed by the armed foreces." বলছেন, সেনাপতি মইন উ আহমেদ যে বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা, সরকারপদ্ধতি, গণতন্ত্রের ধরণ রাজনৈতিক দল ইত্যাদিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছেন তা ঠিক করেননি। এগুলো সংস্কার কর্মসূচির অংশ হওয়া উচিত ছিল। "আর এটা আসা উচিত ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের কাছ থেকে যাকে সেনাবাহিনী দক্ষতার সঙ্গে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।"

তত্ত্বাবধায়ক সরকার!! এখনও? এই সরকারের সাংবিধানিক ভিত্তি নিয়ে তর্ক আছে। তাছাড়া যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারই হয়ে থাকে তাহলে এই সরকারের দায়িত্ব তত্ত্বাবধান মাত্র– কোনো নীতিগত বা 'সংস্কার কর্মসূচি' বাস্তবায়ন নয়। সেনাপতি বললে দোষ, কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান– যাঁর প্রতি সেনাবাহিনীর সমর্থন না থাকলে এক সেকেন্ড টিকে থাকবার ক্ষমতাও যে সরকারের নাই– তিনি বললে সেটা নির্দোষ হয় কোন যুক্তিতে? যদি কথাই আমাদের শুনতে হয় তাহলে যাঁরা সত্যিকারের ক্ষমতায় তাদের কাছ থেকেই আমরা নাগরিকরা শুনতে আগ্রহী। আর এটাই তো বলবার সময়। সরি, মাহফুজ আনামের সঙ্গে আমরা একমত নই।

তার মানে এই নয় যে সেনাপতির বক্তব্য বা প্রকাশ্য রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের কোনো সমালোচনা নাই। অবশ্যই আছে। কিন্তু সেটা মাহফুজ আনামের সমালোচনা বা উদ্দেশ্যের একদমই বিপরীত। সাংবিধানিক সরকারকে কূটনৈতিক হস্তক্ষেপে কার্যত উৎখাত করে বহুজাতিক কর্পোরেশানগুলোর স্বার্থে বাংলাদেশে যখন সেনাবাহিনী সমর্থিত অনির্বাচিত সরকার কায়েম করা হলো, আমরা ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে বলেই মেনে নিয়েছি। তখন মাহফুজ আনাম উৎফুল্ল হয়েছিলেন। এখন মাহফুজ চাইছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বে পরাশক্তিগুলোর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে যে ঘটনা ঘটেছে এবং তাদেরই পছন্দের যে সরকার গঠিত হয়েছে, সেনাবাহিনী শুধু তাদেরই গোলামি করুক। আমরা নিশ্চয়ই তা চাই না। সেনাবাহিনী যদি মনে করে দেশ ও দশের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা আছে, আমরা চাই তারা তা পরিষ্কার করে বলুক। নাগরিকরা তাদের বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতেই তাদের সমর্থন বা বিরোধিতা করবে। কিন্তু সেনাপতি কিছু বলতে পারবে না, অথচ সেনাপতির সমর্থনে যে সরকার ক্ষমতায়– যে সরকারের সাংবিধানিকতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে– শুধু তাঁর কাছ থেকেই আমাদের কথা শুনতে হবে– এই নীতি চরম কপটতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

ফখরুদ্দীন আহমদ বিশ্বব্যাংকেই প্রায় সারাজীবন চাকরি করেছেন। তাঁর চিন্তাভাবনা বিশ্বব্যাংকের চিন্তাভাবনা থেকে আলাদা কিছু নয়। ফলে তাঁর কাছ থেকে আমাদের নতুন কিছু শোনার নাই। তিনি কী করবেন, কী করতে পারেন সে সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। তাঁকে আমরা নির্বাচিত করিনি। তবু, যদি তিনি কেয়ারটেকার হয়ে থাকেন আমরা আপত্তি করবো না।

সেনাপতি সম্পর্কে আমাদের সমালোচনা ইংরেজি দৈনিক New Age-এর অবস্থানের সঙ্গতিপূর্ণ। পত্রিকাটি ৪ এপ্রিল তারিখে A general's day out with a political scientists নামে যে সম্পাদকীয় লিখেছে, তার যুক্তি ও বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত। কিন্তু বাংলা পাঠকদের জন্য ডেইলি স্টার ও নিউ এইজের অবস্থানের পার্থক্য এবং পাশাপাশি আমাদের বক্তব্য আরো স্বচ্ছ করে বলার দরকার আছে। সেটা আমরা আগামী কোনো লেখায় তুলবো। কারণ ওর মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যা অবশ্যই আলোচিত হওয়া উচিত। একটা নীতিগত অবস্থান থেকে এই সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই নিউ এইজ নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করে বলে আসছে। অতএব দুটো পত্রিকার প্রধান পার্থক্য হচ্ছে নৈতিক অবস্থানের পক্ষে সাহসী ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ (নিউ এইজ) বনাম নীতিশূন্য চরম সুবিধাবাদিতার (ডেইলি স্টার) পার্থক্য। খেয়াল করা দরকার যে ৪ এপ্রিল তারিখে নিউ এইজের কঠোর সমালোচনার পরে মাহফুজ আনাম ডেইলি স্টারে ৬ এপ্রিল তারিখে কেয়ারটেকার সরকারের অধীন থেকে সেনাবাহিনীকে কাজ করতে হবে এই প্রধান অবস্থানে দাঁড়িয়ে সেনাবাহিনী বনাম কেয়ারটেকার সরকারের মধ্যে বিরোধ স্পষ্ট করে তোলেন। আমরা তর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, যদিও মাহফুজ আনামের উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমরা একমত নই। আমরা এই দুঃসময়ে যে বিষয়ে বারবার সৈনিকদের সতর্কতা অবলম্বন করতে বলে গিয়েছি তা হচ্ছে – কোনো অবস্থাতেই এখন সেনাবাহিনীর মধ্যে কোনো প্রকার বিরোধ তৈরি করা যাবে না এবং এই সরকারের কোনো দায়দায়িত্বও সেনাবাহিনী গ্রহণ করবে না। পরাশক্তির হাতে জিম্মি হয়ে পড়া সেনাবাহিনীকে কেউ হীন স্বার্থে ব্যবহার করুক তা রুখে দেওয়াই এখনকার কাজ। নিজের মর্যাদায় মেরুদণ্ড সিধা করে আমাদের সৈনিকরা দাঁড়াবেন, আমরা জানি। জনগণ গণপ্রতিরক্ষা ও গণনিরাপত্তার বিকল্প যতক্ষণ অবধি গড়ে তুলতে না পারছে, আমাদের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা জরুরি। দ্বিতীয়ত, বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক রাজনীতির মধ্যে সেনাবাহিনীর পক্ষে স্বাধীন সেনাবাহিনী হিশাবে নিজেদের ভূমিকা পালনের কোনো সুযোগ সেনাবাহিনী যদি পালন করতে চায় এবং তা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার পক্ষে হয়, বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় জনগণ তা সমর্থন করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমরা বারবার বলেছি, রাজনৈতিক সরকার গঠিত হওয়ার আগে তত্ত্বাবধান ছাড়া এই সরকার যেন কোনো প্রকার নীতিগত সিদ্ধান্ত না নেয়।

পরাশক্তিগুলো যখন 'সিকিউরিটি' বা 'নিরাপত্তা'র কথা বলে তখন তারা রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনীকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের হুকুমে খাটায়। আমরা তার বিপরীতে 'গণনিরাপত্তা'র ধারণার কথা বলি। পরাশক্তিগুলো রাষ্ট্রকে সিকিউরিটির নামে আসলে সেনাবাহিনীকে বহুজাতিক কোম্পানির নিরাপত্তা রক্ষায় নিছকই

পাহারাদারের ভূমিকায় পর্যবসিত করতে চায়। অথচ জনগণ চায় সেনাবাহিনী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দৃঢ় মৈত্রীর ভিত্তিতে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। সামগ্রিকভাবে এই ধরনের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা 'গণপ্রতিরক্ষা' বলতে পারি– যেখানে আমাদের মতো আর্থিকভাবে দুর্বল এবং ছোটো দেশের গণসমর্থন ও গণ-অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এই ধরনের গণপ্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া আমরা আমাদের রক্ষা করতে পারবো না।

গণপ্রতিরক্ষা বা গণনিরাপত্তা মানে সেই পুরানো পিপল্স আর্মি বা সিভিল আর্মি নামক ধারণার কথা বলছি না। সত্যি যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য জনগণের সমর্থন, অংশগ্রহণ জরুরি এবং সকল নাগরিকের সামরিক শিক্ষাও এই ধারণার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মূল প্রশ্ন হচ্ছে গ্লোবালাইজেশান ও কৃৎকৌশলের এই যুগে আমরা আমাদের রক্ষা করবো কী করে?

বার্ড ফ্লুর কথাই ধরা যাক। আমি এর আগের লেখায় লিখেছি যে বার্ড ফ্লুর সংক্রমণ এবং তাকে মোকাবিলা করবার নামে আমাদের গ্রামের মোরগ-মুরগি ও হাঁস-কবুতর, পাখপাখালি ধ্বংস করবার যে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে তা কি গণপ্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত নয়? আমরা কি খালি পোলট্রি ফার্মই করবো? আরো কথা আছে। বার্ড ফ্লু আসবার আগেই কয়েকটি কোম্পানি গত বছর থেকেই বার্ড ফ্লুর ওষুধ বানানো শুরু করেছে। যেমন বেক্সিমকো ফার্মার অসেফ্লু (Oseflu), কিম্বা এসকে এন্ড এফের এসকে ফ্লু (SK-Flu) । যে ওষুধ বানানো হয়েছে তার সঙ্গে ইরাক যুদ্ধের প্রধান নায়ক ডোনাল্ড রামসফেল্ডের নাম জড়িত। এই সংযোগ বা কানেকশানগুলো বোঝা ও পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ কি আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত হওয়া উচিত নয়? এই কোম্পানিগুলো কি করে জানলো যে বাংলাদেশে বার্ড ফ্লু মহামারী আসছে?

হাওর অঞ্চলে বিরি ২৮, বিরি ২৯ ও মিনিকেট (ভারতীয় উফশী) ইত্যাদি ধান লাগানো হয়েছে। ক্ষেতের পর ক্ষেত, মাঠের পর মাঠে ধান হয়নি, চিটা হয়েছে। খবর কাগজে এবং টেলিভিশনে দেখলাম কেন ধানে চিটা হয়েছে তার পক্ষে যুক্তি দিচ্ছেন সেই সব বিজ্ঞানী যাঁরা বহুজাতিক কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা বলছেন এটা নাকি কোল্ড ইনজুরি– অর্থাৎ ধানে, ঠান্ডা লেগে ধানে চিটা হয়েছে। কথা হল, এইসব হাওর অঞ্চলে হাজার বছর ধরে কৃষক দেশি জাতের ধান আবাদ করেছে, কোনো দিন আমরা ধানের ঠান্ডাজনিত আঘাত লাগার কথা শুনিনি। অথচ এখন শুনছি। প্রশ্ন হলো, পানি প্লাবিত হাওর অঞ্চলে তো দেশি বোরো আবাদ হবার কথা। যে জাতগুলোতে কোল্ড ইনজুরি হয়েছে সেই জাত হাওর অঞ্চলে ঢুকলো কী করে? কারা প্রবর্তন করলেন যাঁরা করেছেন তাঁরা কি বিজ্ঞানী নাকি আমাদের খাদ্যব্যবস্থা ধ্বংস করবার জন্য বহুজাতিক কোম্পানির এজেন্ট? এর একটা গণতদন্ত হওয়া উচিত।

আজ আমরা এই ধরনের দুই-একটি নোক্তা দিয়েই শেষ করবো আগামীতে আরো তথ্য ও বিশ্লেষণসহ লিখবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং গণমানুষের নিরাপত্তার জন্য চরম হুমকি হয়ে আসছে। দেশে যখন শক্তিশালী সরকার অনুপস্থিত তখন দেশ ও দশের বিরুদ্ধে নানান অদৃশ্য হামলা চলতে থাকে। এই সকল বিষয়ে জনগণ কিম্বা সেনাবাহিনীকে সতর্ক করবার কোনো প্রতিষ্ঠান আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। এই অভাব মারাত্মক ও ভয়ংকর বিপজ্জনক। এই সকল বিষয় আমাদের বুঝতে হবে। আমরা মনে করি, সেনাবাহিনীকে জনগণের সঙ্গে থেকে এবং জনগণের স্বার্থে একসঙ্গে প্রাণ ও পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। এই রক্ষাও গণপ্রতিরক্ষা বা গণনিরাপত্তার অংশ। কনভেনশনাল বা নিছকই সামরিক অর্থে প্রথাগত নিরাপত্তার ধারণা এই যুগে অচল। এই আলোকে আমাদের আরো বহু দূর ভাবতে ও নিজেদের নিরাপত্তা নিজেদের নিশ্চিত করতে হবে। সেনাবাহিনী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মৈত্রী ছাড়া যা অসম্ভব– এটাই এখন আমার কথা।

২৭ চৈত্র ১৪১৩। ১০ এপ্রিল ২০০৭

ছবিটি দেখছিলাম

ছবিটি দেখছিলাম। সম্পাদক মতিউর রহমান বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে অবস্থিত ইসলামি ফাউন্ডেশান কার্যালয়ে সরকারের দুই উপদেষ্টার উপস্থিতিতে খতিব মাওলানা উবায়দুল হকের হাত ধরে ক্ষমা চাইছেন। সরকারের দুইজন উপদেষ্টা হাজির। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের ছবির বিপরীতে মতিউর রহমান। করুণ এবং উদ্বিগ্ন। ইনকিলাব ছবির ক্যাপশানে আরো যোগ করেছে যে তিনি 'কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন'। প্রথম আলোর কার্টুন এবং কার্টুনের জের শেষ না হবার আগেই *সাপ্তাহিক ২০০০* পত্রিকায় দাউদ হায়দারের লেখা নিয়েও প্রবল আপত্তি উঠেছে।

এটা পরিষ্কার যে ব্যাপারটি সহজে মিটছে না। কারণ খুবই সহজ। ব্যাপারটি ধর্মের মামলা নয়, রাজনীতির মামলা। 'ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত' করার কথা কি তাহলে সত্য নয়? অবশ্যই সত্য। তাহলে এটা ধর্মীয় সংবেদনশীলতার প্রশ্ন নয় কেনো? নিশ্চয়ই প্রশ্ন। তাই বলে, একই সঙ্গে তা রাজনীতির প্রশ্ন হবে না কেনো? একটি জনগোষ্ঠী কীভাবে তাদের শত্রুমিত্র নির্ধারণ করে তার সঙ্গে তার ধর্মীয়

সংবেদনশীলতা, ভাষা, সংস্কৃতি, আত্মপরিচয় ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ই উপাদান হিশাবে কাজ করতে পারে। যদি ভাষা ও সংস্কৃতি রাজনীতিতে ব্যবহার করা যায় ধর্ম ব্যবহার করা যাবে না কেনো? কোন উপাদান কোন বাস্তবতায় কী ধরনের ভূমিকা রাখছে তার একটা বিচার হতেই পারে। বাঙালি বা বাংলাভাষী হিশাবে আমাদের ভাষা বা সংস্কৃতি নিয়ে কটাক্ষ করলে সেই কটাক্ষের বিরুদ্ধে যেমন একটা রাজনীতি দাঁড়াতে পারে, ধর্ম তো সেই তুলনায় আরো সংবেদনশীল হবারই কথা। সংস্কৃতির বুঝি শুধু ইহকাল আছে, পরকাল নাই। ধর্মের যেন ইহকাল ও পরকাল দুই 'কাল' আছে!! এটা সত্যি যে ইহলৌকিক অর্থেই পরকালের যে বয়ান ধর্মের কাছে আমরা শুনি তাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করবো, নাকি বিশ্বাস দিয়ে– সেই তর্কের ক্ষেত্র আলাদা। কিন্তু যতক্ষণ বিশ্বাস বলে সমাজে বাস্তব একটা ব্যাপার সাড়ে ষোলআনা হাজির, তাকে মোকাবিলা করার সাহসই হচ্ছে মনীষার কাজ।

এই দিক থেকেই যারা দাবি করেন যে ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা যাবে না, তারা কথাটা গায়ের জোরে বলেন। এঙ্গেলসের Pesant War in Germany-র মতো গ্রন্থের নজির থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে এখনো চরম প্রতিক্রিয়াশীল বামপন্থার অভাব নাই যাদের ধারণা শ্রমিক, কৃষক, গরিব শোষিত জনগণ কার্ল মার্কসের নামে শ্লোগান না দিয়ে ধর্মের ভাষায় বা ধর্মের দোহাই দিয়ে আর্থ-সামাজিক ইনসাফের কথা তুললে সেটা মহা বেদাআতি কাজ হয়ে যাবে। এইসব আবর্জনা দ্রুতই সাফ হবার পথে, এদের জন্য এখানে আমার বলার কিছুই নাই। কে কী ব্যবহার করবে আর করবে না সেটা সমাজের শ্রেণী গঠন, শ্রেণী সংগ্রাম ও বিভিন্ন শ্রেণীর শক্তির ভারসাম্যই স্থির করে দেয়। তার একটা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ দিক আছে। তাকে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বাস্তবতা আকারেই মূল্যায়ন করা দরকার। এর পর আসে এই অবস্থা থেকে আমরা কোথায় যেতে চাই। অর্থাৎ আমাদের নিজেদের ইচ্ছার প্রশ্ন। যদি গন্তব্য জানি, তাহলে কীভাবে যাবো তার একটা সুরাহাও আমরা বের করতে পারি। যাঁরা সমাজকে চিন্তায় চেতনায় মনীষায় সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাঁরা 'ইসলাম' নামটি শুনলে গা চুলকাতে শুরু করেন না। বরং বোঝার চেষ্টা করেন কে কীভাবে ইসলামের কথা বলছে। সাম্রাজ্যবাদ, ইহুদিবাদ (zionism), সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা নানানভাবে ফুঁসে উঠতে পারে। ইসলাম একটা প্রধান ধারা হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, যদি আমরা পনেরো কোটি মানুষকে আজ পথ দেখাতে চাই তাহলে তাদের মনের ব্যথাগুলো আগে বোঝা দরকার। আফসোস, আমাদের সমাজে অতি প্রাথমিক কাণ্ডজ্ঞানই এখনো দানা বাঁধেনি। চিন্তার জায়গায় দাঁড়িয়ে বিশ্বাসের নিশ্চয়তা মোকাবিলা তো অনেক দূরের ব্যাপার।

প্রথম আলোর ঘটনাবলী সম্পর্কে আমি এই মুহূর্তে কিছুই লিখবো না পণ করেছিলাম। একইভাবে সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকাটি সম্পর্কেও। এখানে অতি প্রাথমিক কিছু মন্তব্য করেছি মাত্র। প্রথম আলোয় আমি নিয়মিতই লিখতাম এবং সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকায় আমি প্রায়ই লিখে থাকি। যে সংখ্যাটি এখন আর বাজারে নাই সেই সংখ্যাতেও আমি লিখেছি। ব্যাপক সংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছানো যে কোনো লেখকেরই সাধ থাকে। সে দিক থেকে প্রথম আলোর সঙ্গে আমার সম্পর্ককে আমি মূল্য দিয়ে থাকি। আমার লেখক সত্তার পেছনে এই পত্রিকাটির দান যদি আমি অস্বীকার করি তাহলে মোনাফেকি হবে। তবে স্বীকার করি যে আমাকে নিয়ে তাদের বিপদেই পড়তে হতো। এই বিরোধিতা একান্তই চিন্তার বা রাজনৈতিক বিরোধ। তাকে সম্মান দিয়ে যথাসাধ্য লিখেছি। অধিকাংশ সময় পত্রিকার সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতাকে আমি ভালই বলবো। যেমন, সম্পাদক মতিউর রহমানের ব্যর্থ রাষ্ট্রের তত্ত্ব সম্পর্কে আমার ঘোরতর আপত্তি সম তাঁর বক্তব্যেরই সমালোচনা করে আমি তাঁরই সম্পাদিত পত্রিকায় লিখতে পেরেছি। প্রথম আলো যখন ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রশ্নে মূলত বাংলাদেশকে মৌলবাদী প্রমাণ করবার জন্য ব্যস্ত, তার মধ্যেও তাঁরা আমাকে ভিন্ন অবস্থান নিয়ে লিখতে দিয়েছেন। এই রাজনীতির বিপদ সম্পর্কে আমি যথাসাধ্য হুঁশিয়ারি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এগারোই জানুয়ারিতে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার মধ্য দিয়ে সমাজে যে রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটলো তার ফলে আমাদের রাজনৈতিক দূরত্বকে আর সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল না পরাশক্তির নির্দেশে অসাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় আসা এই সরকারের পক্ষে তাঁরা অবস্থান নিলেন এবং আমার পর্যালোচনামূলক লেখার সঙ্গে তাঁদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনার বিরোধ ঘটল। অন্যদিকে সমাজে ইতোমধ্যে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ ও চ্যানেল আই বাংলাদেশে যে রাজনীতি বাস্তবায়নের জন্য সক্রিয় রয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য পরাশক্তির পক্ষে বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করা। এটা বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থের বিরোধী।

প্রথম আলোর ঘটনা অনেকগুলো প্রশ্ন তৈরি করেছে, যার উত্তর এক লেখায় দেওয়া সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে হয়তো আমাদের কয়েকবারই ফিরে আসতে হবে। আজ আমি সিপিবি, ওয়ার্কার্স পার্টিসহ বাম দলগুলোর অবস্থান বা তথাকথিত স্যেকুলারিস্টদের সম্পর্কে একটি প্রশ্ন তুলবো। তাঁরা বলেছেন, সম্পাদক বারবার মাফ চাওয়া এবং সরকার ও পত্রিকা কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও বিক্ষোভ করা ঠিক না। তাঁদের দাবি এর পেছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে। রাজনৈতিক অভিসন্ধির কেচ্ছা শুনে আমি সত্যি বলতে না হেসে পারিনি। সত্যি যে যাঁরা প্রতিবাদ করছেন, বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা রাজনীতিক এবং প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, সিপিডি ও চ্যানেল আইকে তারা রাজনৈতিক শত্রুই গণ্য করে।

অতএব এটা তো অভিযোগ নয়, বরং বাস্তব। এটা রাজনৈতিক লড়াই, নিছকই ধর্মীয় অনুভূতি আহত হওয়ার ব্যাপার নয়। অতএব মাফ চাইলেই মিটিয়ে ফেলা যাবে না। বামপন্থীরা যদি মনে করেন যে এই মূল্যায়ন ঠিক নয়, তাহলে তাঁদের উচিত হবে এই গণমাধ্যমগুলো ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির ইতিবাচক ভূমিকা ব্যাখা করে বোঝানো এবং কেন এদের পক্ষে দাঁড়িয়ে ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই প্রগতিশীল রাজনীতি সেটা পরিচ্ছন্ন করে তোলা। তাঁরা পুরানা অবস্থানেই আছেন। যেদিকে ধর্ম ও ইসলামের ব্যাপার আছে তার বিরুদ্ধে পুরানা খাসিলত অনুযায়ী অবস্থান নেওয়াই তাঁরা এখনো জরুরি মনে করছেন। এই নির্বিচার ইসলাম বিরোধিতাই বাংলাদেশে বামপন্থার মধ্যে ক্ষয় ও ধস নামিয়েছে।

বর্তমান বাস্তবতায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক মেরুকরণের চরিত্র বিচার করে তাঁরা তাঁদের অবস্থান নেননি। ধর্ম নিরপেক্ষতার জায়গা থেকে ইসলামপন্থী দলগুলোর সঙ্গে বিরোধের জায়গা তাঁদের অবশ্যই থাকতে পারে। আছেও। কিন্তু তাঁদের নির্বিচার ইসলাম বিরোধিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রথম আলোর রাজনীতির পক্ষাবলম্বন। বামপন্থী বা স্যেকুলারিস্টদের যেসব বিবৃতি পড়েছি তাতে পরিষ্কার যে তাঁরা প্রথম আলোর পক্ষে– অর্থাৎ প্রথম আলোর রাজনীতির পক্ষেই অবস্থান নিয়েছেন। এই রাজনীতির পর্যালোচনা করাকে তাঁরা জরুরি বলে মনে করছেন না। ইসলামপন্থীদের ঠেকানো এবং ঠ্যাঙানোই তাঁদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরো ব্যাপারটিকে অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংবেদনশীলতার ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছেন তাঁরা। যে রাজনৈতিক অভিসন্ধিকে বামপন্থীরা নিন্দা করছেন সেই রাজনীতি তো আসলেই প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, সিপিডি ও চ্যানেল আইয়ের রাজনীতির বিরুদ্ধে। এই বিরোধিতায় যদি তাঁদের আপত্তি থাকে তাহলে উভয় ধারার রাজনীতির পর্যালোচনা করে রাজনৈতিক মেরুকরণের নতুন চিহ্নগুলো তাঁদেরকেই স্পষ্ট করতে হবে।

ধর্ম নিরপেক্ষতার রাজনীতির ভালমন্দ তর্ক বাদ দিয়েও ইসলামপন্থী দলগুলোর বিরোধিতা করবার বহু পথ আছে। প্রয়োজনও রয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রতিবাদ-বিক্ষোভের রাজনৈতিক মর্ম উপেক্ষা করে একে নিছকই মুসালমানদের ধর্মীয় অনুভূতির ওপর আঘাত আকারে হাজির করবার অতিশয় বিপজ্জনক দিক সম্পর্কেও তাঁরা হুঁশিয়ার নন। ইসলামপন্থীরা যেভাবে ঘটনাটির ব্যাখ্যা করে তাদের রাজনীতি সাজিয়েছে, বামপন্থীদের ব্যাখ্যাও একই। আর ঠিক এখানেই বামপন্থার চরম ব্যর্থতা ধরা পড়ে। যে কোনো অনুভূতিরই একটা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দেবার একটা মার্কসীয় কর্তব্য আছে তাঁরা সেই কর্তব্য পালনে ব্যর্থ।

প্রথম আলোর কার্টুন নিয়ে যে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ শুরু হয়েছে তাকে প্রশমনের জন্য ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হয়েছে সরকার, আলেম-ওলামাদের একটা অংশ ও সম্পাদকদের মধ্যে। প্রথম আলোর সম্পাদক অঙ্গীকার আর তওবা করেছেন

যে তিনি ভবিষ্যতে আর এই ধরনের ভুল করবেন না এবং ইসলাম সম্পর্কে উস্কানিমূলক কোনো লেখালিখি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রথম আলোতে হবে না। এই আপোশ সভা হয়েছে গত বৃহস্পতিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ইসলামি ফাউন্ডেশান কার্যালয়ে।

খতিব মওলানা উবায়দুল হক মতিউর রহমানের অঙ্গীকার ও তওবার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে মাফ করে দেবার জন্য ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি একজন শ্রদ্ধাভাজন মওলানা হিশাবে ধর্মের জায়গা থেকে অবশ্যই অন্যান্য ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে আরজি পেশ করতেই পারেন; উপদেষ্টা সরকার ও সম্পাদকদের সাক্ষী মেনে ও তাঁর কাছে তওবাতিল্লা করে মতিউর রহমান আর কখনো এই ধরনের কাজ করবেন না বলে কথা দিয়েছেন, অতএব তাঁকে মাফ করে দেওয়া হোক। ইসলাম ক্ষমার ধর্ম। খতিব মওলানা উবায়দুল হক নিশ্চয়ই নিজে মতিউর রহমানকে ক্ষমা করে অন্য সকলকে ক্ষমা করে দিতে বলছেন। মানুষ অবশ্যই ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে খতিব সাহেব ক্ষমার আহ্বান জানালেও ক্ষমার আদর্শে উদ্দীপিত নাগরিকদের সংখ্যা বাংলাদেশে যেন বড়ই কম। তবে খতিব উবায়দুল হক সাহেবের একটা বড়ো লাভ হয়েছে। বাংলাদেশের 'কমিউনিস্ট', 'বামপন্থী', 'প্রগতিশীল', 'ধর্ম নিরপেক্ষ' ইত্যাদি পরিচয়ে যাঁরা বিশেষভাবে পরিচিত তাঁরা মতিউর রহমানকে ক্ষমা করে দেবার প্রশ্নে তাঁর কাতারেই এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রথম আলোর পক্ষে 'ধর্মীয় অনুভূতি'র যে বরাত তারা দিচ্ছেন আগে প্রমাণ করতে হবে যে প্রথম আলোর রাজনীতির সঙ্গে এই কার্টুনের সম্পর্ক নাই। ঘটনাটি আকস্মিক এবং কাজে কাজেই দুঃখজনক। কিন্তু এই কার্টুন তো প্রথম আলোর রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

বামপন্থীরা বলছেন যেখানে বায়তুল মোকাররমের খতিব সাহেব স্বয়ং মাফ করে দিয়েছেন, তারপরও কিছু লোক এই বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে কেনো? কেনো তারা মিটিং মিছিল করছে? এতো বড় দুঃসাহস যে তারা সেটা করছে প্রকাশ্য রাজপথে রীতিমতো 'জরুরি অবস্থা' ভঙ্গ করে! কেন সরকার এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না এটাও তাঁদের প্রশ্ন। মওলানা মাশায়েখদের চেয়েও ইসলামের দরবারে মতিউর রহমানকে ক্ষমা করে দিতে কমিউনিস্ট ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাই যেন অতি বেশি উৎসাহী এবং আগ্রহী। ধর্মের দরবারে ক্ষমা পেয়ে গেলেও রাজনীতির দরবারে ক্ষমা পাওয়া তো কঠিন।

রাজনৈতিক লড়াই রাজনৈতিকভাবেই দানা বাঁধবে। বাঁধুক এবং এই তর্কগুলো যতো সরল ও সিধাভাবে আমরা পরস্পরের সঙ্গে করতে পারব ততোই আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ মত তৈরি করতে পারবো। মতিউর রহমান তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। সেটা তিনি নিজেও উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে আমার ধারণা। নইলে তিনি

খতিবের কাছে ক্ষমা চাইতে যেতেন না। মত প্রকাশের স্বাধীনতার ধূয়াই তুলতেন। ক্ষমা করা বা না করা রাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রামে অবান্তর। কিন্তু রাজনীতির বাইরেও কিছু নীতিগত পরিমণ্ডল থাকে যেখানে আমরা ব্যক্তি হিশাবে নিজের নৈতিক শক্তি ও সাহস প্রদর্শন করি। এই ক্ষেত্রে আমি বিস্মিত হয়েছি যে মতিউর রহমান কার্টুনিস্ট আরিফুর রহমানের দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে বহন করেননি। সম্পাদক হিশাবে এই কার্টুনের সমস্ত দায়দায়িত্ব মতিউর রহমানের নিজেরই বহন করা উচিত ছিল। এখানে তাঁকে আমার অতিশয় ক্ষুদ্র মনে হয়েছে। কার্টুনিস্টকে জেলে পাঠানোর চেয়ে তাঁরই উচিত ছিল সকল দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে বিদ্যমান আইনে বিচার চাওয়া।

বামপন্থী দলগুলো যে দলটির বিরুদ্ধে সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলছে সেই দলটি বয়সে অতি অল্প দিনের। কেনো একটি দল অল্প কয়েক বছরে এতো দৃশ্যমান ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তার একটি রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিতে পারলেই বামদলগুলো বরং ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারতো এবং নিজেদের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থান আরো শক্তিশালী করতে সক্ষম হতো। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই দলটি পরাশক্তির সমর্থনে ক্ষমতার এই বদলকে সমর্থন দেয়নি। বাংলাদেশের রাজনীতিকে তারা আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনীতির আলোকেই পর্যালোচনা করবার চেষ্টা করেছে এবং বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করবার রাজনীতির বিরোধিতা করেছে। জেল জুলুম হুমকি উপেক্ষা করে তাদের তৎপরতা চালিয়ে গিয়েছে।

ট্রুথ কমিশন নাকি তামাশা

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথের এশিয়াবিষয়ক পরিচালক জন ডেনিস তথাকথিত ট্রুথ কমিশন সমর্থন করছেন না। তওবা করে পাপ খালাস করবার একমাত্র অধিকারী শুধু ব্যবসায়ীরা হবেন, এটা শুনতেই তো খারাপ লাগে। তাছাড়া কেউ দুর্নীতি করে কারাভোগ করবে, আর কেউ তওবা করে পাপমুক্ত হবে- গণতন্ত্রের ন্যূনতম নিয়মকানুনের মধ্যে এই কারবার খাটে না। রাজনীতিবিদরা আর্থিক দুর্নীতি করলে জেলহাজত খাটবেন আর ব্যবসায়ীরা দুর্নীতি করলে খালি তওবা করে মাফ পেয়ে যাবেন এটা কি হয়? হয় না। ডেনিস বলেছেন, "সবার জন্য এক নীতি হওয়া দরকার। কারও জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেবার দরকার নাই।"

সাহেবরা বলেছে বলেই তাদের দোহাই দিয়ে এখানে আমরা ট্রুথ কমিশন নিয়ে কথা বলতে বসিনি। বরং সাহেবরা হঠাৎ এতো নীতিবান হয়ে উঠতে চাইছে কেনো তাতেই আমাদের সন্দেহ বেড়েছে। ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর নেতৃত্বে পরাশক্তি বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটিয়ে যে অর্থনৈতিক ফায়দা আদায় করতে চেয়েছিলেন, এই সরকারের সঙ্গে তার ষোল আনা বনিবনা কি তাহলে হয়নি? যেমন, এশিয়া এনার্জি ও টাটার বিনিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত এই লেখা অবধি আটকে আছে। এমনকি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ধমকধামকির পরেও। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক বিনিয়োগ কিম্বা অন্য যে কোনো নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য এই সরকারের বৈধতার প্রশ্ন একটা বড়ো প্রতিবন্ধকতা। এই সরকারের এখতিয়ার নাই তবু ধরা যাক গায়ের জোরে সরকার কোনো একটা নীতি ঘোষণা করলো, কিম্বা চুক্তি করলো– কিন্তু নির্বাচিত সরকার যদি তা ছুড়ে ফেলে দেয়? শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে মাইনাস করে 'সংস্কারবাদী' কর্মসূচির পক্ষে জনগণ হুমড়ি খেয়ে পড়বার যে উৎফুল্ল ধারণা ঢাকার কূটনৈতিক দূতাবাসগুলোর ছিল, সেখানে ভাটা পড়েছে। শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের মোহভঙ্গ এবং ছাত্রদের বিক্ষোভ টনক নড়িয়েছে অবশ্যই। এখন দুই নেত্রীর 'মাইনাস' ফর্মুলা বাদ দিয়ে বরং যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের কারাগারে রেখে তাদের ছাড়াই নির্বাচন করতে পারাটাই হবে বিশাল অর্জন। কূটনৈতিক মহলের ধারণা এটা 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল' ধরনের নীতি– একধরনের 'মাইনাসকরণ' প্রক্রিয়া। অন্তত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে তো খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে বাদ দেওয়া গেলো। (সেটা সম্ভব হবে কি না একমাত্র আল্লাই মালুম!)। পরাশক্তি অতএব ট্রুথ কমিশনের মতো ঝুটঝামেলা বাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়া, ঘরোয়া রাজনীতি চালু করা ইত্যাদির জন্য চাপ দিচ্ছে। জরুরি অবস্থা জারি থাকলে জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে এবং রাজনৈতিক দলগুলো তাকে কাজে খাটিয়ে কি না আবার করে ফেলে! অতএব রাজনীতি ঘোলা করে দিয়ে দুর্নীতিপরায়ণ ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের আবার যত শীঘ্র সম্ভব মাঠে নামানো দরকার। নামাতে না পারলে রাজনীতিতে জনগণের ভূমিকা বাড়বে। বিপজ্জনক। বাংলাদেশের জনগণ খ্যাপা মোষের মতো কোনো দিকে ছোটে তার গ্যারান্টি কেউই দিতে পারছে না। অতএব...

উপদেষ্টা সরকারের 'ট্রুথ কমিশন' সংক্রান্ত ধারণা রীতিমতো তামাশার মতো শোনাচ্ছে। এমনকি ব্যবসায়ীরা একে সরাসরি সমর্থন করতে শরমিন্দা বোধ করছে। দুর্নীতিবাজ হলেও রাষ্ট্র নিছকই ব্যবসায়ী বলে ভিন্ন নিয়ম করবে? মাফ করে দেবে? অন্যান্য দেশে গৃহযুদ্ধ, সংঘাত, সংঘর্ষ, মারামারি কাটাকাটির মতো ঘটনার পর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ রাখার একটি প্রক্রিয়া হিশাবে ট্রুথ কমিশন গঠিত ও ব্যবহৃত হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর বর্ণবাদী (apartheid) ব্যবস্থায় যে ভয়াবহ নিপীড়ন

ও নির্যাতন চালিয়েছে, যদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের সেই ঘাতক ও তিক্ত অভিজ্ঞতাকে দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণ পেছনে ফেলে রেখে সামনে এগিয়ে যাবার অঙ্গীকার না করতো তাহলে বর্ণবাদী গৃহযুদ্ধ সেখানে অনিবার্যই ছিল হয়তো। নেলসন ম্যান্ডেলার ট্রুথ এন্ড রিকনসিলিয়েশান কমিশন সে কারণে বিশেষ মনোযোগ কাড়ে। দোষী ও ভুক্তভোগী উভয়েই যখন তাদের জাতীয় ইতিহাসের তিক্ত স্মৃতিকে মোকাবিলা করবার সিদ্ধান্ত নেয় তখন তার মনস্তাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং আইনী তাৎপর্য খুবই গভীর হয়ে ওঠে।

যেটা জানা দরকার– (এক) সাধারণত এটা মানবাধিকার লঙ্ঘন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অপরাধের সঙ্গেই প্রাসঙ্গিক। ব্যবসাবাণিজ্যের দুর্নীতির ব্যাপার নয়। কিন্তু বাংলাদেশের ট্রুথ কমিশনে বলা হচ্ছে দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের কথা। কেনো? কারণ এই সরকার যদি সামনের দিনগুলোতে টিকে থাকতে চায় তাহলে দুর্নীতিবাজ ও দুর্বৃত্তবাজদের সঙ্গে হাত মেলানো ছাড়া তার কি আর পথ আছে? অতএব যে সকল ব্যবসায়ী দুর্নীতি করেছে এখন তাদের ট্রুথ কমিশনের হাইকোর্ট দেখিয়ে মাফ করে দেবার কেচ্ছা ফাঁদা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মীদের কাছে বরং তর্ক হচ্ছে দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের ধরার নামে অর্থনীতি ও ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষতি করে জনগণের জীবন ও জীবিকা এই সরকার যেভাবে ধ্বংস করেছে তা মানবাধিকার লঙ্ঘনের মধ্যে পড়ে কিনা সেটাই বরং আন্তর্জাতিক আইনের দিক থেকে খতিয়ে দেখা দরকার। আমরা দুর্বৃত্তদের কথা বলছি না। শহরে গ্রামেগঞ্জে হাটবাজার ভেঙে দেয়া, হকারদের উচ্ছেদ করা, ছোটো ও মাঝারি ব্যবসা ধ্বংসের কথা বলছি। আজ দৈনিক নয়া দিগন্তের প্রধান একটি খবর হচ্ছে 'তিন হাজার বাজার উচ্ছেদের ফল হচ্ছে আগাম মঙ্গা'।

(দুই) 'ট্রুথ কমিশন' পরাশক্তির অধীন কোনো তাঁবেদার সরকারের কর্ম নয়, এটা বিজয়ী জনগণের দ্বারা গঠিত সরকারের কাজ। এটা আইনী ব্যাপার নয়, কিংবা কারো বিচার বা ক্ষমা করার বিষয় নয়, এটা হচ্ছে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় উপলব্ধির প্রক্রিয়া। সত্যের মুখোমুখি হওয়া এবং মুখোমুখি হওয়ার মধ্য দিয়ে মানসিক ও সামাজিক ক্ষত নিরাময় করা ট্রুথ কমিশনের লক্ষ্য। একদিকে অপরাধী নিজের অপরাধ প্রকাশ্যে স্বীকার করছে, যাঁরা এই অপরাধের ক্ষতি ও ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছেন ট্রুথ কমিশনের সামনে তাঁদের কাছে মাফ চাইবার মধ্য দিয়ে জাতির কাছে অপরাধী মাফ চাইছেন। আইনের দিক থেকে অপরাধের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, কাজে কাজেই তার আইনী বৈধতাও রয়েছে, অথচ পুরো প্রক্রিয়াকে স্থাপন করা হয়েছে আইন-আদালতের ঊর্ধ্বে ইনসাফের জগতে। সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে জনগণ সংকল্প করেছে দেশ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিভক্তি ও বিভাজন যেন না থাকে। দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য তা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। জনগণ এই ধরনের কমিশনকে তাদের দেশ ও জাতি গঠনের ইচ্ছা ও সংকল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যখন সিদ্ধান্ত নেয়, কেবল তখনই

তার মূল্য ও কার্যকারিতা থাকে। ফলে ট্রুথ কমিশনে তারা 'বিচার' দাবি করছে না, রাষ্ট্র বা দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলা নয় এইসব। বরং 'ইনসাফ' কায়েমের এমন এক প্রক্রিয়া যা একই সঙ্গে জনগণকে বিভক্ত করার পরিবর্তে ঐক্যবদ্ধ করে। বাংলাদেশে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পরপরই ট্রুথ কমিশন গঠনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী রাজনীতিবিদ ও জনগণ যে 'সত্য ও আন্তরিক বোঝাপড়া' Truth and Reconciliation Commission গঠন করেছে তাকে এই সকল দিক থেকে অনেকে আদর্শ গণ্য করেন। তার সমালোচনা-পর্যালোচনা থাকলেও এর তাৎপর্য কেউ অস্বীকার করেন না।

ট্রুথ কমিশনের নীতি, ধারণা ও আদর্শিক অবস্থান খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব। উপদেষ্টা-সরকার এটা ভেবেছে কিনা বলতে পারবো না। যে ভিত্তি থেকে 'ট্রুথ কমিশন' ধারণার জন্ম হয়েছে বাংলাদেশী প্রস্তাব তাকে রীতিমতো হাস্যকর করে তুলেছে। খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে যাজকের কাছে নিজের পাপ স্বীকার করে মানসিক যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতির একটা বিধান আছে। ঈসায়ী ধর্মে যাজকের কাছে পাপ স্বীকার করার এই বিধানকেই ট্রুথ কমিশনের সামনে অপরাধ স্বীকারের ব্যবস্থা করে একটা ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র দেয়া হয়েছে।

শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা নয়, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, শাদ, চিলি, ইস্ট তিমুর, ইকুয়েডর, এল সালভেদর, জার্মেনি, ঘানা, গুয়াতেমালা, হাইতি, নেপাল, নাইজেরিয়া, পানামা, পেরু, সার্বিয়া ও মন্তেনিগ্রো, সিয়েরা লিওঁ, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলংকা, উগান্ডা, উরুগুয়ে এবং জিম্বাবুয়েতে ট্রুথ কমিশন বা এই ধরনের কোনো না কোনো প্রক্রিয়া চলেছে।

এগারোই জানুয়ারিতে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার পরিচালক ছিল বাংলাদেশের পাঁচটি দেশের কূটনৈতিক চাকুরেগণ। ঘটনা ভারতের স্বার্থের অনুকূল থাকায় এর ফায়দা লুটবার জন্য ভারত তৎপর হয়ে উঠেছে। এই অর্থে এই পরিবর্তন যে একটি দেশের বিদ্যমান সাংবিধানিক প্রক্রিয়া– যে প্রক্রিয়ায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হবার কথা– সেই প্রক্রিয়া থেকে বাংলাদেশকে সাংবিধানিক, নিয়মতান্ত্রিক ও রাজনৈতিকভাবে বিচ্যুত করে একটি অসাংবিধানিক, অনির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছে। সেনাবাহিনীকে পাহারাদার করে বিশ্বব্যাংক, এডিবি, আইএমএফ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার নীতি ও স্বার্থের প্রাক্তন চাকুরে, সমর্থক কিংবা অবাধ বাজার ব্যবস্থাওয়ালাদের স্থানীয় মুৎসুদ্দিদের দিয়ে একটা 'সরকার' বানানো হয়েছে। একে কখনো 'তত্ত্বাবধায়ক', কখনো 'অন্তর্বর্তীকালীন', কখনো এর সাংবিধানিক চরিত্র উহ্য রেখে অমীমাংসিত ও রহস্যময় রাখা হয়েছে। সেনাবাহিনীকে বোঝানো হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতি খুবই খারাপ অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে, দেশে কোনো দেশপ্রেমিকই আর নাই। দেশের জন্য কিছু করবার এখনই সময়। একই সঙ্গে রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর

ভূমিকা পাকাপোক্ত করবার সুবর্ণ সুযোগ আর আসবে না। অথচ অপরাধ দমনের জন্য ভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী থাকার পরেও দেশ রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত সেনাবাহিনীকে ধরপাকড়ে ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রশ্নবোধক করে তোলা। মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে সকল ঘটনা ঘটেছে তা এখন সেনাবাহিনীর ঘাড়ে গিয়ে চাপবে। যে সেনাবাহিনী নিজ দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নজির রাখে শান্তি মিশনে সেই সেনাবাহিনীর নিয়োগ প্রশ্নবোধক হয়ে ওঠে। এই বিষয়গুলো দেশে ও বিদেশে এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর বিপদ সম্পর্কে পরাশক্তিগুলো অবহিত। ট্রুথ কমিশন গঠনের আজগুবি চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে তাঁরা তাই দ্রুত জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়া ও নির্বাচন করবার ওপর জোর দিচ্ছে। ডেনিস পরাশক্তির মনের কথাই বলেছেন।

ট্রুথ কমিশন প্রস্তাবের তামাশার দিকটা যদি বাদ রাখি তাহলে ব্যবসায়ীদের ছাড় দিয়ে ক্ষমতাসীন সরকার একটি শক্তিশালী শ্রেণীকে নিজের পক্ষে টানার চেষ্টা করছে। এবং সেটা করছে বেশ তাড়াতাড়িই বলতে হবে। বরং এই তাড়াহুড়াটাই বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। জনগণের সঙ্গে এই সরকারের বিচ্ছেদ ঘটেছে এবং এই বিচ্ছেদ বাড়া ছাড়া কমবার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে। ফলে আমরা দেখছি ১১ জানুয়ারির কারণে শাসক ও শোষক শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে দূরত্ব ও বিরোধ তৈরি হয়েছিল সেখানে মলম দিয়ে সারিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। পুরো ঘটনা ঘটানো হয়েছে অর্থনৈতিক দিক থেকে বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থে আর রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে বহুপক্ষীয় ও দ্বিপক্ষীয় দাতা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সুশীল সমাজের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়োজনে। এই সুশীল সমাজের বলয়টা যে শুধু এনজিওদের বলয় নয়, আমরা তা জানি। তার সঙ্গে গণমাধ্যমের একটি অংশও যুক্ত রয়েছে। এদের রাজনৈতিক শ্লোগান হচ্ছে 'সৎ নেতৃত্ব'। মজা হচ্ছে সম্প্রতি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনে এনজিওদের দুর্নীতির কাহিনী ফাঁস হবার পর সৎ মানুষ খুঁজবার রাজনীতিও বিপাকে পড়েছে।

ব্যবসায়ী শ্রেণী এই সরকারের প্রস্তাবে অতি উল্লসিত নয় বলেই মনে হয়। এটা তো পরিষ্কার যে এগারো তারিখের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন বহুজাতিক কোম্পানির আধিপত্য কায়েমের জন্য। ফলে তাদের অস্বস্তি আছে। এর আগে আন্তর্জাতিক পুঁজিকে এই দেশে বিনিয়োগ করতে হলে দেশীয় মুৎসুদ্দিদের দুর্নীতির একটা বড় হিস্যা দিতে হত। যে প্রক্রিয়ায় এই বিতরণ হতো তাকেই এখন 'দুর্নীতি' বলা হচ্ছে। কিন্তু দুর্নীতির মধ্য দিয়েই পুঁজির একটা আদিম সঞ্চয়ন ঘটছিল সেদিকে নজর রেখেই পুঁজির প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দানা বাঁধছিল। ব্যবসায়ীদের কাছে দুর্নীতি দমন মানে পুঁজি গঠন মাত্র। কিন্তু সরকার দাবি করছে, এটা অপরাধ। তওবা করে অপরাধ স্বীকার না করলে সরকার

কাউকে ছাড়ছে না। প্রথমে কাউকেই ছাড়া হবে না বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। চুনোপুঁটি নয়, রুই-কাতলা ধরা হবে বলা হয়েছিল। সেখান থেকে এতো দ্রুত হটে এসে এখন তওবা করে মাফ চাইবার ও মাফ পাবার কথা শুনে ব্যবসায়ীদের খুশি হবার কোনো কারণ নাই। দেশীয় মুৎসুদ্দিদের আভ্যন্তরীণ ঝগড়া ছিল এই যে এটা শুধু মামুন, ফালু, হারিছ একা খাবে কেনো, লুটের মাল ঠিকমতো বণ্টন হোক। শুরুর দিকে তারা ভেবেছিল এগারোই জানুয়ারি যদি এই ধরণের দুর্নীতিবাজদের গ্রেফতার করে তাহলে মন্দ কী?

একটি জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের লক্ষ্যে পুঁজির বিনিয়োগ ও চলনের জন্য যদি কোনো নীতি কায়েম করার কথা হতো, তাহলে সেই নীতির জায়গা থেকে 'দুর্নীতি' কথাটির একটা অর্থ দাঁড়াত। দুর্নীতি দমন হয়েছে কিনা সেটা আমরা তখন জাতীয় অর্থনীতি ও একটি দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর বিকাশের মাত্রা দিয়ে বিচার করতে পারতাম। এখন দুর্নীতি দমনের অর্থ হচ্ছে লুটপাট। দেশীয় কেউ পারবে না, পারবে শুধু অবাধ বাজারের রক্ষক ও ভক্ষক বহুজাতিক কোম্পানি, তখন ব্যবসায়ীদের কাছে 'দুর্নীতি' কথাটির কোনো মানে থাকে না। আরো দেখা যাচ্ছে বখরা বণ্টন তো দূরের কথা আন্তর্জাতিক পুঁজি কাউকেই কোনো বখরা দিতে রাজি নয়।

উপদেষ্টা পরিষদ যে কলে আটকা পড়েছে সেখান থেকে মুক্তি পাবে কিনা আমার সন্দেহ রয়েছে। ড. ইউনূসকে দিয়ে একবার, তারপর মান্নান ভূঁইয়া-আমু-কোরেশীদের দিয়ে রাজনীতির বাজার দখল করবার চেষ্টা কমবেশি ব্যর্থ হয়েছে। এখন শেষ চমকটা দেখছি ড. বদরুদ্দোজার জাতীয় সরকার গঠনের ডাকে। হয়তো আওয়ামী লীগ এই ডাকের মধ্যে বিএনপি ও ইসলামী দলগুলোকে বাদ দিয়ে একধরনের 'আওয়ামী' সরকারই গঠিত হতে যাচ্ছে বলে বুঝেছে।

বাংলায় 'জাতীয়' বললেও তাকে 'আওয়ামী' সরকারেরই ডাক গণ্য করে উৎফুল্ল হয়েছে। আওয়ামী লীগ এই উপদেষ্টা সরকারকে বৈধ করবার রাজনীতির ধারাতেই রয়েছে। এ কারণেই দৃঢ়তার সঙ্গে জিল্লুর রহমান বলতে পারছেন শেখ হাসিনাকে মুক্ত করে তাঁকে নিয়েই তাঁরা নির্বাচন করবেন। জিল্লুর রহমান উপদেষ্টা সরকার ও আওয়ামী আঁতাতের ভিত্তিতে আগামী সরকার গড়বার দিকে যেতে চাইছেন। আঁতাতের জায়গাটা হচ্ছে এই যে উপদেষ্টা সরকার 'আওয়ামী' সরকারকে ক্ষমতায় আনবে আর আগামী সংসদে সেই সরকারই উপদেষ্টা সরকারকে বৈধতা দেবে।

জনগণ এই বিভাজিত প্রক্রিয়ায় সায় দেবে কিনা তাতে ঘোরতর সন্দেহ আছে। এই ধরনের একটি সরকার বিএনপি-জামায়াতের নৈতিক, সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে অসম্ভব নয়। বিশেষত যখন ভারত ও অন্যান্য পরাশক্তি 'ধর্মনিরপেক্ষ' সরকার চাইছে। কিন্তু এই ফর্মুলায় প্রতারণার দিকটা হচ্ছে শেখ হাসিনার মুক্তির কথাটা বলা হবে নিছকই রাজনৈতিক সুবিধাবাদের

জন্য। আসলে তিনি এই হিশাবের বাইরে। পরাশক্তিগুলো যখন দ্রুত নির্বাচন চাইছে, তারা খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা উভয়কে বাদ দিয়েই নির্বাচনের কথা ভাবছে। একটি রাবার স্ট্যাম্প সংসদের জন্য নির্বাচন, যে সংসদের কাজ হবে শুধু বর্তমান সরকারকে সাংবিধানিক বৈধতা দান। দুই নেত্রীকে কারাগারে রেখে একটি রাবার স্ট্যাম্প সংসদের জন্য নির্বাচনের দিকে যদি জিল্লুর রহমান আওয়ামী লীগকে নিয়ে যান তাহলে আওয়ামী লীগের কর্মীরা সেটা কতোটুকু মেনে নেবে বলা মুশকিল। খালেদা জিয়ার অবশ্য আর হারাবার কিছুই নাই। যে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা এই সরকারের জন্য প্রস্থান পথের অধ্যাদেশ অনুমোদন করবে সেখানে সংখ্যালঘু থেকে তাঁর জোটের বিরোধী ভূমিকাই সম্ভবত তাঁকে এখনকার বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করবে।

কিন্তু কী দাঁড়াবে আমরা বলতে পারছি না। এটা শুধু বুঝেছি যে ট্রুথ কমিশন হচ্ছে ব্যবসায়ীদের কাছে সরকারের গ্রহণযোগ্য হবার একটি পদক্ষেপ। কিন্তু ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ এই ধারণা নিয়ে তামাশা করে সরকার নিজের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যই আবার প্রমাণ করলো।

২৪ আশ্বিন ১৪১৪। ৯ অক্টোবর ২০০৭

চাই সহনশীলতা ও আরো বিপর্যয়ের আগে বুদ্ধিমান প্রস্থান

প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ শুনে ও আজ পত্রপত্রিকায় পড়ে কয়েকটি মন্তব্য করবো মাত্র।

প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, তাঁরা দুর্নীতিবাজদের আর কোনো তালিকা প্রকাশ করবেন না। ঘোষণাটি এসেছে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে গ্রেফতারের পরে। বাংলাদেশের আরেক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদকে আগেই পরাশক্তি ও সেনাবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গ্রেফতার করেছে। প্রধান উপদেষ্টা ঘরোয়া রাজনীতিও আজ থেকে করতে দেবেন। এর আগে ছাত্রদের বিক্ষোভ ও সেই বিক্ষোভের পক্ষে গণসমর্থনকে একদিকে অপশক্তির ষড়যন্ত্র আর অন্যদিকে ৮২ হাজার বা মতান্তরে আরো বেশি বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করায় উপদেষ্টা পরিষদ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হাস্যকর হয়ে গিয়েছিল। অপশক্তির ষড়যন্ত্রে আসলে প্রায় লাখ খানেক লোক জড়িত ছিল? এদের মধ্যে অধিকাংশেরই পরিচয়

আবার অজ্ঞাত। এখন দেখা যাচ্ছে প্রধান উপদেষ্টা লাখের সংখ্যা ছত্রিশে নামিয়ে এনেছেন। অথচ যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ঠিক কী, আমরা জানি না। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকলে, কিম্বা থাকলেও 'ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে' শিক্ষক ও ছাত্রদের নিঃশর্ত মুক্তির ঘোষণা দিলে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ তাঁর পক্ষে জনমত তৈরি করতো। সুযোগটা তিনি গ্রহণ না করায় আমি বিস্মিত হয়েছি।

ফলে গলায় অনেক আবেগ ঢেলে টেলিভিশন পর্দায় প্রধান উপদেষ্টা বক্তৃতা দিলেও সেটা হয়েছে নিষ্প্রাণ ও যান্ত্রিক। বোঝা গেলো, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করবার পর মান্নান ভূঁইয়া, আমু ও কোরেশিকে নিয়ে নির্বাচন করবার প্রক্রিয়াটা এখন দ্রুততর হবে। আজ থেকে ঘরোয়া রাজনীতি করা যাবে। বাংলাদেশ ভারী বিচিত্র দেশ! 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার', ঘরোয়া 'রাজনীতি' ইত্যাদি অদ্ভুত ও বিচিত্র সব ধারণা বাংলাদেশে পয়দা হয়েছে। যাই হোক, বোঝা গেলো যে রাজনীতি করতে দেওয়া হবে, তবে সেটা ঘরের মধ্যে। এখন ঘরের মধ্যে করা মানে কি? ঘরটা কতো বড়ো হলে সেটা 'ঘরোয়া' হবে? ড্রইংরুম জাতীয় ঘর? বড়ো সেমিনার হল, যেমন চীনাদের টাকায় এবং তাদের নাম বহন করে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে রাজনীতি করলে কি সেটা 'ঘরোয়া'? নাকি 'বাহিরিয়া রাজনীতি'?

'বাহিরিয়া রাজনীতি'? এটা আবার কোনো বাংলা হলো নাকি? যদি 'ঘরোয়া' রাজনীতি হতে পারে তাহলে 'বাহিরিয়া রাজনীতি'ও হতে পারে। কেনো হবে না? ব্যাপারটা নিছকই ঠাট্টা-মশকরার জন্য বলছি না। এর মধ্য দিয়ে শাসক শ্রেণীর 'রাজনীতি' সম্পর্কে ধারণাও আমরা বুঝতে পারি। উপদেষ্টা পরিষদ ভীত যে তাদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনগণ বিক্ষুব্ধ। এই ক্ষোভ ঠিক কী মাত্রা ও কী রূপ নেবে বা নিতে পারে, তা আগাম বলা মুশকিল। কিন্তু যেন তা দৃশ্যমান গণঅভ্যুত্থানের রূপ না নেয় তার জন্যই এই সতর্কাবস্থা।

প্রধান উপদেষ্টা জানিয়েছেন, দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় টাস্ক ফোর্স দুর্নীতিবাজদের নতুন কোনো তালিকা দেবে না? কেন দেবে না? দুর্নীতি দমনের কথা বলে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে, এখন হঠাৎ তালিকা দেওয়া বন্ধ হবে কেনো? তার মানে উপদেষ্টা পরিষদ তাদের অপছন্দের দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আগ্রহী আর যারা তাদের পক্ষের লোক তাদের সঙ্গে আঁতাত করতে চাইছে? তালিকা না দেওয়ার তো এটাই মানে। আমরা শুরু থেকেই সন্দেহ করেছিলাম যে, পরাশক্তির সমর্থনে এবং পরাশক্তিরই স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য ১১ জানুয়ারি তারিখে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটানো হয়েছে তার উদ্দেশ্য কখনই দুর্নীতি দমন ছিল না। বরং উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করা। দুর্নীতি দমন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং একমাত্র রাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই দুর্নীতিবাজ ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করা সম্ভব।

এই আন্দোলনের লক্ষ্য আইন, আদালত ও আইনী প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা এবং তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার জন্য সামাজিক ও নৈতিক সমর্থন তৈরি করা। দুর্নীতি দমন সামরিক অভিযান নয় যে সেখানে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করতে হবে। সেনাবাহিনীর কাজ বাইরের শত্রুর হামলা থেকে দেশ রক্ষা করা, পেশাদারিত্বের অঙ্গীকার ও উৎকর্ষতা প্রদর্শনের প্রয়োজনে সকল প্রকার রাজনৈতিক অভিলাষ থেকে দূরে থেকে প্রতিষ্ঠান হিশাবে সেনাবাহিনীকে সকল প্রকার বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখা– অথচ সেখানে সেনাবাহিনীকেই ব্যবহার করা হয়েছে দুর্নীতি দমনের জন্য। দুর্নীতি দমন কমিশন থাকা সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর নেতৃত্বেই দুর্নীতি দমনের জন্য জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে।

এখন হাসিনা ওয়াজেদ ও খালেদা জিয়াকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার করার পর বলা হচ্ছে দুর্নীতিবাজদের আর কোনো তালিকা প্রকাশ করা হবে না। মনে হচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই বিশাল অভিযানের একটাই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল– শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে যে কোনো একটা দুর্নীতির অভিযোগ তুলে গ্রেফতার করা এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে আইনী প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা। এর একটা নাম আছে : মাইনাস টু ফর্মুলা। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কর্মীদের কাছে মাইনাস টু ফর্মুলার প্রতারণা কিছুটা ধরা পড়তে শুরু করেছিল। এখন খালেদা জিয়াকে গ্রেফতারের পর প্রধান উপদেষ্টা যখন দুর্নীতিবাজদের তালিকা আর প্রকাশ করবেন না বলে ঘোষণা দিলেন তখন উপদেষ্টা-সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানের অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশিত হলো মাত্র।

এর রাজনৈতিক ফল হবে মারাত্মক। প্রথমত দুর্নীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন জনগণের একটি ইস্যু ছিল অবশ্যই। যে কারণে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর ব্যবহারে তারা বিস্মিত হলেও এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আপত্তি তোলেনি। এখন প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, 'সরকারের অন্যান্য সংস্থা আইন ও বিধি মোতাবেক তাদের দুর্নীতিবিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রাখবে।' তার মানে কি? দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় টাস্ক ফোর্স কি আইন ও বিধি মোতাবেক এই অভিযান করেনি? আইন ও বিধি মোতাবেকই তো দুর্নীতিবিরোধী অভিযান হবার কথা। দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় টাস্ক ফোর্স দুর্নীতিবাজদের তালিকা প্রকাশ করে তো প্রশংসাই কুড়াচ্ছিল। এই তালিকা প্রকাশ কি তাহলে আইন ও বিধি মোতাবেক হয়নি? যদি তাই হয় তাহলে প্রধান উপদেষ্টা সেনাবাহিনী ও সৈনিকদের ওপর কিছু দায় চাপিয়ে দিচ্ছেন যে দায় মোটেও সৈনিকদের নয়, সেনাবাহিনীরও নয়। প্রধান উপদেষ্টার দাবি অনুযায়ী দুর্নীতি দমন কমিশন যদি শক্তিশালীই করা হয়ে থাকে, তাহলে সেনাবাহিনী ও সৈনিকদের ব্যবহার করবার প্রয়োজনও বা পড়েছিল কেন?

এই দিকটি গুরুতর রাজনৈতিক প্রশ্ন হয়ে থাকবে। দুর্নীতিবাজদের তালিকা প্রকাশ করা আর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া যেমন প্রশ্নবোধক হবে, তেমনি নির্বাচিত

সরকার এলে প্রশ্নটি অবশ্যই আইনী দিক থেকেও উঠবে। যেমন, দুর্নীতি রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ কোনো হুমকি ছিল কিনা এবং জরুরি অবস্থার অধীনে এই ধরনের অভিযান বিধিসম্মত ছিল কিনা। মনে রাখতে হবে আমরা সামরিক শাসনের অধীনে নই, 'জরুরি অবস্থা'-র অধীনে, সংবিধান আংশিক স্থগিত, পুরাপুরি নয়।

প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য আরো বিভিন্ন দিক থেকে পর্যালোচনা করা যায়। কিন্তু আজ আমার উদ্দেশ্য সমালোচনা নয়। এটা বুঝতে পারছি সাম্প্রতিক ছাত্র-গণবিক্ষোভকে উপদেষ্টা পরিষদ যতোই তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'অপশক্তির ষড়যন্ত্র' বলে ব্যাখ্যা করুক দেয়ালের লিখন তাঁরা কিছুটা হলেও পড়তে পারছেন। জানুয়ারির এগারো তারিখের বিপর্যয়ের পর আমরা আরো ভয়াবহ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের দিকে ধেয়ে চলেছি। তাঁর বক্তব্যের ইতিবাচক দিকটা নিয়েই আমরা জনগণের পক্ষ থেকে অগ্রসর হওয়ার পক্ষপাতী। তিনি বলেছেন, "....যে কোনো কর্তব্য পালনে ভুলভ্রান্তি হতে পারে। বর্তমান সরকার তার ব্যতিক্রম নয়।" যদি তাঁর এই স্বীকারোক্তিকে আমরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করি তাহলে আমাদের প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে যে ভুল আমরা এগারোই জানুয়ারিতে করেছিলাম। কিন্তু এই ভুল থেকে বের হবার পথ কি? প্রস্থান পথ কোথায়?

আমার মনে হয় নির্বাচন দেওয়া না দেওয়া এখন অত্যন্ত গৌণ বিষয়। সমাজে যে বিভক্তি, বিখণ্ডিভবন, অবিশ্বাস, সংবিধানশূন্যতা ও আইনহীনতা সৃষ্টি করা হয়েছে এই পরিস্থিতি থেকে প্রস্থানের পথ কি হবে? আমরা কি ভয়াবহ সংঘর্ষ ও পরিণামে রক্তক্ষয়ী বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছি? এই বিপর্যয় কোনো ভুল বা ভ্রান্তি থেকে তৈরি হয়নি। একে পরিকল্পিতভাবেই তৈরি করা হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে ভয়াবহ মন্দা, বিনিয়োগে ধস ও এখন সর্বনাশী বন্যায় বাংলাদেশের জনগণের ভবিষ্যত আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। আমরা দ্রুত পথ হারিয়ে ফেলছি।

এই পরিস্থিতিতে উপদেষ্টা পরিষদ যদি মনে করে তাঁরা শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়াকে কারাগারে বন্দী রেখে একটা প্রহসনমূলক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নিজেদের জন্য একটা প্রস্থান পথ বের করতে পারবেন, তাহলে সেটা হবে আকাশ কুসুম কল্পনা। নির্বাচন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু প্রস্থান আর হবে না। বাংলাদেশ একটি দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক সংঘাত ও অস্থিতিশীলতার মধ্যে নিপতিত হবে বলেই মনে হয়।

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি এবং বন্ধুহীন বাংলাদেশের শোচনীয় পরিণতি বিবেচনা করে প্রধান উপদেষ্টার কাছে আমি বিনীতভাবে জানাই, তাঁর অবস্থানগত কারণে তিনি সম্ভবত এই বিপর্যয় থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে পারেন। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাবার আগে এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো

সংঘাতময় ও জটিল হবার আগে তাঁর উচিত হবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে তার নিজের গতিতে চলবার পরিবেশ তৈরি করা। বাংলাদেশের জনগণের মনোভাব যদি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক ওঠাবসা করে আমি বুঝে থাকি তাহলে শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ও খালেদা জিয়ার সঙ্গে আলোচনা ছাড়া মান্নান-আমু-কোরেশিকে দিয়ে তিনি আগামী বিপর্যয় এড়াতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। রাজনীতির যে ক্ষেত্রকে আমরা 'উদার' অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি সহনশীল, অহিংস ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলে গণ্য করি সেই জায়গাটা দ্রুত সংকুচিত হয়ে আসছে। হয়তো রমজানেই তার ধিকি ধিকি আগুন আমরা দেখবো।

শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে যদি দুর্নীতির অভিযোগ থাকে তাহলে আদালতে তা প্রমাণ হোক। দুর্নীতি আমার বিষয় নয়, সেটা দুর্নীতি দমন কমিশনের এখতিয়ার। কিন্তু আমার এখতিয়ার বাংলাদেশের জনগণ– তাদের ইচ্ছা ও সংকল্প। যদি এই বাঘের বাচ্চাদের আমি একাত্তর সালে চিনে থাকি তাহলে এটা সহজেই জানি যে তারা যদি জেগে ওঠে তাহলে কারুরই পালাবার পথ থাকবে না।

এই পরিস্থিতি খুব একটা মন্দ হতো না। কিন্তু আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সকল পক্ষেরই উপলব্ধি করা উচিত এটা একাত্তর সাল নয়। এটাও সকলের জানা দরকার যে এগারোই জানুয়ারির ঘটনা 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধের' অংশ। দুর্নীতিবিরোধী অভিযান একটা বাইরের ছুতা মাত্র। আমরা যদি না জেনে এই ফাঁদে পা দিয়ে থাকি, যদি অজ্ঞানতাবশে ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে, তাহলে সর্বনাশ থেকে ফিরে আসার সময় এখনো আছে বলেই আমার মনে হয়। যদি প্রধান উপদেষ্টা আমার আকুতি বুঝে থাকেন তাহলে তিনি গঠনমূলকভাবে অগ্রসর হবেন। সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী এখনও কাগজের অক্ষর হয়ে যাননি যে রবার দিয়ে মুছে ফেলা যাবে। এটা দুর্ভাগ্য হতে পারে। হোক। যদি তাঁরা অপাঙ্‌ক্তেয় তো জনগণকেই সেই বিচার করতে দিন। এই সরকার অসাংবিধানিক সরকার হলেও বর্তমান পরিস্থিতি থেকে ইতিবাচক প্রস্থানের মধ্য দিয়ে যদি বাংলাদেশকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করবার পথ দেখাতে পারে তাহলে সেটাই হবে তাদের বৈধতার একমাত্র অবলম্বন।

২৬ ভাদ্র ১৪১৪। ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৭ । শ্যামলী।

'সিডর' ও রাজনীতির অন্ধকার দিক

'সিডর' নামে যে তুফান মানুষ, পশুপাখির প্রাণ বিনাশ করে চলে গেল, সুন্দরবনসহ গাছপালা লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল এবং মানুষকে ঘরহারা, ফসলহারা এবং খাওয়া ও পানির অভাবে দিশেহারা করে রেখে গিয়েছে তাকে নিছকই প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলার মধ্যে ঘোরতর নৈতিক ও রাজনৈতিক অপরাধ আছে। প্রকৃতির নিজের কিছু স্বভাব আছে, যা আমাদের জানা। এমন নয় এই ধরনের প্রলয়ঙ্করী তুফান আমরা এই প্রথম দেখছি। দ্বিতীয়ত এমনও নয় উপকূলের মানুষ প্রকৃতির এই ফণা ধরা ও ছোবল মারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। বরং মৃত্যুর মুখে তুড়ি বাজিয়ে বেঁচে থাকাই তারা ঐতিহ্যগতভাবে রপ্ত করেছে।

রপ্ত করা কথাটা আমি গর্বের সঙ্গেই বলতে পারি, কারণ আমার বাড়ি নোয়াখালী। দুর্ধর্ষ মেঘনার নিষ্ঠুর ভাঙন আর তুফান নিয়েই আমার জন্ম। মায়ের কাছে শুনেছি মেঘনা যখন ভাঙে তখন মায়ের বুক খাঁমচে ধরে আমরা পুরানা নোয়াখালী শহর ছেড়েছি। এরপর শৈশব থেকেই তুফান কী জিনিস তা এতোবার দেখেছি যে তা একধরনের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। ঘরভাঙা আমাদের নোয়াখালী সদরে যখন নতুন বাড়ি ওঠে, সেই ঘরও ভেঙেছে প্রায় প্রতিটি তুফানেই। ঝড়ের মধ্যে ভাইবোনরা চিৎকার করতে করতে মাথার ওপর দিয়ে তুফান পার করিয়ে দিয়েছি। ভাঙা ঘরে ছনের ভাঙা চালা বাঁশ দিয়ে ঠেকিয়ে রেখে আম্মা ভাত রাঁধছেন– চতুর্দিকে তাণ্ডবের আলামত– সেই ভাঙাগড়ার মধ্যে ঠুকঠাক আওয়াজ উঠছে, নতুন ঘর উঠবে– সেই ভাতের গন্ধ আর নতুন ঘর বানানোর আওয়াজ আমার কানে লেগে আছে।

সেই সময় 'বিদেশি সাহায্য' বলে কিছু কি ছিল? ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন যেমন কথায় কথায় 'বিদেশি সাহায্য' শুনি, তেমন ছিল না। আমি ষাটের শেষ আর সত্তরে দশকের কথা বলছি। দ্বিতীয়ত মানুষ কেউ বাইরের সাহায্যের জন্য ইন্তেজার করতো না। জীবন থামতো না। প্রলয়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে বিশাল পাখির মতো ডানা তুলে উড়ন্ত হয়েছে আবার মানুষ। আমি এই মানুষগুলি খুবই কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছি। সৌভাগ্য আমার যে রক্তে, স্মৃতিতে ও সংকল্পে আমি যাদের বহন করে বেড়াই তারা এই উপকূলের মানুষ। দুর্ধর্ষ। জীবন্ত। এরা বেঁচে থাকতে জানে।

ফলে মৃত্যুর মুখে তুড়ি দিয়ে বেঁচে থাকা ‘রপ্ত’ করার কথায় আমার গর্ব হয়, তখন প্রকৃতির রোষানলে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি গণনা করিনি, এটা ভাবার কোনো কারণ নাই। প্রকৃতির সঙ্গে এই ধরনের টিকে থাকার মধ্যে মহৎ কিছু ব্যাপার আছে প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মোকাবিলা করার ধরনের মধ্যে এতো দিনে আরো প্রভূত উন্নতি হবার কথা ছিল। হয়নি। কেন হয়নি সেই প্রশ্ন যেহেতু আমরা তুলছি না, সেইখানেই আমাদের নৈতিক অপরাধ। প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণ ও পরিবেশ রক্ষা এবং ক্ষয়ক্ষতি শূন্যে নামিয়ে আনাই ছিল আমাদের কর্তব্য। সেই কর্তব্য আমরা পালন করিনি কেনো? প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার ক্ষমতা, দক্ষতা, জ্ঞান বা ব্যবস্থাপনার কোনোই বিকাশ ঘটেনি। উপকূলের জনগণের প্রতি রাষ্ট্র ও সরকারের দায় বা দরদ কোনোটিই বাড়েনি। এই অবহেলা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। ‘সিডর’ নামক যে প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে মানুষ, জনবসতি, পশুপাখি, গাছগাছালি, শস্য ইত্যাদির ক্ষতি হলো, সেই ক্ষতির দায়দায়িত্ব কে নেবে? প্রকৃতি? মিথ্যা কথা। যারা জেনেশুনেই জনপদকে এই বিপদের মুখে বছরের পর বছর রাখছে তার দায়দায়িত্ব তাদেরকেই নিতে হবে।

সেই কারণে সিডর-এর ক্ষয়ক্ষতিকে ‘প্রাকৃতিক দুর্যোগ’ বলতে আমি নারাজ। এই ধরনের তুফান মোকাবিলার জন্য কোটি কোটি ডলার এসেছে বাইরে থেকে। সরকার খেয়েছে, এনজিওরা খেয়েছে, আমলারা মেরেছে, ব্যবসায়ী কনট্রাকটররা মুনাফা কামিয়েছে– এমনকি ১৯৯১ সালে অপারেশান সি এনজেলের নামে ইরাকিদের রক্তে রঞ্জিত মার্কিন সেনাবাহিনীর হাত বঙ্গোপসাগরে ধুয়ে নিয়ে তাদের ফেরেশতা বানানোর রাজনীতিও হয়েছে। কিন্তু আসল কাজ– প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে প্রাণ ও পরিবেশ রক্ষা করা– সেই কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

ধসে পড়া ছাদে জীবন্ত আটকে পড়া শ্রমিক এবং একশ পার্সেন্ট হালাল ফ্রিজ ও ডিপ ফ্রিজ

আজ, যখন এই লেখাটি লিখছি, দশই ডিসেম্বর– আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস। ফলে এই বিষয়েই আজ লিখবো বলে মনস্থির করেছি।

গতকাল আমি সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। বলা যায়, ঠায় বিছানায় বসেছিলাম অথবা পায়চারি করেছি। চোখ বন্ধ করলেই দেখেছিলাম বেশ কয়েকটি

ল্যাশ ঝুলে আছে ছাদ থেকে। তাদের পা দেখা যাচ্ছে। ক্ষতবিক্ষত। তাদের ধুলামাখা দীনহীন ময়লা জামাকাপড় সারা ঘরে বাংলাদেশের ক্ষতবিক্ষত পতাকার মতো উড়ছে। শেষ রাতের দিকে আমার মনে হয়েছিল সম্ভবত আমি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি। পরিষ্কার চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম ছাদ ধসে গিয়ে শ্রমিকরা আটকে পড়েছে। উদ্ধারের জন্য তাদের বিকট আর্তনাদ সেনা দফতর ও উপদেষ্টাদের ঘুমের বালিশে আহাজারি করে শূন্য সংসদ ভবনের ইটে ধাক্কা খাচ্ছে। আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে গেলেও সুশীল ঢাকা শহর নিশ্চিন্তে সৎ মানুষের রাজনীতি কায়েমের স্বপ্ন দেখছে। শেখ হাসিনা বা খালেদা জিয়ার কারাগারের দেয়ালে সম্ভবত টিকটিকি কিম্বা তক্ষক– কারণ স্বপ্নের মধ্যেও ঘড়ির আওয়াজ শোনা যায়।

চাপা পড়া শ্রমিকেরা কীভাবে মরছে আমি তা আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলাম। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, চাপা থাকার কারণে হাত পা শরীর নড়ানো যাচ্ছে না। রক্তক্ষরণ হচ্ছে। হাত পা ভেঙে গিয়েছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে কি নাই শ্রমিকের পক্ষে, জীবন্ত থাকা সত্ত্বেও অনুমান করা মুশকিল। যদি তৎক্ষণাৎ কেউ মরে গিয়ে থাকে তাহলে সে কিন্তু বেঁচে গিয়েছে। কিন্তু যারা মরেনি, কিন্তু আটকা পড়েছে তাদের কথা যতোবারই মনে আসে ততোবারই স্থির ও সুস্থ থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। মানুষ কি কখনও বাঁচবার আশা পরিত্যাগ করে? করে না। কিন্তু যারা আটকা পড়েছে তারা কি জানে যে এই এক নিষ্ঠুর শহর এবং তদুপরি ক্ষমতায় আছে অনির্বাচিত সরকার– জনগণের কাছে তাদের কোনো দায় নাই, জবাবদিহিতে তারা বাধ্য নয়। তাদের কাছে শ্রমিকের, কৃষকের খেটে খাওয়া জীবনের কোনোই মূল্য নাই। তাদের জন্য কোনো উদ্ধার কাজ চালানো হবে না। ধসে যাওয়া ছাদের নিচে দম বন্ধ হয়েই এই গরিব শ্রমিকদের ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে।

সকালে যথারীতি সংবাদপত্র এলো। দেখলাম ঠিকই। র‍্যাংগস ভবনে ছাদ থেকে এক হতভাগ্য শ্রমিকের রক্তাক্ত পা ঝুলে আছে। শরীরের বাকিটা চাপা পড়ে আছে ওপরে। নিরুত্তাপ খবর যেন শুধু জানান দেবার জন্য লিখছে : 'র‍্যাংগস ভবনকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে উদ্ধার কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। ফলে এই ধরনের ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে থাকা হতাহতদের ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।' (দেখুন, *প্রথম আলো*, ১০ ডিসেম্বর)

র‍্যাংগস ভবনের ছাদ ধসে তিনজনের মৃত্যুর কথা জানা গেছে। পত্রিকার খবর হচ্ছে ভবনের আট তলায় কম করে হলেও ১১ জন শ্রমিক ধসে পড়া কংক্রিটের স্তূপের নিচে আটকা পড়ে আছে। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেছেন : 'র‍্যাংগস ভবন ভাঙার কাজে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান দায়িত্বে রয়েছে। ভবনের মাঝখান থেকে ধসে পড়ার ঘটনা এক অদ্ভুত ব্যাপার। সিলিংয়ের মাঝখান থেকে ভেঙেছে, যা ভাঙার কথা নয়।' (দেখুন *সমকাল* ১০ ডিসেম্বর ২০০৭)

অদ্ভুত ব্যাপার! ঠিকই। কিন্তু ঝুঁকির ছুতায় আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করার কাজ স্থগিত করা আরো অদ্ভুত, আরো বিচিত্র, আরো নিষ্ঠুর, আরো অমানবিক। 'অনাধুনিক' কায়দায় ভবন ভাঙার কারণে শ্রমিকরা যখন ঘুমাচ্ছে তখন ছাদ মাঝরাতে ভেঙে পড়াটা 'অদ্ভুত' বৈকি। কিন্তু আরো 'অদ্ভুত' সেই সরকার যারা চোখের সামনে আটকে থাকা মানুষকে বাঁচাবার প্রাণান্ত চেষ্টা না করে 'ঝুঁকি'-র ছুতায় উদ্ধার কাজ স্থগিত করে। যদি আজ কোনো ধনীর দুলাল আটকা পড়তো এই উপদেষ্টা সরকারই উন্মাদ হয়ে যেত উদ্ধারের জন্য। এ যাবতকাল শ্রমিক ও গরিববিরোধী চোর, ডাকাত, দুর্নীতিবাজ, লুটেরা ধনীদের যে সরকার আমরা দেখে এসেছি শ্রমিক, কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষের শুধু প্রাণ রক্ষার দায় অনুভবের প্রশ্নে তাদের সঙ্গে এদের কোনোই তফাত কি আমরা দেখেছি? দেখিনি। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে উপদেষ্টা সরকারে ঝুঁকির অজুহাতে উদ্ধার কাজ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত ন্যক্কারজনক। এটা জেনেশুনে জীবন্ত মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার শামিল। নাগরিকদের জীবন রক্ষার দায় আছে সরকারের। কিন্তু বড়লোকের জীবন আর গরিবের জীবনের মূল্য কি এক? নিশ্চয়ই না।

২

কিন্তু আহা! ১০০% হালাল ডিপ ফ্রিজ। রেফ্রিজারেটার! খাদ্যের গুণগত মান ও পবিত্রতার ১০০% নিশ্চয়তার গ্যারান্টি দিচ্ছে আপনাকে একটি কোম্পানি। কোরবানি করে এক টুকরা গোশতও কাউকে বিতরণ করতে হবে না। গরিব হোক কি কোরবানির গোশতে কারো হক থাকুক বা না থাকুক, কেউই পাবে না ইনশাল্লাহ। আপনি সব মাংস একাই খেতে পারবেন। কোরবানি তো আপনি দিচ্ছেন আফটার অল নিজেই কোরবানির মাংস খাওয়ার জন্য। তাই না? সারা বছর মাংস খেয়েও আপনার পেট ভরেনি। এখন কোরবানির সময় আচ্ছাসে খেতে হবে। কিন্তু একসঙ্গে তো এতো মাংস খাওয়া যাবে না। আপনার ফ্রিজ লাগবে, অথবা লাগবে ডিপ ফ্রিজ। সবটাই– হাড়মাংসসহ গরু কি ছাগল কি ভেড়া– কিম্বা আরব দেশ থেকে আমদানি হয়ে আসা উট বা দুম্বা– সবই ফ্রিজে বা ডিপ ফ্রিজে বছরব্যাপী– ফিরতি কোরবানি আসা অবধি– আপনি রাখতে পারবেন। কী মজা! এতো সুন্দর কোরবানির ব্যবস্থা থাকলে দুই দশটা গরু কি উট কোরবানি দিতে আর অসুবিধা কি? কোম্পানি দাবি করছে যে 'যুগ যুগ ধরেই নাকি ব্যবহৃত হয়ে আসছে ফ্রিজ কিংবা ডিপ ফ্রিজ।' দারুণ তথ্য, যদিও আমরা কেউই ফ্রিজ বা ডিপ ফ্রিজের এই ইতিহাস কোনোদিন পড়ি নাই। জানি না। তবে আমরা তো মূর্খই ধরে নিতে পারেন। আচ্ছা ফ্রিজ বা ডিপ ফ্রিজ আবিষ্কার হলো কবে? যুগ যুগ আগে? আজ দেখছি সব কাগজেরই প্রথম পাতায় মস্তো করে এই একশ পার্সেন্ট হালাল ফ্রিজ বা ডিপ ফ্রিজের বিজ্ঞাপন।

কোরবানির গোশত আদৌ ঘরে তোলা, এমনকি নিজে খাওয়া আদৌ ইসলামসম্মত কিনা সেই তর্ক ধর্মজ্ঞানীরা করবেন। সেখানে আমার এখতিয়ার নাই। তবে ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি যাঁরা সত্যি সত্যিই ধর্মপ্রাণ তাঁরা আল্লার রাহে যা কোরবানি দিয়েছেন তা আল্লার রাহেই দান করে এসেছেন। যুক্তি হলো মুখে বলছি 'কোরবানি', কিন্তু যদি আমি নিজেই 'ভোগ' করি তাহলে সেটা 'কোরবানি' হয় কী করে? কোরবানির দিন পশু জবাই করলেই কি সেটা কোরবানি হয়ে যায়? মসজিদে, এতিমখানায়, গরিব ও আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যাঁরা হকদার তাঁদের বিলিয়ে দিয়েছেন মুরব্বিরা। অপরের প্রতি– বিশেষত গরিব, এতিম, দুস্থ ও অসহায়ের প্রতি সংহতির মর্যাদা দেওয়াকেই যাঁরা ধর্ম জ্ঞান করেছেন, তাঁরা সেই ধর্মে অটল থেকেছেন– তাঁদের বিশ্বাসের শক্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। সেই বিশ্বাস মানুষের প্রতি– অপরের প্রতি কল্যাণ চিন্তায়, অপরের জন্য জীবনকে গড়ে তোলার সাধনায়। তাঁরা কোরান হাদিস নিয়ে কূটতর্ক করতে রাজি না। তাঁরা সহজ কথা সহজভাবে বুঝতেন : কোরবানির পবিত্রতা কোরবানির মধ্যেই– ত্যাগে। কিন্তু আপনাদের 'খাদ্যদ্রব্যের ১০০% পবিত্রতার কথা বিবেচনা করে' এক মহৎ ও অতি ঈমানদার কোম্পানি এবার বাজারে ছাড়ল '১০০% হালাল ডিপ ফ্রিজ/রেফ্রিজারেটার'। দুর্দান্ত ব্যাপার!! খাওয়ার জিনিসের ক্ষেত্রে হালাল হারাম আছে বলে জানতাম। এখন দেখছি ফ্রিজ আর ডিপ ফ্রিজের মধ্যেও হালাল হারাম আছে। জবরদস্ত খবর!!

এই কোম্পানি আবার তত্ত্বও দিচ্ছে দারুণ। "খাদ্যের গুণগত মান রক্ষা এবং পবিত্রতা রক্ষার বিষয় দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। যেমন– মাংসের গুণগত মান ঠিক থাকলো, কিন্তু মাংসের সাথে যদি হালাল নয় এমন কোনো জিনিস অজান্তেই মিশে যায়, কিংবা এক সাথে রাখা হয় এমন কোনো উপাদানের ছোঁয়া লাগে, সেই ক্ষেত্রেও খাদ্যের পবিত্রতা নিয়ে দ্বিধাবোধ হয়। আর খাদ্যের পবিত্রতা নিয়ে দ্বিধাবোধ সৃষ্টি হলে গুণগত মান যাই থাকুক না কেনো, সেই খাদ্য আর খাওয়ার উপযোগী থাকে না বললেই চলে।"

খাদ্যের পবিত্রতা। দারুণ কথা। কোম্পানি বুঝে গিয়েছে যারা ফ্রিজ/ডিপ ফ্রিজ চায় তারা সব সময় হালাল খায় না। ঐ সব যন্ত্রে বহু হারাম খাদ্য থাকে। এখন কোরবানির গোশতের সঙ্গে যদি ঐ সব হারাম জিনিস মিশে যায় তাহলে তো বিপদ! ধর্ম রাখা চাই, কোরবানির গোশত খেতে চাই, আবার হারাম জিনিসও ফ্রিজে রাখতে হবে। (নইলে ফ্রিজের দরকারটাই বা কি?)। এখন তত্ত্ব হলো এই যে 'খাদ্যের পবিত্রতা' রাখার ব্যাপারটা কোরবানির মধ্যে নাই– সেটা আছে ফ্রিজ বা ডিপ ফ্রিজের মধ্যে। সেখানে যদি হালাল আর হারাম খাদ্য না মিশবার টেকনলজি দেওয়া যায় তাহলে তো কী সুন্দর। কোরবানির 'হালাল' বা 'পবিত্র' মাংসও খাবো আবার অপবিত্র বা হারাম খাওয়াও যাবে। দারুণ যুক্তি!!

এই কাজটা করা হবে দুর্গন্ধ শোষক হিশাবে গোপনে এক ধরনের (100% floral Organism) উপাদান ব্যবহার করে। কিন্তু সেটা আসলে কী, কোম্পানি

সেই ট্রেড সিক্রেট জানায়নি। অতএব সেটা হালাল না হারাম পাঠকদেরও আমরা জানাতে পারলাম না। দুঃখিত।

পাঠক নিশ্চয়ই ভাবছেন একশ পারসেন্ট হালাল ফ্রিজ/ডিপ ফ্রিজের কোম্পানিটির নাম কী? কে আবার? র‍্যাংগস। একদিকে র‍্যাংগস ভবনের ছাদ ধসে শ্রমিকরা আটকা পড়ে আছে। চিড়ে চেপ্টা হয়ে ঝুলে আছে লাশ, জীবিত কি মৃত শ্রমিকদের উদ্ধার কাজ স্থগিত আর ঠিক তখন কিনা প্রায় প্রতিটি গণমাধ্যমের প্রথম পাতা জুড়ে র‍্যাংগস কোম্পানির একশ পার্সেন্ট হালাল ফ্রিজ/ডিপ ফ্রিজের বিজ্ঞাপন! সূত্র দেওয়া আছে আরইএল নিউজ ডেস্ক। গণমাধ্যমগুলোকে ঠিক এই সময়ে বিশাল অংকের বিজ্ঞাপন দেওয়া নিশ্চয়ই কাকতালীয় ব্যাপার নয়। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেছেন, মধ্যরাতে ছাদ ধসে যাওয়া 'অদ্ভুত ব্যাপার'। তার চেয়েও অদ্ভুত এই নির্মানবিক, নিষ্ঠুর ও ভোগবাদী সমাজের প্রতিচ্ছবি। যে সমাজের ধর্ম ফ্রিজ আর ডিপ ফ্রিজের হিমে গিয়ে ঠেকেছে। আজ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে এই শ্রেণী ও তাদের শাসকদের নির্মানবিক অসভ্যতার বিরুদ্ধে ঘৃণা জানানোই নাগরিকদের প্রধান কর্তব্য হয়ে উঠেছে।

৩

কোনো বিশেষ কোম্পানিকে দোষারোপ করা এই লেখার উদ্দেশ্য মোটেও নয়। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে একটি কোম্পানি আর খোদ ব্যবস্থাটা সমার্থক নয়। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে পাতিবুর্জোয়া বা মধ্যবিত্তসুলভ প্রতিক্রিয়াশীল 'বামপন্থা'র যে জয়জয়কার চতুর্দিকে দেখি আমি সেই হীনম্মন্যতার চর্চা করি না। কোনো বিশেষ কোম্পানির বিরুদ্ধে ক্রোধ দেখানোর সস্তা রাজনীতির সঙ্গে একটি বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রাজনীতির গুণগত তফাত রয়েছে– নিদেনপক্ষে সেই হুঁশটুকু আমার আছে। পুঁজির দাস হিশাবে মানুষকে দেখতে না চাওয়াটা অন্য সব কিছুর আগে নীতিগত বা ধর্মের জায়গা। কেনো এই নীতি বা ধর্ম তার যুক্তিপরম্পরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরের কথা। পুঁজির ইতিহাস– অর্থাৎ পুঁজির মুনাফা কামানোর সর্বগ্রাসী প্রক্রিয়াই মানবেতিহাসের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র চালিকা শক্তি এটা মানা যায় না। পুঁজিই পরমার্থ– এই অধর্মে যাঁদের সায় নাই কেবল তাঁরাই মানুষের ধর্ম পালন করেন, পুঁজির ধর্ম নয়। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধর্মকে 'ব্যক্তিগত' করবার দাবি ওঠে কেনো? অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুশীলন থেকে ধর্মকে নির্বাসন দেওয়ার আসল কারণ কী? কেনো আবার? যেন পুঁজির ধর্মই শুধু পালিত হয়, অন্য কোনো ধর্ম নয়। পুঁজির ধর্মই মানুষের ধর্ম– এই সত্যের ওপরই শুধু পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা দাঁড়ায়। অথচ এই গুকথা মানুষের জীবন বা মানুষ হিশাবে যতক্ষণ নিঃশ্বাস ততক্ষণ কোনো মানুষের পক্ষে মানা সম্ভব নয়।

পুঁজি এবং ধর্ম বা মানুষের ইতিহাস চেতনার সঙ্গে মানুষের স্বভাব বা তার ঐতিহাসিক বিকাশের গতিপ্রকৃতি বোঝার কাজ একসময় মনে হয়েছিল শেষ

হয়েছে। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে প্রচুর বাকি আছে। ধর্ম বললেই আমরা ধর্মতত্ত্ব (theology), বিশ্বাস (belief system), ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ধর্মীয় পরিচয় ইত্যাদি বুঝি। বলাবাহুল্য আমরা ধর্ম নিয়ে কথা বলছি।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে দেখি নিজের স্বভাব বা ধর্ম অন্বেষণ না করে মানুষ মাত্রই কীভাবে একেকজন পুঁজির 'খলিফা' বনে যাচ্ছে– অথচ মুখে নানা রঙের ধর্মের কথা, হাতে তসবিহ তাবিজ, ধর্মগ্রন্থ। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে পুঁজির ধর্ম পালন ছাড়া মানুষের ধর্ম পালন অসম্ভব– এই হুঁশ যার এখনও হয়নি, সে এখনো ধর্মের দরজা খুঁজে পায়নি। মজুরি শ্রমিক হিশাবে পুঁজির জন্য মুনাফা কামানো কিম্বা পুঁজির মালিক হয়ে অন্য মানুষকে শোষণ করা, কিম্বা ভোক্তা হিশাবে পুঁজির পণ্য ভোগ করে পণ্যে নিহিত মুনাফা কোম্পানির জন্য উসুল করবার কর্তব্য পালন ছাড়া পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে মানুষের স্বরূপ কই? বাজার থেকে যে পণ্য আমরা কিনি ও ভোগ করি তার মধ্যে পুঁজির মুনাফাও যুক্ত আছে। তাহলে সেই পণ্য কেনা বা ভোগ করা পুঁজির মুনাফা উসুল করা। পণ্ডিতরা বলেছে বলে নয়, এই কাজ কি আমরা করছি না? ফলে র‍্যাংগসের বিরুদ্ধে এই লেখা নয়। এই লেখা আমাদের বিবেক জাগ্রত করবার জন্য। যেন 'মানুষ' কথাটার অর্থ অন্বেষণের জন্য আমাদের ধর্মবোধ জাগ্রত হয়। র‍্যাংগসের ফ্রিজ/ডিপ ফ্রিজ কি শুধু র‍্যাংগসের বিজ্ঞাপন? যাঁরা কোরবানির গোশত ফ্রিজে রেখে সারা বছর খাবার 'বাসনা' করছেন সেই ফ্রিজ ক্রেতা বা ফ্রিজের 'ভোক্তা'দেরও মাংস লোলুপতাও কি এই বিজ্ঞাপনে কুৎসিতভাবে হাজির হচ্ছে না? এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ধনী ও মধ্যবিত্তের চেহারাটাই কি আমরা দেখছি না? এদের পক্ষেই– হ্যাঁ এদের পক্ষেই জীবন্ত শ্রমিকদের র‍্যাংগসের ধসে যাওয়া ছাদের তলায় চাপা পড়ে গোঙাতে গোঙাতে মৃত্যুর ভয়াবহ অবস্থা জানা সত্ত্বেও উদ্ধার কাজ বন্ধ করে দেবার নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া সম্ভব। আমরা এক নির্মানবিক অন্ধকার ও অজ্ঞানতার যুগে বাস করছি। যাকে এক সময় আইয়ামে জাহেলিয়া বলে চিহ্নিত করা হতো। 'আইয়ামে জাহেলিয়া' আরব ইতিহাসে বিশেষ একটি ধর্ম আবির্ভাবের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা মাত্র কি? নাকি মনবিশারদ সিগমুন্ড ফ্রয়েডের ভাষায় 'supra-historcal archetype' বা মহাকালের পৌরাণিক বয়ানের মতো যে গল্প বারবার মানুষের ইতিহাসে প্রত্যাবর্তন করে, সেই ছক। যেন মানুষ নিজেকে নিজে অন্বেষণের সূত্রগুলো আবার খুঁজে নিতে সক্ষম হয়।

পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার একদিকে উৎপাদন, বিজ্ঞাপন ও কৃৎকৌশলের বৈপ্লবিক ও গতিশীল চরিত্র অন্যদিকে তার ধ্বংসাত্মক, অমানবিক ও গণবিরোধী স্বভাবের স্ববিরোধিতা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি আছে। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের অমানবিক ও নিষ্ঠুর করে তোলে– এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে আমাদের মানবিক অধঃপতনের জন্য অর্থশাস্ত্রের ব্যাখ্যা হাজির করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ কেনো

অপরের প্রতি দয়া, মিনতি, বিনয় ইত্যাদির কথা বারবার বলেছে তার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের দিকে আমি পাঠকদের নজর ফেরাতে চাই। অতি সাধারণ মিনতি আমার। অপরের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া, মানুষের দুঃখে কষ্টে ব্যথিত হওয়া, মানুষের দুর্দশার জন্য কাঁদতে পারা– ইত্যাদি নিজের কাছে নিজের ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তনের জন্য মানুষ প্রতিটি কালেই জরুরি জ্ঞান করেছে। যেন পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের ভেতরে ভেতরে মেরে ফেলতে না পারে, যেন আমরা জীবন্ত ভূত না হয়ে যাই, তার জন্য একটা নৈতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা আমাদের নিজ নিজ চেতনার জায়গা থেকেই করা দরকার। এই কর্তব্যটুকুই শুধু আমি মনে করিয়ে দিতে চাইছি। এই অধর্মের যুগে ধর্মের কথা বললে কিছু লোক পারলে মারতে আসে। কিন্তু আমি ধর্মের কথাই বলবো। কারণ ধর্মের কথা বলতে আমি এইসব ইহলৌকিক ব্যাপারগুলিই বুঝে থাকি।

র‍্যাংগস ভবন নির্মাণের অবৈধতা নানা কারণে এগারোই জানুয়ারির পর রাজনীতির প্রধান একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ব্যারিস্টার রফিকুল হক এই ক্ষেত্রে টেলিভিশনে র‍্যাংগস ভবন সম্পর্কে আদালতের রায়ের কথা তুলে বলেছেন, ভবনের যে অংশ বৈধ বলে আদালত সিদ্ধান্ত দিয়েছে ভাঙতে গিয়ে সেই অংশের যদি ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে র‍্যাংগস কোম্পানির অধিকার আছে আদালতে নালিশ জানাবার। তিনি সাবধান করে দিয়েছেন এই সরকার চিরদিনের জন্য আসেনি। আলবৎ। আজ হোক কাল হোক জনগণের সরকার তো আসবে। অতএব হুঁশিয়ার থাকা দরকার। আইনী প্রক্রিয়ার মধ্যেই সকল অন্যায় ও অবৈধতার মীমাংসা হোক। সেটা র‍্যাংগস করুক, কিম্বা র‍্যাংগসের বিরুদ্ধে করা মামলার রায় বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সরকারই করুক, আইন ও বিচার প্রক্রিয়াকে কোনো প্রভাব, প্রতিপত্তি বা হুমকি ছাড়া কাজ করতে দিতে হবে। সেই কাজ করতে গিয়ে যদি দেখি আমাদের বিদ্যমান সংবিধান, আইন ও বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে নাগরিক ও মানবিক অধিকার রক্ষা করা যাচ্ছে না তাহলে সংবিধানের পরিবর্তনের তাগিদ তৈরি হবে সমাজে। সংবিধান ও আইন পরিবর্তন করতে হবে, প্রয়োজনে নতুন সংবিধানও হতে পারে আমাদের। সেটা রাজনৈতিক কাজ, বিচার বিভাগের কাজ নয়। বিদ্যমান সংবিধান ও আইনকে কাজ করতে দেওয়া এবং একই সঙ্গে তার অভাব বা ঘাটতিগুলো চেনার জন্য বিচার প্রক্রিয়ার দিকে রাজনৈতিক নজরদারি তীক্ষ্ণ করাই আমাদের কাজ। সংবিধান ও আইনের অভাব ও ঘাটতিগুলো পূরণের তাগিদকে তখন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নিয়ে আসা সহজ।

গণতান্ত্রিক লড়াই-সংগ্রামের দিক থেকে 'আইনের শাসন' চাওয়ার দাবিটা এই কারণে কৌশলগত– নীতিগত নয়। কারণ আইন মাত্রই গণতান্ত্রিক নয়, কিংবা সংবিধান মাত্রই জনগণের নাগরিক ও মৌলিক অধিকার রক্ষা করে না। [illegible] কোথায় করে না বা কেনো করে না তার জন্যই বিচার বিভাগ ও বিচার প্রক্রিয়ার পরিচ্ছন্নতা জারি থাকা দরকার। বিদ্যমান আইন মাত্রই ভালো, সংবিধান

মাত্রই গণতান্ত্রিক– সমাজের অগণতান্ত্রিক শ্রেণীর এই ভুয়া দাবির সঙ্গে গলা মিলিয়ে 'আইনের শাসন' চাইবার শ্লোগান দেওয়া যাবে না। স্বচ্ছ বিচার ব্যবস্থা চাই যাতে বুঝতে পারি কোথায় সংবিধান ও আইন গণবিরোধী– কোথায় তা নাগরিকদের মানবাধিকার হরণ করে। আইনের শাসন চাই এই জন্য নয় যে আইন কোনো দৈব বা স্থিরনির্দিষ্ট ব্যাপার। বরং এই জন্যই যে আইন ও বিচার প্রক্রিয়ার কাজে পরিচ্ছন্নতা ও জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া জারি থাকলেই কেবল বিদ্যমান সংবিধান ও আইনের সীমাবদ্ধতা ও ঘাটতি আমরা ধরতে পারি। এমনকি সংবিধান ও আইনের সঙ্গে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সম্পর্ক বিচার করাও সহজ হয়। তখন সেই অভাব ও ঘাটতি পূরণের কাজটিকে রাজনৈতিক কর্তব্য হিশাবে চিহ্নিত করা সহজ হয়। রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার মধ্যে সেই ঘাটতি পূরণের জন্য জনগণকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করা যায়। বিদ্যমান সংবিধানে বা আইনে নাই কিন্তু নাগরিক ও মানবাধিকার নিশ্চিত করাবার জন্য জরুরি সেই অভাব বা ঘাটতি একমাত্র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই আদায় ও কায়েম করা দরকার। বিদ্যমান সংবিধান ও আইনের পরিমণ্ডল এবং সক্রিয় রাজনীতি ক্ষেত্রের মধ্যে এই মৌলিক ফারাক আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। কিন্তু যেখানে রাজনীতি অনুপস্থিত, সংবিধান স্থগিত– সেখানে আইন মাত্রই জংলি আইন। বেআইনী ক্ষমতাই তখন আইন হয়ে ওঠে– বিচার ব্যবস্থা তখন থাকা আর না থাকা সমান। এই সেই সময় যখন নাগরিক ও মৌলিক মানবাধিকারের জন্য খুবই দুঃসময়।

কোম্পানির প্রসঙ্গ এখানে তুচ্ছ। ফ্রিজ/ডিপ ফ্রিজের বিজ্ঞাপন নিয়ে কথা তুলেছি আমাদের নিজেদের চেহারা নিজেরা দেখতে পারি কিনা তার একটা পরীক্ষা দেবার জন্য। একবার একটি সিনেমায় দেখেছিলাম একটি বিশাল ফ্রিজের দরোজা খুলছে একটি মেয়ে। আর ঠিক তক্ষুনি ফ্রিজ থেকে গড়িয়ে পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল মানুষের একটি কাটামুণ্ডু, আর ভেতর থেকে ঝুলে থাকতে দেখা গেলো একটি ধড়হীন লাশ। এটা নেহায়েতই সিনেমা বা গল্প। কিন্তু যাঁরা আমার কথা বুঝবেন তাঁরা এবার ঈদে নিশ্চয়ই ফ্রিজের ডালা খুলে ধসে পড়া ছাদের তলায় চাপা পড়ে চিড়ে চেপ্টা হয়ে যাওয়া শ্রমিকের ঝুলন্ত পা দেখতে চাইবেন না। একশ পার্সেন্ট হালাল ফ্রিজ বা ডিপ ফ্রিজ কিনলেও এই রকম ঘটনা যে ঘটবে না তার কি কোনো গ্যারান্টি আছে? আছে কি?

যিনি মানুষে বিশ্বাস করেন। তিনি আমার কাহিনি বুঝবেন। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে এর চেয়ে অধিক আর আমি কী বলতে পারি!

২৬ অগ্রহায়ণ ১৪১৪। ১০ ডিসেম্বর ২০০৭। শ্যামলী।

কয়েকটি বিনীত প্রশ্ন

গত কিস্তির লেখায় ‘ধসে পড়া ছাদে জীবন্ত আটকে পড়া শ্রমিক এবং একশ পার্সেন্ট হালাল ফ্রিজ ও ডিপফ্রিজ’ যে লেখাটি লিখেছিলাম, তাতে পাঠকেরা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিপুল। তাঁদের ধন্যবাদ। এখনো শ্রমিকদের উদ্ধার শেষ হয়নি। অথচ মৃত মানুষ দাফনহীন রেখে প্রধান উপদেষ্টা ও সেনাপ্রধান হজ করতে গিয়েছেন। তাঁরা যেতে পেরেছেন। মানুষ এই ব্যাপারগুলো লক্ষ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হয়।

হজে যাওয়া প্রসঙ্গে আমার দুটো প্রশ্ন আছে। একটি ধর্মতাত্ত্বিক–শরিয়তি বিধিবিধানের প্রশ্ন, অন্যটি সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক। ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্নটি হচ্ছে র‍্যাংগস ভবন ভাঙছে রাষ্ট্রের পক্ষে রাজউক। অতএব যে মানুষগুলো চাপা পড়ে মরলো তার দায়দায়িত্ব রাজউক তথা রাষ্ট্রের। অতএব লাশের দায়দায়িত্বও রাষ্ট্রের– কাজে কাজেই রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান হিসাবে প্রধান উপদেষ্টার। কিন্তু তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন না করে– আটকে পড়া বাকি লাশ উদ্ধার ও দাফন না করে হজে চলে গিয়েছেন। (কিম্বা আদৌ লাশ এখনো আটকে পড়ে আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়াও তিনি জরুরি জ্ঞান করেননি। বেশ তো এই হজে যাওয়া। আল্লাহ তাঁকে বেহেশতে দাখিল করুন।

কিন্তু বাধ্যতামূলক শরিয়তি কর্তব্য পালন না করে এইভাবে তিনি হজে চলে যেতে পারেন কিনা সেই বিষয়ে শরিয়তের বিধিবিধান জানার আমার খুবই ইচ্ছা। কোনো মওলানা মাশায়েখ এই বিষয়ে আমাদের সচেতন করলে আমি খুশি হই। সমাজে ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়। যার অধিকাংশ ফালতু ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। শ্রমিকদের লাশ হওয়া নিয়ে এর আগে যেসব প্রশ্ন তুলেছিলাম তাকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে মানবাধিকারের প্রশ্ন আকারে তুলেছিলাম। কিন্তু সরকার তাতে কর্ণপাত করেছে বলে আমার মনে হয়নি। অতএব এখন শরিয়তের আশ্রয় নিতে পারি কিনা সেই চেষ্টা করছি। অতএব শরিয়তি প্রশ্ন! পাঠক বুঝতেই পারছেন যখন সমাজে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব রাষ্ট্র পালন করে না ঠিক তখনই মানুষ বিদ্যমান সমস্যা ও সংকটের সমাধান খোঁজে অন্যত্র। সেটা ধর্মতত্ত্বই হোক কিম্বা হোক কোনো না কোনো চরমপন্থা। নীতিহীনতা বা স্রেফ বর্বরতা দিয়ে মানুষের সমাজ বা রাষ্ট্র চলতে পারে না।

যদি রাষ্ট্রই র‍্যাংগস ভবন ভাঙার দায়িত্ব নিয়ে থাকে– এই ধরনের একটি স্থাপনা দক্ষ ও বিশেষজ্ঞদের দায়িত্বে না দিয়ে জাহাজ ভাঙা কোম্পানি দিয়ে ভেঙে অমানবিক পরিস্থিতি তৈরি করে থাকে– তাহলে রাষ্ট্রের দায় আছে অবশ্যই। শরিয়তি বিধান মতে অতি দ্রুত লাশ দাফন করবার যে বিধান সেই দিক থেকে এর দায়দায়িত্ব প্রধান উপদেষ্টার নয় কি? অন্যদিকে যেহেতু সেনাপ্রধান রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ও নীতিনির্ধারণে ভূমিকা রাখছেন এবং গণমাধ্যমে তাঁর সরব উপস্থিতি দেখছি– অতএব দায়দায়িত্ব কি তাঁরও নাই? কিন্তু লাশ ফেলে তাঁরা সৌদি আরবে। তাঁদের ধর্মপ্রাণতা এখানে বিষয় নয়। বরং একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিশাবে তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে হজ পালনের অধিকার ক্ষুণ্ন না করে কীভাবে আমরা এই ধরনের পরিস্থিতিতে ধর্মীয় সমাধান দিতে পারি এটাই আমার মওলানা মাশায়েখদের কাছে প্রশ্ন।

রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্ক বিচারের জন্য আরেকটি প্রশ্ন তোলা এখানে জরুরি। কাগজ পড়ে যতোদূর বুঝেছি তাঁরা সৌদি বাদশাহের রাষ্ট্রীয় অতিথি। কিন্তু হজ পালন তো ব্যক্তিগত ব্যাপার। কেউ যেন আবার এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা টেনে নিয়ে না আসেন। অর্থাৎ আমার তর্কের বিষয় ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ কিম্বা ধর্ম ব্যক্তিগত হওয়া না হওয়ার তর্ক নয়। আরো সিম্পল। আমরা হজ করি একজন মুসলমান হিশাবে, রাষ্ট্রপ্রধান হিশাবে কি? একজন মুসলমান হিশাবে নিজের খরচে নিজের দায়দায়িত্বে হজ পালন করাই বিধেয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় খরচে এবং সৌদি বাদশাহের রাষ্ট্রীয় মেহমান হয়ে যে হজ সেটা আবার কেমন হজ? এটাই আমার বিনীত প্রশ্ন। এই ধরনের কোনো বিধান ইসলামে আছে কিনা। এই ধরনের বিধান যদি না থাকে তাহলে রাষ্ট্রীয় খরচে ব্যক্তিগত হজ পালন রাষ্ট্রের দিক থেকে অন্যায়, ঠিক তেমনি ধর্মের দিক থেকেও অপরাধ। তাই কি? মওলানা মাশায়েখ কিম্বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী উভয়কেই অতি বিনীতভাবে আমার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানাবার আহ্বান জানাই। সরকারী টাকায় হজ পালন যদি নিয়ম হয়ে দাঁড়ায় তাহলে ধর্ম ও রাষ্ট্র উভয়ের জন্যই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। এটাই আমার আশংকা। এর আগে যে সকল রাষ্ট্রপ্রধান এইভাবে রাষ্ট্রীয় টাকায় হজ করেছেন তাদেরকেও আমি এই দুইজনের নজিরের সঙ্গে যুক্ত করতে চাই। অর্থাৎ প্রসঙ্গটি তুলছি প্রধান উপদেষ্টা বা সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে আমার বিশেষ ব্যক্তিগত আগ্রহ আছে বলে নয়। বরং আর দশজন যেমন, তাঁরাও তেমনই। তাছাড়া তাঁরা তো আর চিরকাল থাকবেন না। থাকবার জন্য আসেনওনি। কিন্তু যে প্রশ্ন করেছি তার মীমাংসা না হলে প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই যায়। মানুষ মরণশীল। কিন্তু মানুষের প্রশ্ন সময়ের গালে থাপ্পড় মেরে বহু দিন দাঁড়িয়ে থাকে যতোদিন না সেই প্রশ্নের ফয়সালা করে দিতে পারে এমন মানুষের আবির্ভাব হয়।

সোমবারে প্রধান উপদেষ্টা পবিত্র ওমরা পালন শেষে রাজকীয় প্রাসাদে অবস্থান করবেন। রাষ্ট্রীয় খরচে বা রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদার সুযোগে বিদেশি রাষ্ট্রের

আতিথেয়তায় মোটমাট দশজন প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হয়েছেন বলে ইত্তেফাক খবর দিয়েছে। তবে সকলেই নিশ্চয়ই হজ করবেন না। প্রধান উপদেষ্টার সহধর্মিণী নীনা আহমেদ, সেনাবাহিনী প্রধানের স্ত্রী নাজনীন মইন তাদের স্বামীর সঙ্গে হজ করবেন এই এতোটুকু অনুমান যদি করি তাহলে নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না। কিম্বা এটাও অনুমান করা যায় যে বিদ্যুৎ উপদেষ্টা তপন চৌধুরী হজ করবেন না। ঠিক না? ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরী ঠিক কী করবেন আমি হলফ করে বলতে পারবো না। অন্যরা আপাতত অপ্রাসঙ্গিক।

২

আমার একজন পাঠক আমাকে জানিয়েছেন যে র‍্যাংগস লিমিটেড ও র‍্যাগস ইলেকট্রনিকস আগে একই কোম্পানি হলেও এখন আর এক কোম্পানি নয়। হালাল ফ্রিজের বিজ্ঞাপন দিয়েছিল র‍্যাংগস লিমিটেড নয়, র‍্যাংগস ইলেকট্রনিকস। তিনি আমাকে নিজেই আরো তথ্য নিয়ে নিশ্চিত হতে বলেছেন। আমি তাঁর কথা না মানবার কোনো কারণ দেখি না। আশ্চর্য যে আগে এক থাকা কিন্তু এখন ভাগ হয়ে যাওয়া দুটো কোম্পানির কেউই এই দিকটা পাঠকদের জানাবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। র‍্যাংগস লিমিটেড যে অপরাধ করেনি, আমার লেখায় তাদের প্রতি যদি সেই প্রকার কোনো নেতিবাচক ইঙ্গিত থাকে সেটা আমার অজ্ঞানতাবশেই ঘটেছে। আমি নিজের লেখা আবার পড়ে দেখেছি সেই প্রকার কোনো ইঙ্গিত আমি সরাসরি দেইনি। তবু পাঠক যদি কোনো কারণে বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন তা আশা করি এখন পরিষ্কার হবে। খেয়াল করতে হবে আমি বলেছি, নীতিগত প্রশ্নই মুখ্য। বিশেষ কোনো কোম্পানি নয়।

৩

নয় দিন। বিস্তর সময়। হঠাৎ নয় দিনের কথা কেনো? কারণ প্রধান উপদেষ্টা নয় দিন সৌদি আরব থাকবেন। সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ এবং ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ঠিক কতোদিন থাকবেন সেই সংবাদ জোগাড় করতে পারিনি। নিশ্চয় নয় দিন কিন্তু বহুদিন।

কেনো? কারণ 'জরুরি অবস্থা'। দেশে যদি 'জরুরি অবস্থা'-ই বিরাজ করে তাহলে প্রধান উপদেষ্টা নয় দিন দেশের বাইরে কিভাবে থাকেন? আর যদি তিনি দেশের বাইরে নয় দিন থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই দেশে 'জরুরি অবস্থা' জারি করে রাখার পরিস্থিতি নাই। 'জরুরি অবস্থা' বহাল রাখার কি যুক্তি থাকতে পারে? তিন জন উপদেষ্টা ও সেনাপ্রধান নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা দেশের বাইরে তাহলে যান বা দীর্ঘ সময় থাকেন কিভাবে? দেশের পরিস্থিতি যদি এতোই খারাপ হয় তাহলে নয়

দিন দেশের বাইরে থাকার অর্থ হচ্ছে 'জরুরি অবস্থা' জারি রাখার কোনো প্রকার যৌক্তিকতা ছাড়াই বহাল রাখা হয়েছে।

মনে রাখা দরকার কারাগারে দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দলের নেত্রী বন্দী। বিচার প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ দেখছি আমরা। একদিকে বলা হচ্ছে বিচার বিভাগ 'স্বাধীন'। অথচ কার্যত বিচার বিভাগ যেভাবে চলছে তাতে 'স্বাধীনতা' প্রমাণ হয় না, পরাধীনতাই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিশাবে বিচার বিভাগের যে অপরিসীম ক্ষতি হচ্ছে তা পুষিয়ে তোলা আগামীতে অসম্ভব কাজ হবে বাংলাদেশে।

তাহলে কি 'জরুরি অবস্থা' তুলে নেওয়া উচিত বা তুলে নেবার বায়না তুলছি আমি? আসলে ব্যাপারটা বাংলাদেশের জন্য এখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে। সেই সম্পর্কে দুই একটি কথা বলে আজ ক্ষান্ত দেবো।

৪

বাংলাদেশের জনগণের কাছে জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়া, নির্বাচন দেওয়া বা না দেওয়া এখন খুবই অপ্রাসঙ্গিক। তুলে দিলেই বা কী, না দিলেই বা জনগণের কী? ক্ষমতাসীনরা চাইছে তাদের কর্মকাণ্ডের বৈধতা, আওয়ামী লীগ চাইছে শেখ হাসিনাকে বাদ দিয়ে ক্ষমতা দখল। সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভেদ, বিরোধ ও বিভ্রান্তি ঘটাতে আওয়ামী লীগ দারুণ সফল হয়েছে। পরিস্থিতিই আওয়ামী লীগকে এই সুযোগ করে দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে আওয়ামী রাজনীতির প্রশংসা না করে পারা যায় না। এটা আওয়ামী লীগের নগদ রাজনৈতিক লাভ। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে এই সেনাবাহিনী আর সেনাবাহিনী থাকছে না– এই ব্যাপারে সন্দেহ নাই। কিন্তু আওয়ামী লীগ নিশ্চিত জানে যারা এগারোই জানুয়ারিতে অনিয়মতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতার ঘটি উল্টিয়ে দিয়েছে তাদের পক্ষে আওয়ামী লীগের কাছে পুরাপুরি আত্মসমর্পণ করা ছাড়া নিজেদের বাঁচানোর আর কোনোই পথ নাই। ফলে আওয়ামী লীগের দিক থেকে তারা ক্ষমতায় এলে এই সরকারের সকল কর্মকাণ্ডকে আওয়ামী লীগ বৈধতা দেবে– এই ঘোষণা ছিল মোক্ষম শেলের মতো। আমরা অপছন্দ করতে পারি, কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতার রাজনীতি যে কারও চেয়ে ভালো বোঝে। এই অস্ত্র দিয়ে সেনাবাহিনী ও উপদেষ্টা সরকারকে মোকাবিলা করার পর আওয়ামী লীগের প্রধান রাজনৈতিক বাধা ছিল বিগত জোট সরকারের শরিক জামায়াতে ইসলামী। যদি জামায়াতে ইসলামী বিএনপিকে ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে নির্বাচনের ইঙ্গিত করত আওয়ামী লীগ যুদ্ধাপরাধকে রাজনৈতিক ইস্যুতে তৈরি করতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু গত কয়েক মাসে যুদ্ধাপরাধের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ জামায়াতে ইসলামীকে সম্পূর্ণ একঘরে করে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। আগামী নির্বাচনী রাজনীতির জন্য এই মেরুকরণের পরিণতি সুদূর প্রসারী।

আওয়ামী লীগের এই শক্তিশালী অবস্থানের বিপরীতে খালেদা জিয়ার সমর্থকরা চাইছে দুর্নীতির কলংক থেকে বেরিয়ে আসার জন্য রাজনৈতিক পরিবেশ। কিন্তু এখন অবধি সংস্কারপন্থী বা খালেদাপন্থী কেউই বর্তমান বিপর্যয় থেকে কিছু শিখেছেন বলে আমরা কোনো প্রমাণ পাইনি। বিএনপি এখনো কার্যত বিভক্ত। ফলে দ্রুত কোনো রাজনৈতিক অবস্থানে নিজেদের তারা নিতে পারবে সেই আশা করা মুশকিল।

আগের মতো শেখ হাসিনার শাসন বা খালেদা জিয়ার শাসন ফিরে আসুক এটা জনগণ চাইছে বিশ্বাস করা কঠিন। অতএব পুরানা রাজনীতি বাংলাদেশে আর ফিরে আসছে না। এটাও সত্যি দুই নেত্রীকে 'মাইনাস' করবার ফর্মুলা ব্যর্থ হয়েছে। কিম্বা ব্যর্থ করবার যে সকল প্রক্রিয়া আমরা দেখলাম সেই সব যে একান্তই পরদেশীয় এবং পরাশক্তি সমর্থিত সেই বিষয়েও জনগণ নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। ক্ষমতাসীনরা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার চাননি, রূপান্তর তো নয়ই। রাজনীতির সংস্কার বা রূপান্তরের কোনো গ্রহণযোগ্য নীতিবাচক প্রস্তাব তারা আজ অবধি দেননি। শুধু রাজনৈতিক দলগুলোকে গালাগালি ও দোষারোপ করেছেন। সেখানে গঠনমূলক কোনো প্রস্তাব জনগণের কাছে তারা হাজির করতে পারেনি, ফলে আগাগোড়া পুরো ব্যাপারটাকে জনগণ প্রতিহিংসা হিসেবেই ভাবছে, নতুন রাজনৈতিক চিন্তার আবির্ভাবের সম্ভাবনা আকারে মূল্যায়ন করছে না। এখন আর করবেও না। বিচার বিভাগের ভূমিকার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণতার যে রূপ বারবার ফুটে উঠছে তার মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা ও খালেদার প্রতি তাদের ভীতিই প্রকাশিত হচ্ছে। যতো বেশি এই ভীতি প্রকট হচ্ছে ততোই জনগণ শেখ হাসিনা ও খালেদার প্রতি আকৃষ্টবোধ করছে। এই কারণেই আমরা বারবার বলেছি সঠিক পথ ছিল তাদের জামিনে মুক্তি দিয়ে বিচার প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছভাবে অগ্রসর হতে দেওয়া। এখন যে রায়ই হোক জনগণ তা আর বিশ্বাস করবে না। বিচারে এখন কিছুই যায় আসে না। বিচারকদেরও নিজেদের বাঁচিয়ে অর্থাৎ ভবিষ্যতের কথা ভেবে রায় দিতে হবে। তারা আশা করি মনে রাখবেন যে এই অবস্থা বেশিদিন থাকতে পারে না। এখন মীমাংসা একমাত্র রাজনৈতিকভাবেই হবে। নির্বাচন সেখানে গৌণ ভূমিকা রাখবে। অবশ্য যদি আদৌ নির্বাচন হয়।

মোট কথা যাঁরা এগারোই জানুয়ারিতে বিদেশি পত্রপত্রিকার ভাষায় 'অভ্যুত্থান' করেছেন তাঁরা আগাগোড়াই ব্যর্থ হয়েছেন। এর প্রধান কারণ তাঁরা ক্ষমতা দখল করে কী অর্জন করতে চাইছেন সেই বিষয়ে তাঁদের অপরিচ্ছন্ন ও চরম গোঁয়ার্তুমি। বিশেষত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনীতিতে ক্ষমতার যে ভারসাম্য সেই ভারসাম্যের মধ্যে থেকে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করে নেবার যে দৃঢ়তা, প্রতিভা ও কৌশল আমরা তা দেখিনি। যে হাঁকডাক করে তারা এসেছিলেন সেটা যে অন্তঃসারশূন্য এবং ভুয়া সেটা বুঝতে খুব বেশি সময়

লাগেনি। জরুরি অবস্থা তুলে নিলেই জনগণ আওয়ামী লীগ বা বিএনপির ডাকে রাস্তায় নামবে, এটা ভাবা মুশকিল। সে কারণেই কিছু যায় আসে না।

কিন্তু জনগণ সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। সেই সুযোগ যাতে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাবহির্ভূত উভয়কেই তারা এক কাতারে মোকাবেলা করতে পারবে।

৩ পৌষ ১৪১৪। ১৭ ডিসেম্বর ২০০৭। শ্যামলী।

নববর্ষের শিক্ষা : বেনজিরের জীবন থেকে

ইংরেজি বছর শেষ হতে চলেছে। আমার এই লেখা যেদিন বেরুবে সেদিন নতুন ইংরেজি বছর। যাঁরা ইংরেজি বছর অনুযায়ী চলেন তাঁদের এবং যাঁরা জানেন ইতিহাস ও সংস্কৃতি ভেদে আরও নানানভাবে বছর গণনার নিয়ম আছে– উভয়কেই ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা।

নতুন বছরে ভালো কথা বলা রেওয়াজ। কিন্তু ভালো খবর দেবার মতো যদি কিছু না থাকে তাহলে কী করা। বরং বছর শেষে উপমহাদেশ যেন জ্বলে উঠবার জন্য আবার তেতে উঠছে। কিন্তু সেই খারাপের মধ্যেও আমরা কী করতে পারি সেই দিক নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। আজ পাকিস্তান নিয়ে কথা বলবো। উদ্দেশ্য যেন পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকে দুই-একটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

বৃহস্পতিবার বিকালে (২৭ ডিসেম্বর ২০০৭) বেনজির ভুট্টো পাকিস্তানের রাজনৈতিক ময়দানে বলি হয়েছেন। বেনজিরের হত্যাকাণ্ডের জন্য পাকিস্তানি শাসকেরা আল কায়েদাকে দায়ী করে যে গল্প ফাঁদার চেষ্টা করছিল, আল কায়েদার একজন মুখপাত্র তা অস্বীকার করায় সেই গল্পের ফাঁকিঝুঁকি বেরিয়ে পড়েছে। তবুও রেওয়াজ অনুযায়ী ইসলামি সন্ত্রাসীরাই বেনজির ভুট্টোকে হত্যা করেছে, সেই প্রচারই চলছে। সেটা সত্য নাকি মিথ্যা সেটা সুনির্দিষ্টভাবে জানার পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। কখনো হবে কি না বলা মুশকিল। এর পেছনে ক্ষমতাসীনদের বা পরাশক্তির হাত আছে কি না সেটাও বিবেচ্য। কিন্তু জানলেও বেনজির আর ফিরে আসছেন না। পাকিস্তানের রাজনীতিও আগের মতো থাকবে না। শক্তির ভারসাম্য ও টানাপড়েনের সমীকরণ আঞ্চলিক আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর আগের মতো থাকবে না। এটাই বাস্তবতা।

তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের জন্য এই ক্ষতি পূরণ হবার নয়। তাঁর সমর্থক ও অনুসারীদের জন্য এই আঘাত সামলে ওঠা দুঃসাধ্য। যে কোনো

মানুষই এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকাহত হবেন সন্দেহ নাই। ইতোমধ্যে পিপলস পার্টি বেনজিরের ১৯ বছর বয়সী পুত্র বিলাওয়ালকে চেয়ারম্যান আর আসিফ জারদারিকে কো-চেয়ারম্যান ঘোষণা করেছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ খবর হলো পিপলস পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। নওয়াজ শরিফও নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

পাকিস্তানে আইয়ুবি আমলে সামরিক শাসনবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা এবং এখন দেশে-বিদেশে নিজের নামে খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক তারিক আলী ২৯ ডিসেম্বর তারিখে লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় বলেছেন, "তাঁর মৃত্যুতে আমরা স্তম্ভিত হয়েছি, রেগে গিয়েছি..." কিন্তু লেখার প্রথম বাক্যতেই সমালোচনামূলক একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন, "যখন তিনি ক্ষমতায় ছিলেন তখন যেমন এবং এখনও তাঁর আচরণ ও রাজনীতির আমরা কঠোর সমালোচক হলেও" এই মৃত্যু যে কাউকেই মর্মাহত ও স্তম্ভিত করে (A Tragedy Born of Military Despotism And Anarchy)।

ঠিক। যাঁরা তাঁর সমর্থক ও একনিষ্ঠ অনুরাগী, বেনজিরের জন্য তাঁদের আবেগ ও ভালবাসাকেও আমাদের মূল্য দিতে হবে। কিন্তু বেনজির একজন ব্যক্তি মাত্র নন, একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর মৃত্যুর মধ্যে ব্যক্তির যে করুণ পরিণতি আমরা দেখি তা আমাদের মর্মে আঘাত করে ঠিকই কিন্তু একই সঙ্গে তার 'আচরণ' ও 'রাজনীতি' ঐতিহাসিক পর্যালোচনার মুখ্য বিষয়েও পরিণত হয়। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আচরণ ও রাজনৈতিক বিশ্বাস ও তৎপরতা বহু মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বহু মানুষের আশা, ইচ্ছা ও সংকল্পের বাস্তবায়ন হওয়া-না-হওয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যক্তির জীবন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বেনজির ভুট্টোও ব্যতিক্রম নন।

অতএব তাঁর মৃত্যুও। জীবিত বেনজির যেমন, নিহত বেনজিরও ইতিহাসে সমান হাজির থাকবেন। বলা বাহুল্য দুই জনের ভূমিকা এখন দুই রকম হতে বাধ্য। বেনজির জীবদ্দশায় যা করেছেন, করতে চেয়েছেন তার জের যেমন থাকবে, তাঁর মৃত্যুও পাকিস্তানের রাজনীতির আগামী দিনের গতিপ্রক্রিয়া নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তারিক আলীর বয়ানে মনে হয় উচ্ছল কিশোরী বেনজির রাজনীতিতে আসার চেয়ে বুঝি আনন্দময় জীবনের জন্যই তৈরি হচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর বাবা জুলফিকার আলী ভুট্টোর বিচার এবং 'আইনি প্রক্রিয়ায়' ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যার ঘটনা তাঁর জীবনে বড়ো ধরনের পরিবর্তন এনে দেয়। বেনজির বদলে যান। সামরিক শাসন ও সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে একটা লড়াকু মনোভাব গড়ে ওঠে তাঁর। বেনজিরের স্বভাব রাজনৈতিক নেতার ছিল না, তিনি নিজে কূটনীতিক হতে চেয়েছেন। লন্ডনে বেনজির একটা ছোটো বাসায় থাকতেন এবং সেখানে তার সঙ্গে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে বামপন্থি তারিক আলীর নানান বিষয়ে বিস্তর কথাবার্তা হয়। তারিক

আলী জানাচ্ছেন, পাকিস্তানে ভূমি সংস্কার, গণশিক্ষার বিস্তার, স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির প্রতি তাঁর সমর্থন ও তা বাস্তবায়নের সংকল্পও গড়ে ওঠে। বলা বাহুল্য সামন্তবাদী সমাজ ভেঙে একটি গতিশীল পাকিস্তান গড়ে তোলার পূর্বশর্ত এই সব। বেনজিরের এই দিকটা তারিক আলীর বয়ানে পড়তে পেরে তরুণ ও আদর্শবাদী বেনজিরের জীবনের একটি পর্ব আমাদের নজরে আসে। এই দিকটা বুঝতে পারা জরুরি। কিন্তু বেনজির কি এই রকম আদর্শে অবিচল বা সংকল্পে অটল ছিলেন? ছিলেন না। তাঁর এই অবস্থান পরিবর্তনের তাৎপর্য বহু দূর বিস্তৃত।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তাঁর বাবাকে কার্যত খুন করেছে এবং তার জন্য পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বেনজির দাঁড়াতে গিয়ে তাঁর আদর্শকে পিতৃহত্যার বদলা নেবার উপায় হিশাবেই কি গণ্য করেছিলেন? হয়তো করেছেন, হয়তো নয়। সামন্তবাদবিরোধী আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যাপক জনগণকে আকৃষ্ট করে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং একনায়কী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব। হয়তো তরুণ বেনজির আসলেই এই আদর্শে অনুপ্রাণিতই ছিলেন। তা ছাড়া পাকিস্তানের ভূমিসংস্কারের দাবি আজকের নয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আগের অবিভক্ত পাকিস্তানে প্রগতিশীল আন্দোলনের ষাট দশকের কর্মসূচি হচ্ছে ভূমিসংস্কার। কিম্বা তারও আগে থেকেই ঔপনিবেশিক আমলেও ভূমি বা জমিজমাই রাজনৈতিক বিবেচনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিল। বৈপ্লবিক বা সংস্কারমূলক যা-ই হোক, ভূমিসংস্কার ছাড়া পাকিস্তানের সামন্তব্যবস্থাকে ধ্বংস করা অসম্ভব। একই সঙ্গে সামন্ত শ্রেণীর সঙ্গে সামরিক ও বেসামরিক পেটি বুর্জোয়ার আঁতাত– রাষ্ট্রক্ষমতা হিশাবে যার রূপ হচ্ছে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র– তার গণতান্ত্রিক রূপান্তরও অসম্ভব। ফলে যেসব কর্মসূচির প্রতি বেনজিরের আগ্রহ ছিল বলে তারিক আলী আমাদের জানাচ্ছেন, সেই সব কর্মসূচি পাকিস্তানের প্রগতিশীল আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতা। পাকিস্তানকে বাঁচানোর অর্থ হচ্ছে এই ধরনের কর্মসূচিরই বাস্তবায়ন।

অভিজাত ও নিজে সামন্তবাদী সমাজের প্রতিনিধি হয়েও জুলফিকার আলী ভুট্টো পিপলস পার্টিতে এই ধরনের প্রগিতশীল কর্মসূচির আওয়াজ তুলেছিলেন। কিন্তু তার কাছে এই সব আদর্শবাদী কর্মসূচি যে নিছকই ক্ষমতারোহণের উপায় ছাড়া অধিক কিছু ছিল না সেটা বোঝা গেলো যখন নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ী হবার পরেও তিনি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে আঁতাত করে শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে দিলেন না। তিনি ক্ষমতাই চেয়েছিলেন, পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন তার সংকল্পে ছিল না। যদি থাকতো 'তাহলে এই উপমহাদেশের ইতিহাস ভিন্ন রকম হতো। পাকিস্তানের পরবর্তী রক্তক্ষয়ী ইতিহাস সকলেরই জানা। এর পরিণতি জুলফিকার আলী ভুট্টোর জন্যও যে মন্দ বরাত বয়ে এনেছে ইতিহাসই তার সাক্ষী।

আশ্চর্য যে বেনজিরের ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তারিক আলী বলছেন, প্রধানমন্ত্রী হবার পরে বেনজির আবার বদলে গেলো। শুরুর দিকে তার সঙ্গে তর্কাতর্কির উত্তরে তিনি বলতেন, 'দুনিয়া বদলে গিয়েছে', অতএব বেনজির আর 'ইতিহাসের ভুল পথ' ধরে হাঁটবেন না। তার মানে যে সকল কর্মসূচি পাকিস্তানকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সত্যি সত্যিই পরিণত করতে পারত, তিনি আর সেই কাজ করবেন না। সেটা নাকি ইতিহাসের ভুল পথ 'Wrong side of history' । কারণ বাজারব্যবস্থাই সব কিছুর সমাধান করে দেয়– এই বয়ানের তুমুল আধিপত্যের শিকার হয়েছিলেন বেনজির নিজেও। বেনজির আগের কিশোরীও নাই আর আগের আদর্শবাদীও নাই। গণতন্ত্র তার কাছে আর্থ-সামাজিক বিপ্লব, রূপান্তর বা সংস্কার কোনোটাই নয়। নয়া উদারনৈতিক অর্থনৈতিক কর্মসূচির বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই পাকিস্তানের সমস্যার সমাধান– এই পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী নীতি বেনজির আগেই কবুল করে নিয়েছেন। জর্জ বুশ আর টনি ব্লেয়ার বা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে আঁতাত করে পাকিস্তানে নির্বাচনী 'গণতন্ত্র' কায়েম করাই শক্তি অভিলাষী বেনজিরের একমাত্র পণ হয়ে উঠেছে। 'কাজেই' তারিক আলী বলছেন, 'আরো অন্যদের মতো তিনি ওয়াশিংটনের সঙ্গে সন্ধি (peace) করলেন। এটাই এক দশকের বেশি সময় ধরে বিদেশে নির্বাসনের পর শেষমেশ দেশে ফেরার জন্য তাকে মোশাররফের সঙ্গে একটা চুক্তিতে বাঁধল।' ওয়াশিংটনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাস্তবায়নের নতুন মিত্র হিশাবে আমরা বেনজিরের নব্য অভিপ্রকাশ দেখলাম। আর সেই মৈত্রী বা সন্ধির সাফাই গাইবার জন্য মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মতাদর্শিক ভাণ্ডারের সব গল্প, কেচ্ছা বা বয়ান আমরা আবার বিদূষী ও মুসলিম নারী বেনজির ভুট্টোর মুখে পুরানা ভাঙা রেকর্ডের মতো শুনতে থাকলাম। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো যেসব কথা শুনতে অত্যন্ত ভালবাসে। ইসলামই পাকিস্তানের প্রধান ও একমাত্র দুশমন। ধর্মান্ধরাই পাকিস্তানের ইতিহাসের চাকা পেছনে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে। আর তাদের সঙ্গে গভীর আঁতাত রয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর। ইত্যাদি। অথচ কর্তব্য ছিল জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সামন্তবাদের উচ্ছেদসাধন। বেনজির গণতন্ত্রও করলেন না, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মন জয়ের জন্য যে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা ছিল সেটাও করলেন না। তিনি পাকিস্তানকে পাশ্চাত্য অর্থে 'আধুনিক'– অর্থাৎ পরাশক্তির অধীনই করতে চেয়েছিলেন। সেই কাজ তো পারভেজই ভালো করছেন। তার আর দরকার কী ছিল? কেনো? গণতন্ত্র?

অস্বীকার করার উপায় নাই যে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক রূপান্তরে প্রধান বাধা। কিন্তু গণতন্ত্র মানে শুধু নির্বাচন নয়। ভূমিসংস্কার এবং সামন্তবাদী সম্পর্ক ও তার ওপর গড়ে ওঠা আর্থ-সামাজিক ক্ষমতার ভরকেন্দ্র– যার ওপর দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক পুঁজি পাকিস্তানের নিজের

পুঞ্জীভবন ও আত্মস্ফীতি ঘটাচ্ছে– পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক রূপান্তর মানে তাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে আঘাত করবার শক্তি অর্জন। অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির প্রশ্ন বাদ দিয়ে এবং তার ওপর একনিষ্ঠ মনোযোগ না দিয়ে পাশ্চাত্যের পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নকেই মুহতারামা বেনজির ভুট্টো পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি বলে পাকিস্তানের জনগণকে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু জনগণের রাজনৈতিক ইচ্ছা ও সংকল্পকে তার নিজের পক্ষে টানতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। নিজের করুণ মৃত্যুর মধ্য দিয়েই এখন জনগণের কাছে চলে এসেছেন। এটাই তাঁর সর্বোচ্চ অর্জন। তিনি পাকিস্তানের ও উপমহাদেশের জনগণের ভালবাসা থেকে আর বঞ্চিত হবেন না।

পাকিস্তান থেকে আমরা কী শিখলাম? গণতন্ত্র কায়েমের অর্থ পাশ্চাত্য পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন নয়, ওয়াশিংটনের সঙ্গে সন্ধি নয়, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার নীতি ও শর্ত বাস্তবায়ন নয়, বরং বিদ্যমান যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গণবিরোধী অগণতান্ত্রিক শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পোষ্য, দালাল ও মুৎসুদ্দিদের টিকিয়ে রাখে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সেই সম্পর্ক ও নীতির উৎখাত সাধন করা। অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মসূচির প্রশ্ন বাদ দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে গণতন্ত্র কায়েমের চেষ্টাচরিত্রের দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদী নীতি। এই ধরনের অগণতান্ত্রিক শ্রেণীর মধ্যেই আমরা দেখবো সংস্কৃতি ও সামাজিক আচার–বিশেষত ধর্ম সম্পর্কে নানান আজগুবি ও প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণার আধিপত্য। বিশেষত গণতন্ত্রকে ফেরি করবার জন্য পাশ্চাত্য পরাশক্তির ইসলামবিরোধী যে সকল বয়ানগুলো তৈরি করে, তাদের আধিপত্য।

পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের যদি আমরা তুলনা করি তাহলে দেখবো মূলত সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে পরাশক্তির চাপ কাজ করেছে এবং অধিকাংশ সময়ই গণবিচ্ছিন্ন সরকারগুলো সাম্রাজ্যবাদী চাপের মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানির জন্য মুনাফা লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করাকে তারা ‘গণতন্ত্র’ বলে আখ্যায়িত করেছে। অবাধ বাজারব্যবস্থার লুণ্ঠনকে ‘অর্থনৈতিক ব্যবস্থা’ বলে সাফাই গেয়েছে অধিপতি শ্রেণী। যখন সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি মনে করেছে নেতানেত্রীদের এখন ছুড়ে ফেলা যায়– কারণ জনগণের সঙ্গে এদের সম্পর্ক দৃঢ় কোনো আর্থ-সামাজিক ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো নয়– তাদের রাজনৈতিক সমর্থন প্রধানত রাজনৈতিক প্রপাগান্ডা ও বাহ্যিক– তখন তাদের গ্রেফতার করে কারাগারে পুরে রাখতে তাদের এক মুহূর্তও বাঁধে নি। যদি কেউ মনে করেন আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিকে গণমুখী না করে নির্বাচন ও গণতন্ত্রের ফাঁকা বুলি আউড়িয়ে বাংলাদেশে আবার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করা যাবে, তাঁরা পাকিস্তান থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। বোকার স্বর্গে আমাদের আর বাস করা ঠিক না। সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির ক্ষমতার বিপরীতে

একমাত্র সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচিভিত্তিক গণক্ষমতারই অধিষ্ঠান সম্ভব। মাঝখানের আরাম-আয়েশের জায়গা এখন খালি হয়ে গিয়েছে। যারা বিশ্বব্যাংকের চাকরিবাকরি করে পাহারাদারের যোগ্যতা অর্জন করেছে আর যারা সুশীল সমাজের নামে সৎ মানুষ খুঁজে কাহিল হয়ে যাচ্ছে, তাদেরই এখন পোয়াবারো। যে কাজ যাকে দিয়ে হয় তাকে দিয়েই তো সেটা করা হবে। নয় কি? কী দরকার খালেদা জিয়ার বা শেখ হাসিনার?

বলা বাহুল্য, বেনজিরের মৃত্যুর যে দুঃখ তা বাংলাদেশের মানুষের মনেও বাজবে। যদিও বেনজিরের বাবা বা তাঁর পিপলস পার্টির প্রতি বাংলাদেশের জনগণের বিশেষ কোনো দরদ থাকার কথা নয়। কিন্তু পাকিস্তানের রাজনীতির ভরকেন্দ্র সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা গড়ে তুলতে চাইলে আমাদের নজর রাখতে হবে পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের ওপর। একটি মুসলিম দেশ পারমাণবিক শক্তির অধিকারী থাকুক আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরাশক্তি সেটা চাইতে পারে না। এটা বিপজ্জনক। এটা কাণ্ডজ্ঞানেই আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু এর ওপর দখল বা নিয়ন্ত্রণ কায়েমের ধরনটা ঠিক কী রূপ আগামীতে নেবে তা এখনো স্পষ্ট নয়।

দ্বিতীয়ত, জ্বালানির প্রশ্ন। অর্থাৎ আফগানিস্তানের যুদ্ধে ন্যাটোর বিজয়কে নিশ্চিত করা। সম্প্রতি ফরাসি প্রেসিডেন্ট সারকোজি বলেছেন, "যে কোনো মূল্যেই" আফগানিস্তানে ন্যাটোকে জিততে হবে। এই যুদ্ধের সমীকরণে পাকিস্তান প্রধান। এই মূল্য যে নগদে নগদে বেনজির ভুট্টোকে দিয়ে উসুল করা হবে তা তখন তাঁর কথা শুনে বোঝা যায়নি। এখন খানিক পরিষ্কার হচ্ছে। হয়তো পারভেজ মোশাররফও খরচের খাতায় চলে গিয়েছেন। এখন জেনারেল কিয়ানির হাল ধরবার পালা।

অর্থাৎ পাকিস্তানে নতুনভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধের ময়দান সাজানো হচ্ছে। যাঁরা এই যুদ্ধের খোঁজ রাখেন তাঁরা এই যুদ্ধের সীমান্ত যে বাংলাদেশেও এসে ঠেকেছে তা টের পান। পনেরো কোটি মানুষকে নৈরাজ্য, সহিংসতা, সন্ত্রাস ও ক্ষয় থেকে বাঁচাবার কর্তব্য আছে আমাদের।

সেটা সম্ভব যদি আমরা সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে শিখি ও হুঁশিয়ার হয়ে যাই।

১৭ পৌষ ১৪১৪। ৩১ ডিসেম্বর ২০০৭। শ্যামলী।

চালের দাম হু হু করে বেড়েছে, কৃষি উপকরণের জন্য কৃষক মিছিল বিক্ষোভ করেছে এবং বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ প্রায় আসন্ন বলে দেশে ও বিদেশে রব উঠেছে। এগুলো সবই খারাপ খবর। পাঠকদেরও জানা। কিন্তু কৃষি প্রশ্ন নিয়ে আমি আলোচনা করবো গণপ্রতিরক্ষা ও গণনিরাপত্তার দিক থেকে। প্রতিরক্ষার অর্থ শুধু অন্য দেশের সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক সামরিক ব্যবস্থা মাত্র নয়। এই প্রাচীন ধারণা দিয়ে এই কালে কোনো রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। যদি আমরা আমাদের বীজ ধ্বংস করি, জমি নষ্ট করি, প্রাণ ধারণের শর্তগুলো বিনষ্ট করি, মানুষের খাদ্য নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হই তাহলে তা মারাত্মক প্রতিরক্ষা সঙ্কট তৈরি করে। সাম্রাজ্যবাদী দেশ, বহুজাতিক কোম্পানি এবং তাদের এই দেশীয় দালাল ও মুৎসুদ্দিরা কিভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির নামে এবং কৃষিতে নতুন টেকনোলজি প্রবর্তনের কথা বলে খোদ কৃষি ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করছে এবং বর্তমান সরকারের আমলে বীজ বা জার্মপ্লাজমের ওপর তাদের দখলদারি কায়েম করছে সেই দিকগুলো আমরা জানার চেষ্টা করবো। যদি খাদ্যই না থাকে তাহলে প্রাণ বাঁচানোই দায় হয়ে উঠে। তাহলে খাদ্যব্যবস্থার ওপর সার্বভৌমত্ব কায়েম রাখা গণপ্রতিরক্ষার দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এই প্রসঙ্গেও আমরা এক সময় ফিরে আসবো। যদি প্রতিরক্ষার কাজ হয় আমাদের বাইরের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা, তাহলে এটা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানেই আমরা বুঝবো যে একটি জনগোষ্ঠীকে পদানত বা অধীন রাখবার ক্ষেত্রে তাদের খাদ্যব্যবস্থা নিজেদের কব্জায় নিয়ে আসাই খুবই সফল যুদ্ধ নীতি হতে পারে। অর্থাৎ যুদ্ধ না করেও– একটি জনগোষ্ঠীকে পদানত করে রাখা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে বলেই আমার দৃঢ় ধারণা। গণপ্রতিরক্ষা ও গণনিরাপত্তা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নীতি ও কৌশলের অন্তর্গত। অতএব প্রসঙ্গে যাবার আগে এই বিষয়ে কিছু প্রাথমিক মন্তব্য করছি।

বাংলাদেশ পরাশক্তির অধীন হবার এক বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে আগামী ১১ জানুয়ারিতে। এর আগে বাংলাদেশ অবশ্যই আন্তর্জাতিক পুঁজি বা বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনই ছিল। কিন্তু তথাকথিত বাজার ব্যবস্থার অধীন থাকা– অর্থাৎ বাজারের প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারজিত মেনে নিয়ে নিজেদের মতো করে অংশগ্রহণ করা, ভুলত্রুটি আছাড়পিছাড় খেয়ে ঠেকে শিখে

আগানো আর পরাশক্তির সমর্থনে সেনাসমর্থিত উপদেষ্টাদের হুকুমত কায়েম ও জরুরি অবস্থা জারি করা কি এক কথা? ব্যবধান আকাশ পাতাল। এই দুই অবস্থার পার্থক্য বিচার করবার ক্ষমতা অর্জনের ওপর বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। সাম্রাজ্যবাদ অবশ্যই পুঁজিবাদের একটা পর্যায়– সর্বোচ্চ বা শেষ– সেই তর্ক যাই থাকুক– সাম্রাজ্যবাদ আর পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা এক কথা নয়। বাংলাদেশের অভিমুখ বিশ্ব নাগরিক বা সার্বজনীন হয়ে ওঠার মধ্যে– সাম্রাজ্যবাদ সেই আকাঙ্ক্ষায় বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই মানে একটি জনগোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার লড়াই, আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার শর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে আমাদের নিজেদের অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক জীবনের উন্নতি ও সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ নিশ্চিত করা। আমরা নিজেরাই যদি 'নাই' হয়ে যাই তাহলে আন্তর্জাতিকতা কথাটার কোনো অর্থ হয় না। অন্য জাতির দাস বা অন্য রাষ্ট্রের অধীনতা বা বশ্যতা মানবার বিরুদ্ধে অতএব আমাদের প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনো পথ আর খোলা নাই।

এখন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, বিচারব্যবস্থা সকল ক্ষেত্রেই আমরা অন্যের হুকুমের অধীন। আগেও অন্যের হুকুমে আমাদের সরকার চলেছে। কিন্তু নির্বাচিত সরকার চাইলে এবং জনগণের ইচ্ছা ও সংকল্পের ওপর দাঁড়ালে বাংলাদেশ নিজের ভালমন্দের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারার সুযোগ ও সম্ভাবনা অনুপস্থিত ছিল না। এখন রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে আমাদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা প্রায় বিলীন হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। তাহলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের আশু ও অতি প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে জনগণ যেন নিজেরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আবার উদ্ধার করতে পারে তার জন্য নীতি ও কৌশল নির্ধারণ ও গণশক্তির সমাবেশ ঘটানো। এই লড়াইয়ের মীমাংসার মধ্য দিয়েই আমাদের অন্যান্য জাতীয় বিষয়ে গণতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত নেবার পথ ও পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে– করতে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের স্বার্থকে কেন্দ্রে রেখে। এর আগের প্রতিটি সরকারই সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে বেঈমানি করেছে, অথচ প্রহসন যে সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি তাদেরই বিগত দিনের দোসর রাজনৈতিক দলগুলোকে দোষারোপ করে বিশ্বব্যাংকের একজন অখ্যাত চাকরিজীবীকে পনেরো কোটি মানুষের দেশে প্রধান উপদেষ্টা হিশাবে চাপিয়ে দিয়েছে। যে দেশের মানুষ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই দেশ স্বাধীন করেছে তাদের জন্য এর চেয়ে অপমানজনক আর কী হতে পারে?

পাঠক লক্ষ করবেন যে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর রাগ করে একটা শ্রেণী গড়ে উঠেছে যারা খোদ রাজনীতিরই বিপক্ষে। তাঁরা যে শুধু আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে তা নয়– তাঁরা বাংলাদেশ থেকে রাজনীতি চিরতরে উঠে যাক এটাই যেন চান। এই অবস্থান নিয়ে তারা

জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য হাসিল করবার আরাম করে দিচ্ছেন ক্ষমতাসীনদের। এদের অবস্থা হয়েছে সেই প্রবাদের মতো যে চোরে বাসন চুরি করেছে বলে এখন তাঁরা বাসন ছাড়াই মাটিতে ভাত খাবার সংকল্প করেছেন। কিন্তু যারা আওয়ামী লীগ বা খালেদা জিয়ার আমলে রাজনৈতিক দলগুলোর ঘোরতর সমালোচনা করেছে, এমনকি জেল খেটেছে, জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছে, এঁরা তখন এই দলগুলো থেকেই ননি মাখন তুলে নিতে ব্যস্ত ছিলেন।

বিপরীতে আমরা বলেছি শেখ হাসিনা ওয়াজেদ, বেগম খালেদা জিয়া কেউই রাজনীতি করেননি। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। তাঁদের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ তাঁরা দলবাজি, মাস্তানি ও লুটপাট করেছেন। তাঁদের সমর্থকরাও দলবাজি ও মাস্তানি ছাড়া রাজনীতি চর্চা করেনি, রাজনীতি কাকে বলে তার কোনো নজির তারা রাখতে পারেননি। কী তাঁরা চান, দেশকে কোথায় তাঁরা নিতে ইচ্ছুক তার কোনো ছবি বা স্বপ্ন তাঁরা জনগণকে দেখাবার কোনো দায়ই বোধ করেননি। তাঁদের পার্টি ছিল ব্যবসাবাণিজ্য করবার প্রতিষ্ঠানের মতো। এটাই তাঁদের কাল হয়েছে। জনগণ তাদের দেশ ও জনগোষ্ঠীর স্বার্থে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা দিয়েছিল। এর মর্যাদা তাঁরা রাখেননি। তাঁরা তা প্রয়োগ করেছেন টাকা পয়সা কামানো লুটপাটের জন্য। জনগণের ইচ্ছা ও সংকল্পের যতোটুকু প্রতিনিধি তাঁরা হতে পেরেছিলেন ততোটুকু সার্বভৌমত্ব তাঁদের অবশ্যই ছিল– তাঁরা হেলায় তা অপচয় করেছেন। এই সমালোচনাগুলো তাঁরা ক্ষমতায় থাকার সময়ই আমরা করেছি।

কিন্তু যখন দুই নেত্রীকে মাইনাসের কথা উঠল আমরা ঘোরতরভাবে তার বিরোধিতা করেছি। কারণ তাঁরা রাজনৈতিক না হতে পারেন, আমরা এখনো রাজনৈতিক, এবং আমাদের সমস্যার সমাধান যে অরাজনৈতিকভাবে হবে না, একমাত্র রাজনৈতিকভাবেই হতে হবে সেই প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসতে আমরা সক্ষম হয়েছি বলে এক-এগারো সাম্রাজ্যবাদী হানাদারির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে শুরু করে। মনে রাখতে হবে যাঁরা দৃঢ়ভাবে এই নৈতিক বা রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েছেন তাঁরা কেউই খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনার সমর্থক নন, বশংবদ বা পক্ষের কেউ তো ননই। এটা ছিল আমাদের জনগোষ্ঠীর আত্মসম্মান, মর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন। বিউটেনিস বা আনোয়ার চৌধুরীর মতো স্থানীয় কূটনীতিকদের হুকুমে এই দেশ চলবে না– এই আওয়াজটুকু করবার প্রয়োজন হয়েছিল। তাঁরা বাংলাদেশে থাকবেন কি থাকবেন না সেটা বাংলাদেশের জনগণের ব্যাপার। সেটা পরাশক্তির মাথা ব্যথা হতে পারে না।

খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা বা তাঁর দলের লোক বা অন্য কোনো ব্যক্তি যদি দুর্নীতি করে থাকেন তার বিচার আমরা চেয়েছি এবং এখনও দৃঢ়ভাবেই চাই। কিন্তু আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সেটা চেয়েছি সত্যিকারের আদালতে– যে আদালত আইন মোতাবেক চলে, হুমকির মুখে রায় দেয় না। অনেকে এই বলে

বাহবা দিয়েছেন যে যাঁদের গ্রেফতার করা ছিল রীতিমতো অসম্ভব কাজ আজ এই সরকার তাঁদের কারাগারে বন্দী করে বিচার করছে। আহ্, কী সুন্দর!! এই বাহাদুরি হাস্যকর। কারণ জনগণ দুর্নীতিবাজদের বিচার করতে ঠিকই চেয়েছে, কিন্তু কাউকে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত করে নয়, আইনী প্রক্রিয়া ক্ষুণ্ন করেও নয়। কিন্তু আমরা কী দেখছি? বিচার নাকি বিচারের নামে প্রহসন? বিচারের নামে ক্ষমতা নিয়ে দরাদরি। কে রাজনীতি করবে কি করবে না তার শর্ত মানবার জন্য চাপ সৃষ্টি?

জনগণ যেখানে দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক দলের লুটপাট, মাস্তানি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠছিল সেখানে রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার অজুহাতে সাম্রাজ্যবাদ জনগণের সার্বভৌমত্ব হরণ করে নিয়েছে। তাহলে সার্বভৌমত্ব বা ক্ষমতার দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদকে বুঝতে পারা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার চলন ও গতিপ্রক্রিয়ার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের প্রয়োজন রয়েছে অবশ্যই, কিন্তু ক্ষমতাকে শুধু অর্থনৈতিক ব্যাপার হিশাবে বোঝা যাবে না। একটি জনগোষ্ঠী নিজেদের বিষয়াদি নিজের আভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে নিজেরা সিদ্ধান্ত নেবার সার্বভৌম এখতিয়ার রাখে– এই নীতির পক্ষে দৃঢ়ভাবে না দাঁড়ালে কোনো রাষ্ট্রই টিকে থাকতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রশ্ন তাহলে গণশক্তি পুনর্গঠন ও সার্বভৌমত্ব ফিরে পাওয়ার লড়াই। এই সার্বভৌমত্ব বা আমাদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ২০০৭ সালের এগারোই জানুয়ারিতে হরণ করে নেওয়া হয়েছে। অতএব প্রথম কাজ হচ্ছে তার পুনরুদ্ধার। কিন্তু এই পুনরুদ্ধার করবার পাশাপাশি আমাদের নিরিখ রাখতে হবে আরো গভীরে। এই লড়াই কিন্তু এর আগের ঔপনিবেশিক শক্তি বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মতো হবে না। অর্থাৎ এই কালে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই নিছকই শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শন নয়। লড়াইয়ের ক্ষেত্র এখানে শুধু সামরিক নয়, বরং আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। কেনো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই এই কালে ভিন্ন হতে বাধ্য তার পক্ষে নানা কারণের মধ্যে তিনটি প্রধান কারণ এখানে উল্লেখ করছি।

প্রথম কারণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থা ও বাণিজ্য সম্পর্কে পরিবর্তন। বিশেষত আন্তর্জাতিক বাজার ও আন্তর্জাতিক পুঁজির পক্ষে সক্রিয় আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী ও বাণিজ্য সংস্থার কার্য প্রণালী, ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক মতাদর্শ। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ শুধু রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নয়, একই সঙ্গে এই ধরনের আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্য দিয়ে নিজেকে জারি রেখেছে। বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণ কমবেশি জানে, কিন্তু এদের বিরুদ্ধে লড়বার ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে আমাদের এখনও পরিচ্ছন্ন কোনো ধারণা গড়ে ওঠেনি। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা কি করে কাজ করে সেই সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও বিশ্লেষণ ছাড়া এই সংস্থাগুলোকে বোঝা সম্ভব

নয়। অর্থাৎ বিশ্বপুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেনো এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললো এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রকে অবাধ বাজার ব্যবস্থায় বাধ্য করলো সেই দিকগুলো আমাদের জানা দরকার। বিশ্বব্যাংক এই বছর জোর দেবে কৃষির ওপর। কেনো সাম্রাজ্যবাদ কৃষির প্রতি এতো আগ্রহী হয়ে উঠেছে সেই দিকটা আমাদের বুঝতে হবে। এই জানা ও বোঝা সাম্রাজবাদ বিরোধী লড়াই সংগ্রামের নীতি ও কৌশল নির্ধারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় দিক হলো, সার্বভৌমত্বের ধারণায় পরিবর্তন এবং জাতিসংঘের এখতিয়ার ও ভূমিকায় রদবদল। অন্য কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না, এই নীতি এখন আর কার্যকর নাই। যুদ্ধবাজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকলাপেই তা পরিষ্কার। তাহলে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আমরা কী ধরনের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে পারি সেই দিকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে লেখার অবসর হয়তো পরে আসবে। কিন্তু কৃষির দিক থেকে ব্যাপারটি এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে বিকৃত বীজ প্রবর্তনের জন্য যে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং চালাতে গিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রগুলোতে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করছে সেই দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। নজর দেবার একটা প্রাথমিক দিক হতে পারে বাংলাদেশের কৃষিতে ইউএসএইডের ভূমিকা পর্যালোচনা করা। বিশেষত বুঝতে চেষ্টা করা মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগও বাংলাদেশে কেন জিএমও বা বিকৃত বীজ প্রবর্তনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এই দেশে তাদের সহযোগী কারা। মনসান্টো ছাড়াও কোনো কোনো মার্কিন কোম্পানি বাংলাদেশে সক্রিয়।

তৃতীয় যে দিকটা আমাদের মূল প্রসঙ্গে নজর ফেরায় সেটা হলো এই কালে বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের চরিত্র। বলাবাহুল্য বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলে বড়ো ধরনের বিপ্লব ঘটে গিয়েছে, যা মানুষের জীবনের সবকিছুকেই আমূল বদলে দিয়েছে। ফলে তীর-ধনুক দিয়ে বারুদ ও বন্দুকের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে আদিবাসীসহ বহু জাতিগোষ্ঠী যেমন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশল সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে এবং শত্রুর অস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবার প্রতিভা ও দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে আমরা পনেরো কোটি মানুষকে বাঁচাতে পারবো না। সাম্রাজ্যবাদী দুশমনরা যাকে বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশল বলে ও আমাদের ওপর চাপায় ও চাপিয়ে দেয় তাকে প্রশ্ন ও প্রয়োজনে প্রতিরোধ করতে শিখতে হবে। যদি আমরা নিজেদের খাওয়া নিজেরা উৎপাদন করতে ব্যর্থ হই বা আমাদের কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থা যদি অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তাহলে প্রাণ রক্ষাই তো আমাদের দায় হয়ে পড়বে। কিন্তু খাদ্য উৎপাদনের নামে কেউ যদি আমাদের হাইব্রিড বীজ, জিএমও বা বিকৃত বীজে সয়লাব করে দিতে চায়, তাহলে কি আমরা প্রশ্ন করবো না এই বীজ কেনো? এই বীজ কাদের? কোন কোম্পানির?

অল্প কয়েকটি কোম্পানির হাতে বাংলাদেশের খাদ্য ও কৃষিব্যবস্থাকে তুলে দেওয়া কি আসলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নীতিরই অংশ নয়? পনেরো কোটি মানুষের জীবন অল্প কয়েকটি কোম্পানির হাতে জিম্মি করা তো ভয়াবহ ব্যাপার। কৃষকের বীজব্যবস্থা ধ্বংস করে কোম্পানির বীজের বাজার কায়েম করবার নীতি বর্তমান সরকার জোরেশোরে গ্রহণ করে তাদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকেই উদোম করে দিয়েছে। এদের ব্যবহার চলছে প্রধানত আমাদের মতো দেশের খাদ্যব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবার জন্য। বাংলাদেশে কারা এর পক্ষে বলছে শুধু তাদের চেহারা খানিক স্মরণ করলেই আমরা বুঝবো এরা আসলে কী চায়। জনগণ– বিশেষত খাদ্য ও কৃষির ওপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ উৎখাত করে বীজ ও খাদ্যব্যবস্থা অল্প কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানির কুক্ষিগত করবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে বর্তমান সরকার। অথচ মুখে ফেনা ছুটছে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর। ভয়াবহ দিক হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে এখন বলা হয় Biosafety বা প্রাণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, এই কৃৎকৌশলগুলো প্রাণের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপন্ন পরিস্থিতি তৈরি করছে। অথচ তাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এই কৃৎকৌশলগুলোর প্রাণ ও প্রাণের শর্ত উভয়কেই ধ্বংস করে, এই বিপদ বিজ্ঞানীরা জানেন বলেই তাঁরা Biosafety নিয়ে উদ্বিগ্ন। প্রাণের নিরাপত্তা অনিশ্চিত করে একটি জনগোষ্ঠীকে শুধু জীবন বাঁচানোর জন্য পরাশক্তির পদানত ও পদাশ্রিত হতে বাধ্য করার বিপদ এইসকল টেকনলজির ক্ষেত্রে এতোই প্রকট যে খাদ্য ও কৃষিব্যবস্থা আজ গণনিরাপত্তা বা জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। যেসব টেকনলজি প্রাণের শর্ত বিপন্ন করে তোলে, প্রাণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে– কাজে কাজেই একটি জনগোষ্ঠীকে কার্যত সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলতে পারে– সেই সব টেকনলজি সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকবার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচণ্ড তর্কবিতর্ক চলছে, ইতোমধ্যে কিছু কিছু আন্তর্জাতিক বিধিবিধান হয়েছে। তারা অসম্পূর্ণ এবং আদর্শ প্রতিরক্ষার জন্য পুরাপুরি কাজের না হলেও এই বিধিবিধানগুলো অবস্থাভেদে কাজে আসতে পারে। Biosafety বা প্রাণের নিরাপত্তার প্রশ্নকে কোনো দেশই এখন নিছকই নিরাপদ টেকনলজি ব্যবহারের ব্যাপার বলে আর গণ্য করে না, এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে নতুন ধারণা যাকে বলা হয় Biosecurity বা ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক টেকনলজির বিপরীতে প্রাণের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করবার জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় দায়দায়িত্ব। এই ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ও গণমুখী দেশগুলো তাদের সৈনিক ও গণপ্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তি ও সংস্থাকে বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার দিক থেকে উন্নত প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করছে। এই বাস্তবতার বিপরীতে সৈনিকদের আরো গণমুখী এবং গণনিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য আরো বেশি করে বিজ্ঞান ও নিরাপত্তামনস্ক করবার প্রয়োজন রয়েছে। এই যুগে সৈনিকতার অর্থ বদলে গিয়েছে। বাংলাদেশের সৈনিকদের আমরা মুদিদোকানি হিশাবে বা কোরবানির গোশত বিতরণের কাজে দেখছি। পনেরো কোটি প্রাণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার

পরিবর্তে বা সীমান্ত রক্ষায় কঠোর ও আত্মত্যাগী দায়িত্বে আরো উদ্বুদ্ধ, সংকল্পে দৃঢ় ও দক্ষ করবার পরিবর্তে সৈনিকদের সেই কাজে ব্যবহারের কোনোই যুক্তি নাই যা অন্য নাগরিকদের পক্ষে অনায়াসেই করা সম্ভব। যদি সৈনিকরা সীমান্ত পাহারার কাজ না করে চাল, ডাল, রেশন বেচাবিক্রি করতে দেখা যায় তাহলে সেই দেশে নাগরিকরা কেউই নিরাপদ বোধ করতে পারেন না। সেনাবাহিনীকে গণসেবকের ভাবমূর্তিতে দেখানোর প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু সীমান্তে বাংলাদেশের নাগরিকদের গুলি করে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী মারছে আর সৈনিকদের চাল-ডাল বিক্রিটা ঠিক খাটে না। এই যখন অবস্থা তখন Biosafety বা Biosecurity-র কথা বলা অরণ্যে রোদন করার শামিল।

পলাশির আম বাগানের যুদ্ধে ক্লাইভ একটি ভূখণ্ড দখল করেছিল। এই ঐতিহাসিক পরাজয় আমাদের কতো বছর ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে রেখেছিল ভাবতে হবে। এবার পাঠককে ভাবতে বলি যে ধরা যাক এই কালের ক্লাইভরা আর ভূখণ্ড দখল করলো না। কিন্তু দখল করলো বীজ। আমাদেরই বীজ তারা নিয়ে গেলো তাদের দেশে আর অন্যদিকে আমাদের বীজব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিলো। তখন ভূখণ্ড নিজের দখলে থাকলেই বা কি না থাকলেই বা কি? রেখে আমরা কী করবো? বীজই যদি না থাকে তাহলে জমিজমা কি কাজে লাগবে? অতএব এই কালে প্রতিরক্ষার প্রশ্ন সরাসরি বীজ রক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। বীজের ওপর নিজেদের দখল ও সার্বভৌমত্ব জারি রাখা সাম্রাজ্যবাদী লড়াইয়ের ফ্রন্টলাইনের প্রশ্ন। যাদের হাতে বীজ তারাই আগামী দিনে টিকে থাকবে। যারা হারিয়ে ফেলবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। শুধু খাদ্যের দাম বাড়ার কারণে যে খাদ্যাভাব হয়েছে এবার বীজ হারালে কি দশা হবে পাঠককে তা ভাবতে বলি।

২৪ পৌষ ১৪১৪। ৭ জানুয়ারি ২০০৮। শ্যামলী।

কী করে হাইব্রিড ধানের কোম্পানি বন্যা ও সিডরের সুযোগ নিলো

কৃষকরা দুই হাজার সাত সালে তাদের প্রধান ফসল আমন ধানে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, এই খবর পত্রপত্রিকার কারণে কমবেশি আমাদের জানা। জুলাই এবং আগস্ট মাসে যখন আমন ধান লাগাবার সময় ছিল তখন বন্যার

পানিতে বীজতলা ও নতুন ধানের চারা ভেসে গেছে এবং ঘূর্ণিঝড় সিডর যখন হয়েছে তখন আমন ধান কাটার সময় ছিল। কিন্তু পত্রপত্রিকায় এই কথা পরিষ্কারভাবে আসেনি যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল এবং ঘূর্ণিঝড় সিডরের অঞ্চল এক নয়। তবুও বলাবাহুল্য, এই ক্ষতি সরাসরি কৃষকদের, আর সার্বিকভাবে দেশের জন্যে মারাত্মক সংকটের সৃষ্টি হবে এই আশংকা অনেকেই ব্যক্ত করেছেন।

পত্রপত্রিকায় বন্যায় ধানের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নানান জনে নানান ভাবে দিয়েছেন। তবে যে হিসাবটা বেশি চালু হয়ে গিয়েছিল সেটা হলো বন্যায় আমন ধানের ক্ষতি হয়েছে ২২ লাখ টন। অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড় সিডরের কারণে ১০ লাখ টন ক্ষতি হয়েছে। গত ২০০৭ সালের ২ ডিসেম্বর কৃষি উপদেষ্টা ড. সি এস করিম জানিয়েছেন, "প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে ৩০টি জেলার ২শ' ১০টি উপজেলার ৫ লাখ ৫৩ হাজার ৮শ' ৮৬ হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে আমন ধানের ক্ষতি হয়েছে ৪ লাখ ১৮ হাজার ৬শ' ৩৮ হেক্টর জমির। এতে আমন উৎপাদন ৮ লাখ মেট্রিক টন কম হবে। বন্যায় ক্ষতি হয়েছে ৬ লাখ মেট্রিক টন আমন উৎপাদন। মোট ১৪ লাখ মেট্রিক টন আমন উৎপাদন কম হবে। এই ঘাটতি পূরণ করতে সরকারের ১৯ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানির প্রয়োজন হবে। এতে ১ হাজার ৫শ' কোটি টাকার মতো ব্যয় হবে। তবে যে পরিমাণ ফসলের ক্ষতি হয়েছে তা টাকার অঙ্কে ২ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আমরা কৃষকদের জন্য বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা হাতে নেব। **এর মধ্যে ৭ লাখ হেক্টর জমিতে হাইব্রিড ফসল আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।**" (শেষ বাক্য মোটা হরফে গুরুত্ব দিয়ে ছাপছি– কারণ এর মোজেজা একটু পরেই পাঠক বুঝবেন। আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি ২ ডিসেম্বর ২০০৭ দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকা থেকে। এই খবরের শিরোনাম হচ্ছে '১৯ লাখ টন খাদ্য আনা হচ্ছে'। সাবহেডিং হচ্ছে : 'ঘাটতি মেটাতে ৭ লাখ টন হেক্টর জমিতে হাইব্রিড ধান উৎপাদন করা হবে। দুর্ভিক্ষের আশংকা নেই– কৃষি উপদেষ্টা।)

উপদেষ্টা ড. সি এস করিম ধানের ক্ষয়ক্ষতির যে হিসাব দিচ্ছিলেন তাতে যারা বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান আছে তারা বিস্মিত হবেন। তবে যারা ল্যাবরেটরি বা ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বসে ধানের গাছ নিয়ে গবষেণা করছেন তাদের কথা এখানে বলছি না। ধানগাছ নিয়ে গবেষণা করা আর কৃষিব্যবস্থা জানা, বোঝা ও গবেষণা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। ধানবিজ্ঞানীরা কৃষিব্যবস্থা বুঝবেন তার কোনো গ্যারান্টি নাই, তাছাড়া আধুনিক ধানবিজ্ঞানে পরিবেশ কিংবা জীব ও প্রাণ ব্যবস্থার সংস্থাপন ও সম্ভাবনা (ecology and ecosytems) সম্পর্কে কিছুই প্রায় শেখানো হয় না। ফলে এখানে ধানবিজ্ঞানীর পেশাগত প্রতিভা, অবদান বা দক্ষতার প্রশ্ন আমরা তুলছি না। তথাকথিত 'আধুনিক' কৃষিবিজ্ঞান আসলে পশ্চাৎপদ– বর্তমান প্রাণ ও পরিবেশ বিজ্ঞানের

ক্ষেত্রে যে বিপুল অগ্রগতি হয়েছে সেই তুলনায় আসলেই 'মান্ধাতার আমলের'। অতএব ব্যক্তিগতভাবে কাউকে দোষারোপও করা যায় না।

প্রশ্ন হলো কৃষি উপদেষ্টার এই হিসাবের ভিত্তিটা কি? কিভাবে তিনি এই হিসাব কষলেন? বন্যায় তথাকথিত আধুনিক জাতের ক্ষতি হয় কিন্তু উফশি ধান বন্যা সহনশীল নয়। বন্যা এই ধরনের 'আধুনিক' ধানের ক্ষতি করে বা করতে পারে। দেশি জাতের আমন ধানের ক্ষতি খুব কমই হয়। তবে হতে পারে যদি বন্যায় বালু ঢুকে পড়ে বা গোড়াসুদ্ধ ধান গাছ বন্যা ধুয়ে নিয়ে যায়। বন্যাবিধৌত অঞ্চলে– যেখানে পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে বিজ্ঞানীরা Flood-plain ecology বলে থাকেন, সেখানে বন্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধানের ফলন বাড়ায়, যদি দেশি ধানের আবাদ হয়। তাছাড়া একবার বন্যা হলে প্রায় সব সময়ই ফসলের ফলন বেড়ে যায়, কারণ বন্যা পলিমাটি নিয়ে আসে। তবে এবার আমরা ধান লাগিয়ে ফেলার পরের বন্যায় আক্রান্ত হয়েছি। সেই ক্ষেত্রে আধপাকা ধান অনেক সময় নষ্ট হতেই পারে। দেশি জাতের ধানের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় বন্যার পানি নেমে যাবার পর ধানগাছ প্রাথমিক ধকল কাটিয়ে উঠে আবার সিধা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কেনো? কারণ এই ধরনের ধানের জাত আবিষ্কার করতে বাংলাদেশের কৃষকদের কমপক্ষে ৫০০ আর ওপরের দিকে হাজার বছরেরও বেশি সময় লেগে গিয়েছে। কৃষক যখন হাজার হাজার দেশি ধান থেকে বাছাই করে একটি জমির জন্য ধান নির্বাচন করে তখন তারা মৌসুম, বন্যার সম্ভাবনা, অমাবস্যা-পূর্ণিমা, জোয়ার-ভাটাসহ আরো বহু প্রাকৃতিক বিষয় বিবেচনা করে, প্রকৃতির খামখেয়ালি কৃষির মারাত্মক কোনো বিপর্যয় ঘটাতে না পারে। লৌকিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এই দিকটা এখন আন্তর্জাতিকভাবে বিপুল স্বীকৃত ও সমাদৃত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো একেকটি জমির জন্য যে জাত উপযোগী সেই জমিতে সেই জাত লাগানোই ছিল বাংলাদেশের কৃষকদের হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা লৌকিক বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার শক্তি।

তাহলে উচিত ছিল সঠিক খোঁজখবর নেওয়া। আমন ধানের কোন জাত কোথায় কৃষকরা লাগিয়েছেন। বন্যায় ডুবে গিয়েও কিম্বা সিডরের বাতাসের আঘাতে জমিতে শুয়ে পড়লেও আধপাকা ধান আবার দাঁড়িয়ে যায় কিনা সেই সম্ভাবনাও হিসাবে রাখা। সি এস করিম সম্ভবত বীজ ব্যবসায়ীদের পরামর্শই শুধু শুনেছেন যারা ১৯ লাখ টন ধান আমদানির জন্য তাকে পরামর্শ দিচ্ছিল। অথচ তিনি কৃষকদের নয়– কিংবা যারা কৃষকদের নিয়ে এবং একমাত্র কৃষকদের জন্যই কাজ করেন তাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করেননি বলে আমি নিশ্চিত। কারণ বন্যা আর তুফান হলেই ধানের উৎপাদন কমে যাবার হিসাব এতো তাড়াতাড়ি কোনো কৃষকই তাকে দিত না। তারা বলতো ধান পানিতে ডুবে গিয়েছে, দেখা যায় এক সপ্তাহ কি দুই সপ্তাহ পর কী হয় কিংবা ধান শুয়ে গিয়েছে, কিছু চিটা হবে, কিন্তু দেশি ধান হলে চিটা কম হবে, উফশি হলে চিটা বেশি হবে কিংবা

ধানের বেশি ক্ষতি হবে ইত্যাদি। যে দিকটা বিশেষভাবে আমাদের বোঝার বিষয় সেটা হলো বন্যা ও সিডরের দুর্দশার সুযোগে মুনাফালোভী বীজ কোম্পানি বাংলাদেশের সাত লাখ হেক্টর জমিতে হাইব্রিড ধান উৎপাদনের সুযোগ তার কাছ থেকে আদায় করে নিলো। আন্তর্জাতিক পরাশক্তি ও বহুজাতিক কোম্পানি হাইব্রিড ধান উৎপাদনের জন্য যে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছিল- ড. সি এস করিম কৃষকের ও প্রাণবৈচিত্র্য নির্ভর বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থার দিক থেকে ব্যাপারটি একবারও ভেবে দেখলেন না। ক্ষতিকর টেকনলজির হাত থেকে প্রাণবৈচিত্র্য নির্ভর বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা রক্ষা করা এবং সাম্প্রতিকালের বিজ্ঞান- বিশেষত প্রাণ ও পরিবেশ বিজ্ঞানের আলোকে আরও উৎপাদনশীল কৃষিব্যবস্থার বিকাশ ঘটানোর যে সুযোগ রয়েছে- স্রেফ কোম্পানির স্বার্থে তিনি সেই দিকগুলো বিবেচনাও করলেন না।

অন্যদিক থেকেও ক্ষয়ক্ষতির যে অনির্ভরযোগ্য হিসাব তিনি দিচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে এবং এই বছর ধান কম উৎপাদিত হবে এই খবর পেশ করার মধ্যে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা লক্ষ করে ভীত হয়েছি। আশ্চর্য হয়েছি। তিনি ভাবলেন না তার ব্যবসায়ী ও বহুজাতিক কোম্পানি তাকে দিয়ে সফলভাবে যে আতংক তৈরি করতে পারলো তার ফল সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে পড়া শুরু করবে। ভুলে যাওয়া উচিত নয়, শুধু উপদেষ্টা তপন চৌধুরী নয়, ড. সি এস করিমও এই ধরনের আতংক বাধিয়ে চালের দাম বাড়াবার ব্যবস্থাই করে দিচ্ছিলেন। প্রাক্তন উপদেষ্টা তপন চৌধুরীর সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে তিনি একই সঙ্গে বাংলাদেশে বহুজাতিক কোম্পানির হাইব্রিড ধানের উৎপাদন বাড়ানোর দায়িত্ব নিয়ে নিজেকে এই বহুজাতিক কোম্পানির দোস্ত প্রমাণ করলেন, কৃষক ও বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা রক্ষার লড়াইয়ের বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করলেন। তাকে সতর্ক ও সাবধান করার জন্যই সেই সময় নয়া কৃষি আন্দোলনের পক্ষ থেকে ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। সেই সময় বিশেষভাবে ধানের ক্ষয়ক্ষতির যে হিসাব সরকার দিচ্ছিলেন- বিশেষত যেসব চেনা গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা থিংক ট্যাংকের তথ্য ফলাও করে সরকার ও গণমাধ্যম প্রচার করছিলেন, শেষমেশ তাতে নগদ লাভ হয় চালের আড়তদার আর ব্যবসায়ীদের। চালের দাম বাড়া শুরু হয়। আমরা কৃষি, বীজ ও খাদ্য ব্যবস্থা দ্রুততার সঙ্গে ধ্বংসের বীজই বপন করেছি।

ড. সি এস করিম বাংলাদেশে হাইব্রিড ধান উৎপাদন করে ধান উৎপাদন বাড়াতে চান। তর্কের খাতিরে আমরা যদি তাকে বিশ্বাসও করি তাহলে তাকে অনুরোধ করবো এই ৭ লাখ হেক্টর জমিতে যে হাইব্রিড ধান উৎপাদন করা হচ্ছে তাদের নাম কি? কোন কোম্পানি এই ধান বাজারজাত করছে, এতে বিদেশি মুদ্রা কতো খরচ হচ্ছে, কৃষকদের ভর্তুকি দেবার নামে এই কোম্পানিগুলোর বীজের বাজার সৃষ্টির জন্য কতো টাকা খরচ হয়েছে? এই অর্থ কি জনগণের নয়? দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের এই ডামাডোলে এই সব প্রশ্ন কী জবাবদিহিতা নিশ্চিত

করবার জন্য জরুরি নিশ্চয়ই। তাছাড়া এই ধান উৎপাদন করতে গিয়ে কৃষকের লাভক্ষতি কেমন? সর্বোপরি এর ফলে পরিবেশ ও প্রাণের যে ক্ষতি হবে টাকার হিসাবে তার মূল্য কতো? এর আগে হাইব্রিড বীজ– যেমন 'আলোক ৬২০১' দিয়ে কৃষকদের প্রতারণা করা হয়েছিল। সিডর এলাকায় দেখছি হাইব্রিড ধান 'আলোড়ন' বিতরণ করা হচ্ছে। তিনি কি প্রতারণার খবর রাখেন?

নাগরিক হিশাবে ড. সি এস করিমের কাছে এই তথ্যগুলো চাইবার অনুরোধ আমরা করতেই পারি। আমি আশা করি তিনি অথবা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব আমাদের সঠিক তথ্য দিয়ে বাধিত করবেন। এরপর আমরা আমাদের মাঠ গবেষণা ও অন্যান্য উৎস থেকে যে খবর সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করছি সেটা তাদের বিবেচনার জন্য পেশ করবো।

নয়া কৃষির সাংবাদিক সম্মেলনে আক্ষেপের সঙ্গে বলা হয়েছিল, "কৃষির ক্ষয়ক্ষতি বর্ণনার সময় কত হেক্টর জমি এবং কত টন ফসল ক্ষতি হয়েছে তার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খ দেয়া হয়েছে। কিছু কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড় হিসাব করে গুণ ভাগ করেও ক্ষয়ক্ষতি প্রচার করছে। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের এই ধরনের পদ্ধতি আদৌ নীতিনির্ধারণে সহায়ক কিনা সেই তর্ক ছাড়াও আমরা অবাক হয়ে লক্ষ করেছি কতসংখ্যক কৃষক বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। এমনকি পত্র-পত্রিকায়ও তা অনুপস্থিত দেখেছি।"– এই হলো কৃষক বা গণস্বার্থের বিপরীতে মানুষের দুর্যোগ ও দুরবস্থার সুযোগে পুঁজি ও বহুজাতিক কোম্পানির সেবাদাসত্বের নমুনা।

গত বছর (২০০৭) ২১ নভেম্বরের পত্রিকার সূত্রে জানা যায়, কৃষি মন্ত্রণালয় আরো বেশি জমি হাইব্রিড বোরো ধানের আওতায় আনার পরিকল্পনা নিয়েছে। এবং নির্দিষ্টভাবে ৪৩ লাখ হেক্টর জমি বোরো ধানের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যা গত বছরের তুলনায় ৬৭ হাজার ৮৭৬ হেক্টর বেশি। জানা গেছে, ইতিমধ্যে সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) হাইব্রিড ধানের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শুধু রংপুর জেলায়ই ১ লাখ ১৭ হাজার ১৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে হাইব্রিড ধান 'জাগরণ', 'হীরা', 'সোনার বাংলা', 'আফতাব এলপি-৫০ (LP-50)' এবং 'এসিআই-১ (ACI-1)', এবং 'এসিআই-২ (ACI-2)', 'আলোড়ন', 'সুপ্রিম সিড' চাষ করা হবে বলে জানা গেছে। অর্থাৎ রংপুরে বোরো ধান চাষের জন্য বরাদ্দ জমির প্রায় অর্ধেক হাইব্রিড বোরো ধানের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। ইতিমধ্যে টেলিভিশানে 'এসিআই-১ (ACI-1)', এবং 'এসিআই-২ (ACI-2)'-এর বাম্পার ফলনের নাচ-গানসহ বিজ্ঞাপন দেখা যাচ্ছে। এই বিজ্ঞাপনগুলো সঠিক তথ্যনির্ভর নয়। এর আগেই হাইব্রিড ধানের ফলন নিয়ে কৃষকদের প্রতারণা করা হয়েছে। আমরা আবারও কৃষককে প্রতারণার আয়োজন লক্ষ্য করে আশংকিত হচ্ছি।

সরকারি উচ্চ পর্যায়ের সূত্র থেকে পত্রপত্রিকা জানাচ্ছে, ২০০৭ সালের বোরো মৌসুমের আড়াই লাখ হেক্টর জমির পরিবর্তে এবার ১০ লাখ হেক্টর জমিতে হাইব্রিড ধান চাষ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তার জন্য তাঁরা প্রয়োজনীয় সার, কীটনাশক, বীজ এবং সেচের ব্যবস্থা করবেন। যদিও আমরা দেখেছি যে, এবার সার সঙ্কটের কারণে, কৃষকরা আমন ধানের চাষই ঠিকমতো করতে পারেননি। আমাদের প্রশ্ন, এত বড়ো দুর্যোগের পরে কেনো আবারো কৃষকদের সার-কীটনাশক-সেচনির্ভর বোরো চাষ করতে বাধ্য করা হচ্ছে? অর্থাৎ কৃষকের বিদ্যমান বীজব্যবস্থা ধ্বংস করে ব্যবসায়ীদের হাইব্রিড বীজ প্রবর্তনের জন্য সরকার সার, কীটনাশক, বিদ্যুৎ, পাম্প মেশিন ইত্যাদির ওপর আমাদের পয়সা খরচ করে ভর্তুকি দেবে। অথচ এই বীজ কৃষক ঘরে রাখতে পারবে না বা আগামী মৌসুমে বীজ আকারে ব্যবহার করতে পারবে না। আবার কোম্পানির কাছ থেকে উচ্চ দামে বাজার থেকে কিনতে বাধ্য হবে। কৃষিতে ভর্তুকি দেবার কথা বলে মুনাফাখোর কোম্পানিকে ভর্তুকি দিয়ে কৃষক ও বিদ্যমান বীজব্যবস্থার সর্বনাশ ঘটানো এবং বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থাকে পরনির্ভরশীল করে তোলার এই নীতি আগামী দিনে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করবে বলে আমাদের আশঙ্কা। এই নীতি 'জাতীয় নীতি' হতে পারে না।

এ ধরনের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কৃষকদের সত্যিকার প্রয়োজনের প্রতি সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা– অর্থাৎ কৃষকের নেতৃত্বে কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থাকে দুর্যোগ পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজের পায়ে দাঁড়াবার বা আত্মনির্ভর করে তোলার যে আন্তর্জাতিক নীতি ও দায় রয়েছে তাকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হচ্ছে। কৃষি ও কৃষিব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে দুর্যোগকে কোম্পানির মুনাফা কামাবার সুবর্ণ সুযোগে পরিণত করা হয়েছে।

অন্য দিকে এটা পরিষ্কার যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে, কৃষির ক্ষতি এবং কৃষকদের দুর্বল অবস্থার সুযোগে এক শ্রেণীর বীজ ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী এনজিও হাইব্রিড বীজ প্রবর্তনের অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। তাদের এই উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে অনৈতিক। হাইব্রিড বীজ যদি আসলেই ভালো হতো তাহলে দুর্যোগের অপেক্ষায় তাদের থাকতে হতো না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন হাইব্রিড ধান 'আলোক-৬২০১' ব্যাপকভাবে ১৯৯৮ সালের বন্যার পর দেওয়া হয়েছিল। এই ধান বহুজাতিক কোম্পানী ACI প্রবর্তন করেছিল। তারা দাবি করেছিল ২০-২৫ ভাগ ফলন বৃদ্ধি পাবে। অথচ এর খরচও যে বেশি তা বলেনি। এমনকি ধানে বীজ হয় না এই সত্য কথাও তারা কৃষকদের কাছ থেকে গোপন রেখেছিল। আলোক ধানের বীজের মূল্য প্রতি কেজি ২০০-২২৫ টাকা। অথচ স্থানীয় জাতের বীজের দাম ছিল ১২-১৫ টাকা প্রতি কেজি। ব্র্যাক তার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকদের এই বীজ নিতে বাধ্য করে, একই সাথে সার-

কীটনাশকও তাদের কিনতে হয়। এই আলোক ধানে খোলপচা রোগসহ নানান বালাই দেখা দেয় এবং ধান কাটার সময় অধিকাংশ ধান ক্ষেতেই ঝরে পড়ে। অধিকাংশ কৃষক ফসল তোলার সময় দেখেন যে, ধানে চিটা হয়েছে। 'আলোক-৬২০১' শেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ ছাড়া সাধারণ বাজারে বিক্রি হয়নি। অথচ সরকার যে সকল কোম্পানি ও এনজিও কৃষককে প্রতারণা এবং বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেয়নি।

কৃষি নিয়ে আমরা যারা কৃষকের স্বার্থ রক্ষার জন্য গবেষণা করেছি তারা জানি ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকে আধুনিক কৃষির আওতায় বোরো ধান চাষের প্রবর্তন করা হয়। শুকনা মৌসুমে বোরো ধান চাষ করার জন্য ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করা হয়। বোরো ধান আবাদের কারণে রবিশস্য বিশেষ করে ডাল, তেল, আলুসহ আরো অনেক ফসলের উৎপাদন কমে আসে। সাম্প্রতিক হিশাবেও আমরা দেখেছি ১৯৯১-৯২ থেকে ২০০২-০৩ সালে বোরো ধানের আওতায় জমির পরিমাণ বেড়েছে ৪৬ শতাংশ।

আর ডালের আওতায় জমি কমেছে ২৫ শতাংশ এবং তেলবীজের আওতায় কমেছে ১১ শতাংশ। অর্থাৎ বোরো ধানের জমির পরিমাণ যত বাড়ানো হচ্ছে ততই ডাল এবং তেলবীজ শস্যের আওতায় জমির পরিমাণ কমছে। অথচ তথাকথিত উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের ফলন মোটেও 'উচ্চ ফলনশীল' নয়, বরং নিম্নগামী হয়েছে।

'খাদ্য' বলতে শুধু ধান বুঝিয়ে ধান উৎপাদন বাড়ানোর যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে তা সামগ্রিক খাদ্যব্যবস্থার জন্য হুমকি এবং খাদ্যের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি। এই একফসলি হিসাব ত্রুটিপূর্ণ, কারণ এর ফলে অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন কমে যাচ্ছে। মাছ, গবাদিপশু, হাঁসমুরগি ধ্বংস হয়েছে, অসুখ-বিসুখ বেড়েছে এবং কৃষি ব্যবস্থাপনা দুঃসাধ্য করে তোলা হয়েছে। বোরো ধান চাষের আওতায় জমি বাড়ানোর ফলে সেচের পরিমাণ বেড়ে গেছে এবং আমরা সকলেই জানি বাংলাদেশে বর্তমানে ভূ-গর্ভস্থ পানি নিচে নেমে যাচ্ছে। আর্সেনিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। উত্তরবঙ্গে মরুময়তা বাড়ছে। আমরা খাদ্যে এখন আর্সেনিক খাচ্ছি। অর্থাৎ এই নীতি শুধু খাদ্যব্যবস্থাকে ধ্বংসই করেনি খাদ্যের মাধ্যমে আমাদের বিষ খেতে বাধ্য করছে। এই নীতির বিরুদ্ধে সকল নাগরিক যদি প্রতিরোধ গড়ে না তোলেন তাহলে অচিরেই কিছু এনজিও ও কোম্পানি আমাদের সর্বনাশ ঘটাবে।

বোরো ধানে নতুন সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে 'চিটা'। ২০০৭ সালের শুরুতে বোরো ধানে চিটা সমস্যা পত্র-পত্রিকায় শিরোনাম হয়েছিল। প্রথম সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল এপ্রিলে। যশোরের শার্শা উপজেলায় ৬০০ হেক্টর জমিতে বোরো ধানে চিটা ধরা পড়েছে। আমরা এও জেনেছি, এই বোরো ধানটি ছিল ভারত থেকে আমদানি করা উফশী লাল মিনিকেট ধান। দেশীয় ধান আবহাওয়া

পরিবর্তনে সহনশীল। একই সাথে বোরো ধানের স্বাভাবিক অঞ্চলগুলোতে যেমন, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লায়, তথ্য সংগ্রহ করে দেখেছে স্থানীয় জাতের বোরো ধান যেমন– বাঁশফুল, লাহাইয়া, রাতা ইত্যাদি ধানের কোনো সমস্যা হয়নি। জলবায়ুর পরিবর্তনের মুখে দেশী ধানের বীজের ওপর গবেষণা না করে আমরা কোম্পানির বীজ নির্বিচারে বাজারজাত করতে দিতে পারি না।

পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদনে দেখা গেছে, প্রায় ১ লাখ হেক্টর বোরো ধানের জমি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণভাবে চিটায় আক্রান্ত হয়েছে। এটাকে 'কোল্ড ইনজুরি' বলা হয়েছে। এই আক্রান্ত বোরো ধানগুলো ছিল 'বিআর-১৪', 'ব্রি-২৮', 'ব্রি-২৯', ভারত থেকে আমদানি করা মিনিকেট', হাইব্রিড হীরা', জাগরণ', আলোড়ন', 'আফতাব এলপি-৫০', 'গাছাটা', 'এসিআই-১' এবং 'এসিআই-২'। আমরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই মৌসুমে একই হাইব্রিড ধান আবারও প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ Seed Certification Agency বর্তমানে বেসরকারি ডিলারদের মাধ্যমে ৪৪ ধরনের হাইব্রিড ধান প্রবর্তন করছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের নিজস্ব হাইব্রিড ধান মাত্র একটি। ভারত থেকে এসেছে একটি, বাকি সবই এসেছে চীন থেকে। অথচ বাংলাদেশে ৬২ জাতের স্থানীয় বোরো ধান আছে, যা এখনো পাওয়া যায় এবং কোনো প্রকার সার, কীটনাশক ছাড়া উৎপাদন করা যায়। আমরা কৃষকের সঙ্গে গবেষণা করে দেখেছি যে, কৃষকের কৃষি ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করে এবং জাতিসংঘ নির্দেশিত পরিবেশমুখী কৃষিচর্চা (Ecosystem approach to agriculture) করলে বোরো ধানের উৎপাদনে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। এমনকি বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের প্রবর্তিত উফশী বোরো ধানের মধ্যে 'ব্রি-২৮' ও 'ব্রি-২৯' সার ও কীটনাশক ছাড়া উৎপাদন করা শুধু সম্ভব নয়, এমনকি ফলনও বিপুল পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব বলে আমরা গবেষণায় দেখেছি। কারণ এই ধানগুলো দেশীয় ধান থেকেই বাছাই করা জাত থেকে প্রজনন করা হয়েছে। নয়াকৃষির কৃষকরা এই ধান আবাদ করে ভালো ফলন পেয়েছেন। দেশীয় ধান দিয়ে বীজের বাজারে একচেটিয়া কায়েম সম্ভব নয় বলে আজ দেশীয় বীজের বাজার ধ্বংস করে কোম্পানির বীজের বাজার সয়লাবের পরিকল্পনা চলছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য উপযুক্ত নয় এমন এলাকায় হাইব্রিড বোরো ধানের প্রবর্তন ক্ষতি বয়ে আনতে পারে বলে এটাই আমাদের আশঙ্কা।

কেনো সাত লাখ হেক্টর জমিতে হাইব্রিড বীজ আবাদ প্রসঙ্গে কৃষি উপদেষ্টার ঘোষণা মোটা হরফে দিয়েছে তার কারণ এখন নিশ্চয়ই পাঠকের কাছে পরিষ্কার। বন্যা ও তুফান– অর্থাৎ মানুষের দুর্দশা ও দুর্যোগ জিম্মি করে কিভাবে নির্বিচারে আমরা আমাদের বীজব্যবস্থা ধ্বংস করে বাংলাদেশে বহুজাতিক কোম্পানিকে বীজের বাজার করে দিচ্ছি তার নজির দেবার জন্য।

২৮ পৌষ, ১৪১৪/১১ জানুয়ারি, ২০০৮, শ্যামলী।

রক্ত শুষে নিয়ে এখন লাশ ফেরত দেবার বাহানা

গত সপ্তাহে "রাজনৈতিক সংলাপ : গণতান্ত্রিক রূপান্তরের লক্ষ্যে নাকি পুরানা গর্তে প্রত্যাবর্তন?" শিরোনামে যে লেখাটি লিখেছি তার মূল সুর ছিল এই যে বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরের জন্য সমাজের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপই বাংলাদেশের বর্তমান সংকট থেকে মুক্তির পথ। সংলাপের ধুয়া যখন উঠেছে তখন সমাজের গণতান্ত্রিক শ্রেণী ও গোষ্ঠীর সঙ্গে সংলাপ হতে হবে আগে। অর্থাৎ জনগণকে নিজেদের ঐক্য ও বিরোধের জায়গাগুলো আগেই শনাক্ত করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতান্ত্রিক ইচ্ছা ও সংকল্প বাস্তবায়নের পথ ও পদ্ধতি কী হতে পারে সেই বিষয়ে কথাবার্তা হতে হবে আগে। আগে থাকতেই আমাদের বিপদ ও আগামী দিনের সংকট সম্পর্কে জনগণকে পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে। গণসংলাপের ধারাই গণতান্ত্রিক রাজনীতি শক্তিশালী করবার ধারা– ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতাবহির্ভূত গণবিরোধী শাসক ও শোষক শ্রেণীর নিজেদের মধ্যে আপোশ মীমাংসার জন্য যে সংলাপ সেই সংলাপ যেন জনগণের ইচ্ছা ও সংকল্পের সঙ্গে বেঈমানি না করে তার জন্যই গণসংলাপ দরকার।

কিন্তু ক্ষমতাসীনরা শুধু চাইছে সেনাসমর্থিত ক্ষমতাসীন উপদেষ্টাদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপ। নিয়মতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তরের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন করে সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ এবং ক্ষমতাসীন অবস্থায় যা কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্যরা আগামী নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে এসে যেন আগামী সংসদে সকল কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেয়– সেই অঙ্গীকার আগাম আদায় করবার জন্য এই সংলাপ ক্ষমতাসীনদের দিক থেকে জরুরি। অতীতে এই কুকাণ্ডটিই বারবার করা হয়েছে। এই চক্র থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশকে যদি একটা গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবার সংকল্প আমরা নিতে না পারি তাহলে কখনই আমরা স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারবো না। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার দিক থেকে তাহলে দুটো পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক ধারা বর্তমান। একটি ধারা স্থিতিশীলতা ও ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য গণমুখী ও গণতান্ত্রিক রাজনীতি, অপরটি হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক এবং ক্রমাগত প্রাণ ও পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি করে একের পর এক বাংলাদেশকে অস্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে

যাওয়া। আমাদের আশংকা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ছুতা তুলে ব্যর্থ বাংলাদেশ রাষ্ট্রে সুশীল সমাজের গভর্নেন্স বা দৃশ্য বা অদৃশ্যভাবে ব্লু হেলমেটের শাসন কায়েম করবার পরিকল্পনা পুরামাত্রায় জারি রয়েছে। দুশমনদের তৎপরতার ওপর নজর রেখেই আমাদের বাংলাদেশকে রক্ষার বুদ্ধিমান পথ বের করতে হবে।

সংলাপের ইস্যু, বিষয়াদি, কিভাবে সংলাপ হবে, সময় বা কত দিনের মধ্যে সংলাপ ও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে, সংলাপের নীতিগত ও কৌশলগত দিক এবং সংলাপের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে– ইত্যাদি নিয়ে অচিরেই কথাবার্তা শুরু হবে বলে আমরা জানি। আমাদের আশংকা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ শুধু নির্বাচনের মধ্যেই সংকীর্ণ হয়ে যাবে। অথচ জনগণের কাছে ইস্যু হচ্ছে এগারোই জানুয়ারিতে পরাশক্তির সহায়তায় যারা ক্ষমতায় এসেছে তারা বহুজাতিক কোম্পানি বা কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষার জন্য গোপনে কোনো চুক্তি করেছে কিনা। এইসব চুক্তি করার সঙ্গে যারা জড়িত ছিল তাদের শনাক্ত বা চিহ্নিত করা জরুরি। এমনকি আমরা দেখছি এশিয়া এনার্জি বা পশ্চিমা তেল-গ্যাস-কয়লা স্বার্থের পক্ষের একজন বলে গণ্য 'বিশেষজ্ঞ' প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শক হয়েছেন। তিনি নিয়োগ পেয়েই টেলিভিশানে যা বললেন তা বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক। যদি জনগণের প্রতিরোধের ভয়ে ক্ষমতাসীনরা বহুজাতিকদের কাছে বাংলাদেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেন নি দাবি করেন তাহলে সেই বিষয়ে স্পষ্ট হওয়া দরকার। জনগণের স্বার্থ বনাম কর্পোরেট স্বার্থ এই হচ্ছে লড়াইয়ের প্রধান ভরকেন্দ্র।

আমাদের প্রাণ, পরিবেশ ও গণনিরাপত্তার দিক থেকে এই সরকার সম্পর্কে কিছু গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। যেমন, বার্ড ফ্লু– বিশেষত মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য যে বিশেষ স্ট্রেইন চরম হুমকি তা কী করে ছড়িয়ে পড়লো? এই ব্যাপারে সরকার ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলো কেনো? নাকি ছড়িয়ে পড়তে দেওয়া হয়েছে? বিচিত্র সব অসুখ যেমন মেয়েদের দলে দলে এক ধরনের মূর্ছা রোগে আক্রান্ত হওয়া, কিম্বা ঘাগড়ার পাতা খেয়ে হঠাৎ এক দঙ্গল মানুষ মরে যাওয়া– এই ঘটনাগুলোকে আমরা কিভাবে বিচার করবো? এগুলো আকস্মিক নাকি এই সরকার বাংলাদেশের জনগণের ওপর নানান কিছুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে আপত্তির কিছু মনে করে না। আমরা তো গিনিপিগ হয়েই আছি। ইতোমধ্যে খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার নাম করে সরকার হাইব্রিড বীজ দিয়ে কৃষিব্যবস্থা ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করছে। কৃষকের বীজ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেলে আমাদের নির্ভর করতে হবে বহুজাতিক কোম্পানির ওপর। জমি আছে, কিন্তু বীজ নাই, আর বীজ নিয়ন্ত্রণ করবে আট-দশটি কোম্পানি। সারা বাংলাদেশের কৃষি, বীজ ও খাদ্যব্যবস্থা জিম্মি হয়ে পড়বে অল্প কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানির হাতে। এটাই কি বাংলাদেশের আগামী ভবিষ্যৎ? খাদ্য ব্যবসায়ী– বিশেষত যারা আন্তর্জাতিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করে– তাদের স্বার্থে বাজারে চাল, ডাল, তেল, মশলার দাম আকাশচুম্বি হয়েছে। আমরা তো বুঝতেই

পারছি এই সরকার কাদের সরকার? এই সরকারকে দিয়ে চাল, ডাল, আটা, তেলের যে দাম বেড়েছে তা আর নামবে না। এই কাজটি পরিকল্পিত ভাবেই সম্পন্ন করা হয়েছে। কোনো নির্বাচিত সরকারের পক্ষেই এখন আর আগের অবস্থায় ফিরে যাবার উপায় নাই। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পাওয়া বা ভোটে নির্বাচিত সরকার পাওয়ার প্রশ্ন একই সঙ্গে আমাদের জীবন ও জীবিকা এবং প্রাণ ও পরিবেশ রক্ষার প্রশ্ন। উভয়েই এক ও অভিন্ন। এই দিক থেকে গণতন্ত্র বা আগামী নির্বাচনের প্রশ্ন একান্তই গণনিরাপত্তা ও গণপ্রতিরক্ষার প্রশ্ন। আমরা গণতন্ত্র চাই পরাশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যেন আমরা আমাদের জীবন ও জীবিকা এবং প্রাণ ও পরিবেশ রক্ষা করতে পারি। পরাশক্তি আমাদের মারার ব্যবস্থা করে এখন নির্বাচন দেবার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতা চাইছে। এটা কি সমঝোতা না রক্ত শুষে নিয়ে এখন লাশ ফেরত দেবার বাহানা। বাংলাদেশকে খুন করে এখন লাশ ফিরিয়ে দিতে চাইছে।

ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে সংলাপের প্রস্তাবে পরিষ্কার যে এই সংলাপ বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে বাদ দিয়েই হবে বা হতে হবে। অর্থাৎ সংলাপ হবে 'মাইনাস টু' ফর্মুলার ভিত্তিতে। যদি তা-ই হয় তাহলে আন্তর্জাতিক পরাশক্তি যে–উদ্দেশ্যে দুই নেত্রীকে বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে উৎখাত করেছে, জবরদস্তি দেশান্তরী করতে বা হতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছে– সেই ক্ষেত্রে জনগণের কর্তব্য কী? এমনকি আরও নিষ্ঠুর ও অমানবিক পদক্ষেপ নিতে এই সরকার মোটেও কুণ্ঠিত হবে না বলে আমাদের আশংকা। বলাবাহুল্য, আমরা বারবারই বলেছি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরাশক্তির বলয়ের অধীনে ব্যক্তি খালেদা জিয়া ও ব্যক্তি শেখ হাসিনা বাংলাদেশে বিভিন্ন বিবদমান শ্রেণী, গোষ্ঠী ও শক্তির দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম ও ভারসাম্যের বাইরের দিক কেবল। আমাদের কাজ হচ্ছে এই দ্বন্দ্বের চরিত্র বোঝা এবং গণতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক শ্রেণী, গোষ্ঠী বা শক্তিকে শনাক্ত করা এবং সমাধানের জন্য পথ ও পদ্ধতি অন্বেষণ করা। অর্থাৎ আমাদের সমস্যার সমাধান, যতো কঠিনই হোক, আমাদেরই নিজেদের বের করবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস চালানো। কিন্তু পরাশক্তি ও তাদের এই দেশীয় এজেন্টরা দাবি করছে বাংলাদেশের রাজনীতির দুর্দশার জন্য এই দুই নেত্রীর ব্যক্তিগত চরিত্রই দায়ী। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলেন না, মেয়েলি আচরণের জন্যই নাকি তাঁরা কেউ কাউকে দেখতে পারেন না। বাংলাদেশের সর্বনাশের এটাই নাকি একমাত্র কারণ। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরাশক্তি যেভাবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এই দুই নেত্রীর ওপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ে উপদেষ্টা সরকারের ক্ষমতা নেওয়া ও বহাল থাকাকে সমর্থন করেছে ও এখনও করে যাচ্ছে তা সত্যিই ন্যক্কারজনক।

এই পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির বিপরীতে দুই নেত্রীর বিরুদ্ধে শত কোটি অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেওয়া ছাড়া জনগণের

সামনে অন্য কোনো গত্যন্তর নাই। যে কারণে বলা হয় উপদেষ্টা সরকার পরাশক্তির সমর্থনে বল প্রয়োগের ক্ষমতা দেখিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত রাজনৈতিকভাবে মীমাংসার চলমান কর্তব্য থেকে জনগণ পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। আগে তো দেশরক্ষা, তার পরেই না রাজনৈতিক দলগুলোর ঝগড়া-ফ্যাসাদ মেটানো। বাংলাদেশকে টিকিয়ে রাখতে হবে আমাদের। দেশের সার্বভৌমত্ব, মানবাধিকার রক্ষা ও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার আদায় এবং আইনকে তার নিজের তাগিদে চলতে দেওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে গিয়েই আজ বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা ওয়াজেদের পক্ষে আমরা দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের আসল ও চলমান কাজ বাদ দিয়ে খালেদা জিয়া ও হাসিনা ওয়াজেদের পক্ষে আমাদের দাঁড়াতে বাধ্য করেছে এই সরকার। এই অপরাধের জন্যই বরং উপদেষ্টা সরকারের বিরোধিতা করা এখন আমাদের ফরজ হয়ে গিয়েছে। মূল গণতান্ত্রিক কর্তব্যে ফিরে আসাই জনগণের আশু ও একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই সংলাপের কথা উঠেছে। ক্ষমতাসীনরা যদি সংলাপে আন্তরিক হয় তাহলে সংলাপের পরিবেশ তৈরি করবার জন্য খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। এটাই আমাদের এখনকার পরিষ্কার অবস্থান হওয়া উচিত। নইলে অর্থপূর্ণ সংলাপের পরিবেশ গড়ে উঠবে না।

এই কারণেই আমি মনে করি গণতান্ত্রিক জনগণের দিক থেকে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার মুক্তিই এখন প্রধান ও একমাত্র ইস্যু। আওয়ামী লীগের অবস্থানের সঙ্গে এই কারণেই আমরা সম্মতি দিতে পারি না। এর অর্থ হচ্ছে যে-কেউই পরাশক্তির সমর্থনে ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশের যে-কোনো রাজনীতিবিদকে ধরেবেঁধে তাদের ইচ্ছামতো বিচার ও শাস্তি দিতে পারে। তারা দুর্নীতিবাজ, ফ্যাসিবাদী বা একনায়কতান্ত্রিক সেটা ভিন্ন বিতর্ক। এই অভিযোগগুলো আমরাই তুলেছি, কিন্তু পরাশক্তি বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের হেনস্তা করবে তা হতে পারে না। কারণ তা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদার প্রশ্ন। এই পরিস্থিতির সঙ্গে ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা ও সাদ্দামকে ক্যাঙারু কোর্টে বিচার করে হত্যার সঙ্গে কী পার্থক্য? যদি আওয়ামী লীগ মনে করে থাকে যে তারা ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনাকে কারাগার থেকে মুক্ত করবে তাহলে তারা জনগণকে ধোঁকাই দিচ্ছে। পাঠককে খেয়াল করতে হবে, আমাদের অবস্থান নীতিগত– নীতির দিকটা যদি আমরা পরিচ্ছন্ন রাখি তাহলে খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ, সমালোচনা বা বিরোধিতার প্রশ্নকে পরাশক্তির স্বার্থ রক্ষার জন্য ক্যাঙারু কোর্টে বিচারের গুরুতর প্রশ্ন থেকে আলাদা করাই সঠিক রাজনীতি। এখানেই পরাশক্তির স্বার্থ রক্ষার রাজনীতি বনাম গণতান্ত্রিক জনগণের লড়াই-সংগ্রামের ধারা আলাদা হয়ে যায়। ব্যক্তিকে মাইনাস করা-না-করা আমাদের কর্ম হতে পারে না, বরং এদের যে

রাজনীতি আজ বাংলাদেশকে ঘোরতর বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, সেই রাজনীতির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লড়াই আমাদের চালিয়ে যাবার জন্যই পরাশক্তির সমর্থনপুষ্ট বর্তমান সরকারকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করা ছাড়া আমাদের পথ নাই।

বোঝা যাচ্ছে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করবার পথ অন্বেষণ। আগামী নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনে কারা জয়ী হবে বা কাদের জয়ী করানো হবে, জাতীয় সরকার গঠিত হবে কি হবে না এবং সর্বোপরি জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন এই সংলাপের প্রধান বিষয়ে পরিণত হবে বলে মনে হয়। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলো কী করবে সেটাই এখন দেখার বিষয়। আমরা সমাজে গণতান্ত্রিক ধারা বনাম অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী ধারার মধ্যে মেরুকরণ চাই অবশ্যই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, রাজনৈতিক দলগুলোকে সংস্কারের নামে জবরদস্তির মাধ্যমে ভেঙে পরাশক্তির তাঁবেদার হিসেবে দাঁড় করানোকে আমরা সমর্থন করবো। বরং বিরোধিতা করাই এখানে গণতান্ত্রিক রাজনীতির কর্তব্য।

বলাবাহুল্য আমরা ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপের বিরোধিতা করি না এবং নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসুক আমরা তা-ই চাই। এখন 'নির্বাচিত' সরকারের অর্থ যদি হয় ক্ষমতাসীনরা নিজেদের কর্মকাণ্ড বৈধ করার জন্য যাদের নির্বাচিত করে আনতে চায় তাদেরই সরকার এবং 'সংলাপ' আসলে তাদের সঙ্গেই যাদের আমরা টাউটটন্নি বলেই জানি তাহলে জনগণ কেনো এই ধরনের সংলাপ বা নির্বাচন চাইবে? এটাও আমাদের আশঙ্কা যে আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের যে অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জনগণের রয়েছে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিলতার কারণে এই পথটা এখন বিপদসঙ্কুল হতে পারে। বলাবাহুল্য, বৃহৎ দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল ও সহিংস করে তোলার পাণ্ডারা বহাল তবিয়তেই আছে। তারা ভিন্ন খাতে আন্দোলনকে প্রবাহিত করবার চেষ্টা করবে। বিভিন্ন দিক থেকেই আমাদের সতর্ক হবার দরকার আছে।

বাস্তবতা বিবেচনা করে এখন আমাদের প্রধান ও প্রথম কাজ হওয়া উচিত রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতা বাড়ানো। এই সংলাপই জনগণ আগে দেখতে চায়। ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সংলাপের আগে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ ও জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার কাজ বহু বিপদ ও অনিশ্চয়তা থেকে জনগণকে মুক্তি দিতে পারে। বলাবাহুল্য এই ক্ষেত্রে প্রচুর ঘাটতি আছে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ ও দূরত্ব এতোই প্রকট যে এই ক্ষেত্রে ইতিবাচক কিছু আশা দুরাশাই হয়তো। কিন্তু ভরসা এই যে গত এক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে যদি রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা কিছু শিখে থাকেন তাহলে বাংলাদেশের জনগণকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরাশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করবার প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা আগের চেয়ে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের মুক্তির দাবি সমর্থন করে এর আগে লিখেছি। আজ আদালতের রায়ে পলাতক ছাত্ররা ছাড়া শিক্ষক ও ছাত্রদের সকলেই বেকসুর খালাস পেয়েছেন বলে শুনেছি। প্রেসিডেন্ট পলাতক ছাত্রদেরও ক্ষমা করে দিয়েছেন। এটা ভালো খবর। কিন্তু আজ গণমাধ্যম, মানবাধিকার কর্মী ও অন্যান্য সচেতন ও সংবেদনশীল নাগরিকদের অনুরোধ জানাতে চাই যে শ্রমিক, কৃষকসহ বহু সাধারণ গরিব মানুষ জরুরি অবস্থার অধীনে কারাগারে আছেন। তাঁদের তালিকা তৈরি করা জরুরি এবং তাঁদের কারাগার থেকে মুক্ত করবার জন্য দেশে বিদেশে জনমত সৃষ্টি করা আমাদের দরকার। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয় বা শিক্ষক নয় বলেই কি আমরা তাঁদের মুক্তি দাবি করবো না? এটা কেমন কথা? এই নীতি আমরা সমর্থন করতে পারি না। খেটে খাওয়া মানুষ ও গরিব জনগণের প্রতি মধ্যবিত্ত শ্রেণী অতিশয় সংবেদনহীন ও নিষ্ঠুর– বিভিন্ন রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার মধ্যে তা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরাই আবার নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে বড়াই করে। অতএব সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষেই আমাদের দাঁড়াতে হবে।

জনগণের মধ্যে সরকার যদি কোনো আস্থা তৈরি করতে চান তাহলে জরুরি আইনে যেসব গরিব ও নিরীহ মানুষকে কারাগারে আটক করা হয়েছে তাদের অবিলম্বে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করবেন, এটাই আমাদের আশা।

৮ মাঘ ১৪১৪। ২১ জানুয়ারি ২০০৮। শ্যামলী।

ফরহাদ মজহারের কাছে এক ডজন প্রশ্ন

প্রশ্ন : কেমন দেখছেন বর্তমান বাংলাদেশকে?

বাংলাদেশকে পরাধীনতার পথে ও অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাবার কাজ সাময়িক ঠেকানো গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তবুও ব্যর্থ রাষ্ট্র বা অকার্যকর রাষ্ট্র বানিয়ে বাংলাদেশে 'ব্লু হেলমেট' আমদানি করবার পরিকল্পনা এখনো পুরোমাত্রায় বহাল। ফলে বিপদ কাটেনি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরজীবী ও সুবিধাবাদী একটি শক্তিশালী অংশ এই দেশ ও তার ১৪ কোটি মানুষকে পরাশক্তির অধীনে নেবার জন্য জোর চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা চাইছে বাংলাদেশ রাজনীতিহীন হয়ে পড়ুক এবং বহুজাতিক কর্পোরেশান এবং তাদের তাঁবেদাররা বাংলাদেশকে তাদের প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বানাক। পরিকল্পনা পুরাপুরি নস্যাৎ হয়ে যায়নি। জনগণ রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন থেকে মুক্তি চায়, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা বাংলাদেশকে রাজনৈতিকভাবে এতিম বানানোর প্রক্রিয়া সমর্থন

করবে। বাংলাদেশকে যারা রাজনীতিহীন করতে চায় তারা এই সরকারের দীর্ঘস্থায়িত্ব চাইছে। সরকার চায় না তারা, তারা চায় পরাশক্তির তদারকি। ভারতের শাসক শ্রেণী ও তাদের গণমাধ্যমগুলোর কাছে ব্যাপারটা কমবেশি পরিষ্কার বলে তারা ফখরুদ্দীন আহমদের সরকারকে আখ্যা দিয়েছে 'তদারকি' সরকার। অর্থাৎ এই সরকার প্রচলিত অর্থে সরকার নয়, বরং পরাশক্তি ও বহুজাতিক কর্পোরেশানের পক্ষে বাংলাদেশ 'তদারকি' করছে এবং করতে থাকবে যতোদিন পরাশক্তি ও সেনাবাহিনীর যোগসাজশ এই সরকারকে টিকিয়ে রাখে। আঞ্চলিকভাবে ইন্দো-মার্কিন-ইসরায়েলি আধিপত্যের অধীনে বাংলাদেশের কপালে চিরস্থায়ী 'তদারকি' জুটবে কিনা সেটা সম্ভবত দুই-এক মাসের মধ্যেই আমরা বুঝবো। এটা নির্ভর করবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সেনাবাহিনীর ভূমিকার ওপর। কারণ রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ছিন্নভিন্ন ও ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। তার জন্য রাজনৈতিক দলও কম দায়ী নয়, বলাই বাহুল্য। এটা আমাদের জাতীয় দুর্ভাগ্য। কিন্তু মোট ফল হচ্ছে এই যে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়েছে এবং সেনাবাহিনীকে এই অসাংবিধানিক সরকারের পেছনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে যে এই সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে যেন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ধ্বংসও অনিবার্য হয়ে ওঠে। বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বা ইরাক বানাবার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলা হয়েছে। আজ ১৪ কোটি মানুষকে রক্ষা করবার কোনো কূলকিনারা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। এই বাস্তবতার কথা মনে রেখেই রাজনৈতিক দলগুলোর চরম ব্যর্থতার এই দুঃসময়ে আমি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ও দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর ঐক্যের ওপর বারবার আমার লেখালিখিতে জোর দিয়ে আসছি। জানি না কতোটুকু রক্ষা হবে।

প্রশ্ন : দেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কারা দায়ী বলে আপনি মনে করেন?

বিশ্বব্যাংক, এডিবিসহ নানা বহুপক্ষীয় ও দ্বিপক্ষীয় সাহায্য সংস্থা এবং 'অবাধ বাজার' ব্যবস্থার নানান কিসিমের প্রবক্তা, এনজিও, তথাকথিত সিভিল সোসাইটি, লুটেরা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং কয়েকটি হাতেগোনা গণমাধ্যম। এরাই, এদের কুকীর্তি ও ব্যর্থতা এখন রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের দায়দায়িত্ব থেকে খালাস পেতে চাইছে। অথচ একমাত্র রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আমরা এখনকার ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো, অন্য কোনোভাবে নয়। যে কারণে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান লড়াইটা হচ্ছে যারা রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন বিরোধিতার নামে বাংলাদেশকে রাজনীতিহীন বা রাজনীতিশূন্য করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে রাজনীতি সচেতন জনগণ, সেনাবাহিনী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কৃষক ও নারী– অর্থাৎ নির্দলীয় অথচ রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় প্রতিটি নাগরিকের লড়াই। এই লড়াই ঠিক কী ধরনের রাজনৈতিক রূপ নেবে এটা

এখনও পরিষ্কার হয়নি বটে, তবে তা যে দানা বাঁধছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। অন্যভাবে বললে বাইরের পরাশক্তি ও ভেতরের পরজীবী শ্রেণীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র হিশাবে বাংলাদেশকে টিকিয়ে রাখার জন্য জনগণের লড়াই। এ লড়াইয়ের শত্রু-মিত্র কমবেশি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন : পনের বছরের সংসদীয় গণতন্ত্র আপনি দেখেছেন, এর আগের ইতিহাস আপনার জানা। কখনও একদলীয়, কখনও সেনাশাসন, কখনও স্বৈরশাসন। গণতান্ত্রিক শাসন নিয়ে আপনার অভিমত জানতে চাই।

আগে গণতন্ত্র কায়েম হোক, তখন গণতান্ত্রিক শাসন সম্পর্কে বলা যাবে। আমি বাংলাদেশে 'সংসদীয় গণতন্ত্র' নামক কোনো ভূত দেখিনি। এ যাবত ফ্যাসিবাদ ও একনায়কতন্ত্রেরই রকমফের দেখেছি। গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার আগে দরকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েমের আগে দরকার গণতান্ত্রিক সংবিধান, আবার গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের জন্য দরকার 'সংবিধান সভা'। যে সভা গণতান্ত্রিক লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণঅভ্যুত্থানে বিজয়ী জনগণ আহ্বান করে। ভুলে গেলে চলবে না বাংলাদেশের জনগণকে একটি সংবিধান প্রণয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সনের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যাদের আমরা ভোট দিয়েছি তারাই নিজেদের স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের 'সংবিধান সভা' বলে দাবি করেছে। এই ঐতিহাসিক বঞ্চনার খেসারত আজ ৩৬ বছর ধরে আমরা দিয়ে যাচ্ছি। যাঁরা এই ইতিহাস চাপা দিতে চাইছেন তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে প্রফেসর ইউসুফ আলীর স্বাক্ষরিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "We the elected representative of the people of Bangladesh, as honour bound by the mandate given to us by the people of Bangladesh whose will is supreme duly constituted ourselvesinto a Constituent Assembly...এর বাংলা অনুবাদটি লক্ষ করুন: "আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদ গঠন করিলাম"।

সংবিধান সভা বা Constituent Assembly যে সভায় একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের জন্য জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে তার অনুবাদ করা হয়েছে 'গণপরিষদ', যাতে সংবিধানসভার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ম্রিয়মাণ বা হাল্কা করে ফেলা যায়। সে যাই হোক, জনগণ ভোট দিয়েছে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের জন্য পাকিস্তানের গণপরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিরূপে। পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরাধীনতা থেকে স্বাধীন হওয়ার জন্য যে জনগণ দীর্ঘ নয় মাস রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ

করেছে, সেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানসভার স্বঘোষিত প্রতিনিধিদের কাউকেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিকরা নির্বাচিত করেনি। যারা ছিল পাকিস্তানের সংবিধানসভা বা গণপরিষদের জন্য নির্বাচিত, যারা পাকিস্তানের জন্য সংবিধান প্রণয়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল, তারাই নিজেদের সুযোগমতো বাংলাদেশের সংবিধানসভার স্বঘোষিত সদস্য হিশাবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় বাংলাদেশের সংবিধানসভার প্রতিনিধি বলে ঘোষণা দেয় এবং ভারতীয় সহায়তায় অধিষ্ঠিত হয়। যাদের আমরা পাকিস্তানের নাগরিক থাকার সময় পাকিস্তানের নাগরিক হিশাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশের স্বার্থ দেখবার জন্য ভোট দিয়েছি তাদের আদৌ স্বাধীন বাংলাদেশে জনগণ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করত কিনা তাতে সন্দেহ।

অর্থাৎ সংবিধানসভা বা যে সভায় একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের নাগরিকরা তাদের সংবিধান সভার প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজেদের সংবিধান রচনা করে বাংলাদেশের জনগণ আজ অবধি সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এই অর্থে শেষ হয়নি। পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা ভারতীয় হস্তক্ষেপে স্বঘোষিত একটি সংবিধানসভা পেয়েছি। পাকিস্তানের সংবিধানসভার সদস্যরা আমাদের সংবিধান লিখেছে– এটা কী করে হয়? মুক্তিযুদ্ধকে তার যৌক্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার সময় আবারো হাজির হয়েছে। আসুন, আগে হাতের কাজ সারি, গণতন্ত্র কায়েম হোক, তারপর গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলা যাবে।

প্রশ্ন : অনেকেই বলে থাকেন, বর্তমান সরকার সামরিক সরকার নয় তবে সেনাসমর্থিত–মন্তব্য।

তাতে জেরজবরে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। সব সরকারই সেনাসমর্থিত। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে তারা কোন শ্রেণীর স্বার্থ বা কাদের স্বার্থ দেখছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য বা দেশ ও দশের প্রতিরক্ষার জন্য যদি সেনাবাহিনী সরাসরি জনগণের কাতারে এগিয়ে আসে তাতে অসুবিধা কি? একাত্তরে কি তাই ঘটেনি? প্রশ্ন হচ্ছে একটি পরাধীন সরকারকে সেনাবাহিনী সমর্থন দিচ্ছে কিনা। তাদের তো এটা করার কথা নয়, সৈনিক হিশাবে তারা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবার জন্যই শপথ নিয়েছে। তাই না? তাহলে দেশের সার্বভৌমত্ব যদি এই সরকার বিপন্ন করে সেক্ষেত্রে সৈনিক হিশাবে তাদের কর্তব্য আছে। এতোটুকুই আমি বুঝি।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

পেশাগত কারণে পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের স্বাধীন নাগরিকের যে ভূমিকা– একজন সৈনিকেরও ভূমিকা একই– দেশ ও দশের স্বার্থ দেখা।

প্রশ্ন : ড. ইউনূসের নতুন দল গঠন আবার সরে আসাকে কীভাবে দেখছেন?

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিজয় হিশাবে। তিনি ব্যক্তি হিশাবে একজন সজ্জন ও ভালো মানুষ। মানুষ যে তাকে চায় না, এটা বুঝেছেন। অন্তত তাঁকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী তিনি ডেকে আনেননি। এই জন্য জাতির উচিত তাঁর কাছে আপাতত কৃতজ্ঞ থাকা। এই রকম একটা সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল। এখন তিনি যদি তাঁর সুদের ব্যবসা থেকে সরে এসে জনগণের স্বার্থ রক্ষার কাজে থাকেন তাহলে সেটা সোনায় সোহাগা হবে। তবে কথায় আছে ছাড়তে চাইলেও ছাড়া যায় না। তাঁর সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় আসেনি।

প্রশ্ন : রাজনীতিতে খালেদা-হাসিনা যুগের অবসান হচ্ছে এমন কথা আলোচনায় আছে, এটা কি নতুন যুগের সূচনা করবে? অনেকেই বলে থাকেন হাসিনা-খালেদা ছাড়া আওয়ামী লীগ বিএনপি টিকবে না–মন্তব্য।

ব্যক্তি এখানে মুখ্য নয়। তাঁরা বাংলাদেশের শাসক ও শোষক শ্রেণীর দুটো প্রধান রাজনৈতিক ধারার প্রতিনিধি। যতোদিন তাঁরা আছেন ততোদিন তাঁদের বাদ দিয়ে নব্য শাসক ও শোষক শ্রেণীর পক্ষে নতুন কিছু করার হিম্মত আছে বলে আমি মনে করি না। এই দুটো রাজনৈতিক ধারার দ্বন্দ্ব ও সংঘাত বাস্তব। এর সমাধান পরিণত রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে আমাদের বিকাশ ঘটানো এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের চরিত্রকে ঐতিহাসিকভাবে বোঝার চেষ্টা করা। সর্বোপরি সহিংসতা এড়িয়ে যথাসম্ভব রাজনৈতিকভাবে তার মীমাংসা করা। এই মীমাংসা একমাত্র এই দেশের খেটে খাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের পক্ষেই করা সম্ভব। ফলে যতক্ষণ না আমরা সংখ্যালঘুর লুটপাটের বিপরীতে সংখ্যাগরিষ্ঠের রাজনীতি বা অগণতান্ত্রিকতার বিপরীতে গণতান্ত্রিক রাজনীতি প্রবর্তন করতে পারছি, ততোদিন তাদের প্রভাব থাকবে। মুরগির পাখনার তলায় ওম দিলেই ডিম ফোটে, আগুনে গরম করলে ডিম সেদ্ধ হয়ে যায়– বাচ্চা হয় না।

প্রশ্ন : নতুন দল গঠনের নানা আলোচনা চলছে। নতুন দল গঠন কি বর্তমান সমস্যা সমাধানের কোনো পথ?

একই খেলা দেখিয়ে বাংলাদেশের জনগণকে বারবার বিভ্রান্ত করা যাবে বলে মনে হয় না। এবারকার লড়াইয়ের চরিত্র ভিন্ন। আগের মতো নয়।

প্রশ্ন : নির্বাচন কমিশন ১৮ মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে তফসিল ঘোষণার জন্য। তাছাড়া আইডি কার্ড জাতীয় হবে না ভোটার আইডি হবে; ক্যাম্পে হবে না বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হবে এমন বিতর্ক তো আছেই। আপনি কবে নাগাদ নির্বাচন প্রত্যাশা করেন?

অচিরে নির্বাচন হবে এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। এমনকি বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে হবে কিনা তাও এখন সাংবিধানিক নানান জটিলতার

কারণে প্রশ্নবিদ্ধ। দেখা যাক কী হয়। নাগরিক পরিচয়পত্র বা ভোটার পরিচয়পত্র ছাড়া এর আগে মোটামুটি সুষ্ঠু নির্বাচনের নজির আমাদের আছে। ফলে পরিচয়পত্র সংক্রান্ত তর্কের রাজনীতি আলাদা। হয়তো পরাশক্তিগুলো চাইছে বাংলাদেশের নাগরিকদের সার্ভেলেন্সের জন্য একটা ডাটাবেজ তৈরি হোক যাতে ওয়ার এগেইনস্ট টেররিজমের রণকৌশল নির্ধারণে সুবিধা হয়। বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বা ইরাকের জায়গায় ফেলে এইসব বিচার করলে বুঝতে সুবিধা।

প্রশ্ন : সংস্কার নিয়ে নানা আলোচনা চলছে– আমাদের রাজনীতিতে কী ধরনের সংস্কার হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

আমি সংস্কারবাদী নই। আমাদের এখনকার ঐতিহাসিক কর্তব্য হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা এবং বাংলাদেশের জন্য একটি শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তোলা। বিশ্বে আমাদের মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার সময় এসে গিয়েছে। পরাশক্তি ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে জনগণের লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। জনগণের জয় অবশ্যম্ভাবী।

প্রশ্ন : আমাদের রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের অন্তরায়গুলো কি জনকল্যাণমূলক রাজনৈতিক চর্চায়?

'আমাদের রাজনীতি' বলে কোনো কথা নাই। কোন শ্রেণীর রাজনীতির কথা বলা হচ্ছে তা পরিষ্কার না করলে উত্তর দেওয়া মুশকিল। শাসক শোষক শ্রেণীর রাজনীতি আমরা যা দেখছি তা এই রকমই হয়। এখন যা দেখছেন এটাই শাসক আর শোষক শ্রেণীর রাজনীতি। 'ঘোড়ার ডিম' বলে একটা কেচ্ছা আপনি বানাতেই পারেন, কিন্তু ঘোড়া থেকে তো হাঁসের আন্ডা আপনি পাবেন না।

প্রশ্ন : বর্তমান পরিস্থিতি থেকে নির্দিষ্ট গোলে পৌঁছতে হলে করণীয় কী?

নির্দিষ্ট গোল কী? কার লক্ষ্যের কথা বলা হচ্ছে? সংখ্যাগরিষ্ঠের দিক থেকে লক্ষ্য হচ্ছে একটি গণঅভ্যুত্থান এবং একটি সংবিধানসভা যাতে নতুন বাংলাদেশের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প ধারণ করে নতুন সংবিধান জনগণ প্রণয়ন করতে পারে যার ওপর দাঁড়িয়ে নতুন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হবে। তার সম্ভাবনা পরিণত হয়ে উঠছে বলেই আমার মনে হয়।

জনতার চোখ, ২৪ মে ২০০৭

সাপ্তাহিক ২০০০
ফরহাদ মজহারের সাক্ষাৎকার

সাপ্তাহিক ২০০০ : বাজেট প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু করি। বাজেট নিয়ে নানা বিতর্ক, এতো বিপুল অঙ্কের বাজেট, আমদানি নির্ভর বাজেট...। সমাজ দার্শনিক হিসেবে এই বাজেটকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

বাজেট দেখে সরকারের চরিত্র বোঝা যায়। বাজার ব্যবস্থা, বাজারি প্রতিযোগিতা- প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে যে বিতরণ করতে পারে না, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিকভাবে সেই বিতরণই সম্পন্ন করে বাজেট। তো বোঝা যায় বাজেট দিয়ে সরকার কোন্ শ্রেণীকে কোন্ গোষ্ঠীকে ধন বিতরণ করছে, কাকে দিচ্ছে না। বাজেট বাজারব্যবস্থা দিয়ে সম্পদ বিতরণ করে না, করে রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে। এই সরকার বৈধ কি বৈধ না, বাজেট করার এখতিয়ার তার আছে কিনা শেখ হাসিনার এইসব দাবি অর্থহীন। প্রশ্ন হচ্ছে বাজেটে কোন শ্রেণী জিতলো, কোন শ্রেণী হারলো, এই বিতরণের পর অর্থনৈতিক অবস্থা কী দাঁড়াবে এইসব। যে শ্রেণীর কাছে সম্পদ বিতরণ করা হচ্ছে তারা ধনী। কর্পোরেশানের স্বার্থই রক্ষা করা হয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই। দেখুন সুদের টাকা কী পরিমাণ দিচ্ছি আমরা— নিচ্ছে বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য দাতাসংস্থা। তাদের এই টাকা লাথি মেরে মুখের ওপর ছুড়ে ফেলে দিলে বাংলাদেশের কিছুই আসে যায় না। অথচ এই টাকা তাদের কাছে চাওয়া হয়েছে, তারা দেবেও, আর আপনার বাজেটের পুরোটাই তারা তাদেরই স্বার্থে সাজাবে, লিখবে। তাদের মনতুষ্টির জন্যই এই সরকার। কই যারা শরীরের হাড়মাংস গলিয়ে বিদেশে কুকুরবেড়ালের মতো পরিশ্রম করে এই দেশের অর্থনীতি টিকিয়ে রেখেছে সেই পরবাসী শ্রমিকদের জন্য কী আছে এই বাজেটে?

পণ্য আমদানি অবাধ করে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী শ্রেণী ও অন্য দেশের উৎপাদকদের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এই সমর্থন এই সরকার দিতে বাধ্য। কারণ এই বাজেটের সমর্থনের ভিত্তি তো জনগণ নয়। সমর্থনের ভিত্তি হচ্ছে পরদেশী পরাশক্তি। অতএব আমরা বলতে পারি এই বাজেট পরাশক্তির বাজেট। যারা এই সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে, ক্ষমতায় রাখছে তাদেরই বাজেট।

সাধারণ জনগণ বা কৃষকের কী উপকার এই বাজেটে তা আমরা দেখিনি। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর বিশাল অর্থনৈতিক সুবিধা হচ্ছে এখানে

পরিবেশসম্মত কৃষি বা অর্গানিক বা ইকলজিকাল এগ্রিকালচার সম্ভব এবং তার আন্তর্জাতিক বাজার বাড়ছে, লাভও বেশি। এই চাষে সার লাগে না, বিষ লাগে না, পাম্প দিয়ে পানি তুলে সারাদেশ আর্সেনিকে সয়লাব করারও দরকার হয় না। অথচ বাজেটে মনে হয় সার কীটনাশক ডিজেলে তেল পাম্প ছাড়া বুঝি কৃষিকাজই করা সম্ভব না। সার ভর্তুকি ডিজেল দেওয়া হচ্ছে কৃষকদের কিন্তু তাতে লাভবান হচ্ছে কোম্পানি। অথচ আপনাকে ফাঁকি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে ভর্তুকি যেন কৃষককেই দেওয়া হচ্ছে। তারপর কার্ড দিয়ে এইসবের বিতরণের মধ্য দিয়ে আরেকটি মধ্যস্বত্বভোগী গড়ে তোলার পরিকল্পনা তো আছেই। রাজনৈতিক সমর্থনের ভিত্তি তৈরি করতে হবে না? রাজনৈতিক চাপের অধীনে থেকে শক্তিশালী শ্রেণী বা পক্ষের মনতুষ্টি করে একটি রাজনৈতিক সমর্থনের বেইজ তৈরি করতে চাইছে বাজেট। এই সমর্থনের বেইজ প্রধানত ঢাকা এবং অল্পকিছু মফস্বল শহরে। দুর্নীতি দমন যাদের একমাত্র ইস্যু। রাজনীতি ধ্বংস করে যারা অল্পকিছু দুর্নীতিবাজকে ধরপাকড় করে খোদ দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ ও অর্থনীতি যারা টিকিয়ে রাখতে চায় তাদেরই বাজেট এটা।

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনি দুর্নীতির কথা বলেছেন কিন্তু বিগত সরকারগুলো দুর্নীতির দায়ে তো অভিযুক্ত...

না। বিগত সরকারগুলো তো শুধু দুর্নীতি করে নাই। দুর্নীতি করেছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক...। সরকারগুলো পরাশক্তি ও আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থাগুলোর দুর্নীতির ফল মাত্র। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, দ্বিপক্ষীয় দাতা সংস্থা, এনজিও মহল...। দুর্নীতি করেছে মহাশক্তিধর বহুজাতিক কোম্পানি। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক-আইএমএফ এ পর্যন্ত বাংলাদেশের যে স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট করেছে, ডোনার কমিউনিটি এনজিওগুলোকে দিয়ে এই সমাজকে যেভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত করেছে, অবাধ বাজারের নামে অর্থনীতিকে যেভাবে ধ্বংস করেছে তার তুলনা কী? সেই তুলনায় রাজনৈতিক দলগুলো কী দুর্নীতি করেছে? ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যে ভয়াবহ দুর্নীতি করেছে সেই বিষয়ে সে নিজেও সচেতন। সে বলছে সে যদি কোনো অপরাধ করে থাকে, খারাপ কাজ করে থাকে তাকে আমাদের ইনডেমনিটি বা দায়মুক্তি দিতে হবে। ভাবুন, তারা বলছে, আমরা দুর্নীতি করবো, অপরাধ করবো কিন্তু বাংলাদেশের আদালতে আমরা তাদের বিচার করতে পারবো না। যাঁরা আজ দুনীতির বিরুদ্ধে এতো বুকের পাটা দেখাচ্ছেন দেখি তো তাঁরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের দুর্নীতির খতিয়ান নিতে পারেন কিনা। দুদকের বুকের পাটা কতোদূর একটু দেখি! ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা দাতাসংস্থার দুর্নীতি নিয়ে কী করেছে সরকার? কোনো বিদেশি কোম্পানি সম্পর্কে পদক্ষেপ নিয়েছে কি? কী পদক্ষেপ নিয়েছে যেসকল ব্যবসায়ী ও আমলা এইসব দুর্নীতবাজ রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিগুলোর দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত? দুর্নীতির দায়ে সামরিক বা বেসামরিক কোন আমলাকে ধরতে দেখেছেন?

রাজনৈতিক দলগুলো কী এমন দুর্নীতি করেছে যে তাদের ধরার নামে খোদ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করে দিতে হবে? আমরা কি জাতিসংঘের পীস মিশন দিয়ে দেশ চালাবো? আমরা কি ব্লু হেলমেট দেখবো ঢাকার রাস্তায়? আর আমাদের সরকার প্রধান হবে শান্তি মিশনের নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশের মার্কিন রাষ্ট্রদূত? ভয়াবহ পরিস্থিতি...

দুর্নীতিকে উৎখাত করতে হবে অবশ্যই। ভালো কথা। ক্যাপিটালিজম চাই আবার দুর্নীতি চাই না এটা হয় না। ক্যাপিটালিজমের পূজা করবেন, বাজেটও দেবেন উৎপাদনশূন্য বেনিয়া পুঁজির কারবার বাড়াবার জন্য, তো আপনি কীসের দুর্নীতিবিরোধী সরকার? আপনি আসলে বলছেন মামুন তারেক জলিল খনায়েদদের দুর্নীতি করতে দেবো না, কারণ আমরা নিজেরাই সেই কাজটা করতে চাই। ওদের কায়কারবারটাই আরো বড়ো পরিসরে বিশ্বব্যাংক বহুজাতিক কোম্পানিকে সঙ্গে নিয়ে করবে। ওর সঙ্গে এশিয়া এনার্জি থাকবে, টাটা থাকবে, সিনজেন্টা-মনসান্টো থাকবে, খনিজ কোম্পানি থাকবে, তাই না? উকিল— ব্যারিস্টাররা উপদেশও দেবেন আমাদের!! দুর্নীতির প্রশ্ন একটি সিস্টেম বা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের প্রশ্ন, ব্যক্তি তো না। মামুনকে তারেককে ধরে জেলে দিয়ে দিলে কি দুর্নীতি দূর হবে? আরো কয়েক হাজার মামুন, তারেক তৈরি হবে। কোনো বিচক্ষণ লোককে এইসব বলে সন্তুষ্ট করা সম্ভব না। যদি দুর্নীতি দমন করতেই হয়— দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণভিত্তিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান যদি আমরা গড়ে তুলতেই চাই তাহলে তা একমাত্র গণবিপ্লবের মাধ্যমেই সম্ভব। এই জন্যই আমি বারবার বলেছি যাঁরা ক্ষমতার সঙ্গে বা পেছনে সত্যি সত্যিই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়তে চান তাঁরা জনগণের কাতারে নেমে আসুন অথবা জনগণের সঙ্গে মৈত্রীর নমুনা দেখান। এই বাজেট দিয়ে তাঁরা উল্টাটা প্রমাণ করলেন।

সাপ্তাহিক ২০০০ : তাহলে কি আপনি বলছেন রাজনীতিকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে একটা ষড়যন্ত্র চলছে?

আমি ষড়যন্ত্র বলবো না। করণ এর অর্থনৈতিক দিক আছে। আন্তর্জাতিকভাবে ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবনযাপনে ইসলামে বিশ্বাসী বা ইসলাম দ্বারা অনুপ্রাণিত জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একটা রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছে, আমরা দেখছি। এর গোড়ায় আছে তেল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ, প্রাণসম্পদ বা biological resources এবং মিষ্টি পানি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিস। বাংলাদেশের বিপদ হচ্ছে এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী কিন্তু তারা আবার প্রভূত প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী। এখন এই দেশের মানুষের ধর্ম বিশ্বাস সংস্কৃতিকে তো ধ্বংস করতেই হবে তাদের হীন প্রমাণের জন্য— নইলে ঐ সম্পদ আপনি নেবেন কী করে? অতএব প্রচার করতে হবে আপনি সন্ত্রাসী, আপনি সহিংস, আপনি জেহাদ করে দুনিয়ার সভ্যতা ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর ইত্যাদি। অর্থাৎ

আমাদের সম্পদ লুণ্ঠন করবার জন্য আমাদের ধ্বংস করবার একটা প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি শক্তিশালী অংশ জড়িত–এটাই ভয়াবহ ও বিপজ্জনক দিক। কারণ শ্রেণীটি বিপজ্জনক। আমাদের বুঝতে হবে আমাদের চিন্তাচেতনা ধ্যানধারণায় রাজনৈতিক ভাব ও আদর্শে পার্থক্য আছে। থাকুক। তর্ক করে নিজেদের মধ্যে লড়াই সংগ্রাম করে আমরা তা নিরসন করবো। কিন্তু আমাদের সীমা টানবো আমরা। জনগোষ্ঠী হিশাবে আমাদের দেশ ও রাষ্ট্রকে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতে দিতে পারি না। সেখানে আমাদের এক থাকতে হবে। বিপদের মুখে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। সেখানে একটা প্রশ্নই শত্রুমিত্র নির্ধারণ করবে : একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে যে দেশ আমরা কায়েম করেছি সেই দেশ ও জনগোষ্ঠীর প্রতি আমার পূর্ণ আনুগত্য আছে কিনা। একাত্তরই হচ্ছে পয়েন্ট অব ডিপার্চার–বা সোজা কথায় শত্রুমিত্রের ঐতিহাসিক বিভাজনের দাগ বা মানদণ্ড। বিভক্ত সমাজকে একত্র করার কর্তব্য রয়েছে আমাদের। ন্যাশনাল ইকনোমি বিল্ডআপ করার কাজ আছে। প্রতিষ্ঠান গড়বার শক্ত কাজগুলো পড়ে রয়েছে। অতএব দুর্নীতিবাজদের ধরো-মারোর মতো শর্টকাট সমাধানে আমরা যেতে পারি না। সমাজ ও রাজনীতির ক্ষতটাই এতে বরং আরো বীভৎস রূপ নেবে। ধরুন সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ লোকটিকে ধরে এই সরকার শাস্তি দিলে আমি রাষ্ট্র গড়ার কারিগর হিশাবে সন্তুষ্ট হবো না। কারণ দেখতে পাচ্ছেন জরুরি অবস্থার অধীনে জুডিসিয়াল প্রসেস ছাড়া এইসব হচ্ছে। তার মানে রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা বা নির্বাহী ব্যবস্থাপনা গড়বার পরিবর্তে সব ভেঙে ফেলা হচ্ছে। গড়বার চিহ্ন কই? সর্বত্রই বুলডোজার ও হাতুড়ির শব্দ। দালান কই? আমি লিখে বলেছি এই সরকারের ভিত্তি অস্ত্র এবং কূটনৈতিক সমর্থন। এই ভিত্তি বৈধতার শর্ত নয়, ক্ষমতার শর্ত মাত্র। দুর্বল মুহূর্তে একটি টোকাতেও ভেঙে পড়তে পারে।

সাপ্তাহিক ২০০০ : অনেকে প্রশ্ন তুলেছে এই বাজেটের সাংবিধানিক কোনো ভিত্তি আছে কি না।

শেখ হাসিনার কথা তো? এটা আমার কাছে কোনো ম্যাটার মনে হচ্ছে না। প্রথমত যাঁরা সংবিধানের দোহাই দিচ্ছেন তাঁরা সংবিধান দেখিয়েই আজ দেশকে এই অবস্থায় নিয়ে এসেছেন। আমাদের সংবিধান দরকার ঠিকই, কিন্তু পুরানা বহু কর্তন ও ছেঁড়াখোঁড়ায় ত্যানা হয়ে যাওয়া সংবিধান দরকার নাই। চাই নতুন সংবিধান। নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া প্রয়োজন। নতুন সংবিধান নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করতে হবে অবিলম্বে। নতুন সংবিধান পিপল বেইজড হবে। নতুন সংবিধান যেহেতু আসে নাই অতএব পুরানা সংবিধানের ওপর দাঁড়িয়ে এই সরকার বৈধ কি অবৈধ সেই তর্ক বৃথা। আইনী বা সাংবিধানিক তর্ক দিয়ে আগামী দিনের রাজনীতি নির্ধারিত হবে না, এই দিকটা পরিষ্কার। কার হাতে বলপ্রয়োগের ক্ষমতা আছে তার দ্বারাই ঠিক হবে। আমি শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ– বিশেষত শ্রমিক ও কৃষকের

দিক থেকে বলবো আজ অবধি জনগণকে সংবিধান রচনা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এই ঐতিহাসিক বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সরকার জনগণকে সংবিধান রচনার সুযোগ করে দিয়ে নিজেদের বৈধতা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা থেকে নিষ্পন্ন করতে পারে। তত্ত্বগতভাবে। জনগণকে যখনই সংবিধান রচনার সুযোগ করে দেওয়া হয়, একটা সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি সংবিধানসভার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের আহ্বান জানানো হয়– তখনই জনগণ বুঝতে পারে যাঁরা অস্ত্র নিয়ে ক্ষমতায় আছে তাঁরা জনগণের ইচ্ছারও পাহারাদার হতে চায়। ব্যাটে বলে ক্রিকেট খেলার মতো শক্তি ও সংখ্যার মধ্যে একটা যোগ হয়। তখন এই যোগ জনগোষ্ঠীর শক্তিতে পরিণত হতে পারে। আগামী দিনের মহা রাজনৈতিক বিপর্যয় থেকে আমাদের সম্ভবত এই পথই বাঁচাতে পারে। নইলে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং পরিণতিতে বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের তত্ত্বাবধানে জাতিসংঘের শান্তি মিশন বসানোর সম্ভাবনা আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না।

সাপ্তাহিক ২০০০ : দুর্নীতি নিয়ে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে সেই যুদ্ধের মধ্যে কিন্তু আমরা তেল গ্যাস নিয়ে অভিযুক্ত আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো নেই, আবার চট্টগ্রাম মহাবন্দর, পাটকল....

এ সরকার তো আসছে সাংবিধানিকতার বাইরে গণবিরোধী সরকার আকারে, শুধু দুর্নীতি বিরোধী না। শ্রমিক বিরোধী, কৃষক বিরোধী সরকার সে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাউন্টার টেররিজমের তত্ত্বানুযায়ী আগামী দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে লড়াইটা হবে সেটা ঘটবে বস্তিগুলো থেকে। ফলে কাউন্টার টেররিজমের অংশ হিসেবে বস্তিগুলো ভেঙে দেয়া হয়েছে। শুধু অবৈধ স্থাপনা হওয়ার কারণে নয়। সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করতে চায়। এখন কথা হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের রাজনৈতিক ও আদর্শিক স্বার্থের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দিয়ে যে রাজনৈতিক উপায় হাসিল করতে চায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও কি তা মোকাবিলা করতে হবে না? নিশ্চয়ই হবে। অতএব আমরা কি টেররিজমকে মোকাবেলা করতে চাই না? অবশ্যই চাই। আমাদের সঙ্গে এ ক্ষেত্রে কি আমেরিকার কোনো অ্যালায়েন্স হতে পারে না? হ্যাঁ হতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি আমরা মনে করি আমাদের ইকনোমি অক্ষম বা ভঙ্গুর হয়ে যায়, আমাদের এমন একটা জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে আমরা গ্লোবালি অংশগ্রহণ করতে পারি না। আমরা একঘরে হয়ে যাচ্ছি। এটা তো আমাদের ব্যবহারিক প্রশ্ন হিশাবে রয়েই গেছে। এটার সমাধান করতে হবে। কিন্তু সেই সমাধান তো নিঃসন্দেহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাউন্টার টেররিজম থিসিস দিয়ে করতে পারবো না। প্রথম থেকেই আমরা এই সরকারের মধ্যে এটা লক্ষ করেছি যে, তারা একেবারে স্টেট ডিপার্টমেন্টের স্ট্রাটেজি ফলো করছে আমাদের বস্তিগুলো ভেঙে দিয়ে। আমার যেটা মনে হয়েছে সম্ভবত এই সরকারের মধ্যে দু-একজন যারা বিচক্ষণ আছেন

তারা আমাদের এই সমালোচনা শুনেছেন এবং তারা সরে এসেছেন। সরে আসার পর আমরা মনে করি ঠিক আছে। আমাদের টেররিজম মোকাবিলার একটা প্রশ্ন তো আছেই। এটা আমরা মোকাবিলা করবো, কিন্তু সেটা সামরিক বা আইনী দিক থেকে শুধু ক্রিমিনাল ল বা ফৌজদারি আদালতে সন্ত্রাসীদের শাস্তি দিলেই হবে না। কালচারাল প্রশ্ন : রাজনৈতিক বিতর্ক ও বিভাজন আছে। একটি জনগোষ্ঠীর টিকে থাকা না থাকার প্রশ্ন আছে। এসব নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। দ্বিতীয়ত আমরা দেখেছি খুলনাতে খালিশপুরে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যে কাজটা এই সরকার করেছে তাতে প্রমাণিত হয়েছে এই সরকার অ্যাবসুলেটলি শ্রমিক বিরোধী। আমি আগে এ সরকারকে চিনবো কী করে?

আমি সরকারের কাছ থেকে গরিবের জন্য দয়া-মায়া আছে মনে করি না। কিন্তু সন্ত্রাস মোকাবিলার অংশ হিশাবে খালিশপুরে যেসব ঘটনা ঘটেছে, যেসব শ্রমিক এখনো জেলে আছে, তাদেরকে নিঃশর্ত মুক্তি দেবার কথা বলি। এই সরকারকে করজোড়ে বলতে হবে যে তোমাদের ন্যায্য যে মজুরি প্রাপ্য সেই মজুরি না দেবার কারণে তোমাদের যে বিক্ষোভ তার জন্য আমরা দুঃখিত। আমাদের অন্যায় হয়েছে তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে। এর আগের সরকারগুলো এ অন্যায় করেছে, আমরা তোমাদের উপরে এ অন্যায় করবো না। কই বাজেটে তো এদের কথা নাই। সরকার পেট্রোকেমিক্যালকে বাঁচাবার জন্য টাকা দিচ্ছে কিন্তু শ্রমিকের বেতন তো দিচ্ছেই না, উল্টা তাদের লে অফ করছে। এটা ঘোর অন্যায় ও অবিচার। সরকার বিশ্বব্যাংকের মিস্টার প্যাটেলের কথামতো বাংলাদেশের পাটশিল্প ধ্বংস করে আমাদের শুধু কাঁচাপাটের জোগানদার বানাতে চায়, তাই না? এটা তো গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা দ্বারা আমি মনে করি আরো বেশি সন্ত্রাসের শর্ত তারা তৈরি করে দিচ্ছে। আরো বেশি মানুষকে ডেসপারেট করে দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যে যে ধরনের বিভিন্ন রকম রাজনীতি আছে তারা নানা কারণে বাংলাদেশকে ব্যবহার করবে। কাল যদি মোসাদ (ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা) একটা গ্রুপকে ধরে নিয়ে এসে বোমা ফুটিয়ে দেয়, বলে ইসলামী জঙ্গীরা বোমা ফুটিয়েছে। তাহলে সরকার কীভাবে ঠেকাবে? বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কি কোনো ক্ষমতা আছে? গোয়েন্দা সংস্থার ক্ষমতা হচ্ছে একটা লোককে ধরে নিয়ে জেলে ঢোকানো। জেলে নিয়ে এসে তাদের পিটিয়ে এভিডেন্স বের করা? তথ্য ছাড়া, কোয়ালিটি ইনফরমেশন ছাড়া কি আদৌ রাষ্ট্র চালানো সম্ভব? সেই কারণে আমি বলি, জাতীয় সংস্থাগুলোরও দক্ষতা বাড়াতে হবে। জাতীয় সংস্থাগুলোকে সহায়তা করতে হবে। পত্রিকাগুলো সেটা সাপোর্ট করে, ভালো। পৃথিবীর সব দেশে এই কাজটা করে, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমাদের দেশের পত্রিকাগুলো গোয়েন্দা সংস্থার প্রচারপত্রে পরিণত হয়েছে। এটা তো অন্যায়, তার মানে একটা লোককে ধরার বিরুদ্ধে কোনো এভিডেন্স পাচ্ছেন না, কিন্তু ধরে নিয়ে এসে তারা তার কাছ থেকে অত্যাচার করে, নির্যাতন করে

স্বীকারোক্তি আদায় করছেন। তারপর পত্রিকা তা ছাপছে। এটা তো গোয়েন্দা বিভাগের কাজ না। গণমাধ্যমের এই ভূমিকাও ন্যক্কারজনক। আজকে মানবাধিকার বিরোধী যে কথাটা উঠেছে সেটা কেনো উঠেছে? কারণ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের ঠিক নেই। সংবাদপত্রের নীতিনৈতিকতা নাই। যে এজেন্সিগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন সেই এজেন্সিগুলোর দক্ষতা ডেভেলপ করা হয় নাই। এ ক্ষেত্রে সরকারকেও আমি বলবো আমরাও এবং আপনারা যারা পত্রিকায় রয়েছেন আমাদেরকে সহায়তা করতে হবে। এটা কিন্তু খেয়ে না-খেয়ে সরকারবিরোধী জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা পারবো না। দেশ ও দেশের মানুষকে বাঁচাতে পারবো না। সরকারকে বুঝতে হবে যে আমরা ক্রাইসিসের মধ্যে পড়েছি। কাজেই আমাদেরকে অনেক বিচক্ষণতার মধ্যে কাজ করতে হবে। সেই বিচক্ষণতা সরকারের মধ্যে তখনই আমরা দেখবো যখন তারা সজ্ঞানে বুঝেসুঝে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থের পক্ষে দাঁড়ায়। কারণ সরকার ও রাষ্ট্র উভয়ই সংকটাপন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাউন্টার টেররিজমের সম্প্রসারিত বিভাগ হওয়ার হাত থেকে সরকারকে বাঁচানো তখন আমাদেরও কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

সমাজের যে পরিবর্তনটা হয়েছে সেখানে থেকে আমরা চাইলেই ফিরে যেতে পারবো না। সমাজে পোলারাইজেশন ঘটে গেছে, বিরোধ ঘটে গেছে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন অবস্থান নিয়ে ফেলেছে। আমাদেরকে এখন ঠিক করতে হবে যে আমরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রটাকে টিকিয়ে রাখতে চাই কিনা? এটা পহেলা বিবেচনা। দুই নম্বর হলো রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখার জন্য কোন শ্রেণীগুলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সরকার যদি মনে করে যে জনগণের উপরে ভিত্তি করে তাকে চলতে হবে তাহলে জনগণে প্রতি তাকে ক্রমাগত সংকেত দিতে হবে। এ বাজেটে সেই সিগন্যাল আমরা পাইনি। খালিশপুরে শ্রমিকদের লে অফ করার মধ্য দিয়ে এই সরকারের গণবিরোধী চরিত্রই আমাদের দেখতে হবে। যদি এই দেশের মানুষ একটা রক্তাক্ত বিভাজনের দিকে চলে যায় তাহলে এর জন্য তারাই পুরোপুরি দায়ী হবে।

সাপ্তাহিক ২০০০ : আমাদের এখানে যখনই এনার্জি সিকিউরিটি নিয়ে কথা ওঠে তখনই...

এনার্জি সিকিউরিটি আমাদের একটা ইস্যু এতে কোনো সন্দেহ নাই। এটা বলার কোনো কারণ নাই যে এনার্জি সিকিউরিটি আমাদের লাগবে না। অবশ্যই আমাদের লাগবে। তাহলে তো কয়লা, গ্যাস, তেল ইত্যাদি কী আছে না আছে তার হিশাব নেওয়ার দরকার আগে। অথচ তার আগেই আমরা বেচাবিক্রি করে দিতে চাইছি । এনার্জি নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে হয়তো বিক্রি করাটাই বিপজ্জনক হবে ভবিষ্যতে।

ওপেন পিট দিয়ে তুলতে, এশিয়া এনার্জি– যার কোনো নাম আমরা জানি না, কিছু জানি না, তাদের যেন ডেকে আনা হচ্ছে, কেনো? পরিবেশ ধ্বংস করা টেকনলজিই বা কেনো? জানুয়ারির ১ তারিখে যে ঘটনাটা ঘটালো— মনে হচ্ছিল যে সরকার যেন টাটা, এশিয়া এনার্জির জন্যই কাজ করছে। এশিয়া এনার্জি আবার গ্লোবাল কোল ম্যানেজমেন্ট নাম বদলিয়ে আমাদের সংশয় বাড়িয়ে দিয়েছে। এগুলো কী? আমাদেরকে ন্যাশনাল সিকিউরিটির কথা ভেবে এনার্জির প্রশ্ন সুলভ করতে হব।

মাটির নিচে কী পরিমাণ গ্যাস বা খনিজ সম্পদ আছে, কি তথ্য এ সরকারের কাছে আছে? এ সরকারের কাছে কোনো তথ্য যে নেই এটা আমি ঘোষণা দিয়ে বলতে পারি। একটা ছোট্ট তথ্য দেই যে সুনামির পরে বেইজ পরিবর্তনটা হয়েছে যার কারণে ইন্টারন্যাশনালি আমরা কাগজপত্র পাচ্ছি, কানাঘুষা শুনছি যে তেলের বড়ো পাটাতন বঙ্গোপসাগরের দিকে চলে এসেছে। আমি বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু জানা দরকারি। আমাদের সীমানার মধ্যে তেলের বিশাল ক্ষেত্র চলে আসছে। সরকারের কাছে এর কি তথ্য আছে? রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আছে?

অন্যদিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারত– অর্থাৎ জীবশ্মনির্ভর প্রতিটি পুঁজিতান্ত্রিক দেশের মধ্যে শক্তি নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছে, শক্তির দ্বন্দ্বের মাঝখানে চ্যাপ্টা হয়ে যাবার ভয় আছে আমাদের। তেল, কয়লা, গ্যাস থাকাও একটা আপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের। এনার্জির প্রশ্নে কেউ আমাদের বন্ধু নয়, আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যতো সহজ আমরা মনে করি, কাজটা ততো সহজও নয়।

সাপ্তাহিক ২০০০ : জঙ্গিবাদের নামে বাইরে থেকে টাকা আসছে বলে জাতিসংঘের একটা প্রতিনিধিদল সম্প্রতি কথা বলে। আমরা এই জঙ্গিবাদ, তার অর্থায়নের বিরুদ্ধে কীভাবে ফাইট করবো?

আমরা জঙ্গিবাদ শব্দটি কেনো ব্যবহার করি? কারা করি? জর্জ বুশ আর টনি ব্লেয়ারের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে যাদের কণ্ঠস্বর মিলে যায় তাদের কথা বাদ দিন। আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা আকারে বিচার করুন। কোনো একটা দল তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিলিটারি মিনস বা কোনো জঙ্গি মিনস নিচ্ছে, তাকে আমরা নিন্দা করছি। কিন্তু এই রাজনৈতিক বলপ্রয়োগের সঙ্গে আইন, সংবিধান নতুন রাষ্ট্রের উত্থান নানা প্রশ্ন রয়েছে। আইনের দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এইসব নিয়ে বিস্তর লেখালিখি করেছে। আমাদের সমাজে সেইসব নিয়ে আলোচনা কোথায়? জঙ্গিত্বের সঙ্গে সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদির সম্পর্ক বিচারের মুশকিল থেকেই যাচ্ছে। তাহলে কেনো নিন্দা করছি? রাজনীতির মধ্যে এটা তো ভেলিড একটা পথ হতেই পারে। কেনো একটা রাজনৈতিক দল এ ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করে? বা সহিংস উপায়কেই একমাত্র পথ মনে করে? যখন সোসাইটির

মধ্যে ডায়লগের কোনো সুযোগ থাকে না। কথাবার্তা নাই, কেউ কারো কথা শোনে না, তখন পুরো সমাজই আসলে জঙ্গিবাদের শর্ত তৈরি করে দেয়। আপনি যদি জেনুইন পলিটিক্যাল গ্রুপ হন। আপনি খুব খারাপ আদর্শ প্রচার করছেন। যার বিরোধিতা হওয়া দরকার। রাজনৈতিকভাবেই। যখন এই ধারা দেখছে যে, তারা তাদের কথাটা সমাজে হাজির করতে পারছে না, হাজির করার কোনো সুযোগ নাই, সমাজ ক্রমাগত তাকে দাবিয়ে রাখছে, তাকে ডায়ালগের সুযোগ দিচ্ছে না, তখন আমরা নিজেরাই আসলে জঙ্গিবাদের জন্ম দিলাম। তাহলে জঙ্গিবাদের ক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে যে, সোসাইটির মধ্যে ডায়লগ নাই...কেনো নাই?

গণমাধ্যমগুলোই বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের জন্য অনেকটা দায়ী। বাংলাদেশে গণমাধ্যমগুলো যদি '৭১-এর পর এই ডায়লগটা শুরু করতো যে আমাদের বাঙালির মধ্যে ইসলামের ভূমিকাটা কী, তাহলে আজকের সমাজ ও রকম বিভক্ত থাকতো না। সেক্যুলারিজম বলতে আমরা যেটা করেছি এটা একান্তই ইসলাম ফোবিয়া। এন্টি ইসলামিক সেন্টিমেন্ট প্রকাশ করা ছাড়া কিছুই ছিল না। এখনো নাই। এই ডায়লগটা আমাদের দরকার ছিল। এ ডায়লগটা থাকলে আমরা বুঝতাম যে, নতুন রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে আমাদের কালচারের মধ্যে কতটুকু আমরা ভাষা ও সংস্কৃতি এবং কতোটুকু আমাদের ধর্ম পরিচয়ে অবস্থান দেবো। কতোটুকু দেবো না। যদি থাকতো তাহলে রাষ্ট্র দাবি করতে পারতো যে আমি কথাবার্তা, ডায়লগের সুযোগ দিয়েছি কিন্তু তার পরেও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যারা জঙ্গি অবস্থান নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কনভেনশনাল মিলিটারি মিনস আমাদের লাগবে এই জঙ্গিবাদ দমনের একমাত্র উপায়, আর কখন শুধু ডায়লগ আর সম্ভব না। তখন কনভেনশনাল মিলিটারি মেথডস গ্রহণ করতে রাষ্ট্র বাধ্য। কারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের কাজ।

দেখা যায় আমাদের সমাজে, গণমাধ্যমের মধ্যে একটা গ্রুপ রয়েছে যাদের অপপ্রচারই আসলে জঙ্গিবাদ উসকে দিচ্ছে। তারা প্রচার করছে, ইসলাম মাত্রই একটা বর্বর ধর্ম। তাহলে আপনি কী করে বুঝবেন যে একটা তথাকথিত জঙ্গি, সে একটা বোমা ফাটায় 'আল্লার দল' নামে। সে মিটিং করলো। তাকে যে মোসাদ অপারেট করেনি বা বোমা ফাটার জন্য পয়সা দেয়নি কেউ কী করে বুঝবেন? এগুলো তো এজেন্সির, গণমাধ্যমগুলোর জানানোর কথা। তারা যদি করেও থাকে তাহলে তাদেরকে বলতে হবে যে তোমরা কী চাও? তোমরা কেনো এই দল করছ? এই দল করার জন্য বা তোমাদের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য বোমা ফাটানোর কী দরকার? তাদের বলতে হবে আসো আমরা আলোচনা করি, দশজনকে তুমি তোমার দলে টানতে পারো কিনা সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে আমাদের সমাজে। ন্যায়বিচার আছে এবং তার কথা শোনার সংস্কৃতি আছে আমাদের।

যতক্ষণ না আমরা খোলা মনে পরস্পরের সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে কথাবার্তা বলতে পারছি, যুক্তি, বিচার ও জ্ঞানচর্চার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে না পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত জঙ্গিবাদের প্রশ্নের সমাধান হবে না। এটা কি কালচারাল, এটা কি, আইডেলজিক্যাল সমাধান না কনভেনশনাল মিলিটারি কায়দায় সমাধান হবে– এ প্রশ্নটাই তো আমরা তুলিনি। তুলতে জানি না। এ ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা কী? এজ এন ইন্টেলেকচুয়াল? এই প্রশ্নটাকে সুন্দর করে হাজির করা এবং ডায়লগের জায়গাগুলো তৈরি করা। দ্বিতীয়ত, যে টেররিজমের কথা চলছে বাংলাদেশে এটা চূড়ান্তভাবে আমেরিকান সন্ত্রাসবাদ নির্মূল অভিযানের অংশ। আমি এটার ঘোরতর বিরোধী। এই জন্য নয় যে আমি মার্কিন বিরোধী বা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। না, সেটা আলাদা প্রশ্ন। আমি এই কারণে বিরোধী যে এর দ্বারা এই রাষ্ট্র টেররিজম বা জঙ্গিবাদ কখনোই মোকাবিলা করতে পারবে না। বরং মার্কিনি নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জঙ্গিবাদ উসকে দেওয়া। অতএব জঙ্গিবাদ মোকাবিলা করতে চাইলে মর্কিন এন্টিটেররিজম নীতি থেকে অবিলম্বে দূরে সরে আসতে হবে।

আরেকটি বিষয় হলো, মানি লন্ডারিং। যুক্তরাষ্ট্র বলছে যে, মানি লন্ডারিংটা হচ্ছে তাদের জঙ্গিবাদ দমনের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপায়। আমাদের দেশে তাদের নিয়োগপ্রাপ্ত লোকজন রয়েছে। এফবিআইয়ের যে লোক রয়েছে তাদের কাজ হলো মানি লন্ডারিং বন্ধ করা। আমাদেরকে সিকিউরিটি নিয়ে কথা বলতে সুযোগ দেয়া হয় না। হবে না। তারপরেও আমরা সাহস নিয়ে লিখছি, কারণ সাধারণ জনগণকে তো আমাদের বাঁচাতেই হবে। আমি গরিব খেটে খাওয়া শ্রমিক কৃষকদের লোক। আমি তাদের বাঁচাতে চাই। কর্পোরেশানগুলো এসেনশিয়ালি চায় তাদের প্রপারটিগুলো রক্ষা করার জন্য র‍্যাব-জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক। তাহলে র‍্যাব কার ইন্টারেস্ট সার্ভ করে? স্পেশালি কর্পোরেশান বা বিজনেস কমিউনিটির স্বার্থ। পিপলস ইন্টারেস্ট কী করে তারা সার্ভ কবে? তারা তো তার ট্রেনিংই পায়নি। বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক এক পরাশক্তির অধীন করার জন্য যেসব লোক এ দেশে কাজ করে তাদেরও তো আধিপত্য। ফলে সেনাবাহিনী তো নতুন করে কিছু একটা ভাববে, ইতিবাচকভাবে নতুন কিছু ভাবাতে পারবেন না। ঐ গণমুখী ট্রেনিং তো তাদের দেয়া হয় নাই। আমি মনে করি প্রত্যেকটি নাগরিককে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা দিতেই হবে। যদি এই ছোট্ট দেশকে বাঁচাতে হয়। এর কোনো বিকল্প নাই। তার পরে আমাদের দেখতে হবে কী ধরনের ট্রেনিং কী ধরনের পদক্ষেপ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। বিদেশ থেকে দুইটি মিগ-২৯ আনলেন কি ফ্রিগেট কিনলেন এতে আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে না। একটা হিউম্যান নিরাপত্তার দিকে আমাদের যেতে হবে। আমাদের দেখতে হবে বৃহত্তর আঞ্চলিক যে লড়াই সংগ্রাম চলছে– তার আলোকে– একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই সংগ্রাম হচ্ছে তার আলোকে– আমাদের একটা নিরাপত্তা নীতি, প্রতিরক্ষা নীতি দরকার। সেই নীতিটা

কনভেনশনাল মিলিটারি নীতি নির্ভর নয় বা হার্ডওয়্যার সর্বস্ব হবে না। একই সঙ্গে ইন্টেলেকচুয়াল নীতিও বটে। এই যুদ্ধে জিততে হবে বুদ্ধি দিয়ে, অস্ত্র এই যুদ্ধে সহায়ক না হয়ে বাড়তি ঝামেলা হতে পারে। আমাদের দরকার দক্ষ, বুদ্ধিমান ও ভবিষ্যৎ দেখতে পারে এই ধরনের সৈনিক। সুযোগমতো যন্ত্রপাতি আমরা আনবো, কাজে লাগাবো। কিন্তু লোকবলই যেখানে নাই সেখানে যন্ত্রপাতি দিয়ে কী হবে? তাছাড়া আমরা যদি বাঙালি বাংলাদেশীই বিভক্ত থাকি তাহলে সব সময়ই আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। এই বিভাজন মীমাংসা জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতির অংশ হতে হবে। এই সবকিছুকেই আমি সংক্ষেপে বলি 'গণপ্রতিরক্ষা'।

সাপ্তাহিক ২০০০ : অনেকে বলছেন জাতীয় সরকার, জাতীয় নিরপেক্ষ কাউন্সিল গঠনের কথা। এক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী কী?

আমার অবজারভেশান হলো জানুয়ারি ১ তারিখের পরে পরাশক্তি এবং সেনাবাহিনীর যোগসাজশে যে সরকার এসেছে সেই সরকার জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য না। এ সরকার জনগণের সাংবিধানিক এবং মৌলিক অধিকার হরণ করে এসেছে। এই জায়গাটা মেনে নিয়ে যদি সে ইতিবাক কাজ করতে চায় তাহলে তার প্রথম কাজ জনগণকে বুঝানো হবে পরাশক্তির ছায়া থেকে তারা বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে। দ্বিতীয়ত বুঝাতে হবে, জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য তারা বদ্ধপরিকর। বাজেটে এই দুটো ক্ষেত্রেই তারা ব্যর্থ হয়েছে। এই বাজেটের মধ্যে তার প্রতিফলন আমরা দেখিনি। তৃতীয়ত বাংলাদেশের জন্য আমাদের গণনিরাপত্তা নীতি এবং গণপ্রতিরক্ষা নীতি দরকার।

যদি আমরা দুর্নীতি দমনই করতে চাই তাহলে শুধু দুই-একজন লোককে ধরে নিয়ে পিটিয়ে তার কাছ থেকে তথ্য আদায় করে আদালতে দোষী সাব্যস্ত করা কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নয়। যখন জরুরি অবস্থা উঠে যাবে তখন আদালতেও এই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না বলেই তো বিশেষজ্ঞরা বলছেন। অথচ সত্য হলো আসলে লোকগুলো দুর্নীতিগ্রস্ত।

এ সরকারকে বলতে হবে দুর্নীতি দমন করতে চাই। তাহলে জনগণের কাছ থেকে দুর্নীতি প্রশ্নে গণভিত্তি তৈরি দরকার। সেটা করতে হলে একটি নতুন কনস্টিটিউশনাল প্রসেস তৈরি করতে হবে। জাস্টিফাই করতে হবে। অকপটে স্বীকার করতে হবে আমরা একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার না, আমরা সাংবিধানিক সরকার না – আমরা একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তারা যদি বলে যে আমরা একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই অর্থে বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কার করে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমরা উপহার দিতে চাই। আমাদের আগামী দিনের কল্যাণের জন্য। আমাদের একটি বিকাশের জন্য এটা দরকার। সেই দিকে যদি পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়ে সামনের দিকে এগোনো যায় তাহলে এই যে বিভিন্ন পার্টি গঠন করে ড. ইউনূসকে দিয়ে, ড. কামাল হোসনকে

দিয়ে, কোরেশীকে দিয়ে তাদের বৈধতা পাওয়ার কোনো দরকার নাই। জনগণের মন জয় করতে হবে। কামাল হোসেনের মন জয় করলে লাভ হবে না। মন জয় করতে হবে কৃষকের। শ্রমিকের। কোরেশীর মন জয় করলে লাভ হবে না। তাদেরকে খেটে খাওয়া মানুষের মন জয় করতে হবে। দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক মন্ত্রী-এমপিদের মন জয় করলে চলবে না। মার্কিন দূতাবাসের, ব্রিটিশ হাইকমিশান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইত্যাদির মন জয় করলে লাভ হবে না। যদি তারা এখানে সফল হতে চায়, সেই ক্ষেত্রে প্রথম মানদণ্ড হবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা যাবে না। এটা যদি তারা না করে, জনগণের সঙ্গে যদি বিচ্ছিন্নতা ঘটে, তাহলে আমি যেটা আশংকা করছি একটা রক্তাক্ত বিভাজনের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

সাপ্তাহিক ২০০০ : নিরঙ্কুশ ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশসহ কোনো দেশের রাজনৈতিক মঙ্গল আনেনি। আমাদের গণতান্ত্রিক আমলের ক্ষমতাও তো...

নিরঙ্কুশ ক্ষমতাটা জনগণের কাছে থাকে, জনগণ সেটা হস্তান্তর করে ভোটের মাধ্যমে সংসদে। আসলে সংসদ সিদ্ধান্ত নেয় না। হয় প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কেউ সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে আমরা তো একনায়কতন্ত্রের মধ্যেই আছি। আমাদের সংবিধানও আসলে সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্রের একটা নজির। একনায়কতন্ত্রটা কি সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্র অথবা অসাংবিধানিক একনায়কতন্ত্র সেই তর্ক অর্থহীন। সুতরাং একনায়কতন্ত্র আমাদের সমস্যা না। এই একনায়কী ক্ষমতা জনগণের পক্ষে না বিপক্ষে এটাই হলো আমাদের বিতর্কের বিষয়। ক্ষমতা কায়েম করবার নৈতিক ও আদর্শিক হিম্মত দেখায়, তাতে অসুবিধা কোথায়? বুর্জোয়া গণতন্ত্র কি শাসক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র নয়? আমাকে দেখতে হবে আমার গরিব মানুষ উপকৃত হচ্ছে কি না। আমার কৃষি উপকৃত হচ্ছে কি না, আমার শ্রমিক বেতন ঠিকমতো পাচ্ছে কিনা, আমাদের কলকারখানা ঠিকভাবে চলছে কি না, এটাই আমি দেখবো।

কিন্তু যখন খালিশপুরে দুই জন শ্রমিক না খেয়ে মারা যায়, এই খবর পত্রিকায় পড়ি, তখন আমার মধ্যে ক্রোধ ফুঁসে ওঠে। কারণ আমি তাদের লোক....।